শান্তির মিনার

একযুগ পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মারক

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

ঢাকা মহানগরী পূর্ব

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক
রাশেদুল হাসান রানা

সম্পাদক
রেজাউল হক রিয়াজ

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ আব্দুল কাদের

সম্পাদনা সহযোগী
শরিফুল ইসলাম
রওশন জামান
তোজাম্মেল হক
সোহেল রানা মিঠু
মতিউর রহমান
মো: গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া
আব্দুল্লাহিল কাফী মামুন
এস এম মনিরুজামান
তসলিম আলম
গোলাম সাদেক
আমিরুল মোমেনীন তালুকদার
ইমাম হোসাইন
আশ্রাফ উদ্দিন
শরিফুল ইসলাম
রায়হান উদ্দিন

উপদেষ্টামণ্ডলী
দেলাওয়ার হোসেন
নুরুল ইসলাম বুলবুল
সেলিম উদ্দিন
ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ
আবদুল জববার
ইয়াছিন আরাফাত
মোবারক হোসেন
শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির

কৃতজ্ঞতায়
ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম
ডা: ফখরুদ্দিন মানিক
এডভোকেট হেলাল উদ্দিন
শামসুর রহমান
মোহাম্মদ কামাল হোসাইন
ছগির বিন সাঈদ
মোকারম হোসাইন

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৩

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ঢাকা মহানগরী পূর্ব

মূল্য
২৫০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

সূচি

বানী ০৪
সম্পাদকীয় ১১

প্রবন্ধ

শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপ ১৪
প্রিয় সাথী শহীদ আবদুল মালেক ২৭
ইসলামী নেতৃত্ব ৩৭
বহুমুখী সন্ত্রাসের শিকার বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ৪৪
ইতিহাস ঐতিহ্য ও মুসলিম জাগরণ ৫৭
ঈমানের জাগরণ ও শাহাদাতের উজ্জীবন ৬৪
২৮ অক্টোবর: ইসলামী আন্দোলনের অনিবার্য বাস্তবতা ৭০
স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতিতে ইসলামপন্থীরা অবশ্যই ফ্যাক্টর ৭৫
ভারতীয় পানি আগ্রাসন : ফারাক্কা থেকে টিপাইমুখ ৮২
ওরা বাংলাদেশকে '৩২ নম্বর' মনে করে ৮৮
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন ৯৪
বাংলাদেশের অবস্থান ভূ-রাজনীতি পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমাদের করণীয় ৯৭
শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা একটি প্রেরণা একটি ইতিহাস ১০৮
শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার চিঠি ১২০
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির একটি একক ও অনন্য
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং নেতৃত্ব তৈরির কারখানা ১২৮
শাহাদাতের রক্তে সিক্ত জমিনে সুদৃঢ় বন্ধন ১৪৬
যে স্মৃতি বেদনার, প্রেরণার ও সম্মুখে এগিয়ে যাবার ১৪৮
তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতা ও আমাদের সংস্কৃতিচর্চা ১৫৩
অধ্যাপক নাজির আহমদ একটি বিপ্লবী চেতনার নাম ১৫৮
জুলুম : পীড়িতের অশ্রু পীড়কের পরাজয় ১৬২
ইন্টারনেট : ঈমান, আখলাক ও বুদ্ধি-বিবেকের পরীক্ষা ১৬৫
কামাল আতাতুর্কের উত্তরসূরিরা কি এখন বাংলাদেশে? ১৭৫
স্বপ্ন ও প্রত্যাশার ঘুড়ি ১৭৯
মিয়ানমারে গণহত্যা : জেগে উঠো মুসলিম বিশ্ব ১৮৬
অশ্রুসিক্ত ২৮শে অক্টোবর ১৯১
স্মৃতিতে আরিফ মঈনুদ্দীন ১৯৭

শহীদ স্মরণে

প্রিয় ভাই মরহুম আমজাদ হোসাইন ২০১
শহীদ ঈদগাহ সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া ঢাকা ২০৬
আমার কুরআনে হাফেজ ছেলেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে
তার দাঁত পর্যন্ত শহীদ করেছে ২১০
রক্তে রঞ্জিত সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া ২১২
রক্তে রঞ্জিত সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া ২১৪
শহীদ মাসুম আমার প্রেরণা ২১৭
শহীদ পরিচিতি ২১৮

স্মৃতি চারণ

কষ্টের মুহূর্ত ২২৮
স্মৃতিময় F10 ২৩২
মিডিয়া ও তথ্যসন্ত্রাসের শিকার ছাত্রশিবির ২৩৪
ঝরা পাতা ২৩৮
সেই আমি এই আমি এবং ইসলামী ছাত্রশিবির ২৪২
সাবেক সভাপতিদের সাক্ষাৎকার ২৫১
পরিচিতি ২৭৬
কবিতা ২৯২
পত্রিকার পাতায় ২৯৮
অ্যালবাম ৩০১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

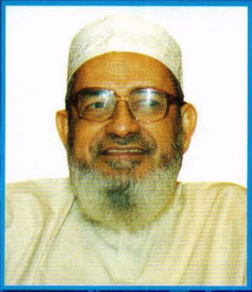

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বাণী

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা সায়্যিদিল মুরসালিন। ওআলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন। পৃথিবীর শুরু থেকে অদ্যাবধি দ্বীনের পথে সকল শহীদদের মাগফেরাত কামনা করছি। দীর্ঘায়ু কামনা করছি ইসলামী আন্দোলনের সকল নেতাকর্মীদের। পৃথিবীতে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব চলে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকে, বাতিল শক্তিরা সত্যের আলোকে নিভিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছে বারবার, তাদের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে সত্য পথের পতাকাবাহীরা, তবু নিভে যায়নি সত্যের আলোক মশাল।

দেশের বিরাজমান অবস্থার পটপরিবর্তনের একটা সময়ে মানুষ মুক্তির প্রহর গুনছিল ঠিক সেই সময়ে ১৯৭৭ সালে ছাত্রশিবিরের যাত্রার সূচনা ছিল এ দেশ ও জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। দীর্ঘ ৩৬ বছরের পথচলায় ছাত্রশিবিরকে অতিক্রম করতে হয়েছে কঠিন কণ্টকাকীর্ণ পথ। সেই ধারাবাহিকতায় রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখায় পল্টন এলাকায় আওয়ামী বাতিল শক্তির হিংস্র থাবায় সংঘটিত হয় বাংলাদেশের এক কলঙ্কজনক ইতিহাস ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর। শহীদ হন ৭ জন আর আহত হয় অসংখ্য।

কালের পরিক্রমায় ১৮৬ জন শহীদ ভাইয়ের দীর্ঘ তালিকায় ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখায় ৫ জন ভাইয়ের রক্ত ঢাকা মহানগরী পূর্ব ইসলামী আন্দোলনে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মাঝে ইসলামের সুমহান আদর্শ উপস্থাপন ও জাতির ক্রান্তিকালে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার একযুগ পূর্তি উপলক্ষে ইতিহাস সঙ্কলনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা সত্যিই সময়োপযোগী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রেরণাদায়ক। এ উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী পূর্ব কর্তৃক "শাণিত মিনার " নামক স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগের প্রশংসা ও সফলতা কামনা করছি। আমিন।

মকবুল আহমদ
(ভারপ্রাপ্ত) আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

বাণী

এক দশকের পথচলায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা ইসলামী আন্দোলনের কাজে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। রাজধানীর স্বনামধন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মাঝে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে এ মহানগরীর প্রত্যেক জনশক্তি নিরলস কাজ করে গেছেন। শাখার ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী পূর্ব স্মারক প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত।

ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক বিস্তৃতির একটি বড় প্রমাণ ঢাকা মহানগরী পূর্ব। উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত ঢাকা মহানগরীকে ২০০৪ সালে চার ভাগে ভাগ করা হয়। ঢাকা মহানগরী উত্তর, দক্ষিণের সাথে যোগ হয় ঢাকা মহানগরী পূর্ব ও পশ্চিম। বিভক্তির মাধ্যমে সাংগঠনিক শাখা বৃদ্ধিকরণ রাজধানীতে ছাত্রশিবিরের কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মহানগরী পূর্ব সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে চলছে। চলমান আন্দোলনসহ বিগত এক দশকের যে কোন সঙ্কটকালে এই মহানগরীর দায়িত্বশীল থেকে শুরু করে প্রতিটি কর্মীর ত্যাগ রাজধানীতে ছাত্রশিবিরকে সুদৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ১৯৭৭ সালে ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ছাত্রসমাজ এই সংগঠনের সাথে থেকে বাংলাদেশকে একটি ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করতে কাজ করে যাচ্ছে। সৎ ও মেধাবী নেতৃত্ব তৈরির লক্ষ্যে ছাত্রশিবির প্রায় চার দশকের এই পথচলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ছাত্রশিবির সৎ, দক্ষ ও মেধাবী নেতৃত্ব তৈরির ধারাবাহিকতায়ই বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে সোনার বাংলায় পরিণত করতে পারবে। বাংলাদেশের জনগণও সে আশা নিয়ে ছাত্রশিবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। ছাত্রসমাজকে দেশ পরিচালনায় যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে রাজধানীতে সংগঠনের কাজকে আরো বিস্তৃত করার কোন বিকল্প নেই। বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, সময়ের চাহিদার আলোকে কাজের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে রাজধানীর ছাত্রসমাজকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

এক দশকের পথচলায় এই মহানগরীর শাহাদাতবরণকারী ভাইদের আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। চলমান অপশাসনবিরোধী আন্দোলনসহ অতীতে যে কোন আন্দোলনে নির্যাতিত নেতাকর্মীদের জন্য রাব্বুল আলামীনের দরবারে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। এক দশকের অভিজ্ঞতা নিয়ে ঢাকা মহানগরী পূর্ব ইসলামী আন্দোলনের দুর্বার ঘাঁটিতে পরিণত হোক, সেই প্রত্যাশাই করছি।

মো. দেলাওয়ার হোসেন
কেন্দ্রীয় সভাপতি

www.pathagar.com

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

বাণী

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার এক যুগ পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্র পরিবেশ রক্ষা করা, নৈতিক ও আত্মিক চরিত্র গঠন, লেখাপড়া, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং আগামী দিনে সৎ যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশের ক্রান্তিকালে ইসলামী ছাত্রশিবির গঠনমুলক ভূমিকা পালন করে যাবে এবং তা শত প্রতিকুলতার মাঝেও অব্যাহত রাখবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আমি তাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

www.pathagar.com

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বাণী

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য। দরূদ ও সালাম সায়্যিদিল মুরসালিন খা'তামুন্নাবিয়্যিন, মানবতার মুক্তির মহান দূত হযরত মুহাম্মদ (সা) সহ সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর। সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করছি সকল শহীদদের বিশেষ করে যারা বাংলাদেশে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য। দীর্ঘায়ু কামনা করছি পৃথিবীর দিকে দিকে নির্যাতিত ইসলামী আন্দোলনের সকল কর্মীদের।

ইসলামী ছাত্রশিবির বাংলাদেশের পথহারা তরুণ-যুবসমাজের আলোর দিশা। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়দীপ্ত কাফেলা হিসেবে শিবির ইতোমধ্যে যুবসমাজের হৃদয়ে জায়গা নিতে সক্ষম হয়েছে। গঠনমূলক ছাত্ররাজনীতির পাশাপাশি বিভিন্ন সময় সরকারের অন্যায়, অত্যাচার আর দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রায়ই এই সংগঠনটি নির্যাতনের শিকার হয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের ওপর সরকারের পেটোয়া বাহিনীর নির্যাতন সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। শাহাদাত বরণ করেছে কয়েক শতাধিক নেতাকর্মী এবং পঙ্গুত্ববরণসহ জেলে ঢুকতে হয়েছে কয়েক সহস্রাধিক নেতাকর্মীকে। এরপরও সকল অন্যায় জুলুম সহ্য করার মধ্য দিয়েই চালিয়ে আসছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ঢাকা মহানগরী পূর্ব রাজধানী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এখানে সংঘটিত হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে ঘৃণিত ও কালো অধ্যায় ২০০৬ সালের ২৮ শে অক্টোবর যা বাংলাদেশসহ সারবিশ্বের মানুষ সেদিন মিডিয়ার মাধ্যমে দেখে বিস্মিত হয়েছিল।

"শাণিত মিনার" নামক স্মারক প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আমার বিশ্বাস এই মুহূর্তে ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার এই স্মারকটি প্রকাশ করে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সমৃদ্ধ করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনশক্তিদের প্রেরণা জোগাবে। জাতির সামনে আওয়ামী দুঃশাসনের সঠিক মুখোশ উন্মোচন করতে সক্ষম হবে। সর্বশেষ আমি এই স্মারক-এর সফলতা কামনা করছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামী ছাত্রশিবিরের এই মহান মেহনতকে কবুল করুন। আমিন॥

মাওলানা রফিকুল ইসলাম খাঁন
আমীর, ঢাকা মহানগরী

www.pathagar.com

ইসলামী ঐক্যজোট

বাণী

আমি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার একটি স্মারক প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এতে বর্তমান সরকারের শাসনামল সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভসহ রাজধানীর এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ঘটে যাওয়া আন্দোলন-সংগ্রামের অনেক ঘটনা বিশেষ করে ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর পল্টন ট্র্যাজেডি যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কলঙ্ক সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবেন এই স্মারকের পাঠকবৃন্দ।

আধুনিক জাহেলিয়াতের এ সময়ে ইসলামের আদর্শ নিয়ে টিকে থাকা এবং ইসলামের পক্ষে কথা বলা একটি কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন সময় বিশেষ করে গত পাঁচ বছর ইসলামী আন্দোলন ও দ্বীনি শিক্ষার ওপর যে নির্যাতন এসেছে তা ইসলামী আন্দোলন হিসেবে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরকে বেশি সহ্য করতে হয়েছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এই ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্রদের মাঝে ইসলামী অনুশাসন পালনে অনুভূতি জাগ্রত করা, উন্নত ক্যারিয়ার গঠন, চরিত্র গঠন, সুস্থসংস্কৃতি চর্চাসহ দেশের ক্রান্তিকালে আন্দোলন সংগ্রামে রাজপথে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে আসছে।

"শাণিত মিনার" নামক স্মারক ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চলার পথে উৎসাহ প্রদান করবে বলে আমি আশা করি। বর্তমান জুলুমবাজ এবং ইসলামবিদ্বেষী সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ইসলামী ছাত্রশিবির দেশের ছাত্রসমাজের মাঝে ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার করায় আমি তাদের সফলতা কামনা করি।

মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী
চেয়ারম্যান

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

সভাপতির বাণী

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এদেশের ছাত্র সমাজকে মেধা, নৈতিকতার সমন্বয়ে উপযুক্ত মানুষ হিসেব গড়ার কারিগর হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে কাজ করে যাচ্ছে। যা এদেশের ছাত্রসমাজের জন্য আল্লাহর এক বড় নেয়ামত। শহীদি রক্তে হেসে উঠেছে এদেশের তরুণ যুবসমাজের সংগ্রামী বিশাল এই শহীদি কাফেলা, একটি একটি করে এ সংগ্রামী কাফেলা পেরিয়ে এসেছে ৩৬ বছর। যা একটি ছাত্রসংগঠনের জন্য সহজ ব্যাপার নয়। অবশ্য পৃথিবীর সকল আন্দোলন সংগঠনকেই বাধা-বিপত্তি ও সমস্যার হিমালয়সম পাহাড় সাহসিকতার সাথে পার হতে হয়েছে। মুখোমুখি হয় অত্যাচার, নির্যাতন নিষ্পেষণ, অনাকাংখিত পরিবেশ পরিস্থিতি এবং দুর্দশার। পেশ করতে হয় কর্মী বাহিনীর তাজা রক্তের নজরানা। ঐ ধারাবাহিকতায় ইসলামী ছাত্রশিবিরও ব্যতিক্রম নয়। ফেলে আসা দিনগুলোতে নানা ঘটনা রটনা অপপ্রচার এবং অপশক্তির অপকৌশল, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতাকে মাড়িয়ে ছাত্রশিবির আজ এক গর্বিত আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও থেমে নেই বাতিলের হুংকার, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বক্তৃতা, বিবৃতি এবং লেখনির মাধ্যমে হয়রানি ও অবদমনের অপচেষ্টা, পলক পড়েনি আজও জালিমের রক্তচক্ষুর, প্রতিনিয়ত বর্ষিত হচ্ছে বারুদের নির্মমতা, তবুও থেমে নেই এই বিপ্লবী কাফেলার স্বর্ণালি ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনার ধারাবাহিকতা। থামবেও না কোন দিন কেননা সকল বিপত্তির মোকাবেলায় আমাদের দৃষ্টি সেই মঞ্জিলের দিকে উচ্চকিত। আমরা সবকিছু বিনিময় করি একটি মাত্র ঠিকানার আশ্বাসে যার নাম জান্নাত।

সংগঠন সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে ০৩ অক্টোবর ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার যাত্রা শুরু হয়। যাত্রালগ্ন থেকে এই শাখাটি সাহসী ভূমিকা পালন করে আসছে। রাজধানী ঢাকা অনেক ঘটনা ধারণ করে যার এগিয়ে চলা, '৯১ এর স্বৈরাচার পতন আন্দোলন, ৯৬ এর কেয়ারটেকার আন্দোলন, ২৮ অক্টোবরের গণতন্ত্র হত্যার কালো অধ্যায়। ১/১১ এর অগণতান্ত্রিক সরকারসহ নানা ঘটনা।

শহীদ আবদুল মালেক ভাইকে স্মরণ করছি, যিনি আমাদের প্রেরণার বাতিঘর, আজকের ঢাকার অলিতে গলিতে ছিল যার পদচারণা, যার পুরোটাই ছিল দ্বীন বিজয়ের জন্য নিবেদিত। তার পথ ধরেই আবদুল কাদের মোল্লা ভাইয়ের শাহাদাতের নজরানা। আবদুল খালেক, সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম, গোলাম কিবরিয়া শিপন, খলিলুর রহমান মানসুর হোসাইনদের দীর্ঘ সারি হয়েছে। তারাই আমাদের প্রেরণার উৎস। এগিয়ে যাবার সাহস। ঢাকা দেশের রাজধানী হলেও রাজধানীর পল্টন, মতিঝিল, মুগদা, সবুজবাগ, শাহজাহানপুর, রমনা, খিলগাঁও, রামপুরা লালবাগ, চকবাজার,

www.pathagar.com

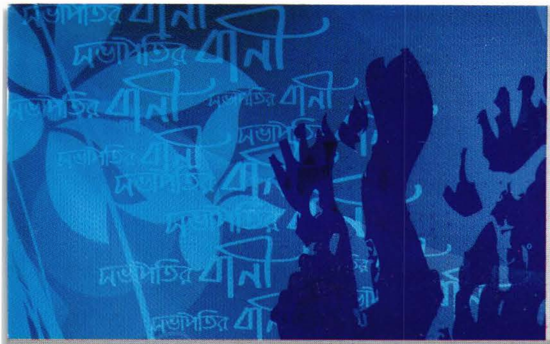

কামরাঙ্গীরচর, দেশের সর্বোচ্চ দ্বীনি বিদ্যাপীঠ সরকারি মাদরাসা ই আলিয়া, মিছবাহুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, সিদ্ধেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ হাবিবুল্লাহ বাহার বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এসব নিয়েই বর্তমান ঢাকা মহানগরী পূর্ব। এ জনপদের ছাত্রসমাজের মাঝেও ইসলামের সুন্দর সত্য পথ দেখিয়ে যাচ্ছে ছাত্রশিবির। যেখানে ইসলামী আন্দোলনের কাজ চলছে তার নিজস্ব গতিতে।

ছাত্রশিবির এদেশের ছাত্রসমাজের জন্য এক আলোকবর্তিকা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। হতাশাগ্রস্ত ছাত্রসমাজের জন্য শিবির এক অমিয়ধারা। এত ছাত্রকল্যাণমূলক কাজ নিয়ে দীপ্ত প্রত্যয়ে এগিয়ে যাবার পরও আজ শিবিরের পথচলা কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। তবুও শত বাধা প্রতিকূলতার মধ্যে দৃঢ়কণ্ঠে আমরা বলছি এবং বলব

"আসুক না শত বাধা তবুও পথ যদি হয় মুক্তির
সব বাধা পেরিয়ে যাবোই যাবো, বলুক না
যত কথা মুক্তির।"

মহান রবের দরবারে কায়মনোবাক্যে শুকরিয়ার মস্তক অবনত করছি যার দয়ায় ঢাকা মহানগরী পূর্বের এই দীর্ঘ ১২ বছরের প্রথম স্মারকটি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, আশা করছি এই স্মারকটি এই জনপদের প্রত্যেক জনশক্তির স্মৃতি জাগানিয়া হয়ে আলোকবর্তিকা হিসেবে পথনির্দেশ দানে সক্ষম হবে। ঢাকা মহানগরী পূর্বের শহীদি ময়দানে এটি এক অনবদ্য দলিল হিসেবে টিকে থাকবে যুগ যুগ ধরে । সে লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা এই স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের শহীদ আর জীবন্ত শহীদ ভাইদের প্রত্যয়দীপ্ত ত্যাগের ঋণ পরিশোধ করতে পারব না জানি তবে তাদের রেখে যাওয়া কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারলেই হয়ত কিছুটা শান্তি খুঁজে পাওয়া যাবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে স্মারক প্রকাশ একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার জেনেও আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। মহান আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমিন।

রাশেদুল হাসান রানা
সভাপতি
ঢাকা মহানগরী পূর্ব

www.pathagar.com

শস্য-শ্যামল সবুজে ভরা আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমির আকাশে কালেমার পতাকা উড্ডীন করার দৃঢ় প্রত্যয়ে এবং মেধাহীন, সন্ত্রাসনির্ভর, দুর্নীতির আষ্টে-পৃষ্ঠে আবদ্ধ রাজনীতি থেকে এদেশের ছাত্রসমাজকে মুক্ত করে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিব। ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ কাননে যে বীজ বপিত হয়েছিল, তা আজ দীর্ঘ ৩৭ বছরে পত্র-পল্লবে ও ফুলে ফলে সুশোভিত। একসময়ের ছোট্ট এই গোলাপ বৃক্ষটি আজ অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে স্বমহিমায় সৌরভ ছড়িয়ে অবিরাম গতিতে লক্ষ্য পানে এগিয়ে চলছে বাংলার সকল প্রান্তরে। একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশায় এদেশের ছাত্রসমাজকে সততা, যোগ্যতা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে একজন সোনার মানুষে পরিণত করার জন্য আলোর দিশারি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বিত প্রয়াসে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে ছাত্রশিবির এদেশের মুক্তিকামী ও শান্তিপ্রিয় ছাত্রজনতার একমাত্র আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ইসলামী ছাত্রশিবিরের গৌরবময় ও সাফল্যগাথা অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতায় ঐতিহ্যবাহী বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে অবস্থিত রাজধানী ঢাকায় ২০০২ সালে জন্ম লাভ করে ঢাকা মহানগরী পূর্ব নামে একটি শাখা। কালের পরিক্রমায়, সময়ে আবর্তনে ঢাকা মহানগরী পূর্ব আজ একযুগ অতিক্রম করে মঞ্জিল পানে এগিয়ে চলছে অবিরাম গতিতে। দীর্ঘ এই পথচলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বক্ষে ধারণ করে আগামী দিনের এই শহীদি কাফেলার কর্মীদের জন্য একটি "শাণিত মিনার" নির্মাণের মানসে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অনিয়ম, অনাচার, রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ আর নৈতিকতা বিবর্জিত নেতৃত্বের বিষবাষ্পে যখন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি কলুষিত সে মুহূর্তে আদর্শিক শক্তি ও নৈতিক চরিত্রে বিকশিত হয়ে সৎ,দক্ষ ও দেশপ্রেমিক মানুষ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সারা দেশের ন্যায় রাজধানী ঢাকাতেও নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আজও ইসলামের চরম শত্রু আবু জেহেল, উতবা, শায়েবা, আবু লাহাবের উত্তরসূরিরা আমাদের গঠনমূলক কোন কার্যক্রমকেই বাধাহীন ও কন্টকমুক্ত হতে দেয়নি। বরং আদর্শের লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে বেছে নেয় হিংসা, বিদ্বেষ, অপপ্রচার ও জুলুম নির্যাতনের বর্বরতম পন্থা। যাদের নির্মমতার শিকার হয়ে ১৯৬৯ সালে শাহাদাতের নজরানা পেশ করতে হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র, বিংশ শতাব্দীর তরুণ ও উদীয়মান নেতৃত্ব শহীদ আবদুল মালেক ভাইকে। তাদেরই উত্তরসূরিরা ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি মাদ্রাসা-ই আলিয়া ঢাকায় ১৯৮৯ সালে শাহাদাত বরণ করেন শহীদ আব্দুল খালেক ভাই। শহীদ আব্দুল খালেক ভাইয়ে শাহাদাতের শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই আবারও ১৯৯২ সালে ইসলামবিদ্বেষী শক্তির নির্মমতার শিকার হয়ে শহীদ হন আতিকুল ইসলাম দুলাল। তাদের প্রেতাত্মাদের হিংস্র দানবীয় থাবা লগি-বৈঠার রূপ ধারণ করে ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখায় পল্টন প্রান্তরে পরিণত হয় আরেক বদর প্রান্তর। সেদিন বিশ্ববিবেক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে বাকরুদ্ধ হয়েছিল। সংঘটিত হয়

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘৃণ্যতম আরেকটি কালো অধ্যায়। শহীদ মুজাহিদ, শিপন, ফয়সাল, জসিম আর মাসুম, খলিল, মনসুর আহম্মদসহ অসংখ্য গাজি রক্তে স্নাত হয় ঢাকার পিচঢালা রাজপথ। বাতিলের পাহাড়সম বাধা অতিক্রম করে রাজধানীকে প্রশান্তির জোয়ারে প্লাবিত করতে স্রোতস্বিনী নদীর মত দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে সত্য ও সুন্দরের এ মিছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞান আর তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় বিশ্ব পরিণত হয়েছে Global Village বা বিশ্ব গ্রামে, ঠিক তখনই একই "সুসভ্য" মানুষ আদর্শহীনতা ও নৈতিকশূন্যতার কারণে "নব্য জাহিলিয়াতে"-এর তিমিরে হাবুডুবু খাচ্ছে। যার ফলে লুণ্ঠিত হচ্ছে মানবতা, মায়ের কোলের ছোট্ট শিশুর নিষ্কলুষ রক্তে ভিজে উঠছে কাশ্মির, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনি তৃপ্ত মরুভূমি। পা খিঁচে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, মিয়ানমারে মুসলমানদের উপর অমানবিক নির্মম অত্যাচার চালিয়ে প্রকাশ্যে হত্যার হলিখেলায় মেতে উঠেছে। মনুষ্যত্বের পরম সত্তাকে পরিহাস করে মানুষের শবে লাথি মেরে অট্টহাসিতে মেতে উঠছে নব্য আজাজিল।

মানবতা আজ শান্তির শ্বেত কবুতরটি খোঁজে ফিরে বার বার। সমস্যার সঠিক উত্তরণ ঘটিয়ে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ গড়তে আজ খুববেশি প্রয়োজন এমন একদল দেশপ্রেমিক সাহসী মানুষের যারা যোগ্যতা ও চরিত্রের মাপকাঠিতে হবে পরীক্ষিত সোনার মানুষ, বিশ্বাসের দিক থেকে হবে সাচ্চা ঈমানদার। নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলীর সমন্বয়ে গঠিত হবে তাদের নেতৃত্ব। আর ঠিক এ উদ্দেশ্য পূরণেই ইসলামী ছাত্রশিবির আশার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হাতে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে প্রায় ছাত্র ও যুবসমাজকে ঘনঘটা অন্ধকারের গলি থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় নিবেদিত। ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার একযুগ পূর্তি উপলক্ষে স্মারক প্রকাশ করা অনেক কষ্টসাধ্য ও সময়ের ব্যাপার জেনেও আমরা এ উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। অনেকের অক্লান্ত শ্রম, আন্তরিক প্রচেষ্টা আর ত্যাগের বিনিময়ে প্রকাশ পেল এ স্মারক। যাদের প্রচেষ্টায় "শাণিত মিনার" নামক স্মারক প্রকাশ করা সম্ভব হল তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

সময়ের স্বল্পতা ও দেশের বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতি, আমাদের ব্যর্থতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি, ইতিহাস, মর্মস্পর্শী ও প্রেরণাদায়ক স্মৃতি তুলে ধরতে না পারার কারণে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা তার দ্বীনের পথে কবুল করুন। আমিন!

রেজাউল হক রিয়াজ
সেক্রেটারি
ঢাকা মহানগরী পূর্ব

www.pathagar.com

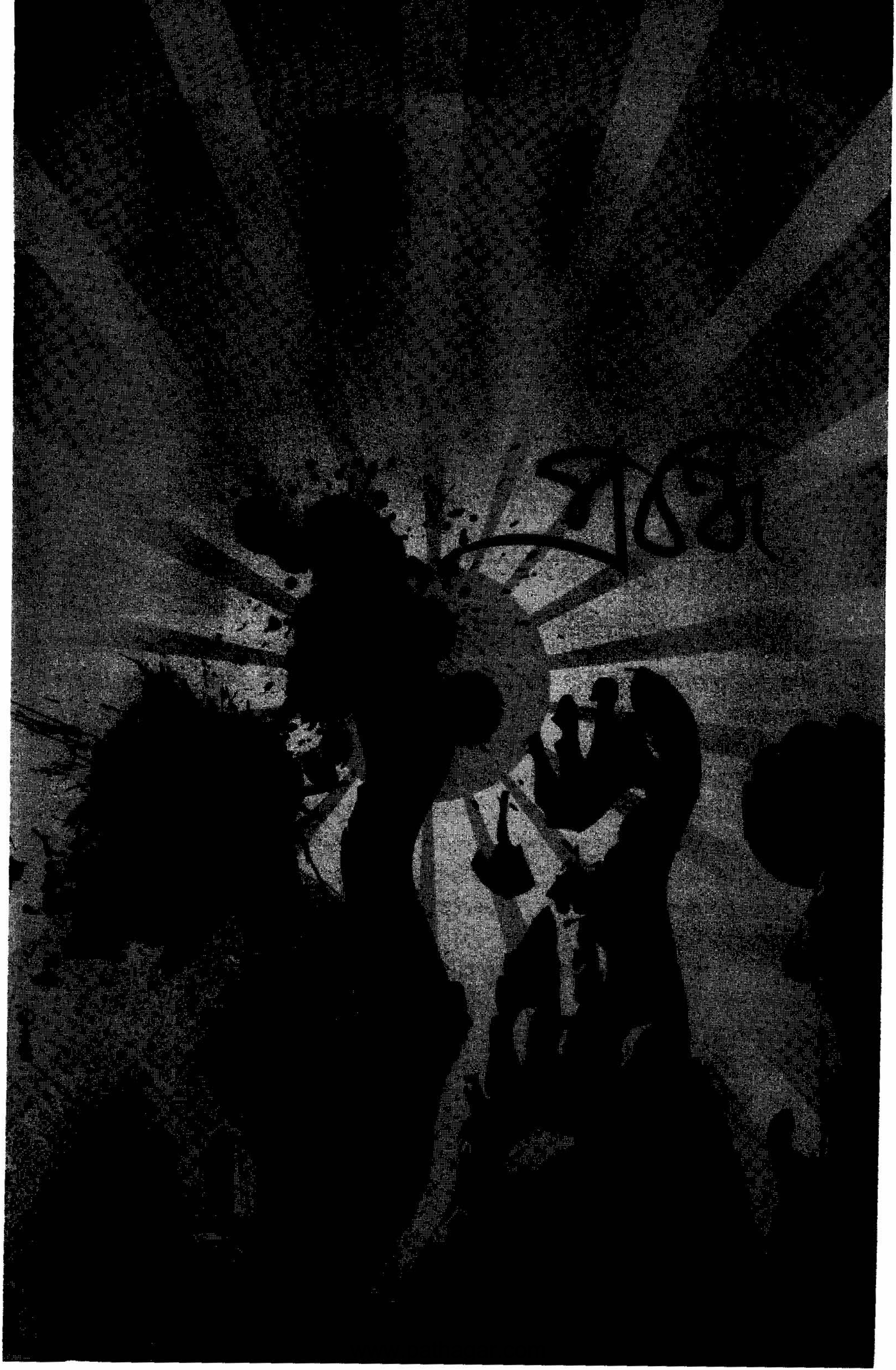

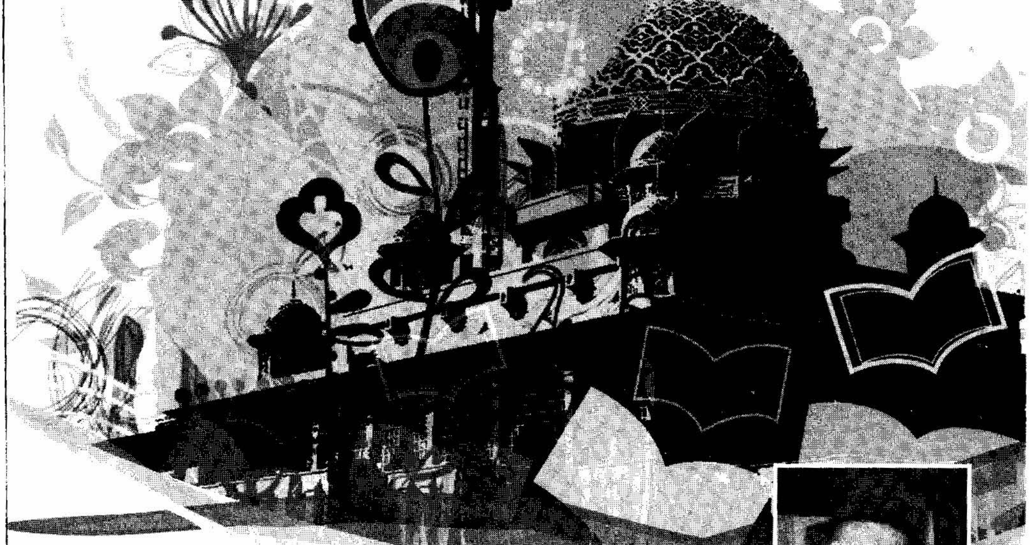

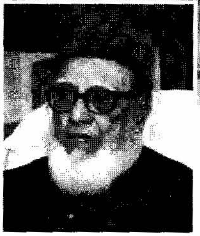

শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপ

অধ্যাপক গোলাম আযম

আমাদের দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কথাটি যেরূপ কুয়াশাচ্ছন্ন, ইসলামী শিক্ষা কথাটিও তেমনি অস্পষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এদেশে প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষাই যদি ইসলামী শিক্ষা হয় তাহলে প্রতিভাবান ছাত্রদের এ শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হবার কোন কারণ নেই এবং সমাজে উন্নতি ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে কোন অভিভাবকই তাদের সন্তানদিগকে এ শিক্ষা দিতে রাজি হবেন না। আর ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাই যদি আদর্শ শিক্ষা বলে প্রচারিত হয় তাহলে এ শিক্ষার ফল দেখে কোন ইসলামপন্থী লোকই সন্তুষ্টচিত্তে এ ধরনের শিক্ষাকে সমর্থন করতে পারে না। যারা ইসলামী মূল্যমান ও মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব দেখতে চায়, তারা প্রচলিত দুটি শিক্ষাব্যবস্থার কোনটিই আদর্শ শিক্ষা বলে স্বীকার করতে পারে না। তাই বর্তমান যুগে দুনিয়াতে শান্তি ও মর্যাদার সহিত জীবন যাপন করে আখেরাতের আদালতে মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সম্মুখে হাজির হবার যোগ্যতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যেসব অভিভাবক ছেলেমেয়েদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার অন্বেষণ করেন, তারা রীতিমত এক মহা সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। মাদ্রাসার শিক্ষা দ্বারা পার্থিব কোন যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। আর আধুনিক শিক্ষায় ইসলামী চরিত্র সৃষ্টিই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আধুনিক দুনিয়ার উপযোগী শিক্ষা কোন ধরনের হবে, তা আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। সরকারি পর্যায়ে এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু না হলেও যাতে আগ্রহশীল লোকদের প্রচেষ্টায় একটি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলা যায়, সেদিকে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই এই আলোচনার অবতারণা করছি।

www.pathagar.com

যেহেতু বর্তমান শিক্ষা সঙ্কট হতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাই ইসলামী শিক্ষার রূপ সম্পর্কে আলোচনা করছি, সেহেতু দেশের পটভূমিকে সম্মুখে রেখেই আমাদেরগকে অগ্রসর হতে হবে। শুধু অবাস্তব মতবাদ নিয়ে চর্চা করায় কোন লাভ নেই। এরূপ কল্পনাবিলাসের অবসরও আমাদের নেই। তাই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বিশেষ করে আমাদের শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করা অত্যন্ত জরুরি মনে করি। প্রথমত: শিক্ষা বলিতে কী বুঝায়, তাহা পরিষ্কার হওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত: মানুষের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা রচনাকালে মানুষের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। মানুষকে দেহসর্বস্ব জীব মনে করলে শিক্ষাব্যবস্থায় আত্মার বিকাশ লাভের কোন বন্দোবস্তই থাকবে না। আবার মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনের দিকটি উপেক্ষা করে একমাত্র আত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম হবে তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তৃতীয়ত: যে ধরনের লোক তৈরি করা শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে নির্ধারিত হবে, সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে তদানুযায়ী পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। শিক্ষার উদ্দেশ্যের সহিত জাতীয় জীবনাদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যে আদর্শকে জাতির লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হবে, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সে আদর্শের উপযোগী চরিত্র গঠন করতে হবে। চতুর্থত: মূল ত্রুটি কোথায়, তা সঠিকরূপে অবগত না হলে শিক্ষা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কেননা রোগের প্রকৃত কারণ না জানলে নির্ভুল চিকিৎসা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ চারটি বিষয়ের মীমাংসা শিক্ষা পুনর্গঠন এর ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে শিক্ষার বাহ্যিক কাঠামো, আধুনিক উন্নত শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন, শিক্ষার স্তর, বিভাগ, শিক্ষার মানোন্নয়ন ইত্যাদির শ্রুতিমধুর ও মুখরোচক আলোচনা নিতান্তই অর্থহীন। রোগ নির্ণয় ও নির্ভুল চিকিৎসার বন্দোবস্ত না করে রোগীকে যত সুন্দরভাবে রাখা হোক এবং যতই শুশ্রূষা করা হোক রোগীর অবস্থার উন্নতি এ বাহ্যিক ব্যবস্থা দ্বারা মোটেই সম্ভব নয়। সুচিকিৎসার সহিত এসব বাহ্যিক ব্যবস্থা যুক্ত হলে উদ্দেশ্য সফল হবার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

মানুষের পরিচয়

মানুষ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ব্যতীত যদি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয় তাহলে প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হতে পারে না। তাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজন। মানুষ সৃষ্টি জগতের বহু রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে এবং প্রত্যেক যুগেই বস্তুজগতের বিভিন্ন শক্তিকে নিজের উপকারে ব্যবহার করেছে। কিন্তু অহির জ্ঞান ব্যতীত এবং নবীদের শিক্ষা ব্যতীত কোনকালেই মানুষ তার নিজের পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে এত বিপুল শক্তির অধিকারী করেছে যে, মানুষ আজ পাখির চেয়েও দ্রুত উড়তে সক্ষম। দ্রুততম প্রাণীর চেয়েও অধিকতর বেগে চলার উপযোগী যানবাহনের অধিকারী। এমনকি গ্রহ হতে গ্রহান্তরে বিচরণের ক্ষমতায়ও ভূষিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় জীবন যাপন করার উপযোগী শিক্ষা হতে আধনিক মানুষ বঞ্চিত রয়ে গেল। এর মূল কারণ এই যে, মানুষ নিজকে ভালরূপে চিনতে সক্ষম হয়নি। শুধু বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে মানুষ নিজকে চিনতে অক্ষম বলেই মহান স্রষ্টা রাসূলের মারফতে যুগে যুগে মানুষকে

www.pathagar.com

আত্মজ্ঞান দান করেছেন। তাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে আমাদিগকে কোরআন মজিদের নিকট ধরনা দিতে হবে।

কোরআনে মানুষের পরিচয়

কোরআন অন্যান্য জীবের সহিত মানুষের যে ব্যবধান নির্দেশ করে তা এই যে, মানুষ নৈতিকজীব আর অন্যান্য জীব নৈতিকতার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভাল মন্দ, সৎ- অসৎ, সত্য ও মিথ্যার বিচার করার ক্ষমতা মানুষ ছাড়া আর কোন জীবের মধ্যে আমরা দেখতে পাই না। মিথ্যার বেসাতি যার সম্বল, সে মানুষটিও মিথ্যা বলা অন্যায় বলে স্বীকার করে। মিথ্যা বলাকে ভাল কাজ মনে করলে সে মিথ্যুক উপাধিতে ভূষিত হওয়া পছন্দ করত। চুরি করা খারাপ এ কথা স্বীকার করে বলেই চোর প্রকাশ্যে না যেয়ে গোপনে চুরি করতে যায়। ভাল মন্দের এ বিচারজ্ঞানই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে পৃথক করেছে। যারা এ নৈতিক দিককে উন্নত করার চেষ্টা করে না, কোরআন তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে যে, তারা পশুর ন্যায় বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট । নৈতিকতার উন্নতি ব্যতীত মানুষ তার যাবতীয় শক্তি যখন ব্যবহার করে তখন সে পশুর চেয়েও অনিষ্টকর ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি মানুষের এক বিরাট অস্ত্র। এই অস্ত্রের সাহায্যে শারীরিক আকারে ক্ষুদ্র হয়েও সে বিরাট বপু বিশিষ্ট হাতির ওপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু নৈতিকতার বিকাশ না হলে এই বুদ্ধি শক্তিকেই সে মানবজাতির অকল্যাণে প্রয়োগ করে। কথা বলার শক্তি নিশ্চয়ই অন্যান্য জীবের চেয়ে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। কিন্তু নৈতিক অবনতির ফলে যখন কেহ মিথ্যা বলে তখন সে কুকুরের চেয়েও অধম হয়ে পড়ে। কেননা কুকর মিথ্যা বলতে পারে না। তাই বস্তুগত শক্তির হাতে সঠিক ব্যবহার নৈতিকতার ওপর নির্ভরশীল। এক তরবারি নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে ব্যবহৃত হলে তা মানুষের উপকারই করবে, কিন্তু নৈতিকতাহীন দানবের হিংস্র থাবা দ্বারাই এদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। (কোরআন)

হাত, পা, চোখ কান বিশিষ্ট শরীরটাকে প্রকৃত মানুষ মনে করে না। কোরআনের মতে এ দেহ সৃষ্টির বহু পূর্বে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। কোরআনের পরিভাষায় সেই মানুষটিই হল রূহ বা আত্মা। এই আত্মাই নৈতিকতার আধার। রূহকে উন্নত করার ব্যবস্থা না করলে এই শরীর পশুর মতো ব্যবহার করবে। শরীরের যত সব বস্তুগত দাবি আছে তা পূরণের এই শরীর পশুর মতো ব্যবহার করবে। শরীরের যত সব বস্তুগত দাবি আছে তা পূরণের জন্য মানবদেহ সকল সময়ই ব্যস্ত। পেট খালি হলেই সে খাদ্যের জন্য ব্যস্ত হয়। মানুষ সে খাদ্য চুরি করে আনল, না পরিশ্রম করে অর্জন করল সে বিষয়ে পেটের কোন মাথাব্যথা নেই। তার খাদ্যের প্রয়োজন। অন্যায়ভাবে খাদ্য এনে দিলেও সে নিশ্চিন্তে খেতে থাকে কিন্তু তখন রূহ বলতে থাকে যে, কাজটা অন্যায় হল। গৃহপালিত পশু রজ্জু ছিঁড়ে নিজেরাই দয়ালু মনিবের সাজানো বাগান খেতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। নৈতিকতার বন্ধন ছিঁড়তে পারলে মানব দেহও তেমনি একটি পশুতে পরিণত হয। মহানবী (সা) তাই নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষকে এমন এক ঘোড়ার সহিত তুলনা করেছেন যা রজ্জু দ্বারা এক খুঁটির সাথে আবদ্ধ । এ ঘোড়াটি স্বাধনীভাবে বিচরণ করতে পারে না। মানুষের স্বাধীনতাও নৈতিকার রজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই একমাত্র রজ্জুর সীমা পর্যন্তই সে স্বাধনীভাবে চলফেরা করতে সক্ষম।

www.pathagar.com

দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব

উপরিউক্ত আলোচনা ছাড়াও প্রত্যেক ব্যক্তিই তার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষের আত্মার সাথে তার দেহের এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব লেগে আছে। মানুষ অনেক নৈতিকাবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে কিন্তু অনেক সময় দেহের তাগিদের কাছে পরাজয় বরণ করে। এ দ্বন্দ্বেব দেহের জ্বালায় অস্থির হয়ে এক শ্রেণীর মানুষ নৈতিকতার চাপে বৈরাগী হবার প্রেরণা লাভ করে। তারা দরবেশ ও সন্ন্যাসী হলেও মানুষের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। আবার অন্য দিকে অধিকাংশ গাছের মতো জীবন যাপন করে মনুষ্যত্বের উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয়। আবার অন্য দিকে অধিকাংশ লোক দেহের কাছে পরাজিত হয়ে আত্মাকে পঙ্গু করে পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে। কোরআন মানুষকে এ দ্বন্দ্বের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যে বিধান দিয়েছে তা দেহের সকল দাবিকে নৈতিকতার সীমার ভেতরে পূরণ করতে সাহায্য করে। দেহের দাবিকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে কোরআন বলে: বৈরাগ্য সাধনের নীতি মানুষ নিজেই আবিষ্কার করেছে আমরা তাকে এই নির্দেশ দান করিনি।

আত্মা ও দেহের দ্বন্দ্বে দেহকে স্বীকার করার বৈরাগ্য নীতি যেমন মানুষের উপযোগী নয়, তেমনি আত্মাকে পরাজিত করে পশুর ন্যায় ভোগবাদী জীবন যাপনও মানুষের অপমৃত্যু বৈ আর কিছু নয়। বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মাঝামাঝি মনুষ্যত্বের সিরাতুল মুস্তাকিমই কোরআনের শেখানো পথ। তাই কোরআনের মতে মানুষ আত্মাহীনও নয়, দেহহীনও নয়। আবার আত্মাসর্বস্বও নয়, দেহ সর্বস্বও নয়, বরং সে দেহ ও আত্মা উভয়েরই সমন্বয়। এইখানে দেহ আত্মার বাহন আর আত্মা দেহেরই সহিস।

প্রবৃত্তি ও বিবেক

সাধারণ অর্থে দেহের দাবিকে প্রবৃত্তি এবং আত্মাকে বিবেক বলে অভিহিত করা চলে। মানব দেহের ইন্দ্রিয় সমূহকে বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ আকর্ষণই প্রবৃত্তি । একদিকে দুনিয়ার আকর্ষণীয় বস্তুসমূহের প্রতি মানুষের তীব্রভাবে আকৃষ্ট হবার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে অপরদিকে তাকে সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে সচেতন বিবেক শক্তি দান করা হয়েছে। এরূপে মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি ও বিবেকের বিপরীতমুখী তাড়না সৃষ্টি করা হয়েছে। এরূপে মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি ও বিবেকের বিপরীতমুখী তাড়না সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় যখনই বিবেকের বিপরীত কাজ করে তখনই বিবেক তাকে দংশন করতে থাকে। দেহ অসুস্থ হলে যেমন তা আকর্ষণীয় বস্তুর দিকে ধাবিত হয়না, তেমনি বিকে অসুস্থ হলেও তার দংশন করার শক্তি হ্রাস পায়। স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন না করলে কোন দেহ যেমন অসুস্থ হয় তেমনি বিবেকের বিরুদ্ধে বার বার চললে বিবেকশক্তি লোপ পেতে থাকে। এ দু'শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের ওপরই মানবজীবনের শান্তি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

মানুষের উপযোগী শিক্ষা

মানুষকে যারা আত্মাবিহীন এক জড় পদার্থ মনে করেন তার শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করার বেলায় মানুষের শুধু বস্তুগত প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রাখেন। আর মানুষের প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবার ফলে সে ব্যবস্থায় মানুষকে অন্যায় জীবের ন্যায়ই পরিচয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবার ফলে সে ব্যবস্থায় মানুষকে অন্যায় জীবের ন্যায়ই দেহসর্বস্ব মনে করে গড়ে তোলা হয। পাশ্চাত্য সভ্যতা ধর্মনিরপেক্ষ ও খোদাবিমুখ বলে তার পক্ষে মানুষকে আত্মপ্রধান

www.pathagar.com

হিসেব চিনবার সুযোগ হয়নি। ডারউইন মানুষকে বানরের উন্নত সংস্করণ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এই মতাদর্শে বিশ্বাসীগণ মানুষকে অন্যান্য পশুর ন্যায় গড়ে তুলবার উপযোগী শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন করেছে। এ শিক্ষা দ্বারা মানুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব।

আবার যাঁরা মানুষকে আত্মসর্বস্ব মনে করে অথবা তার জৈবিক প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ না দিয়ে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রচলন করেন, তারাও মানুষের উপযোগী প্রকৃত শিক্ষা দিতে অক্ষম। এ শিক্ষা মানুষকে যতই খোদাভীরু ও ধর্মপ্রাণ হওয়ার অনুপ্রেরণা দান করুক, বাস্তব জীবনে বস্তুগত প্রয়োজনের তাগিদ তাকে ঈমানের বিপরীত পথে যেতে বাধ্য করে। তাই এ প্রকার শিক্ষা মানুষের স্বভাবের বিপরীত।

তাই যে শিক্ষা মানুষের আত্মা ও দেহকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যময় পরিণতিতে পৌঁছায়ে এ জগতের রূপ-রসগন্ধকে নৈতিকতার সীমার মধ্যে উপভোগ করার যোগ্যতা দান করে, সে শিক্ষাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা। যে শিক্ষা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে মানবতার উন্নতি ও নৈতিকতার বিকাশে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তা-ই মানুষের উপযোগী শিক্ষা। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি দান করা সত্ত্বেও যে শিক্ষা মনুষ্যত্ব ও আত্মার উন্নতিকে ব্যাহত করে, তা প্রকৃত পক্ষে মানবধ্বংসী শিক্ষা, তাকে কিছুতেই মানুষের উপযোগী শিক্ষা বলা চলে না।

শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় আদর্শের স্থান

দুনিয়ার সকল শিক্ষাবিদই এ বিষয়ে একমত যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র গঠন। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মন, মস্তিষ্ক ও চরিত্রকে গঠন করার চেষ্টায় প্রত্যেকটি সজাগ জাতির কার্যসূচির প্রধান অঙ্গ। উন্নত জাতিসমূহের শিক্ষাব্যবস্থায় বাহ্যিক দিক দিয়ে অনেক সামঞ্জস্য থাকলেও মূলত তাদের সকলেরই একই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি উদ্দেশ্য নয়। আমেরিকায় শিক্ষাব্যবস্থা যে প্রকার মন মস্তিষ্ক ও চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে; রাশিয়ার হুবহু তার অনুকরণ হচ্ছে । এর প্রকৃত কারণ হল তাদের আদর্শের পার্থক্য। ভাল-মন্দের পার্থক্য জ্ঞান, মূল্যবোধ, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যক্তি চরিত্রের মান নির্ণয় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কতক ধারণা ইত্যাদির সমন্বয়েই এবটি আদর্শ গড়ে ওঠে। যে জাতির নিকট যে আদর্শ গ্রহণযেগ্য সে আদর্শকে সম্মুখে রেখেই উক্ত জাতীর শিক্ষাববস্থা গড়ে তোলা হয়। প্রত্যেক দেশের কোন না কোনা আদর্শ থাকে। সে আদর্শ নিজস্বও হতে পারে অথবা অপর কোন দেশের নিকট হতে ধার করাও হতে পারে কিন্তু কোন আদর্শ নির্ধারণ ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতির পথে পদক্ষেপ রাখতে পারে কিন্তু কোন আদর্শ নির্ধারণ ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতির পথে পদক্ষেপ রাখতে পারে না। আদর্শ একটি জাতির লক্ষ্য যে জাতির কোন নিদিষ্ট লক্ষ্য নেই সে অপরাপর জাতির উচ্ছিষ্ট ভোগী হতে বাধ্য একটি সঠিক আদর্শে জাতিকে গড়ে তোলার উদ্দেশে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত প্রকার পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক তা শেষ পর্যন্ত একই লক্ষ্যের দিকে দেশকে পরিচালিত করবে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের বেলায় জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ অপরিহার্য।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হলে প্রথমেই জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়াজন। বাংলাদেশে কোন ধরনর মানুষ গড়ে তোলায় উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন

www.pathagar.com

করছি, তা-ই এ ক্ষেত্রে মৌলিক প্রশ্ন। আমাদের নিজস্ব কোন মত, বিশ্বাস, জীবনদর্শন উদ্দেশ্য এবং জীবনধারা বলতে যদি কিছু থাকে, তাহল আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন তারা আমাদের তাহজিব তমুদ্দুনকে ভিত্তি করে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

আজ বাংলাদেশে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার যার মাধ্যমে ইসলামের আদর্শকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে রূপদানের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও কর্মী সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের আদর্শকে মানবজাতির মুক্তির বিধানরূপে পেশ করার যোগ্য লোক তৈরি করতে হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিকের শিক্ষায় এবং সাহিত্য ইসলামে, নৈতিকতা মূল্যমান ও মূল্যবোধের প্রাধান্য স্থাপন করতে হবে। বস্তুগত জ্ঞানের সহিত নৈতিক শক্তির সমন্বয় সাধনই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হতে হবে। আমরা যদি গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হই তাহলে দিশেহারার মতো অনিশ্চিত পথে চলে জাতিকে ধ্বংসের পথেই নিয়েই যাব।

আমাদের শিক্ষা পুনর্গঠনের প্রধান সমস্যা

বর্তমানে আমাদের দেশে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'টি শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। একটি হল প্রাচীন ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা এবং অপরটি ইংরেজি শিক্ষা নামে পরিচিত। প্রথমটি ইসলামী শিক্ষা বলে দাবি করে এবং দ্বিতীয়টি আধুনিকা শিক্ষা হিসেবে গৌরববোধ করে। যারা মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করে, তারা কোরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদির অধ্যয়ন করে বটে। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করার কোন সুযোগ পায় না। ফলে মানবজীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের যত প্রকার সমস্যা আছে, এর আধুনিক রূপ ও গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তারা কোন ধারণাই লাভ করে না। ফলে মানব সমস্যার যে সুষ্ঠু সমাধান আল্লাহর কোরআন ও রাসূলের হাদীসে দেয়া হয়েছে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কোন দৃষ্টিভঙ্গিই তারা লাভ করতে পারে না। এ কারণে দীর্ঘকাল মাদ্রাসায় কঠোর সাধনা করেও তারা যে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা লাভ করে তা আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন পূরণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম । আর যারা আধুনিক শিক্ষা অর্জন করে, তারা প্রচলিত দুনিয়ায় ভাল মন্দ জ্ঞান অনেক কিছুই হাসিল করতে সক্ষম হয় বটে। কিন্তু মুসলিম হিসেবে জীবন যাপনের কোন প্রেরণাই তারা লাভ করে না। চিন্তা ও কর্মে তারা প্রায়ই অমুসলিম হিসেবে গড়ে ওঠে। এ শিক্ষা পাবার পরও যারা ইসলামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন, তারা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষাব্যবস্থার বাইরের পরিবেশে নিজদিগকে খাঁটি মুসলিম রূপে গঠন করেন, তারা নিয়মের ব্যতিক্রম।

এমতাবস্থায় আমাদের দেশে শিক্ষা পুনর্গঠন করা রীতিমত জটিল ব্যবহার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি দেশের নাগরিকদেরকে উপযুক্তরূপে গড়ে তুলবার জন্য একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। দু'ধরনের শিক্ষিত লোক সমাজকে দু'বিপরীত দিকে টানতে থাকলে দেশের বিপর্যয় অনিবার্য। উপরিউক্ত দু'প্রকারের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারা সৃষ্টি করে চলেছে। বাংলাদেশের আদর্শ ইসলাম বলে স্বীকার করার পর ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা বলে দু'প্রকার শিক্ষা চলতে থাকার কোন অর্থই হয় না। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক করে তুলতে হবে এবং আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষায় রূপ দিতে হবে। শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে এ কাজ অসম্ভব নয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিক্ষা পুনর্গঠন প্রচেষ্টা

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের যে কয়েকটি প্রচেষ্টা হয়েছে তার কোনটিতেই ইসলামী রাষ্ট্রের উপযোগী নাগরিক গড়ে তুলবার ব্যবস্থা হয়নি। এ পর্যন্ত যতগুলো শিক্ষা কমিশন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য নিযুক্ত হয়েছে, তাদের কোনটিতেই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়বার সুপারিশ করতে পারেনি। সকলেই ইসলামকে একটি ধর্মের মর্যাদা দিয়েছে মাত্র। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় খ্রিষ্টধর্মকে যেটুকু স্থান দেয়া হয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে মাত্র ততটুকু স্বীকৃতিই দেয়া হয়েছে।

বস্তুত শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে গঠন করে এর সাথে (ধর্মীয় শিক্ষা) এর লেজুড়টুকু জুড়ে দিলেই কোন শিক্ষাপদ্ধতি ইসলামী হয়ে যায় না। এ ধরনের অস্বাভাবিকতা সংযোগ দ্বারা আর যাই হোক, ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক গঠন করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক গলদ

ইসলামকে বাংলদেশের জাতীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতির ভিত্তিতে শিক্ষা পুনর্গঠন করতে হলে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক গলদটুকু তালাশ করে বের করতে হবে। যে কোন শিক্ষাব্যবস্থার মূলে যে প্রশ্নটি বিশেষভাবে সক্রিয় থাকে, তা এই যে, ঐ শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা কোন ধরনের মানুষ গঠন করা হবে? এদেশে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাটি ইংরেজদের অবদান। ইসলামী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত কর্মী তৈরি করার উদ্দেশ্যে ইংরেজগণ নিশ্চয়ই এদেশের আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করেনি। এমনকি তারা নিজ দেশে যে প্রকার নাগরিক গঠন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছে, সে ধরনের উদ্দেশ্য এখানে ছিল না, বরং এমন কতক লোক তৈরি করা তাদের মূল্য লক্ষ্য ছিলো যারা মুষ্টিমেয় ইংরেজ শাসকদের বিশ্বস্ত কর্মচারী রূপে এদেশে ইংরেজ শাসন জারি রাখতে সাহায্য করবে। তাদের এমন কতক লোক জোগাড় করার প্রয়োজন দেখা দেয়, যারা ইংরেজদের কথা বুঝতে পারে, তাদের আদব-কায়দা, চাল-চলন, রীতি নীতি অনুকরণ করতে সক্ষম এবং তাদের আদর্শকে ভালবাসতে রাজি। ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত সে শিক্ষাব্যবস্থাকেই বর্তমানে অধিকতর উন্নত করার চেষ্টা চলছে। সে ব্যবস্থার সাথে নামে দ্বীনিয়াত সংযোগ ও ইংরেজদের অনুকরণ মাত্র। পাশ্চাত্য দেশসমূহে দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইতিহাস, ভুগোল, অঙ্ক ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা জন্ম লাভ করে, বিশ্বাস ও জ্ঞান যে পথে ধাবিত হয়, আমাদের দেশে এর ব্যতিক্রম হবার কোনই কারণ নেই।

বিশাল শিক্ষাবৃক্ষকে যদি ইসলামের জীবনদর্শন হতে নিরপেক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা যায় তাহলে সে শিক্ষাবৃক্ষের কাণ্ডের সহিত দ্বীনিয়াতে আলাদা কলাম বেঁধে দিলে যে কী পরিণাম হয়, তার অভিজ্ঞাতা আমাদের বহুবার হয়েছে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকালে এ পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হয়েছিল। পাশ্চাত্যে জীবন দর্শনের ভিত্তিতেই সব কিছু শিক্ষা দেবার সঙ্গে দ্বীনিয়াতের অস্বাভাবিক সংযোগ সেখানেও ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই এরূপ ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে বাধ্য । এক প্রকারের জীবের শরীরে অন্য জীবের অংশ বিশেষ বেঁধে দিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়তা বেশি ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।

www.pathagar.com

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পার্থিব সকল শাস্ত্র এমনভাবে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে ও বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে দেখানো হচ্ছে যে, এ বিশাল বিশ্বের কোন স্রষ্টা নেই। ইহা নিজে নিজেই চলছে এবং সাফল্যের সাথে নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবেই চলছে। সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিধান শিক্ষা দেওয়ার ভেতর দিয়ে ছাত্রদের মগজে এ ধারণাই জন্মাচ্ছে যে আল্লাহ রাসূল, অহি কোরআন ইত্যাদি ব্যতীত জগৎ উন্নতি লাভ করছে। সমগ্র শিক্ষার মাধ্যমে তারা গোটা জীবনব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যতীতই জগৎ উন্নতি লাভ করছে । এমতাবস্থায় তাদেরকে যখন হঠাৎ দ্বীনিয়াত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয় তখন আল্লাহ, রাসূল, আখেরাত অহি ইত্যাদির কথা প্রথম প্রথম তাদিগকে করে। অতঃপর এ সকল বিষয় তাদের নিকট জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে হেয় মনে করা হয়, ধর্মকে অবৈজ্ঞানিক অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় বলে বিশ্বাস করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ ধরনের ব্যবস্থায় বড়জোর ধর্মকে শুধু একটি নিষ্ক্রিয় বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকার করা কিছু লোকের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু ইহা জীবনকে ইসলামের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনে ইসলাম একটি অপ্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট হিসেবে স্থান পাবে।

ইসলাম এমন কোন ধর্মের নাম নয় যে, মানুষকে নিয়ে ইচ্ছানুযায়ী যাবতীয় কাজ করার অনুমতি দেবে আর সে সঙ্গে কিছু কর্মহীন বিশ্বাস ও প্রাণহীন অনুষ্ঠানের পরিশিষ্ট জুড়ে দিলেই রাজি হবে। কারো গড বা ভগবান হয়তবা এতে রাজি হতে পারে যে, গির্জা ও মন্দিরে তাকে ডাকলেই সে সন্তুষ্ট হবে এবং জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও কর্মে তাকে ত্যাগ করলে কোন আপত্তি করবে না। কিন্তু কোরআনের আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি কারো সাথে আপস করতে রাজি নন। এই কারণেই তিনি মুমিনদের পরিপূর্ণরূপে দাখিল হও বলে আহবান জানিয়েছন। আমরা একে অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক মনে করি যে, আল্লাহ আছেন বলে মানবো অথচ পার্থিব জীনে আমাদের পথ-প্রদর্শক হবেন না। যে আল্লাহ দুনিয়ার চলার পথে আমাদের সঠিক হোদায়েত দেন না, তাকে শুধু মসজিদে মেনেই বা লাভ কী?

সুতরাং ইসলাম সম্বন্ধে যে শিক্ষার মাধ্যমে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় নিশ্চয়ই তা বিশুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা। এর সাথে দ্বীনিয়াতের শিক্ষাকে জুড়ে দিয়ে ইসলামকে একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মেই পরিণত করা হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ধরন

বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তাতে ইসলামে ধর্মীয় দিকটুকুই চর্চা হয় না। ইসলামকে একটি ধর্ম হিসেবে স্বীকার করার নাম ইসলামী শিক্ষা বলা কিছুতেই উচিত নয়। ইসলাম একটি জীবন-দর্শন ও জীবন বিধান। মানব জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের জন্যই এর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বিধান রয়েছে। ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শ বলে স্বীকার করলে নামাজ যাকাত বিবাহ তালাক ফরায়েজ ইত্যাদি শিক্ষাদান করার দ্বারাই ইসলমী শিক্ষার প্রয়োজন হতে পারে না। যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে এবটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন হিসেবে শিক্ষা দেয়ার বন্দোবস্ত থাকে তা-ই ইসলামী শিক্ষা। যে শিক্ষা লাভ করার ফলে শিক্ষার্থীদের মন-মগজ ও চরিত্র, এমনভাবে গড়ে উঠবে যাতে ইসলামের আদর্শে একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। সে শিক্ষালাভ করলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোরআন যে দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে চায় তাই লাভ করা যাবে। এ শিক্ষা ব্যক্তিজীবন হতে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র

www.pathagar.com

পর্যন্ত সকল দিকেই ইসলামের আদর্শকে মানবরচিত সকল আদর্শ হতে উন্নত ও প্রগতিশীল বলে প্রমাণ করবে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা হতে উচ্চতম মান পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরেই এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখাই কোরআন ও সুন্নহর আলোকে যাবতীয় শিক্ষা দান করতে হবে। ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কনীতি এমনভাবে শিক্ষা দিতে যাতে মানবরচিত মতবাদসমূহের সহিত তুলনা করে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মোটকথা, যে শিক্ষা মুসলিম দার্শনিক, মুসলিম, শাসক মুসলিম বিচারক মুসলিম অর্থনীতিবিদ মুসলিম বিচারক মুসলিমস রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি সৃষ্টি করবে তাই ইসলামী শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। যদি ইসলামই আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হয় তাহলে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপযোগী একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করার জন্য সচেষ্ঠ হতে হবে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনকরতে হলে ছয়টি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (১) শিক্ষাব্যবস্থাকে একই সঙ্গে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হতে হবে। (২) পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে যত প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করতে হয় সে সবকেই ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করতে হবে। (৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গোটা পরিবেশই ইলাসমী ছাঁচে ঢালাই করতে হবে। (৪) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের সাথে মানবরচিত বিধানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠাত্ব শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল করতে কহবে। (৫) যেহেতু কোরআন, হাদীস ও ফিকাহ ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস, সেহেতু শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চস্তরে উন্নতমানের মুফাচ্ছির মুহাদ্দিস ও ফকীহ সৃষ্টির উপযোগী বিশেষ কোর্স থাকতে হবে। (৬) শিক্ষকগণকে চিন্তা ও কর্মে প্রকৃত মুসলিম হতে হবে।

ইসলামী শিক্ষার বাস্তবরূপ

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে যদি শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হয়, তাহলে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপ কী দাঁড়াবে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

দ্বীন ও দুনিয়া

প্রথম বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়াজন পূর্ণ করার যোগ্য হতে হবে। দ্বীন ও দুনিয়া কথাটি দ্বারা সাধারণত ধর্মীয় ও পার্থিব বলে কথিত দুটি পৃথক দিক মনে করা হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীন ও দুনিয়া দুটি সামঞ্জস্যহীন পৃথক সত্তা নয়। অন্যান্য ধর্মে যেহেতু জীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ বিধান নেই (অন্তত অন্য কোন ধর্মের নেতৃবৃন্দ এরূপ দাবি করেন না) সেহেতু সে সব ধর্মের প্রভারমুক্ত। তারা ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বিশ্বাস করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্য তারা ঐ ধমনিরপেক্ষ শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার পরিশিষ্টটুকু জুড়ে দেন।

কিন্তু ইসলাম ঐ ধরনের কোন ধর্ম মাত্র নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের ধর্মীয় অনুষ্ঠনসমূহ পালন করার উপযোগী শিক্ষাকে পূর্ণ ইসলামী শিক্ষা মনে করা মারাত্মক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য সে শিক্ষাকে যদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয়

www.pathagar.com

তাহলে তা ইসলামী শিক্ষায় পরিণত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য শাসন ও বিচার, পারিবারিক ও সামাজিক কাজকর্ম সকল মানুষকেই করতে হয়। যারা আল্লাহকে স্বীকারই করে না তাদেরও এসব কাজ না করলে চলে না। জীবনের সকল কাজ কর্মে তারা নিজেদের মনগড়া নীতি বা অন্য কোন মানুষের রচিত নীতি ও বিধান অনুসরণ করে চলে। কিন্তু এ কাজ গুলি যদি কোরআন ও হাদীসের নীতি ও আইন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়, তাহলে এই চিন্তাধারা সবই ইবাদতে পরিণত হয়। ইসলাম কোন বিশেষ অনুষ্ঠান শুধু ইবাদাত নয়-গোটা জীবনটাকে ইবাদতে পরিণত করার উদ্দেশ্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার যোগ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন। একথা যদি স্বীকৃত হয় তাহলে ইসলামী শিক্ষা বাস্তব জীবন যাপন করার উপযোগী শিক্ষাই ইসলাসী শিক্ষা নামে অভিহিত করার যোগ্য। তাই ইসলামী শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা নামে অভিহিত করার যোগ্য। তাই ইসলামী শিক্ষায় দ্বীন ও দুয়িার প্রচলিত কৃত্রিম পার্থক্য অযৌক্তিক এবং দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনকে এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে দেখাও অসম্ভব।

পার্থিব ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান পরোক্ষ শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। মানুষের মনস্তত্ত্বকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এবং বাস্তব গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা-বিজ্ঞানীগণ এ সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন যে, শিক্ষার্থীদিগকে নীতি জ্ঞান ও তত্ত্বকথা পৃথক ভাবে শিক্ষা দিতে গেলে যতটা কার্যকরী হয়, বাস্তব কার্যকলাপের মাধ্যমে সে শিক্ষা দিলে অবচেতন ভাবা তা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। মানুষ স্বাভাবিক ও অভ্যন্তরীণ প্রেরণার যা করতে চায় তাকে শিক্ষামূলক করে তোলার নামই পরোক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষা এ নীতির ওপর ভিত্তি করেই খেলার মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা জ্ঞান, শব্দ গঠন ইত্যাদি শিক্ষাকে শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় করা সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষাপদ্ধতির এ পরোক্ষ নীতি অবলম্বন করে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষাকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে শিক্ষা দিলে বাস্তব দিক দিয়ে অধিক কার্যকরী হবে। সুদ যে এক প্রকার জঘন্য জুলুম তা পৃথকভাবে মখস্থ না করিয়ে যদি সুদের অংক কষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেয়া যায়, তাহলে অবচেতনভাবেই শিক্ষার্থীর মনে তা সহজে কায়েম হবে। আমরা স্কুলজীবনে গোয়ালা কর্তৃক দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করার অংকের মাধ্যমে যা শিখেছি, তাকে এরূপ সমাজবিরোধী কার্যের প্রতি অন্তরে ঘৃণার সৃষ্টি হয়নি। সেখানে পরোক্ষভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কিরূপে বেশি দামে কিনে পানি মিশাবার ফলে কম দামে বিক্রি করেও গোয়ালা লাভবান হতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এ অংকে গোয়ালা কত লাভ করেছে জিজ্ঞাসা না করে যদি গোয়ালা মানুষকে কত পরিমাণ ঠকিয়েছে? জিজ্ঞাসা করি তাহলে এ কাজের প্রতি ছাত্রদের ঘৃণার উদ্রেক হবে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পড়ানোর সংগেই পবিত্রতার ইসলামী ধারণা মনে করা হলে পবিত্রতা সম্পর্কে পৃথকভাবে মাসায়ালা শিক্ষা দেয়া অপেক্ষা বেশি উপকারী হবে। সৌরজগৎ সম্পর্কে ভৌগোলিক জ্ঞান দান করার সংগেই যদি সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা সম্বন্ধে কোরআনে বর্ণিত আয়াত সমূহকে শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে ভূগোল বিজ্ঞানেও ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করবে।

www.pathagar.com

এভাবে সকল স্তরের শিক্ষাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষা দেয়া সম্ভব এবং সকল বিষয়কেই কোরআন হাদীসের জ্ঞান দান করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিক্ষার পরিবেশ

আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের গোটা পরিবেশ একেবারেই ইসলামবিরোধী। এ পরিবেশে কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা অধিক পরিমাণে পরিবেশন করলেও শিক্ষার্থীদের চরিত্রে ইসলামের কোন প্রভাবই প্রতিষ্ঠিত হবে না। নামাজ ইসলামী জীবন বিধানের দ্বিতীয় প্রধান ভিত্তি। কিন্তু আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম শিক্ষক ও ছাত্রদের নিকট উহা ফরজ বলে গণ্য নয়। সেখানে নামাজ বাস্তব ক্ষেত্রে একটি মুবাহ (যা করা ও না করার কোন লাভ ক্ষতি নেই) কাজ মাত্র। ইসলাম পর্দার নির্দেশ দেয়; কিন্তু সেখানে পর্দা হারাম। মিথ্যা প্রচার ও মিথ্যা সাক্ষ্য ইসলামে হারাম, কিন্তু সেখানে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে এ সবই আর্টের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী নৈতিকতার অধিকাংশ সীমাই সেখানে লংঘন করা সহজ আর নেতিকতা পালন করা সেখানে অত্যন্ত কঠিন।

বিশেষ করে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ্বাস ও মূল্যমান সম্পর্কে যেটুকু শিক্ষা ছোট সময় হতে শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসে, কলেজ জীবনে যখন তাদের বিশ্বাস ও মূল্যমানের বিপরীত চলাই সহজতর মনে হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে তাদের বিশ্বাস ও কর্মে প্রথমে দ্বন্দ্ব ও পরে স্পষ্ট বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয় তাদের নৈতিক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়। গোটা শিক্ষাজীবনেই বিপরীত কাজ করার এক ব্যাপক ট্রেনিং লাভ করতে থাকে।

এর ফলে তাদের বাস্তব জীবন কোন বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিচয় বহন করে না। তারাঘুষ খাওয়াকে অন্যায় বলে বিশ্বাস করলেও এ বিশ্বাসের বিপরীতে চলারই শিক্ষা লাভ করেছে। জাতির খেদমত করা কর্তব্য বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজের খেদমত করার মহান ট্রেনিংই এ শিক্ষাব্যবস্থায় লাভ করেছে।

জাতির মূল্যমান ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গোটা পরিবেশ গড়ে তোলা না হলে শুধু কীতবিবিদ্যা দ্বারা চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে না। বিদেশে সে সমস্ত বই পড়ান হয়, আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও সে সমস্ত বই আছে। কিন্তু ঐসব দেশে সমাজের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সহিত শিক্ষার পরিবেশের বিরোধ আছে। ছাত্রছাত্রীদের অবাধ মেলামেশা তাদের বিশ্বাসের বিপরীত নয়। সুতরাং তাদের বিশ্বাস মোতাবেক চরিত্র সেখানে সৃষ্টি হয়। ফলে সেসব দেশের শিক্ষিত লোকদের এতটা নৈতিক অধঃপতন দেখা যায় না।

প্রকৃত কথা এই যে, চরিত্র সৃষ্টি জন্য কিছু মূল্যবোধ প্রয়োজন। যদি মূল্যবোধ ও বাস্তব শিক্ষা একরূপ হয় তবেই চরিত্রের উন্নতি সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে আমাদের সাধারণ মূল্যবাধের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং হয় আমাদের মূল্যবোধের বিশ্বাসকে বদলিয়ে শিক্ষার পরিবেশে গঠন করতে হবে, না হয় পরিবেশকে ঈমান অনুযায়ী সংস্কার করতে হবে। প্রথম অবস্থায় আমরা বিশুদ্ধ অনৈসলামী চরিত্র সৃষ্টি করব, আর দ্বিতীয় অবস্থায় সত্যিকার চরিত্র গঠিত হবে।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষার ইসলামী রূপ

জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত লোকেরাই নেতৃত্ব দান করে। কারণ চিন্তার নেতৃত্বেই প্রকৃত নেতৃত্ব। বর্তমানে আমাদের দেশের অনৈসলামীরা ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষিত লোকের নেতৃত্বের ফলেই সমাজে ইসলামের প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই উচ্চ শিক্ষাকে ইসলামী করে গঠন না করলে বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজে ইসলামী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার কিছুতেই সম্ভবপর নয়। উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে ইসলামী জীবন দর্শন, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান এবং কোরআনের ইতিহাস দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ও যৌক্তিকতা শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ ব্যতীত প্রচলিত পন্থায় এসব বিষয় শিক্ষা দিতে থাকলে পৃথকভাবে দ্বীনিয়াত শিক্ষা যতই দেয়া হোক তাতে ছাত্রছাত্রীদের মনমগজ কিছুতেই ইসলামের ছাঁচে গঠিত হবে না।

ইসলামের জড়বাদী ব্যাখ্যা মন মগজে প্রতিষ্ঠিত করার পর শুধু কোরআনের অনুবাদ ও তফসির শিক্ষা দ্বারা কিছুতেই ইসলামের ইতিহাস দর্শনকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ইতিহাসের উচ্চ শিক্ষায় কোরআনের ইতিহাস দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা দ্বারাই তা সম্ভব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা দেবার পর হজরতের সহিত অন্যান্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা কিছুতেই মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সৃষ্টি করবে না। তাই শিক্ষার বিষয়বস্তুকে এমনভাবে পরিবেশেন করতে হবে, যাতে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীগণ মুসলমান বৈজ্ঞানিক, মুসলমান দার্শনিক, মুসলমান ঐতিহাসিক এবং মুসলমান অর্থনীতিবিদ হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের একাংশ মসজিদের মুসলমান, রাজনীতিতে গণতন্ত্রী, অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রী এবং পারিবারিক জীবন ফ্রয়েডপন্থী হিসেবে গঠিত হয়ে কিছুসংখ্যক কার্টুনে পরিণত হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গঠন করতে হলে শিক্ষার সকল বিষয়কেই ইসলামের ছাঁচে ঢেলে গঠন করতে হবে।

ইসলামী জ্ঞানের উৎস

কোরআন ও হাদীসই ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস। আরবি ভাষায় মূল কোরআন ও হাদীসকে পূর্ণরূপে বোঝার লোকের অভাব হলে জীবনের সকল দিকেই ইসলামের প্রভাব ক্ষুণ্ন হবে। তদুপরি বহু শতাব্দীর কঠোর সাধনার ফলে কোরআন ও হাদীসের ভিত্তি যে ইসলামী আইনশাস্ত্র বা ফেকাহ গড়ে উঠছে, তাও আরবি ভাষায়ই রচিত। সুতরাং কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর গবেষণার যোগ্য প্রতিভাশালী লোক তৈরি না হলে ইসলামী শিক্ষা তো দূরর কথা ইসলামী সমাজই টিকতে পারবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষার পর বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার যেমন ব্যবস্থা থাকে তেমনি কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্য শিক্ষার উচ্চস্তরে বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে হবে এর মাধ্যমে যে সকল মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ তৈরি হবে প্রকৃত পক্ষে তারাই ইসলামী দৃষ্টিতে সর্বক্ষেত্রে জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য হবে। কিন্তু তারা যদি মানব সমস্যা, আধুনিক জগৎ ও প্রচলিত চিন্তাধারার সাথে পরিচিত না হয় তাহলে তাদের কোরআন হাদীস

www.pathagar.com

সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের কোনই উপকারে আসবে না। সুতরাং তাদেরকে ডিগ্রি পর্যায়েও বিভিন্ন প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে হবে, যাতে তারা কোরআন ও হাদীসের আলোকে জাতিকে যোগ্য ইসলামী নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়।

শিক্ষকদের আদর্শ

শিক্ষার ব্যাপারে সকল অবস্থায়ই শিক্ষকের গুরুত্ব সর্বাধিক। শিক্ষকর বিদ্যা ও চরিত্রের মানের ওপর চিরদিনই শিক্ষার ফল প্রধানত নির্ভরশীল। কী পড়ান হচ্ছে তার চেয়ে কী ধরনের শিক্ষক পড়াচ্ছেন এর মূল্য ও গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। তাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকগণকে চিন্তা ও কর্মে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। কিতাবিবিদ্যা অপেক্ষা বাস্তব উদাহরণ অনেক বেশি কার্যকরী হয়। যদি শিক্ষকগণ ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শস্থানীয় হন, তাহলে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হবে।

আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের উন্নতি

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার ন্যায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান আজ বিরাট উন্নতি লাভ করেছে। এ উন্নতিকে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে যাতে ব্যবহার করা যায় সেদিকেও আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। ইসলামের চর্চা করার জন্য আমরা যেমন মাইক্রোফোন ব্যবহার করি, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণার ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে, তাও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।

উপসংহার

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এ প্রবন্ধে শিক্ষাপদ্ধিতির ইসলামী রূপ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সরকারি পরিকল্পনা ব্যতীত ব্যাপকভাবে প্রচলন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আর যে সরকার ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করেনি সে ধরনের কোন সরকারকে এরূপ কোন কাঠামোর ভিত্তিতে একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে বললেও কোন সুফল ফলবে না।

সমাজে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য সর্বক্ষেত্রে যেমন কিছুসংখ্যক মুজাহিদের সুসংবদ্ধভাবে কাজ রকতে হবে, তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদিগকে চিন্তা ও গবেষণার সংগে ক্ষুদ্রাকারে হলেও এরূপ একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এভাবেই যখন কোন সমাজে একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলন চলতে থাকে, তখন জীবনের সকল দিকেই উপযুক্ত চিন্তানায়ক ও কর্মীদের দল তৈরি হতে থাকে। কোথাও এরূপ একটি আন্দোলন বিজয়ী হলে অতি সহজেই উপরিউক্ত রূপে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবে পরিণত হবে। সুতরাং যারা ইসলামের পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখেন তাদিগকে একটি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনাকেও নিজেদের কর্মসূচির একটি বিশিষ্ট অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

লেখক : সাবেক আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.pathagar.com

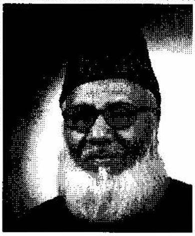

প্রিয় সাথী শহীদ আবদুল মালেক

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

আবদুল মালেকের সুদক্ষ পরিচালনায় সংগৃহীত অর্থের নিখুঁত হিসাব পেলাম। সিকি, আধুলি, পাই পয়সা থেকে নিয়ে কত টাকার নোট কতটি, তার হিসাবের ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছিলেন।

আপনি আবদুল মালেক? হ্যাঁ তাই, আপনি নিজামী ভাই? সেদিনের সে কথাগুলো ডায়েরির পাতায় লেখা না হলেও আমার মনের কোণে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে যখন আমরা মাত্র ক'জন কর্মী কাজ করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যেতাম তখন মফস্বল থেকে আমাদের বেশ কিছু কর্মী ঢাকায় আসছে দেখে আমরা সবাই আনন্দিত হয়েছি। আবদুল মালেক, নূরুল ইসলাম, আজিজ, ইসকান্দার ও মামুনসহ আরো অনেকে পরীক্ষায় ভালো করায় আমরা বেশ উৎসাহিত হয়েছি। আজিজ ছাড়া আর সবাই ঢাকায় আসবে এ সংবাদ পেয়ে আমরা প্রতীক্ষা করছি। ভর্তির সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আবদুল মালেক ছাড়া আমাদের সম্ভাব্য কর্মীদের সবাই এসে গেছে। আবদুল মালেকের অপেক্ষায় আমার মনটা বেশ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলে কোনো ছাত্রের সাথে দেখা হলেই তার কথা জিজ্ঞেস করছি। আসবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত খবর পেয়েছি। দেরির কারণ জানা যাচ্ছে না। অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। সেদিনের সংগঠনের দুরবস্থা, কর্মীস্বল্পতা প্রভৃতি কারণে নতুনদের প্রতীক্ষায় আমাদের হৃদয়মন সঙ্গত কারণেই ব্যাকুল হয়ে উঠত। যতদূর মনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মুহূর্তে নতুন ছাত্র এবং মফস্বল থেকে আগত কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কর্মী ছিল মাত্র দু'জন। অন্য দিকে সংগঠনটা সবেমাত্র গুছিয়ে ওঠার পথে। তখন নাজির ভাই কর্মজীবনে পদার্পণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পূর্ব-পাক দফতরে তখন আমরা মাত্র

www.pathagar.com

দু'জনে কাজ চালাতাম, নাজেম এবং অফিস সেক্রেটারি। কর্মীস্বল্পতার কারণে পূর্ব-পাক দফতরের দায়িত্ব সম্পাদনের সাথে সাথে আমাকে ঢাকা শহরের কর্মী হিসেবেও কাজ করতে হচ্ছে। এমন সময় নূরুদ্দীন ভাই ঢাকা শহর শাখার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করছেন। কর্মীস্বল্পতা ও নেতৃত্বশূন্যতার এই মুহূর্তে একযোগে এতগুলো কর্মীর ঢাকা আগমনে আমরা মনে প্রাণে যে আনন্দ অনুভব করছি তা কেবল উপলব্ধিই করা যায়, ভাষায় রূপ দেয়া যায় না।

তখন পূর্ব-পাক দফতর ছিল জয়কালী মন্দির রোডে। আমি ফজর পড়ে অফিসে যেতাম। অফিস থেকে ইকবাল হল পর্যন্ত আসা-যাওয়ার পথে ফজলুল হক হল, এস এম হল ও শহর অফিসে দায়িত্বশীল কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয়ে যেতো। ঢাকা শহরের কর্মী হিসেবে এর চেয়ে বেশি কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। নতুন সেশনে নতুনদের সাথে যোগাযোগের জন্য তবুও দৌড়াতে হচ্ছে। কলাভবন থেকে বিজ্ঞানভবন, বিজ্ঞানভবন থেকে কলাভবন, কখনো আবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেদিন পূর্ব- পাক দফতরে কাজ সেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো বিল্ডিং পেরিয়ে রেজিস্ট্রার অফিসের পাশ দিয়ে ইকবাল হলে ফিরছি। বেলা তখন ১টা দেড়টা হবে বলেই মনে পড়ে। এই পর্যন্ত সবসময়ই আবদুল মালেকের কথাই মনে করে আসছি। হঠাৎ চার পাঁচজন ছাত্রের এক গ্রুপ রেজিস্ট্রার অফিস থেকে বেরিয়ে তারা পুরাতন পরিষদ ভবনের গেটের পাশে এসে দাঁড়াতেই অকৃত্রিম আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে সালাম ও কোলাকুলির মাধ্যমে যে তরুণ মর্দে মুমিনের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়, আবদুল মালেক শহীদ তার নাম। মুসলিম জাহানের অমূল্য রতন ভাগ্যবান এই তরুণের পূর্ণ পরিচয় লাভ করার মতো দিব্য দৃষ্টি আমার ছিল না। তথাপি সততার উজ্জ্বল প্রতীক আবদুল মালেকের মুখপানে চেয়ে সেদিন আমার মনে বিরাট আশা জেগেছিল। সংগঠনের সেই দুর্দিনে আবদুল মালেকের প্রথম দর্শনে জীবনের সকল ক্লান্তি যেন আমি ভুলে গেলাম। সংগঠনের যে শূন্যতা আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলত আবদুল মালেকের প্রতিভাদীপ্ত চেহারা দেখে সে শূন্যতা পূরণের আশা জেগেছিল কী না তা বলতে পারব না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ অনার্স ক্লাস রীতিমতো শুরু হয়েছে। আমাদের নবাগত কর্মীরা ক্লাসের সাথে সংঘের কাজেও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আত্মনিয়োগ করেছে। সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধের মুহূর্তে সংঘের কর্মী-সমর্থক এমনকি সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও ইসলামী জোশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময় সারওয়ার ভাই ও একরাম ভাই ঢাকায় এলেন। প্রদেশব্যাপী কাজকে ছড়িয়ে দেয়ার এক সুন্দর সুযোগ এল। এখন ঢাকায় কর্মীর অভাব অনেকটা দূর হয়েছে। অন্য দিকে প্রদেশব্যাপী কাজ বৃদ্ধির চাপ বেড়ে চলেছে। সুতরাং ঢাকা শহরের কর্মী হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলাম। এবার পূর্ব-পাক দফতরে পুরোমাত্রায় অফিসিয়াল কাজে আত্মনিয়োগ করতে হচ্ছে। তাই ঢাকায় থেকেও ঢাকার কর্মীদের সাথে সরাসরি পরিচয়ের খুব সুযোগ হচ্ছে না। শহর সভাপতির মাধ্যমেই নবাগত কর্মীদের তৎপরতা ও অগ্রগতি জানার চেষ্টা করছি। আবদুল মালেক একজন নীরব কর্মী, অনেকের কাছ থেকে তা জানা যাচ্ছে। এখন থেকে ঢাকার বৈঠকগুলোতে যোগদানের সুযোগ হচ্ছে না। মাঝে মধ্যে বড় কষ্টে সময় করে নিচ্ছি। এক বৈঠকে ইসলামী বিপ্লবের পথ এই বিষয়ের ওপর আবদুল মালেকের বক্তৃতা শুনলাম। একজন নতুন কর্মীর কাছ থেকে এ কঠিন বিষয়ে এমন সুন্দর বক্তৃতা আমার জন্য ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত। বিশেষ প্রয়োজনীয় মুহূর্ত ছাড়া আবদুল মালেকের সাথে আলাপ-

www.pathagar.com

আলোচনার সুযোগ হচ্ছে না। কারণ বিনা প্রয়োজনে উর্ধ্বতন সংগঠনের কর্মীদের সাথে আলাপের মাধ্যমে নিজেকে প্রদর্শন করা ছিল তার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। মাত্র তিন মাসের মধ্যে আবদুল মালেক একজন দায়িত্বশীল ও নির্ভরযোগ্য কর্মী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। এখন তিনি ঢাকা শহর শাখার অফিস সম্পাদক। অতি অল্পদিনে শহর শাখার অফিসের চেহারা পাল্টে গেছে। শাখা ও প্রশাখার কার্যক্রমের সুষ্ঠু রেকর্ড যেমন খাতাপত্রে সুরক্ষিত হচ্ছে, তেমনি তা সুরক্ষিত হচ্ছে আবদুল মালেকের মন-মগজে। আবদুল মালেকের সহযোগিতায় ঢাকা শহর শাখার পর পর তিনজন সভাপতি যত সহজে বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন তেমন আরামে ও গুরুদায়িত্ব পালনের সুযোগ কোনোদিন কেউ পেয়েছে বলে আমার জানা নেই।

সত্যিই অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী হয়েও আবদুল মালেক একজন নীরব কর্মী। যশ ও খ্যাতির বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না তাঁর মনে। নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভাকে লুকিয়ে রেখে নীরবে কেবল কাজ করে যাওয়াতেই ছিল তাঁর তৃপ্তি। জিঞ্জিরায় সংঘের শিক্ষাশিবির হচ্ছে। রমজান মাসে দেড় শতাধিক কর্মীর সে শিবিরে ব্যবস্থাপনা করতে হচ্ছে ঢাকার কর্মীদেরকে। আবদুল মালেককে খাদ্য ও পানি সরবরাহ ও পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে হচ্ছে। কাজের ধরন দেখে মনে হচ্ছে তিনি কেবল শারীরিক পরিশ্রমই করতে জানেন। হঠাৎ কর্মীদের বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় সে ভুল ভেঙে গেল। প্রদেশব্যাপী কর্মীদের এই প্রতিযোগিতায় আবদুল মালেক তৃতীয় স্থান দখল করলেন। এরপর ইনকিলাবের যুগ। সংঘের পক্ষ থেকে সাহিত্য সঙ্কলন বের করা হবে। কিন্তু লেখক কোথায়? সারওয়ার ভাই অত্যন্ত পেরেশান হয়ে ফিরছিলেন। অনেক কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে চাপ দিয়ে চিঠি লিখেছি। লেখা সময় মতো আসছে না। অথচ সঙ্কলনটা সময়মতো তাড়াতাড়ি বের করতেই হবে। আমি অফিসের ঝামেলা সেরে বেশ একটু সকালেই হলে ফিরছি। হঠাৎ সারওয়ার ভাই বেশ উৎফুল্ল মনে আমার কামরায় গিয়ে হাজির হন। মালেক ও মামুনের দুটো লেখা পেয়ে তিনি যে আনন্দ পেয়েছিলেন তা প্রকাশ করার জন্য আমার কামরায় গিয়েছিলেন কী না বলতে পারি না। তবে সেদিনের আলোচনায় লেখা দুটোর প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু স্থান পায়নি। এভাবেই একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিভার প্রতি ধাপে ধাপে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে থাকে। আলোচনার ফাঁকে একদিন হঠাৎ কে যেন মন্তব্য করল আবদুল মালেক কিছুটা নিরাশাবাদী। কাজ করা দরকার করতে হবে, কিন্তু আন্দোলনের সাফল্য এ যুগে কী করে সম্ভব? এমন চিন্তা নাকি তিনি মাঝে মাঝে করে থাকেন। মূল ব্যাপারটা জানার সিদ্ধান্ত নিলাম। হল সংসদের নির্বাচনের পর মুহূর্তটাই এজন্য সর্বোত্তম সময় হওয়ার কথা। নির্বাচনী ফলাফলকে সামনে রেখে আবদুল মালেক তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলাপ করছেন। ঘটনাক্রমে আমার কানে একটি দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত আওয়াজ ভেসে এল- Shangha will rise surely rise, আসলে মালেক ভাইয়ের কথাগুলো হতো সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক। সুতরাং তাঁকে যাচাই করতে গিয়ে যারা তাড়াহুড়া করে মন্তব্য করেছেন তারা তাঁকে বুঝেই উঠতে পারেননি। হ্যাঁ, আবদুল মালেক সহজে ধরা দেয়ার মতো ব্যক্তি ছিলেন না। তাই তাকে বুঝতে হলে গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হতো, নতুবা অতি নিকটে এসে তার সাহচর্য লাভ করতে হতো।

ইসলামী আন্দোলনের একজন উদীয়মান কর্মী হিসেবে তাঁর মন ছিল মানবতার দরদে ভরপুর। দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অবস্থা জানাও ছিল তাঁর অন্যতম কার্যসূচি। ঈদুল আজহা উপলক্ষে

www.pathagar.com

কর্মীরা বাড়ি যাচ্ছে। রাতের ট্রেনে আবদুল মালেক বাড়ি যাবেন শুনেছি। দু-একদিনের মধ্যে দেখা হয়নি। সময় মতো স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। আবদুল মালেককে খুঁজে পেতে বেশ সময় লেগেছে। কারণ তিনি মধ্যম শ্রেণীতে ওঠেননি। আমাকে দেখে তিনি বেশ অপ্রস্তুত হলেন। আমার স্টেশনে যাওয়া তার কাছে কেমন যেন লেগেছে। বেশ একটু জড়সড় হয়ে বলতে লাগলেন, আপনি স্টেশনে আসবেন জানলে আমি যে করেই হোক দেখা করেই আসতাম। অবশ্য একবার খোঁজ করেছি, আপনাকে পাইনি। আমি কথাগুলোর দিকে কান না দিয়ে কামরটার দিকে ভালো করে দেখছিলাম। তিল ধারণের জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে সারারাত। আমি চেষ্টা করলাম ইন্টারে জায়গা করে দেয়ার। টিকেটের ঝামেলাও চুকিয়ে দেয়া যেত। কিন্তু রাজি করানো সম্ভব হলো না। আবদুল মালেক অকপটে বলে ফেললেন এই লোকগুলোর সাথে আলাপ করলে আমার ভালো লাগবে। তখনো বুঝতে পারিনি কত মর্যাদাবান ব্যক্তির কাছে এই কথাগুলো শুনেছি।

বছর শেষ না হতেই আবদুল মালেক সংঘের সদস্যপদ (রুকন) লাভ করলেন। এখন তিনি সংঘের প্রথম কাতারের কর্মীদের একজন। এত দ্রুত যারা অগ্রসর হয় তাদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত তাল সামলাতে পারে না। কিন্তু আমরা আবদুল মালেকের মধ্যে এর বিন্দুমাত্র ছাপ লক্ষ্য করিনি। ইতোমধ্যে আবদুল মালেক আন্দোলন ও সংগঠনকে বোঝার দিক দিয়ে অনেকের চেয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর অধীনে কাজ করতে আবদুল মালেকের মনে মোটেই সঙ্কোচ নেই। আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাঁর এ আদর্শ সংঘকর্মীদের জন্য একটি স্থায়ী উদাহরণ।

এ পর্যন্ত আবদুল মালেককে নিকট থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। ১৯৬৫-৬৬ সেশন শেষ হয়ে আসছে। আর মাত্র এক মাস পরই নতুন সেশন শুরু হবে। মুজিবের অনার্স এবং হাফিজুল্লাহ ভাইয়ের ফাইনাল পরীক্ষা। ঢাকা শহর শাখার কাজ তদারকের জন্য পূর্ব-পাক দফতরেও তখন সারওয়ার ভাই, একরাম ভাই পরীক্ষার্থী। এক মাসের জন্য আমাকে ঢাকার কাজ দেখাশোনা করতে হবে। মনে করলাম দিনে ঢাকার কাজ দেখাশোনা করে রাত জেগে পূর্ব-পাক দফতরের কাজ সারতে হবে। কিন্তু আবদুল মালেকের সহযোগিতায় আমাকে বেগ পেতে হয়নি মোটেই। সারাদিনের পরিবর্তে এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা সময় দিয়ে আমি বেঁচে গেছি। নিজ হাতে তেমন কিছুই আমাকে করতে হয়নি। সামান্য কিছু বুঝিয়ে দিয়েই আমি পূর্ব-পাক দফতরে যথারীতি আমার কাজ করেছি। আবদুল মালেকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও কর্মকুশলতায় প্রতিটি কাজই হয়ে যেতো। দায়িত্বানুভূতি ও স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল আবদুল মালেকের। আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও অদ্ভুত কর্মকুশলতায় প্রতিটি কাজই হয়ে যেতো। দায়িত্বানুভূতি ও স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল আবদুল মালেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দিক। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে একদিন ঢাকায় প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেল। আগামসি লেনস্থ সংঘের পূর্ব-পাক দফতর থেকে বেরোবার উপায় ছিল না আমাদের। বস্তির লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতন কলাভবন, হোসেনী দালান ও সিটি ল কলেজে আশ্রয় নিয়েছে। আমি কোনো মতে ফজলুল হক হলে গেলাম। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা কী করতে পারি সে সম্পর্কে পরামর্শ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে কথা ওঠার আগেই আবদুল মালেকের মুখে খবর পেলাম ঢাকা শহর অফিসে পানি উঠেছে। বৃষ্টি একটু থেমে যেতেই তিনি অফিসে গিয়ে সব দেখে এসেছেন। অধিক পানি ওঠায়

www.pathagar.com

কাগজপত্রাদি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবদুল মালেক এগুলো সব ঠিকঠাক করে এসেছেন। তাঁর দায়িত্ব সচেতনতার এ চাক্ষুষ প্রমাণটুকু আমার পক্ষে কোনদিনই ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তারপর কর্মী বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে একদিন নিউমার্কেট ও আরেক দিন জিন্নাহ এভিনিউয়ে রোড কালেকশন করা হলো। অল্প সময়ে কর্মীদেরকে জমায়েত করে এত বড় কাজ আঞ্জাম দেয়ার মতো আর কোনো কর্মীই ছিল না। আমার তো কাজ ছিল শুধু কাগজের টুকরায় কিছু নোট লিখে অথবা আধঘণ্টা পনের মিনিটের আলাপে মোটামুটি কিছু বুঝিয়ে দেয়া। আবদুল মালেকের সুদক্ষ পরিচালনায় সংগৃহীত অর্থের নিখুঁত হিসাব পেলাম। সিকি, আধুলি, পাই পয়সা থেকে নিয়ে কত টাকার নোট কতটি, তার হিসাবের ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছিলেন। এরপর তিন দিন তিন রাত একটানা পরিশ্রম করে আবদুল মালেক অল্পসংখ্যক কর্মী নিয়ে চাল বণ্টনের কাজ সমাধান করে ফেললেন।

সেদিন আবদুল মালেককে স্বচক্ষে অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখেছি। আর মুরব্বি সেজে পরামর্শ দিয়েছি কাজটা আর একটু সহজে কিভাবে করা যায়। এই ভাগ্যবান ব্যক্তির পরিশ্রমকে লাঘব করার জন্য সেদিন তার সাথে মিলে নিজে হাতে কিছু করতে পারলে আজ মনকে কিছু সান্ত্বনা দিতে পারতাম।

অক্টোবর থেকে ১৯৬৬-৬৭ নয়া সেশন কাজ শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে ঢাকা এবং পূর্ব-পাক সংগঠনের নেতৃত্বের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দেবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। ঢাকার তৎকালীন সভাপতি মুজিব অনার্স পরীক্ষা শেষ করে এমবিএ পড়ার উদ্দেশে করাচি চলে যাচ্ছে। ঢাকায় সিনিয়র কর্মী নেই বললেই চলে। অন্যত্র থেকে নেতৃত্বের অভাব পূরণ করা যায় কী না আলোচনা চলছে। ঢাকা শহর শাখার বার্ষিক নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে প্রায় এক মাস। কেন্দ্র থেকে তাগিদ আসছে। কিন্তু আমরা কিছুই যেন ঠাওর করতে পারছি না। সারওয়ার ভাই অবশ্য চিন্তা করেছিলেন শেষ পর্যন্ত পূর্ব-পাক দফতর থেকেই কোনো একজনকে ঢাকা শহর শাখায় দিয়ে দেবার কথা। ঢাকায় তখন সদস্যসংখ্যা একেবারেই সীমিত। এর মধ্যে চিন্তা ও কাজের দিক দিয়ে আবদুল মালেকই ছিলেন অগ্রসর। একদিকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তদুপরি সদস্য হয়েছেন মাত্র কয়েক মাস আগে। সুতরাং এত তাড়াতাড়ি তার ওপর বিরাট কোনো জিম্মাদারি চাপালে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নষ্ট হয় কী না সে প্রশ্নটাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সারওয়ার ভাইয়ের নির্দেশে আমি ঢাকায় সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগতভাবেও সমস্যা সম্পর্কে আলাপ করলাম। এ সুযোগে সংগঠনের বর্তমান- ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আবদুল মালেকের চিন্তার গভীরতার সাথে আন্দোলনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য যে বলিষ্ঠ যোগ্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের প্রয়োজন সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এমন নেতৃত্ব আমাদের মধ্যে না থাকলে আমরা কাজ করবো না এমনও হতে পারে না। আমাদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ এবং সিনিয়র যে কোনো একজনকে সামনে রেখে আমরা কর্মীরা যদি পূর্ণ দায়িত্বানুভূতি নিয়ে কাজ করে যাই তা হলে এ অভাব অবশ্যই পূরণ হয়ে যাবে। এ ধরনের একটা বিজ্ঞচিত উক্তি শুনে আমরা অন্য চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে ঢাকা শহর শাখার নির্বাচন দিয়ে দিলাম। ফজলু ভাই নির্বাচিত হয়ে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত হলেন। মাঝে মধ্যে দু-একবার অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টাও করলেন। শেষ পর্যন্ত কর্মী গঠনের কাজটাও এ সেশনেই ভালো হয়েছে বলে আমার ধারণা। এ সেশনে

www.pathagar.com

আবদুল মালেক শাখা সম্পাদক হিসেবে সংঘের মেরুদণ্ডের ভূমিকা পালন করলেন। ১৯৬৬-৬৭ সালের নতুন সেশন শুরু হয়েছে। কিন্তু বিগত সেশনের ন্যায় কাজে যেন গতি আসছে না। একই যোগে ঢাকা শহর পূর্ব-পাক সংগঠনের নেতৃত্বের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। মুজিব সবেমাত্র তৈরি হতেই বিদায় নিয়েছে। সারওয়ার ভাইতো উল্কার বেগে এসে উল্কার মতোই চলে গেলেন। প্রাক্তন কর্মীদের থেকে শুরু করে সংঘের সর্বস্তরের কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষী মহল এতে বিস্মিত হলেন। সারওয়ার ভাইকে রাখার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আমি একরাম ভাইকে সামনে রেখে কাজ শুরু করে দিয়েছি। সম্মেলন ও মাহে রমজানের সার্কুলার একরাম ভাইয়ের নামে ইস্যু করা হলো। ইতোমধ্যে সারওয়ার ভাই চট্টগ্রাম থেকে এসে গেলেন। তিনি এবার গঠনতান্ত্রিকভাবে কাউকে কার্যকরী সভাপতি করে বিদায় নেয়ার উদ্দেশ্যেই আসছিলেন। গত এক বছরের সাংগঠনিক জীবনে সারওয়ার ভাইয়ের সাথে খুঁটিনাটি সব বিষয়ে আমার আলাপ হতো বেশি। কিন্তু এবারে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম। আমাকে ডিঙিয়ে পর্দার আড়ালে কিছু একটা হচ্ছে বলে মনে হলো। সারওয়ার ভাই সংঘের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব সম্পর্কে এদিক ওদিক কিছু সলাপরামর্শ করেছেন। ফজলু ভাই, ফোরকান ভাই ও মালেক ভাইয়ের ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি একটা ফয়সালা করে ফেললেন বলেই আঁচ করা গেল। পরদিন কার্যকরী পরিষদের জরুরি অধিবেশনে সারওয়ার ভাই ছুটি নিলেন। আর আমাকে কার্যকরী সভাপতি নিযুক্ত করা হলো। ব্যাপারটা ভীষণ খাপছাড়া লাগল আমার কাছে। কারণ ১৯৬৩ থেকে ৬৬ পর্যন্ত সংঘের কেরানিগিরির কাজ ছাড়া আমার অন্য কোনো ভূমিকা ছিল না। পাঁচ-দশজনের একটি কর্মী বৈঠক চালানোর অভিজ্ঞতাও হয়নি। সংঘের নিজস্ব প্রোগ্রামে মাঝে মধ্যে দারসে কুরআন ও দারসে হাদিস দেয়া ছাড়া সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে এ পর্যন্ত বক্তৃতা দেয়ার তেমন একটা সুযোগ আসেনি। এখন হঠাৎ করে প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হবে এটা কী সম্ভব? সাংগঠনিক শৃঙ্খলার খাতিরে পরিষদের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিলেও এটাকে নির্ভুল সিদ্ধান্ত বলে আমার মনে আস্থা আসেনি। সম্মেলনে আজমে আলা সদস্যদের অভিমত নিয়ে নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করবেন, সে মুহূর্তে নিশ্চিত আমি বেঁচে যাব এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে আমি কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম।

সম্মেলন আরম্ভ হয়েছে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে। ৮ তারিখ পর্যন্ত প্রস্তুতির দিকে ভালোভাবেই নজর নিয়েছি। ৯ থেকে ১০ তারিখের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কোন কিছু করতে পারিনি। বেলা তিনটার সম্মেলন উদ্বোধন হলো। তার আগে নাজেমে আলার পরিচালনায় পূর্ব-পাক। সভাপতি হিসেবে আমাকে শপথ নিতে হলো। বিরাট সম্মেলনের নিয়মশৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগী হতে পারিনি। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় অনেকটা উদাসীনভাবে চারটা দিন কেটে গেল। এ ফাঁকে সম্মেলনের পরিবেশও অনেকটা নষ্ট হলো। সম্মেলন-উত্তরকালে তার প্রভাব দু-এক জায়গায় মারাত্মক আকার ধারণ করল। এ সময়টা সংগঠনের জন্য যেমন ছিল অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত তেমনি আমার নিজের জন্যও। সেদিন আবদুল মালেকের আন্তরিক সহযোগিতা ও সুচিন্তিত পরামর্শ না পেলে হয়তো আমার পক্ষে আন্দোলনে টিকে থাকাও সম্ভব হতো না।

সম্মেলন শেষ হওয়ার পর পর বেশ কয়কটি জায়গা সফর করে এলাম। কর্মীদের অনেকের মন্তব্য শুনলাম। যে কয়জন নীরব কর্মীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বিচক্ষণতার কারণে সম্মেলন শেষ

www.pathagar.com

পর্যন্ত সার্থক হয়েছিল আবদুল মালেকের নাম তাদের শীর্ষভাগে। প্রথম সফর থেকে ঢাকায় ফিরে ফজলুল হক হলে গিয়েছি। আবদুল মালেক আমার থেকে বাইরের খবর জানলেন এবং ঢাকার অবস্থা জানাতে চেষ্টা করলেন। ঢাকার কোনো এক উপশাখায় আমাকে কেন্দ্র করে মারাত্মক একটা কিছু হয়ে গেছে, আরো হতে যাচ্ছে বলে খবর পেলাম। সেদিকে কোনো কান না দিয়ে সফরের দ্বিতীয় পর্বের দিকে মনোযোগী হলাম। আমার অনুপস্থিতিতে ঢাকার পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়েছে। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সবাই স্বীকার করছেন। ব্যাপারটা আমাদের সাংগঠনিক শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু একে স্থায়ীভাবে প্রতিহত করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। ঢাকা এবং পূর্ব-পাক সংগঠনের নেতৃত্বকে দুর্বল এবং অসহায় মনে করে সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মানসে কিছু সংখ্যক অকর্মী কর্মী সেজে এ অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়ে এগুলো দমন করার জন্য যখন দায়িত্বশীল কর্মীদেরকে রাজি করাতে পারিনি তখন দায়িত্ব ছেড়ে সরে পড়ার মনোভাব আমার প্রবল হয়েছিল। আমার হাতে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগে আমি সরে পড়ি, তারপর যাদের ওপর দায়িত্ব আসবে তারা পারলে সংগঠনকে বাঁচাবেন নতুবা নিজেরাই দায়ী হবেন। এমন বাজে চিন্তা আমার মনে একাধিকবার এসেছে। সংগঠনজীবনে এ ছিল আমার সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্ত। আবদুল মালেকের একক হস্তক্ষেপের ফলে সেদিন দরবেশী কায়দায় এহেন শয়তানী ওয়াসওসা থেকে আমি রক্ষা পেয়েছিলাম। কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আবদুল মালেকের কাছ থেকে সবচেয়ে উন্নত পরামর্শ পাচ্ছি অথচ সে মজলিসে শূরায় নির্বাচিত হয়নি। কারণ সদস্য হিসেবে তিনি নতুন, সেই সাথে নীরব কর্মী হিসেবে তিনি অনেকটা অপরিচিতও। মজলিসে শূরার প্রথম সাধারণ অধিবেশনে তাকে বিশেষভাবে ডাকা হলো। এতে সংগঠনকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচানোর একটা চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তার কাছ থেকে বেশির ভাগ সহযোগিতা পেলাম। শূরায় তার ভূমিকা দেখে তাকে পরে মনোনয়ন দান করা হয়েছিল। তারপর প্রদেশব্যাপী কাজের পরিকল্পনা গ্রহণের পালা। সংগঠরে দাবি অনুযায়ী কাজ অনেক করা দরকার। কিন্তু আমিসহ পূর্ব-পাক সংগঠনের চারজন কর্মী বিএ পরিক্ষার্থী। একই সময়ে আবদুল মালেকেরও Subsidiary পরীক্ষা। শূরার সদস্যরা পরীক্ষা দেখে তেমন কোনো প্রোগ্রাম না নেয়ার দিকে রায় দিচ্ছেন। আবদুল মালেকের সম্মতিক্রমে আমি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হলাম। শেষ পর্যন্ত সেশনের দুটো উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম স্কুল কর্মীদের শিক্ষা শিবির ও বিশিষ্ট কর্মীদের শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় বেশির ভাগ ঝুঁকি নিলেন আবদুল মালেক। সংগঠনের নাজুক পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করে মন-প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করে চলেছেন আবদুল মালেক। সংগঠনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জানার চেষ্টা করেছেন তিনি। এ বছর ঢাকা শহর শাখার তিনটি পাঠকচক্র পর্যায়ক্রমে পরিচালনা করতে হয়েছে আমাকে। পাঠচক্রের সদস্যদের কাছ থেকে সে চক্রের অবস্থা জেনে নিচ্ছে যোগদানকারীদের অবস্থা। শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত যতবার সফর থেকে এসেছি, প্রায় প্রতিবারই তিনি অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বিভিন্ন শাখার অবস্থা জানার চেষ্টা করেছেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেও সঙ্কোচ করেননি কোনোদিন।

১৯৬৭-৬৮ সেশন শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত তিনটি শিবিরের ব্যবস্থাপক হিসেবে আবদুল মালেকের যোগ্যতার প্রচ্ছন্ন রূপটি কর্মীদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। বিগত সেশনে তিনি

www.pathagar.com

প্রাদেশিক মজলিসে শূরায় নির্বাচিত হননি। এবারে তিনি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য। দ্রুতগতিতে আন্দোলনের এত সামনে আসা তার কাছে ভালো লাগেনি। আবদুল মালেকের মনে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। নিজের প্রদর্শনী (Projection) হয় এমন যে কোনো প্রোগ্রাম এবার এড়িয়ে যেতে তিনি বদ্ধপরিকর। তার এরূপ অনমনীয় মনোভাব আর কোনোদিন লক্ষ্য করিনি। ব্যাপারটা অবশ্য আমার বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু খুব সহজে এটাকে আমল দিতে চাইনি। কার্যকরী পরিষদের এক বৈঠকে স্কুলকর্মীদের প্রোগ্রাম দেয়ার জন্য আমি জোর করছিলাম। পরিষদ সদস্যদের সবাই চাপ দেয়ার পরও তিনি রাজি হচ্ছেন না। এ ছিল তার সজ্ঞ জীবনের একটা ব্যতিক্রম ঘটনা। মজলিসে শূরার ফয়সালা হিসেবে পেশ করার পর অবশ্য তিনি মৌন সম্মতি জানালেন। একদিন পর হঠাৎ আমার হাতে একটা এনভেলাপ এল। খুলে দেখি ওটা তার মজলিসে শূরা থেকে ইস্তফাপত্র। আমি বিশেষ কোনো চিন্তা না করে ওটা প্রত্যাখ্যান করলাম। পরে আবার একটা বিরাট পত্র এল যা পড়ার মতো ধৈর্য আমার ছিল না। আমি সরাসরি আলাপ করতে গেলাম। ফজলুল হক হলে পুকুরপাড়ে কয় ঘণ্টা আলাপ হলো হিসাব নেই। তিনি বলেন, ইসলামী আন্দোলনের জন্য নৈতিক ও মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন তার কিছুই আমার নেই। অথচ অনেক বেশিই আমাকে সামনে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এটা আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর হবে এবং আমার নিজের জন্যও। এ অভিযোগের জবাব আমি কী দিয়েছিলাম মনে নেই। তবে সরাসরি কুরআন হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা না বলা পর্যন্ত তার মত পরিবর্তন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরিশেষে ইস্তফাপত্র Withdrwa করতে সম্মত হলেন তিনি। এরপর থেকে আর এরূপ মনোভাব তেমন একটা লক্ষ্য করিনি।

১৯৬৮-৬৯ এর সেশন শুরু হয়েছে। এবার আবদুল মালেক ঢাকা শহর শাখার সভাপতি। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে নির্বাচিত তিন সদস্যের তিনি অন্যতম। গণ-আন্দোলনের কর্মমুখর এই বছরে বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে তিনি তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। মনের দিক দিয়ে অনেক সরল ও মজবুত আবদুল মালেককে অপেক্ষাকৃত একটু বেশি কোমল মনে হচ্ছে। গত ক'বছর তার সাথে আমার সম্পর্ক অনেকটা সহকর্মী ও সহপাঠী পর্যায়ের। এবারে কিভাবে তা ছোট ভাই বড় ভাইয়ে রূপ নিলো তা বুঝে উঠতে পারিনি। এখন থেকে আবদুল মালেক প্রাদেশিক দফতরে মাসিক রিপোর্ট অথবা পরিকল্পনার কপির সাথে ছোট একটি চিঠিও দিয়ে দেন যার শেষে লেখা থাকে– আপনার স্নেহের ছোট ভাই আবদুল মালেক। তার সারা জীবনের ভালোবাসাটুকু অন্তর নিংড়িয়ে দিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন কী না কে বলবে? প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ডেমরার অগণিত জানমালের ক্ষতি হয়েছে। সংঘের পক্ষ থেকে সেখানে রিলিফ ওয়ার্কে যেতে হবে। ঢাকায় কর্মীদের নিয়ে আবদুল মালেক হাজির। সেখানকার অবস্থা দেখাশোনা ও কায়িক পরিশ্রম যা কিছু করা যায় তার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে কর্মীদের পাঠিয়ে দিলেন তিনি। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় যেখানে মানুষগুলো হাহাকার করছে সেখানে খালি হাতে যেতে মালেক রাজি হচ্ছেন না। মনটা তার বেশ ভারাক্রান্ত। কোনো মতে সম্মেলন ফান্ড থেকে টাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। মালেক পাউরুটি নিয়ে ডেমরা যাবেন। আমি কাউসার হাউজে গিয়েছি। হঠাৎ এক টেলিফোন এলো। বিশেষ কোনো কথা নয়। কিছু একটা সাথে নিয়ে যেতে পারছে বলে মনটা একটু হালকা

www.pathagar.com

হয়েছে। এবার আমার মনটা হালকা করা দরকার। তাই নিজামী ভাই বলে ডাক দিয়েছেন– এই আর কি! কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বৈঠক উপলক্ষে করাচি যেতে হবে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যদের সকলের যোগদান সম্ভব নয়। আমার সাথে আর যে কোনো একজনের যেতে হবে। আবদুল মালেককেই সাথে নেয়ার সিদ্ধান্ত হলো। এতে আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। বিমানে উঠে তার থেকে দুটো নতুন জিনিস পেলাম। বিগত আন্দোলনের গতিধারা বিশ্লেষণ করে সামনের পদক্ষেপ সম্পর্কে উচ্চাঙ্গ আলাপ হলো। এর আগের ঘটনাটি ছিল শিক্ষণীয়। বিমানে উঠেই দু'জনে দু'টি পত্রিকা হাতে নিয়েছি। আমার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী পত্রিকার প্রথম আর শেষ পাতায় চোখ বুলিয়েই এবার আবদুল মালেকের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছি। পাশ ফিরে তাকাতেই দেখি তিনি পত্রিকার দুটো বিশেষ খবর নোট করছেন। মিষ্টি হাসি হেসে আমার কাছে আরো কয়েকটি মিনিট সময় চেয়ে নিলেন তিনি।

কেন্দ্রীয় মজিলেস শূরার অধিবেশন থেকে ফিরে এসেছি। প্রদেশব্যাপী ব্যাপক প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। নূরুল ইসলাম পরীক্ষার্থী বলে এবার সফর একাকীই করতে হচ্ছে। সফরে যাবার আগে আবদুল মালেকের সাথে দেখা করে যাই। আর ফিরে এলে তিনি আমার Tour Impression জানার চেষ্টা করেন। এখন থেকে তার সততাদীপ্ত চাহনি আর আন্তরিকতাপূর্ণ কথা আমার মনের ওপর নতুন ধরনের প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। প্রাদেশিক মজলিসে শূরার বৈঠকের মাত্র দু-একদিন আগে হঠাৎ করে আবদুল মালেক বাড়ি যাবেন বলে শুনলাম। ব্যাপারটা কেমন যেন লাগল। আমি ডেকে জিজ্ঞেস করলাম। মনটা বেশ ভারাক্রান্ত মনে হলো তার। বাড়ি যাওয়াটা প্রয়োজন মনে করছি। কিন্তু আপনাকে না বলে বাড়ি যাচ্ছি– এ কথা বলতে পারি না মালেক উত্তর করলেন। ছোটোখাট কারণে তিনি বাড়ি যেতে পারেন না। সুতরাং তাকে বাধা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এক দিকে তার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছে অন্য দিকে তার অনুপস্থিতিতে মজলিসে শূরার গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হবে এটা আমার কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব । তার কারণটা জানতে চাইলাম। কী যেন একটা স্বপ্ন দেখে তিনি বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। সংগ্রামী জীবনে আমরা স্বপ্নকে এরূপ গুরুত্ব দিতে পারি না, বাস্তবে কিছু ঘটে থাকলে সেটা স্বতন্ত্র কথা, বাড়ি গেলে বেশ সময় যাবে। বরং টেলিগ্রাম করে প্রকৃত অবস্থা জেনে নিলেই তো ভালো হয়। আমার মুখ থেকে এতটুকু কথা বের হতেই মালেকের চোখে মুখে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। পরে আমি নিজেই তাকে বাড়ি যাওয়ার জন্য কয়েকবার চাপ দিয়েছি। মালেক উত্তর দিয়েছেন, এখন না গেলে চলবে, বাড়ি থেকে চিঠি পেয়েছি। কে জানত যে শহীদ হয়েই তিনি মায়ের কাছে ফিরে যাবেন।

মজলিসে শূরার পরিকল্পনা অনুসারে ৯ আগস্ট আমার সফরসূচি শেষ হয়েছে। ১০ আগস্ট ভোরে ঢাকায় পৌঁছেছি। একটানা আড়াই মাস সফর শেষে ক্লান্ত হয়েছি বেশ। সারাদিন আর বাইরে বের হতে পারিনি। মালেকও অন্যান্য বারের মতো প্রাদেশিক অফিসে এসে খোঁজ নেননি। মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। শেষ সফরে কেন যেন তাড়াতাড়ি ঢাকায় ফিরে আসার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। নীলফামারীর প্রোগ্রামটা সংক্ষেপ করে একদিন আগেই রংপুর পৌঁছে গেছি। দিনগুলো দু'হাত দিয়ে ঠেলছিলাম। ফিরার পথে গাড়িটাও যেন বেশ বিলম্বে পৌঁছল। দিন শেষে আবদুল কাদের থেকে খবর পেলাম আজ রাতে ঢাকায়

www.pathagar.com

রুকনদের জরুরি বৈঠক আছে। মাগরিবের নামাজ পড়ে ধীরে ধীরে রওনা হলাম। পথে বেশ একটু দেরিও হয়ে গেল। কার্জন হলে পৌঁছতেই এশার জামায়াতের একামত শুরু হলো। মালেক অজু শেষ করে মসজিদের দিকে পা বাড়াতেই আমি সামনে হাজির। সালামের জবাবটা দিয়েই কিছু সময়ের জন্য আমার দিকে অবাক দৃশ্যে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তার স্বভাবসুলভ মিষ্টি-মধুর হাসিভরা মুখে বললেন, আপনি আসছেন? নামাজ শুরু হয়ে গেছে। কথা বলা সম্ভব ছিল না। শুধু হাতটা মিলিয়ে জামায়াতে শামিল হলাম। একটু পরে বৈঠক শুরু হলো। শেষ হতে হতে রাত বাজল প্রায় ১টা। সুতরাং কারো সাথে ব্যক্তিগত আলোচনার সুযোগ হলো না। রুকনদের এই বৈঠকে মালেক তার শেষ হেদায়াত দিচ্ছিলেন, এ কথা আমরা কেউ তখন বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, এটাই ছিল মালেকের শেষ আরকান ইজতেমা। তার শেষ হেদায়াত আমি সরাসরি শুনতে পেয়ে এখন নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। শহীদি আত্মার স্মৃতিবিজড়িত এই আরকান ইজতেমার তিনটি কথা আমাদের সংগ্রামী জীবনের প্রতি পদক্ষেপের স্থায়ী পাথেয় হয়ে থাকবে। রুকনদের ভূমিকা বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত হতে হবে। আন্দোলনের দাবি ও বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রুকনদের career sacrifice-এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, মূল সংগঠনের দাবি পূরণের প্রাধান্যকে উপেক্ষা করে Side Organisation-এর প্রতি অহেতুক ঝোঁক প্রবণতাকে রোধ করতে হবে। কথাগুলোর প্রতি এতবেশি জোর দিচ্ছিলেন তিনি, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, আবদুল মালেক carreer sacrifice এর হেদায়াত দিয়ে নিজেই তার চূড়ান্ত স্বাক্ষর রেখে গেলেন। ঈমানের দাবি পূরণ করতে গিয়ে আবদুল মালেক দ্বিধাহীনচিত্তে শাহাদাতের পিয়ালা পান করলেন। জীবনের বিনিময়ে বাতিলের মোকাবেলায় সত্য প্রতিষ্ঠার রক্তস্বাক্ষর রেখে গেলেন তিনি। মালেক আমাদের মধ্যে ছিলেন সর্বোত্তম– এ কথাও সবাই জানতাম। কিন্তু আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার মতো এত বড় মর্যাদায় তিনি ভূষিত হবেন এটা বুঝে ওঠা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। আন্দোলন ও সংগঠনের হাজারো সমস্যা নিয়ে মালেকের সাথে আলাপের সুযোগ আর হলো না। ১০ তারিখ রাতের সেই মুহূর্তে আমার দিকে তিনি যেভাবে তাকিয়ে ছিলেন ১৭ তারিখের অপরাহ্নে তার জ্যোতির্ময় চেহারার দিকে আমি অনুরূপ চেয়ে আছি।

লেখক : আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও সাবেক কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী

www.pathagar.com

ইসলামী নেতৃত্ব

আল ইসলাম আল্লাহ্প্রদত্ত দীন বা জীবনবিধান। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে বলে ইকামাতে দীন। কোন একটি ভূ-খণ্ড সমাজের সকল স্তরে, সকল দিকে ও বিভাগে ইসলামী বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলেই বলতে হবে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কায়েমের প্রচেষ্টা চালিয়ে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই হচ্ছে মুমিন জীবনের আসল লক্ষ্য। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কখনো আপনা আপনি কায়েম হয়ে যায় না। এর জন্য প্রয়োজন আন্দোলন। আর আন্দোলন মানে হচ্ছে লক্ষ্য হাসিলের জন্য একদল মানুষের সমন্বিত প্রয়াস।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কায়েমের আন্দোলনকে বলা হয় আল্লাহর পথে জিহাদ। বাংলা ভাষায় 'ইসলামী আন্দোলন' পরিভাষা আল্লাহর পথে জিহাদকেই বুঝায়। আন্দোলনের জন্য চাই সংগঠন। নেতৃত্ব এবং একদল কর্মী না হলে সংগঠন হয় না। সংগঠনে বহু সংখ্যক কর্মী থাকে। নেতার সংখ্যা থাকে কম। কমসংখ্যক হলেও নেতৃত্বকেই সংগঠনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।

ইসলামী নেতৃত্ব ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নবীদের উত্তরসূরি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দূর অতীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নেতৃত্ব দেবার জন্য নবী রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। আদম (আ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত বহু

www.pathagar.com

সংখ্যক নবী রাসূল পৃথিবীর বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে আবির্ভূত হয়ে-প্রদত্ত জীবনবিধান আল ইসলামকে মানবসমাজে কায়েম করার আন্দোলন গড়ে, তোলেন এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এই প্রসংগে মহান আল্লাহ্ বলেন-

আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম (যাতে) আমার নির্দেশে লোকদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়। (সূরা আম্বিয়া :৭৩) আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী আবির্ভূত হবেন না। কিন্তু তাঁর প্রতি নাযিলকৃত আল-কুরআন এবং সেই আল-কুরআনকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাহ অবিকৃতভাবে বিদ্যমান। আল্লাহর রাসূলের (সা) ইন্তেকালের পর যুগে যুগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতৃত্ব আল ইসলামকে আল্লাহর যমীনে কায়েম করার জন্য বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। আজো সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। যেইসব মহান ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের (সা) দেখানো পদ্ধতিতে আল ইসলামকে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নবী রাসূলদের উত্তরসূরির ভূমিকাই পালন করছেন।

এই নিরিখে বিচার করলে ইসলামী নেতৃত্বের রয়েছে একটি বড়ো মর্যাদা। সেই কারণে তাঁদের দায়িত্ব বড়ো। তাঁদের সব সময় সজাগ থাকা উচিত যাতে তাঁদের কথা, কাজ এবং আচরণে এমন কিছু প্রকাশ না পায় যা নবীর উত্তরসূরির জন্য শোভনীয় নয়।

'কথার অনুরূপ কাজ' ইসলামী নেতৃত্বের প্রধান ভূষণ

অনুগামী ও কর্ম এলাকার লোকদের মাঝে আল ইসলামের জ্ঞান বিতরণ ইসলামী নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান কাজ। কিন্তু অনুগামীগণ কিংবা কর্ম এলাকার লোকেরা যদি নেতৃত্বের বাস্তব জীবনে আল ইসলামের অনুশীলন দেখতে না পায়, শুধু মুখের কথা শুনেই তারা অনুপ্রাণিত হয় না। যেইসব নেতা মুখে সুন্দর সুন্দর কথা বলেন অথচ তাঁদের জীবনে সেইসব সুন্দর কথার প্রতিফলন থাকে না, লোকেরা তাঁদের কপট নেতা গণ্য করে। কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য লোকেরা কখনো কখনো তাঁদের কথা মেনে নিতে বাধ্য হলেও তাদের অন্তরে এইসব নেতার প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ, কোন ভালোবাসা থাকে না।

লোকেরা যখন দেখতে পায় যে নেতাগণ যেইসব কাজ করার জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন, তাঁরা নিজেরাও সেইসব লোকেরা যখন দেখতে পায় যে নেতাগণ যেইসব কাজ করার জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন। তাঁরা নিজেরাও সেইসব কাজ করে থাকেন, তখন তারা নেতাদেরকে নীতিবান নেতা বলে স্বীকার করে, তখন তারা তাঁদের কথা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে। নীতিবান নেতৃত্বের নিরাপস ভূমিকাই সাধারণ লোকদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকে। এমন নেতৃেত্বের নির্দেশ মতো কাজ করতে তারা উৎসাহ বোধ করে।

আল্লাহর বাসূল মুহাম্মদ (সা) আল-কুরআনের শিক্ষা লোকদের সামনে পেশ করতেন। লোকেরা দেখতে পেতো যে তিনি যেই শিক্ষার কথা মুখে উচ্চারণ করছেন সেই শিক্ষা অনুযায়ীই তাঁর জীবন পরিচালনা করছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর জীবন ছিলো আল-কুরআনেরই জীবন্ত রূপ। বৈসাদৃশ্যহীন, বৈপরীত্যহীন পরিচ্ছন্ন জীবন তাকে অসাধাণ করে তুলেছিলো, তাকে অনুকরণীয় অনুসরণীয় করে তুলেছিলো। কথার অনুরূপ কাজ না করা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত। এমন চরিত্রের লোকদের সমালোচনা করেই তিনি বলেনঃ

www.pathagar.com

ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, যেই কাজ তোমরা নিজেরা কর না তা বল কেন? আল্লাহর নিকট এটি গর্হিত কাজ যে তোমরা এমন কথা বল যা তোমরা কর না। (সূরা আস সাফ: ২,৩)

ইসলামী নেতৃত্বকে অবশ্যই পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে হবে। তাঁদের কথা ও কাজের মাঝে যাতে কোন বৈপরীত্য না থাকে সেই ব্যাপারে তাদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কথার অনুরূপ কাজই তাদেরকে লোকদের নিকট শ্রদ্ধা কুড়াতে না পারেন তবে তো তাদেরকে ব্যর্থ নেতৃত্বই বলতে হবে।

মানুষের কল্যাণ কামনা ইসলামী নেতৃত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ইসলামী নেতৃত্ব মানুষের সুখ, শান্তি এবং কল্যাণের কথা ভেবে থাকেন। তারা নিশ্চিত যে মানবরচিত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করে মানুষের সুখ, শান্তি এবং কল্যাণে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। মানুষের দুনিয়ার জীবনের কল্যাণে এবং আখিরাতের জীবনের নাজাতের কথা ভেবেই তারা পেরেশান। কল্যাণ এবং মুক্তির পথে মানুষকে নিয়ে আসার জন্যই তারা তৎপর।

প্রাচীন ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন নূহ (আ)। তিনি লোকদেরকে বলেন, আমি তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম পৌছাই। আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। আমি আল্লাহর নিকট থেকে এমন সব বিষয় জানি যা তোমরা জান না। (সূরা আল আরাফ: ৬২)

প্রাচীন আরবের আদ জাতির নিকট আমার রবের পয়গাম পৌছাই। আমি তোমাদের নির্ভরযোগ্য কল্যাণকামী। (সূরা আল আরাফ : ৬৮)

প্রাচীন আরবের আরেক জাতি ছিলো সামুদ জাতি। এই জাতির নিকট প্রেরিত হন সালিহ (আ)। লোকদেরকে সম্বোধন করে তিনি বলেন:

'ওহে আমার কাউম, আমি তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম পৌছে দিয়েছি, আমি তোমাদের কল্যাণই চেয়েছি। কিন্তু তোমরা তো কল্যাণকামীদেরকে পছন্দ কর না। (সূরা আল আরাফ: ৭৯)

প্রাচীন আরবের উত্তরাঞ্চলে বাস করতো মাদাইয়ান জাতি। এদের নিকট প্রেরিত হন শুয়াইব (আ)। তিনি লোকদেরকে ডেকে বলেন,

ওহে আমার কাউম, আমি আমার রবের বাণী তোমাদের নিকট পৌছে দিয়েছি। আমি তোমাদের কল্যাণ চেয়েছি। (সূরা আল আরাফ : ৯৩)

তাদের মতো সকল নবীই মানুষের কল্যাণকামী ছিলেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা) নবুওয়াত লাভের পূর্বেও ছিলেন একজন অসাধারণ মানবদরদি মানুষ। মানুষের কল্যাণকামী ছিলেন বলেই তিনি সতর বছর বয়সে হিলফুল ফুজুল নামক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

চল্লিশ বছর বয়সে জাবালে নূরের হেরা গুহায় অবস্থানকালে জিবরিলকে (আ) দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। বাড়িতে ছুটে এসে স্ত্রী খাদিজাহ বিনতু খুয়াইলিদকে বলেন তার গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিতে। কিছুক্ষণ পর তার গায়ের কম্পন দূর হয়। তিনি স্ত্রীকে বলেন, আমার তো জীবনের ভয় ধরে গেছে। খাদিজাহ (রা) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আপনি আশ্বস্ত থাকুন, কেননা আপনি সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে থাকেন। সর্বদা সত্য কথা বলেন। অসহায়

www.pathagar.com

লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। নিজের উপার্জিত অর্থ দরিদ্রদেরকে দান করেন। ভালো কাজে লোকদের সহযোগিতা করেন।

খাদিজাহ বিনতু খুয়াইলিদের (রা) বক্তব্যে মানবদরদি মানুষের কল্যাণকামী মুহাম্মদের (সা) পরিচয় ফুটে উঠেছে। শুধু দুনিয়ার জীবন নয় মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনেও মানুষ যাতে সুখী হতে পারে সেই জন্য তিনি লোকদেরকে আল্লাহর পথে এগিয়ে আসার আহবান জানাতে থাকেন। আল্লাহর পথ পরিহার করে মানুষ যখন ইবলিসের পথে চলে তখন তাদের জীবনে সৃষ্টি হয় অসংখ্য জটিলতা। সমস্যার আবর্তে তারা ঘুরপাক খেতে থাকে। অশান্তির আগুনে তারা পুড়তে থাকে। তদুপরি আখিরাতের কঠিন আযাব তো তাদের জন্য অপেক্ষমাণ।

এই অবস্থা দেখে ইসলামী নেতৃত্ব কখনো উল্লসিত হন না। মনের গভীরে তারা দারুণ ব্যথা অনুভব করেন। দুঃখী মানুষের দুঃখ বেদনা লাঘবের জন্য তারা এগিয়ে আসেন। মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য মানুষের চিন্তা চেতনা থেকে জাহিলিয়াতের মূলোৎপাটন করে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে কল্যাণময় সমাজ গঠনের উপাদানে পরিণত করার চেষ্টা চালাতে থাকেন।

ইসলামী নেতৃত্ব জানেন যে মানুষের মন্দ আচরণের মূলে রয়েছে মন্দ চিন্তা চেতনা। এই মন্দ আচরণ দেখে মানুষকে ঘৃণা না করে মানুষের মন্দ চিন্তা চেতনা দূর করার দিকেই তারা নজর দেন। কারণ মন্দ চিন্তা চেতনা দূর হলেই মানুষের জীবন থেকে মন্দ আচরণ বিদূরিত হয়। ইসলামী নেতৃত্বই মানুষের প্রকৃত কল্যাণকামী। দুর্ভাগা মানুষেরা এই মহা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে তারা তাদের কল্যাণকামীদেরকেই তাদের দুশমন মনে করে এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকে। ইসলামী নেতৃত্ব এই দুর্ভাগাদের প্রতি দরদি এবং ক্ষমাশীল মন নিয়ে তাকান। দিনরাত তাদের কল্যাণের কথাই ভাবেন। যাদের অন্তরে মানব প্রেমের ফলগুধারা নেই ইসলামী নেতা হওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই। রাহমাতুললিল আলামীনের উত্তরসূরি হওয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাদের মাঝে নেই।

ইসলামী নেতৃত্বের বুনিয়াদি কাজ ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন

ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য চাই ইসলামী ব্যক্তিত্ব যাদের জীবনে ইসলাম নেই তারা সমাজে ইসলাম কায়েম করবেন কিভাবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যেই পর্যন্ত না তারা তাদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে।" (সূরা আর রাদ : ১১)

এই আয়াতটিতে রয়েছে সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ইসলামী কনসেপ্ট। এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, একটি জাতির ব্যক্তিবর্গ তাদের জীবন ধারা যেইভাবে গড়ে তোলে, সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনে সেই ধারাই বিকশিত হয়। অর্থাৎ কোন জাতিকে যদি সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন করতে হয় তাহলে প্রথমে জাতির লোকদের চরিত্রে পরিবর্তন আনতে হবে। আবার এটাও সত্য যে, চিন্তাধারায় পরিবর্তন সাধন না করে কারো চরিত্রে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষের প্রকৃতি। মানুষের জীবনে পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়া একমাত্র তারই জানা। মেহেরবান আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। ওহির মাধ্যমে প্রদত্ত তার জীবন দর্শন

www.pathagar.com

মানুষের সামনে উপস্থাপন করার দায়িত্ব দিয়েছেন তাদেরকে। নবী রাসূলগণ প্রথম মানুষের চিন্তা চেতনাকে আলোড়িত করতে চেয়েছেন। মানুষের চিন্তা জগতে ইসলামী জীবনদর্শন ধারণ করেছে তাদের কর্ম জগতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মেই। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা) একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, তিনিই সেই সত্তা যিনি উম্মীদের জন্য তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূলের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যে তাদেরকে তার আয়াত পড়ে শুনায়, তাদের তাযকিয়া করে এবং তাদেরকে আল কিতাব আল হিকমাহ শিক্ষা দেয়। (সূরা আল জুমুআ :২)।

যেমন আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছি। যাতে সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে আল কিতাব ও আল হিকমাহ শিক্ষা দেয় এবং যেইসব কথা তোমাদের জানা ছিল না তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়। আল্লাহ মুমিনদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল বানিয়েছেন, যে তাদেরকে আল্লাহ আয়াত পড়ে শুনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে আল কিতাব ও আল হিকমাহ শিক্ষা দেয় মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী। তার প্রতি অবতীর্ণ আল- কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামাত পর্যন্ত আল কুরআনকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মহানবীর (সা) দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগির যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিবরণও অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে।

এই যুগের ইসলামী নেতৃত্বের কর্তব্য হচ্ছে মহানবীর (সাঃ) অনুকরণে আল কুরআনকে মানুষের সামনে পেশ করা, আল কুরআনে উপস্থাপিত জীবন দর্শনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং আল কুরআন ও আল হাদীসের আলোকে জীবনকে ঢেলে সাজানোর জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। যারা আল কুরআনের জীবন দর্শনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে তারাই খাঁটি মুমিন। আর এই মুমিনগণ যাবতীয় গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থেকে এবং যাবতীয় নেক আমল অনুশীলন করে তাদের জীবনকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে নিক, এটাই আল্লাহর অভিপ্রায়। কোন ভূ-খণ্ডের বিপুল সংখ্যক লোক যখন এইভাবে গড়ে ওঠে তখনই তৈরি হয় ইসলামী গণভিত্তি। আর এই গণভিত্তি ইসলামী সমাজ নির্মাণের বুনিয়াদ। ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন হচ্ছে ইসলামী নেতৃত্বের বুনিয়াদি কাজ।

কঠোরতা নয় কোমলতা অবলম্বই ইসলামী নেতৃত্বের প্রধান সাংগঠনিক নীতি

ইসলামী আন্দোলনের মূল নেতৃত্বের অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরাম তাদের অনুগামীদের প্রতি খুবই কোমল ছিলেন। তারা অনুসারীদের সাথে কঠোর আচরণ করতেন না। তাদের সাথে কর্কশভাবে কথা বলতেন না। তাদেরকে তিরস্কার করতেন না। তাদেরকে গালমন্দ করতেন না। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের (সা) জীবন চরিত বিস্তারিতভাবে লিখিত রয়েছে। তার জীবনে মন্দ আচরণের কোন উদাহরণ নেই। তিনি অনুগামীদেরকে তাদের আগেই সালাম দিতেন। হাসিমুখে তাদের সাথে কথা বলতেন। কখনো রাগান্বিত হলে তিনি তা কাউকে বুঝতে দিতেন না। তিনি যখন রাগতেন চেহারায় রক্তিমাভা ফুটে উঠতো। চেহারায় ঘাম দেখা দিতো। এ থেকে লোকেরা আন্দাজ করতো যে রাসূলুল্লাহ (সা) রাগান্বিত হয়েছেন। রাগান্বিত অবস্থায় আল্লাহ তার রাসূলকে (সা) সম্বোধন করে বলেন:

www.pathagar.com

ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর। (সূরা আল আরাফ : ১৯৯)

অনুগামীদের প্রতি সব সময়ই ছিলেন সহনশীল ও ক্ষমাশীল। তিনি ছিলেন মুমিনদের প্রতি দরদি ও করুণাসিক্ত। (সূরা আত তাওবা : ১২৮)

আল্লাহর রাসূলের (সা) অনুগামীগণ মানুষই ছিলেন। ফলে তাদের ভুলভ্রান্তি হতো। কিন্তু তাদের ভুলভ্রান্তি দেখে তিনি ক্ষেপে উঠতেন না। সংশোধনের লক্ষ্যে বিনম্র ভাষায় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

তার কথা ও কাজে ছিলো মাধুর্য। তার অমায়িক ব্যবহার তাকে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলো। তার মুখের মধুর বাণী শুনার জন্য, তার কাছে ছুটে আসতো। তারা সহজে তার সান্নিধ্য ত্যাগ করতে চাইতো না। মহানবী (সা)-এর আচরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ নিজেই বলেনঃ

এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে তুমি তাদের প্রতি নম্র স্বভাবের হয়েছো, যদি তুমি কঠোর ভাষা ও কঠোর চিত্তের লোক হতে লোকেরা তোমার চারদিক থেকে ভেগে চলে যেতো। (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং সাথীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, কিন্তু পরস্পর রহম দিল। (সূরা আলে ইমরান :২৯)

কাফিরদের প্রতি কঠোর মানে এই নয় তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতো। বরং কাফিরদের অনুসৃত মত ও পথের প্রতি তাদের ভূমিকা ছিলো নিরাপস। আবার কাফিরগণ যখন তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিতো তখন ইস্পাতের দৃঢ়তা নিয়ে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করতো। কিন্তু এ্ ইস্পাত কঠিন মানুষগুলো যখন একের সাথে অপর জন মেলামেশা করতো, আলাপ করতো তখন একটি মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হতো। তাদের আচরণে সহমর্মিতা ও সম্প্রীতিরকালে ইসলামী নেতৃত্ব যাতে অনুগামীদের প্রতি কোমল আচরণ করে সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল ওই ব্যক্তি যে অধীন ব্যক্তিদের প্রতি কঠোর। সাবধান থাকবে যাতে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়। (সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আয়িশা (রা) বলেন, যে নবী (সা) বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতা দ্বারা ওই জিনিস দান করেন যা কঠোরতা দ্বারা দান করেন না। (সহীহ মুসলিম)

এই যুগের ইসলামী নেতৃত্বকেও আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে উদারতা-ক্ষমাশীলতাকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের অনুগামীদের সাথে আচরণ করা উচিত। ইসলামী শারীয়ার বিধান লঙ্ঘন করার কারণে আল্লাহর রাসূল (সা) তার কোন কোন অনুগামীকে কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু ওই ব্যক্তিদেরকেও তিনি গালমন্দ করেননি। তাদের সাথে অশোভন আচরণ করেননি।

এই যুগের ইসলামী নেতৃত্বকেও তাদের অনুগামীদের কারো কারো বিরুদ্ধে বিশেষ কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। এতদসত্ত্বেও তাদের ব্যক্তিগত আচরণ বিন্দুমাত্র অভদ্রজনোচিত হবে না।

www.pathagar.com

সংগঠনের সকল কর্মী একই মানের থাকে না। তাই সকলের কাজও একই মানের হয় না। মেধার পার্থক্য বয়সের পার্থক্য, সুস্থতা-অসুস্থতা, সমস্যার স্বল্পতা কিংবা আধিক্য ইত্যাদি কারণে সকলের কাজের মান এক হবে না, হতে পারে না।

বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্বকে অনুগামীদের ওপর বিশেষ বিশেষ কাজ চাপাতে হয়। কাজ চাপানোর আগে আগে উপরোক্ত বিষয় গুলো ভালোভাবে বিবেচনা আগেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিষয় ভালোভাবে অবহিত হয়ে তবেই কাজ চাপানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

শূরা ইসলামী নেতৃত্বের নিরাপত্তা বেষ্টনী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নেতৃত্বকে নির্দেশ প্রদানের অধিকার দান করেছেন। নেতৃত্বের নির্দেশ পালন অনুগামীদের ওপর ফরয করেছেন। নেতৃত্বে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যই অনুগামীদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। যদিও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদানের অধিকার নেতৃত্বকে দেয়া হয়েছে কিন্তু এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেতৃত্বকে দেয়া হয়নি। মহাবিজ্ঞ আল্লাহ বলেন, "তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হয়। (সূরা আশ শূরা : ৩৮) মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যক্তিগতভাবে খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। নবী হওয়ার পূবেই কাবা সংস্কারের পর হাজরে আসওয়াদ যথাস্থানে সংস্থাপনের জন্য বিবদমান গোত্রগুলোর বিবাদ তিনি যেইভাবে মীমাংসা করেছিলেন তাতে তার অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে। কিন্তু এই বিচক্ষণ ব্যক্তিটির প্রতিও আল্লাহ নির্দেশ ছিলো।

লেখক: বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

www.pathagar.com

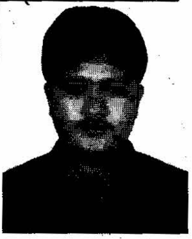

বহুমুখী সন্ত্রাসের শিকার বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

মুহাম্মদ আবদুল জব্বার

সমাজ, সভ্যতা বিনির্মাণের ভবিষ্যৎ কারিগর ছাত্রসমাজ। ছাত্রসমাজের আদর্শিক সৌন্দর্য, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ অর্জনের ওপর নির্ভর করে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাল-মন্দ। আদর্শিক, নৈতিক, মানবিক ও দেশপ্রমিক তরুণের কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক বেশি। আবার বাস্তব সমস্যার ভিড়ে নিজেকে সত্য ও সুন্দরের পক্ষে জাতির জন্য তৈরি করে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে উৎসর্গ করাও চাট্টিখানি কথা নয়। ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীর ধ্বংসলীলায় দাঁড়িয়ে কোন আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা উপন্যাস বা সিনেমার বুলি আওড়ানো নয়। স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির হিসাব করতে বসলে নিরন্তর হতাশায় অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে হয়। পারস্পরিক বিশ্বাসের ফাটল, আদর্শচ্যুতি, দুর্নীতি ও সাম্রাজ্যবাদের কশাঘাতে জাতি আজ হতভম্ব, বাকরুদ্ধ ও অচলপ্রায়।

স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রাপথে ছাত্রসমাজ যখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, ঠিক তখনই দেশপ্রেমিক, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির প্রত্যয়ে আপসহীন, দৃঢ়চিত্তে ইসলামী ছাত্রশিবিরের পথ চলা শুরু হয়। ৩৬ বছরে ছাত্রশিবির এই জাতিকে অনেক সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে। এই সংগঠন মাদক ও সন্ত্রাস মুক্ত একদল দেশপ্রেমিক কর্মনিষ্ঠ তরুণ তৈরিতে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে ছাত্রশিবিরের অপ্রতিরোধ্য এগিয়ে যাওয়া ইসলামবিদ্বেষী, পেশিনির্ভর অপশক্তি ও দেশদ্রোহীদের সহ্য হয়নি। তাই সর্বশক্তি দিয়ে এর অগ্রযাত্রাকে ধুলোয় মলিন করতে এমন কোন চক্রান্ত নেই যার আশ্রয় তারা গ্রহণ করেনি। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রহত্যা, নিপীড়ন; ক্যাম্পাস বন্ধ করে ছাত্রসমাজকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে তারা এই অকুতোভয় সংগ্রামী কাফেলার পথচলা রক্তপিচ্ছিল করেছে । এই সংগঠনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও মিডিয়া আগ্রাসন চালানো হয়েছে যৌথভাবে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বোচ্চ অপব্যবহার করে

www.pathagar.com

ছাত্রশিবিরকে দমানোর চেষ্টা করা হয়েছে। নানামুখী প্রতিবন্ধকতার কারণে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির কাজ সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারপরও দেশের সকল দুর্যোগে ছাত্রশিবির ছাত্রসমাজকে সাথে নিয়ে পথ চলেছে। স্বেচ্ছাচারী ফ্যাসিস্ট শাসকদের শোষণ, অবিচার রুখে দিতে প্রতিবাদী হয়েছে। আর তাই ক্ষমতালোভী সরকার ছাত্রশিবিরকে নিশ্চিহ্ন করতে রাষ্ট্রের সকল শক্তিকে ব্যবহার করেছে। বর্তমান আওয়ামী জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ছাত্রহত্যা, নির্যাতনের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। ছাত্রশিবির এর প্রতিবাদ করতে গেলে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। হারাতে হয়েছে এ সংগঠনের অনেক তাজা প্রাণকে।

২০১০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি অন্তঃকোন্দলে ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় দেশব্যাপী চিরুনি অভিযান। এ সময় হাজার হাজার ছাত্রকে অন্যায়ভাবে মাসের পর মাস কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ছাত্রত্ব হারিয়ে শিক্ষাজীবনের ইতি টানতে হয়েছে জাতির ভবিষ্যৎ কাণ্ডারিদের। সন্ত্রাসের তাণ্ডবে তটস্থ হয়ে দেশের সকল মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে ছাত্রলীগের লাগাম টেনে ধরার আর্তি জানালেও তার কোন প্রতিকার, সুরাহা জাতির ভাগ্যে জুটেনি। যার ফলে দিন-দুপুরে রাজপথে ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর মতো বিশ্বজিৎসহ অসংখ্য বনি আদমকে খুনের শিকার হতে হয়েছে। এখনও কেউ জানে না- এর শেষ কোথায়। সবাই আজ নিরুপায়, নির্বাক স্বাধীন জাতি!

ইসলামের অনুসারীরা তাদের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে নিজেকে কায়েম রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসীদের এই প্রণান্তকর লড়াই চলছে। এই লড়াইয়ের পথ থেকে যারা বিচ্যুত তারা হয় শয়তানের গোলাম, নতুবা সহযোগী। এই লড়াইয়ে যারাই লিপ্ত হবে তাদের সামনে কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষমাণ। ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সত্য-ন্যায়ের দুর্জয় কাফেলা হিসেবে এই লড়াইয়ে অবতীর্ণ। আল্লাহর রঙে যুবসমাজকে রঙিন করার যে স্বপ্ন নিয়ে এ কাফেলার যাত্রা হয়েছিল, সে যাত্রা পদে পদে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এরপরও শাহাদাত, গুম, পঙ্গুত্ববরণ, নির্যাতন ও এক সাগর রক্ত পেরিয়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছাত্রশিবির মঞ্জিলের পানে ছুটে চলছে।

১৯৭৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। দেশের সংকট মুহূর্তে রেখেছে জোরালো সাড়া জাগানো ভূমিকা। মেধা ও বুদ্ধির বিকাশে সহায়ক ভূমিকার পাশাপাশি দেশের চলমান সংকটপূর্ণ সময়ে এই সংগঠনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য ভূমিকার কারণে ছাত্রশিবিরকে নিয়ে দেশবাসী নতুন করে স্বপ্ন দেখছে। এতে কেঁপে উঠেছে ইসলামবিরোধী স্বৈরাচারীর প্রেতাত্মা। এ সংগঠনকে রাষ্ট্রীয় নানামুখী সন্ত্রাসের জাঁতাকলে পিষে নিস্তব্ধ করতে চলে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে নির্মম নির্যাতন চালানো হয় ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছাত্রনেতা দেলাওয়ার হোসেনের ওপর।

মূলত কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে সরকার আন্দোলনকে দমাতে চেয়েছে। কিন্তু গ্রেফতারের পর আন্দোলন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রশিবির শুধু নেতৃবৃন্দের মুক্তি আন্দোলনকে তীব্র করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং স্বৈরশাসকের

www.pathagar.com

পিঞ্জির থেকে জনগণকে মুক্ত করতে ফুঁসে উঠেছে। এ জন্য চরম মূল্যও দিতে হয়েছে সংগঠনের নেতাকর্মীদের। শাহাদাত, পঙ্গুত্ব বরণ হয়েছে এ সংগঠনের নিত্যদিনের সঙ্গী। তবুও এক মুহূর্তও ছাত্রজনতাকে লক্ষ্য থেকে টলানো যায়নি। বরং এসব ত্যাগ-তিতিক্ষা চলার পথের অদম্য শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। মানুষের ভালবাসা, সহযোগিতা ও আল্লাহর রহমত ছিল এ আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি। আল্লাহর ওপর আস্থা, বিশ্বাস রেখে এ আন্দোলনের নেতাকর্মীরা যদি তাদের যাত্রা মঞ্জিলের দিকেই অব্যাহত রাখতে পারে, বিজয় তাদের হবেই।

রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্র নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানের অন্যতম রক্ষাকবচ। সে রক্ষাকবচ যখন উল্টো নিরাপত্তাকে চরমভাবে লঙ্ঘন করে তখন নাগরিকের আশ্রয়স্থল বলতে কিছুই থাকে না। দেশের আগামী প্রজন্ম যদি প্রতিনিয়ত সরকারের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতায় বেড়ে ওঠে, তবে এই প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে? বিগত পাঁচটি বছর ছিল ইসলামী ছাত্রশিবিরের জন্য দুঃসহ যাতনার বছর। এই সময়ে এ কাফেলার লাখো তরুণকে হাজারো মামলায় আসামি করা হয়েছে। অনেক তরুণকে ঘর-বাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া করেছে পুলিশ প্রশাসন। হাজার হাজার নেতাকর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। রিমান্ডের নামে নির্মম নির্যাতন করে জীবনের তরে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে শতাধিক শিবির নেতাকর্মীকে। শিবির সন্দেহে গ্রেফতারকৃত অসংখ্য ছাত্রের জীবনেও নেমে এসেছে দুঃসহ কালো মেঘ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংঘটিত যে কোন ঘটনার সাথে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের জড়িয়ে মামলা দায়ের, নির্যাতন ছিল পুলিশের নিয়মিত কর্মসূচি। আওয়ামী লীগ ও এর সন্ত্রাসী ছাত্রসংগঠন কর্তৃক খুন ও নির্যাতনের শিকার হয়ে থানায় অভিযোগ করতে গিয়ে অপদস্থ হয়েছে ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবার। আমার জানা নেই- চলতি সরকারের আমলে বিরোধী দলের কোন অভিযোগ কোন থানা গ্রহণ করেছে কি না।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করার অধিকার সবার আছে। সে প্রতিবাদ মিছিলে যদি বিনা কারণে লাঠি চার্জ, টিয়ার শেল, জলকামান, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়, রাবার বুলেট ছুঁড়ে ও নির্বিচারে গুলি করে নাগরিকদের হত্যা করা হয় তাহলে গণতন্ত্রের ফাঁকা বুলি আওড়ানোকে নিরেট জঘন্য ভণ্ডামি ছাড়া আর কী বলা যায়? রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত কোন দলের নেতাকর্মীদের থানায় অথবা জেলহাজতে নিয়ে চোখ তুলে নেয়া, পায়ে-হাতে গুলি করে পঙ্গু করে দেয়া ও গ্রেফতার বাণিজ্যের ভয়াবহতা আজ দেশের প্রত্যেক সচেতন নাগরিককে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রশাসনের এমন পক্ষপাতমূলক আচরণ কারো জন্যই শোভন হতে পারে না। পুলিশের কিছু কর্মকর্তার আচরণ দেখে মনে হয় তারা এ পেশায় না এসে রাজনীতি করলেই ভাল করতেন। যে কোন দেশের পুলিশ প্রশাসন অপরাধীদের দমন করতে চেষ্টা করে। তাহলে কি বলবেন ছাত্রশিবির অপরাধী ছাত্রসংগঠন? পুলিশ তো ভাল করেই জানে ছাত্রশিবির কোন অপরাধী সংগঠন নয়। এরপরও তাদের এ ধরনের নির্লজ্জ আক্রমণাত্মক ভূমিকার কারণ কী?

মূলত চারটি কারণে পুলিশ এ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রথমত: তারা রাজনৈতিক চাপে এ ধরনের আচরণ করে। দ্বিতীয়ত: ক্ষমতাসীনদের খুশি করে নিজের আখের গোছানোর চেষ্টা। তৃতীয়ত: নিজের রাজনৈতিক মনোবৃত্তি পূরণের জন্য প্রশাসনের ছদ্মাবরণে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল

www.pathagar.com

করা। চতুর্থত: নতুন কোন শক্তি যাতে বেড়ে উঠতে না পারে, তা নিশ্চিত করা। সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনকে দমনের অংশ হিসেবেই আজ পুলিশের এ মহড়া চলছে। বিনা দোষে দোষী সাব্যস্ত করে মামলা জুড়ে দিয়ে হয়রানি ও গ্রেফতার করাই এখন পুলিশ প্রশাসনের মূল দায়িত্ব। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি সৃষ্টিকারীদের দমনের প্রচেষ্টা বলতে গেলে শূন্যের কোটায়। প্রশাসনের সাথে সন্ত্রাসী গডফাদারদের সুসম্পর্কেরও যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে। এমন পরিস্থিতি দেশ ও জনগণের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। রাজনৈতিক দেউলিয়া হয়ে যারা বেপরোয়াভাবে পুলিশকে বিরোধী দল দমনের কাজে লাগাচ্ছে, তারা অপরিণামদর্শী। এর ফল কী হতে পারে, তা তারা ভাবেন না। এ কারণে সরকার পরিবর্তন হলেও পলিসির কোন পরিবর্তন হয় না। অধিকাংশ শাসকরা হয়ে ওঠে বেপরোয়া। তারা ভুলে যায় তাদের নির্বাচনী ইশতিহার ।

মানুষের আশ্রয়ের শেষ ভরসাস্থল হল আদালত। আদালতের প্রতি সকল নাগরিকের শ্রদ্ধা থাকা খুবই ন্যায়সংগত ও যৌক্তিক । কিন্তু সেই আদালত যখন অপরাধীদের পক্ষাবলম্বন অথবা নির্দোষ নাগরিককে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে, তখন কি এর প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ থাকতে পারে? বিগত পাঁচ বছরে ছাত্রশিবির নানাভাবে অবিচারের শিকার হয়েছে। নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের পর রিমান্ড ছিল অনেকটা বাধ্যতামূলক। আর সেই রিমান্ডে শত শত শিবিরকর্মীকে জীবনের তরে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। এক সময় জানতাম আইনের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধীদের জন্য রিমান্ডের আবেদন করা হয়। আর এখন? রিমান্ড প্রতিটি মামলায় মঞ্জুর হয়। মনে হয় ছাত্রশিবির করাই তাদের অপরাধ। আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে কোন নাগরিকের রিমান্ড এর নিয়ম না থাকলেও শুধু ছাত্রশিবিরের সমর্থক হওয়ায় অনেক কিশোর-তরুণকেও দিনের পর দিন রিমান্ডের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে হয়েছে। জামিন পাওয়ার পর বিনা মামলায় শ্যোন এ্যারেস্ট করা হয় অধিকাংশ নেতাকর্মীকে। অনেক সময়ই পুলিশ বাণিজ্য করার লক্ষ্যে এসব ঘৃণ্য পথ বেছে নিয়েছে। এই সংগঠনের নেতাকর্মীদের মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করার জন্য অনিয়মই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সংগত কারণে প্রশ্ন জাগে, এমন গর্হিত কাজের পরেও যদি দেশের আইন-আদালতের কোন পদক্ষেপ না থাকে, তাহলে দেশে আইন-আদালত বলতে কিছু থাকা প্রয়োজন বলে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না । নিরুপায় হয়ে বলতে হয়- বর্তমানে আইন আদালত হল দুর্বল, নির্যাতিত ও নিরপরাধ মানুষের নির্যাতনশালা।

স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হিসাবে আওয়ামী লীগ নিজেদের দাবি করে এলেও বর্তমান সময়ে তারা নাস্তিক্যবাদের দোসর হিসেবে নিজেদের পরিচয় পাকাপোক্ত করেছে। আওয়ামী লীগ পুলিশকে রাজনৈতিক দলের সদস্যদের হয়রানি করে নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করেছে। যেখানে আইনের কথা বলেও নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারেনি সেখানে সেই পুরোনো সন্ত্রাসী কায়দায় খুন, গুম, নির্যাতন চালিয়েছে, যা কোন সভ্য রাজনৈতিক দলের আচরণ হতে পারে না। আওয়ামীলীগ এক সময় ভারতকে তুষ্ট রাখার জন্য কিছু কাজ করলেও এখন তা চরমে উঠেছে। যা দেশের স্বাধীনতার জন্য হুমকিস্বরূপ। বর্তমানে যারা আওয়ামীলীগের নীতিনির্ধারক তাদের অধিকাংশই বামঘারনার রাজনীতি থেকে আসা। তারা আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে উসকে দেয়ার পাশাপাশি সরকারকে ইসলামপন্থীদের

www.pathagar.com

দমনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে প্ররোচিত করছে। অবশ্য এ কারণে মুসলমানদের কাছে আওয়ামীলীগ একটি প্রত্যাখ্যত ও ঘৃণিত দল হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের পতাকাবাহী ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির আওয়ামীলীগের কাছে একটি আতঙ্কের নাম। তারা মনে করে আগামী দিনে ক্ষমতার মসনদে যেতে ছাত্রশিবিরই মূল অন্তরায়। তাই হত্যা, গুম, নির্যাতন, হামলা করে এই কাফেলার কর্মীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে পাঁচটি বছর তারা ব্যয় করেছে।

বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির ইতিহাসকে কলংকিত করে এর শবযাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি থেকে শুরু করে প্রতিটি অপরাধ কর্মের সাথে এই দলটির নেতাকর্মীরা জড়িত। জ্ঞান ও যোগ্যতায় পারদর্শী হওয়ার বদলে ছাত্র নেতারা চরিত্রবিধ্বংসী কাজে জড়িয়ে পড়লে তাদের কাছে কী আশা করা যেতে পারে? তেঁতুল গাছ রোপণ করে যেভাবে আঙ্গুরের ফলন আশা করা যায় না, তেমনিভাবে অপরাধমূলক ছাত্ররাজনীতির সাথে জড়িত ছাত্ররাও জাতির ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি হতে পারে না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে থেকেই এই সংগঠনটির ভূমিকা উচ্ছৃঙ্খল ও সর্বগ্রাসী। ভিন্ন মতের ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মী হত্যা, নির্যাতনের পাশাপাশি নিজেদের অন্তঃকোন্দোলে নেতাকর্মীদের হত্যা এই সংগঠনের নিয়মিত কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। যার কারণে এই সংগঠনটিতে মেধাবী ও চরিত্রবান ছাত্রদের খুঁজে পাওয়া যায় না। উচ্ছৃঙ্খল ও অপরাধপ্রবণ ছাত্রদেরই আশ্রয়স্থল হল বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ এবং ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ছাত্রলীগের কার্যক্রম ছিল চরমভাবে ধ্বংসাত্মক। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছিল গণমাধ্যমের নিয়মিত শিরোনাম। যে কারণে ছাত্রলীগের লাগাম টেনে ধরার আহ্বান জানিয়ে পত্রিকার সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের অভিভাবকত্বের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা যে ভাঁওতাবাজি ও প্রহসন ছিল তা জনগণ বুঝে গেছে।

ছাত্রলীগের শ্লোগান 'শিক্ষা শান্তি প্রগতি' হলেও আদর্শের লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে তারা ভিন্ন মতের ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মী-শিক্ষক-সাংবাদিক ও কর্মচারীদের উপরে হামলে পড়ে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র নেতা শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় সেক্রেটারি শরীফুজ্জামান নোমানী হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ছাত্রলীগ আওয়ামী আমলে খুনের মহোৎসব শুরু করে। এর পরপরই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেশ কয়েকজন ছাত্র নেতা-কর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। দলের ভেতর গ্রুপিংয়ের ফলে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী বিপক্ষ গ্রুপের হাতে প্রাণ হারায়। যে সংগঠন নিজ দলের নেতাকর্মীদেরও অবলীলায় খুন করতে পারে, তাদের খুনি সংগঠন বৈ কী বলা যায়? ঢাকা মেডিক্যালের ছাত্রলীগ নেতা রাজীব ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতা জোবায়েরকে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই খুন হতে হয়। এভাবে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে খুন হয়েছে আরো অনেকে। শিবির সন্দেহে রাজধানীর পুরান ঢাকার বিশ্বজিৎকে হত্যার ঘটনা কে না জানে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজেদের অন্যায় আবদার মেনে না নিলে শিক্ষকদের অপমানিত করা ছাত্রলীগের নিয়মিত কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই যেখানে শিক্ষকদের অপমানিত করা

www.pathagar.com

হয়নি। শিক্ষকদের ওপর এসিড নিক্ষেপের ঘটনা শিক্ষকদের মাঝে নতুনভাবে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। শিক্ষকদের হত্যার হুমকি, ধর্মঘটের নামে শ্রেণিকক্ষ ভাঙচুর, ক্লাস চলা অবস্থায় শিক্ষকের সামনেই ছাত্রদেরকে দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে বাধ্য করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের বাসভবন ঘেরাও, অফিসে তালা দিয়ে বন্দি করে টেন্ডারবাজি, ছাত্রসংসদ ফান্ডের টাকা ছিনতাই, ভর্তিবাণিজ্য ও হল দখলের মত কাজ ছাত্রলীগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবৈধ হল দখল, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ও ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারে সন্ত্রাস সৃষ্টি, ক্যান্টিন ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র দোকানিদের কাছ থেকে ফাও খাওয়া এইসব অসভ্য ছাত্র নেতাদের নিয়মিত কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। এসব অনিয়ম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিনষ্টকারী কর্মকান্ডের ঘটনা সাহসী সাংবাদিকরা গণমাধ্যমে প্রকাশ করলে তাদেরকেও হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। আওয়ামী সরকারের দুই আমলে বিরোধী দলের ছাত্রসংগঠনেগুলোর কারণে যত দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল, ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও প্রশাসনকে বেকায়দায় ফেলে নানা ধরনের অনৈতিক দাবি আদায়ের খেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার চেয়ে অনেক দিন বেশি অচল ছিল। এই সন্ত্রাসী সংগঠনের অন্যায় কাজের প্রশ্রয়দাতা হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে খোদ সরকার, পুলিশ প্রশাসন ও সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত মদদপষ্ট কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনযন্ত্র। যাদের অত্যাচারের বিচার চাওয়া অরণ্যে রোদনের শামিল। ছাত্রলীগ আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়ে আরো বেশি অপরাধে জড়িয়েছে।

ছাত্রলীগের চাহিদা অনুযায়ী অদক্ষ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, অপরাধীর শাস্তি মার্জনা ও অর্থের বিনিময়ে ভর্তি ও সার্টিফিকেট বাণিজ্য এখন নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের ছত্রছায়ায় দেশী-বিদেশী অস্ত্র এখন অধিকাংশের হাতে হাতে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিটি ছাত্রসংঘর্ষে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হাতে প্রকাশ্যে অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে। ডজন ডজন মামলার খুনি আসামিদের সাথে পুলিশের খোশ মেজাজে আড্ডা জমাতেও দেখা যায়। ছাত্রলীগের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুলিশ যেমন সহায়তা করেছে, তেমনি শিবিরকর্মী অথবা অন্য সংগঠনের কর্মীদের নির্যাতন পরবর্তী পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে ছাত্রলীগ পুলিশকে গ্রেফতার বাণিজ্যে সহায়তা করেছে। বিরোধী মতের ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদেরকে অকথ্য নির্যাতন করে, কিডন্যাপ করে অর্থ আদায় করা হয়েছে। সাধারণ ছাত্ররাও এর হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস মধ্যবিত্ত ও গরিব ঘরের সন্তানদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষার সুযোগ লাভের ঠিকানা হলেও এসব ছাত্রাবাস এখন অছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে। আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে ছাত্রলীগের কর্মী-সমর্থক পরিচয় ছাড়া ছাত্রদের এসব ছাত্রাবাসে থাকার সৌভাগ্য হয় না। কোনভাবে সাধারণ ছাত্রদের থাকার সুযোগ মিললেও নানা ধরনের শর্ত মেনে ছাত্রলীগ পরিচয়ে কথিত বড় ভাইদের আশ্রয়ে থাকতে হয়। ছাত্রাবাসগুলোতে ছাত্রলীগের নেতারা কী পরিবেশ সৃষ্টি করে তা ভুক্তভোগীরাই ভালো জানে। দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে অবাধ্য ছাত্রদের ওপর অকথ্য নির্যাতন, মাদক ব্যবসা, মাদক সেবন ও নারী নির্যাতনের আখড়া হিসাবে ছাত্রাবাস ব্যবহৃত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্তানদের পাঠিয়ে অভিভাবকরা অনিশ্চয়তার প্রহর গুনছেন। ঠুনকো অভিযোগে সারা দেশের ক্যাম্পাসগুলো মাসের পর মাস বন্ধ রেখেছে ছাত্রলীগ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যখনই ছাত্রলীগের সাথে ছাত্রশিবির অথবা

www.pathagar.com

অন্য যে কোনো ছাত্রসংগঠনের সংঘর্ষ বাধে, তখনই তারা হল-ছাত্রাবাসগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন জাগে এটা কোন ধরনের রাজনীতি? এতে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বইপত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ক্ষতি হয়। যদি ছাত্রলীগের ছাত্রাবাসগুলো দখল অথবা নিয়ন্ত্রণ করার খায়েশ থাকতো তাহলে তারা কখনও হল-ছাত্রাবাসে আগুন জ্বালাতো না। জ্বালাও পোড়াও রাজনীতির পেছনে মূল কারণ হচ্ছে- এসকল ছাত্রাবাসে মেধাবী ছাত্ররা থাকে আর ছাত্রশিবির সেখানে মেধাবীদের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই নিজেরা যেহেতু মেধাবী ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতে পারে না সেহেতু অন্যরা নেতৃত্বে থাকুক অথবা তাদের নেতৃত্বে হল-ছাত্রাবাস পরিচালিত হোক এটা তারা কোনোভাবে সহ্য করতে পারে না। এছাড়াও ছাত্রলীগের অধিকাংশ নেতার ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে অথবা বারবার ফেইলের রেকর্ড করেছে। তাই হল-ছাত্রাবাসে আগুন, ভাঙচুর, ক্ষতিসাধন ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে পারলেই তাদের লাভ।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। কতদিন তারা হল দখল করে রাখবে? কারণ ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপ-উপগ্রুপ থাকার কারণে প্রতিনিয়ত অন্তঃকোন্দল লেগেই থাকে। সারা দেশের দলীয় অন্তঃকোন্দলে অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে, নিহত হয়েছে দলীয় নেতাকর্মী। এ থেকে বুঝতে বাকি থাকে না, হল জ্বালাও পোড়াও রাজনীতির কারণে তারা ছাত্রদের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এসব প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘটলেও প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করছে।

ছাত্রলীগের অপকর্ম আরো অনেক দিকে বিস্তৃত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন কলেজ ও মদনমোহন কলেজসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রী নেত্রী ও সাধারণ ছাত্রীদেরকে নেতাদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য বাসাবাড়িতে পাঠানোর খবর গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে এ কোন ধরনের অসভ্যতা? এ ধরনের নিচুতা আমাদের সমাজের শৃংখলাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে? গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের বাইরে এ ধরনের আরো কত কী যে ঘটেছে, তা কেউ কি জানে? নিজেদের অন্তঃকোন্দলে দলীয় কর্মী খুন হলে মন্ত্রীদের আইনি ব্যবস্থা নেয়ার তাৎক্ষণিক লোক দেখানো প্রতিশ্রুতি গণমাধ্যমে এলেও পরে কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি। আর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ বরাবরই সংশ্লিষ্ট কমিটির বিলুপ্তি ঘোষণা করে। যা আইওয়াশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্প্রতি চট্টগ্রাম মহানগর নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এতে পদবঞ্চিতরা নতুন কমিটিকে বয়কট ঘোষণা করে নগরীতে শত শত গাড়ি ভাঙচুর করে। ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের অসন্তোষের সাথে গাড়ি ভাঙার সম্পর্ক কী? বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন নিয়ে অসন্তোষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট, এ কেমন কর্মসূচি? এ ধরনের অহরহ কর্মকাণ্ড ছাত্রলীগকে ছাত্রসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তবুও প্রশাসন নির্বাক। ছাত্রলীগ বলে কথা!

ছাত্রলীগের নেতা হওয়া মানে অর্থ-বিত্তের মালিক হওয়ার পথ খুলে যাওয়া। তাই কমিটিতে স্থান করে নিতে কেন্দ্র থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত চলে তীব্র প্রতিযোগিতা। যার শেষ পরিণতি হয় প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাকে খুন করা। এই প্রতিযোগিতায় যারা স্থান করে নেয়, তাদের প্রত্যেকেই সন্ত্রাসী ও মাস্তান প্রকৃতির। তাদের অধিকাংশের ছাত্রত্ব নেই অথবা ছাত্রত্ব বাতিল

www.pathagar.com

হয়ে যাওয়া আদু ভাই। এ ধরনের নেতারা নেতৃত্বে এসে সুস্থ ছাত্ররাজনীতি চর্চার পরিবর্তে যে কোন ভাবে অর্থশালী হওয়ার অনভিপ্রেত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ নানামুখী অপরাধমূলক কাজে চরম ভাবে লিপ্ত হবে এটি কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। ছাত্রশিবির দেশের ছাত্ররাজনীতির ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। যে সংগঠনকে কোন ভাবেই তার আদর্শিক পথ চলা থেকে লক্ষ্যচ্যুত করা যায়নি। যে সংগঠনকে নির্মম নির্যাতন ও মিথ্যাচার চালিয়েও দমানো যায়নি। সরকার এখন ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধের পথ সন্ধানে মরিয়া। কিন্তু ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচারই চালানো হয়েছে, তা হালে পানি পায়নি। উল্টো মানুষের এতে শিবিরকে জানার তীব্র আগ্রহ জন্মেছে। তারা শিবিরকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টার পরও আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে শিবির ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মুকাবেলা করে চলছে। নেতিবাচক প্রচারণা চালিয়ে শিবিরকে উসকে দেয়ার সরকারি ষড়যন্ত্র হালে পানি পায়নি।

আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের পক্ষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে হত্যার ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সরকার জামায়াতে ইসলামীর অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতাকে গ্রেফতার করে সংগঠনের কার্যক্রম স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। যাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কোথাও কোন থানা ডায়েরিতে অভিযোগ ছিল না, তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ। হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার মত জঘন্য অপরাধ! মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইবুনালের খোলসে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের নতুন আয়োজন চলছে। সরকার নির্দোষ জামায়াত নেতাদের দোষী সাব্যস্ত করতে নাটক সাজিয়ে একের পর এক ফাঁসির রায় দিয়ে চলছে। অথচ স্বাধীনতার সময় যারা প্রকৃত রাজাকার ছিল তারা এখন মুক্তিযোদ্ধা! দেশবাসী জানে, শেখ হাসিনার আত্মীয় ১৯৭১ সালে তালিকাভুক্ত রাজাকার ছিল। তাই কারো বুঝতে আর বাকি নেই যে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত জামায়াত নেতাদের হত্যা করে আগামী দিনে ক্ষমতায় টিকে থাকার নিমিত্তেই এই নাটক। এ ধরনের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে তাই জামায়াত প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নামে আসে। তাদের সাথে হাজার হাজার সাধারণ জনগণ মাঠে নামে। যা দেশের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। জামায়াত নেতৃবৃন্দকে হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে এ পর্যন্ত তিন শ'র অধিক মানুষ জীবন দিয়েছে। প্রিয় নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করতে আওয়ামী পুলিশ ও সরকারি সন্ত্রাসীদের গুলির সামনেও জনগণ থেমে যায়নি। ছাত্রশিবিরও এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে রাজপথে নেমে এসেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। এ আন্দোলনকে দমন করার জন্য ছাত্রশিবিরের ৫০ জন তরুণের তাজা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে হায়েনারা।

ইসলামী ছাত্রশিবিরকে আরেকটি সন্ত্রাসের মোকাবেলা করতে হয়েছে। যে সন্ত্রাস এখনো অব্যাহত গতিতে চলছে। ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্রসমাজের কাছে দ্বীনের দাওয়াত, অনুশীলন ও অনুশাসনের দাওয়াত দিয়ে থাকে। এতে ধীরে ধীরে সমাজে দ্বীনের পক্ষে মুসলমানদের অবস্থান মজবুত হতে থাকে। তাই এই অগ্রযাত্রাকে রুদ্ধ করার জন্য শিবিরকে জঙ্গি, মৌলবাদী হিসেবে প্রমাণের জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তিকে ব্যবহার করেছে সরকার। এর যৌক্তিক ভিত্তি

www.pathagar.com

তৈরি করার জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ছদ্মবেশী আলেম ও কথিত সুশীলসমাজ একাধারে নানা অযৌক্তিক দাবি তুলেছে। 'দেশে ইসলামী রাজনীতি চলতে পারে না, জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে, ইসলামী ব্যাংক বন্ধ করতে হবে, ইসলামের পক্ষের গণমাধ্যম বন্ধ করতে হবে।' নানা অভিযোগ তুলে ইসলামের পক্ষের টিভি, পত্রিকা, ব্লগ, ফ্যান পেইজসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম বিরোধীদের ষড়যন্ত্র এতদিন গোপনে গোপনে থাকলেও এখন প্রকাশ্য রূপ লাভ করেছে। ইসলামের বিরুদ্ধে দেদারসে আওয়াজ তুলছে একদল জ্ঞানপাপী। ইসলাম, জিহাদ, রোজা, সালাত এসবকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। আওয়ামীলীগ জামায়াত-শিবির ও ইসলামী সংগঠনগুলোর বিপক্ষে অবস্থান নিতে গিয়ে এখন ইসলামের বিপক্ষে নিজেদের অবস্থান করে নিয়েছে। তারা ইসলামবিদ্বেষীদের পক্ষাবলম্বন করে তাদের সকল দাবি দাবা মেনে নিচ্ছে। এ ষড়যন্ত্রকে মানুষ ভাল ভাবে মেনে নিতে পারেনি। যার ফলে ইসলামবিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্র বুমেরাং হয়েছে। সরকার নিজেই এখন বিপদে পড়ে গেছে। নিজের খোঁড়া গর্তে তারাই এখন ঢুকে পড়েছে।

সরকারের তল্পিবাহক গণমাধ্যম ছাত্রশিবির নেতাকর্মীদের সন্ত্রাসী, জঙ্গিবাদী ইত্যাদি নামে অভিহিত করে চলছে। যে কোন ঘটনা ঘটলেই ছাত্রশিবিরকে দায়ী করা হচ্ছে। এভাবে মানুষকে যেমন বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে, পাশাপাশি সন্ত্রাসী ও অপকর্মের হোতাদেরও আড়াল করা হচ্ছে। অনেক সময় কারা সন্ত্রাসী আর কারা অত্যাচারিত সেটা মানুষ বুঝতে পারে না। যে সকল মিডিয়া ইসলামপন্থীদের তৎপরতা সহ্য করতে পারে না তাদেরকে অপপ্রচারের নানা কৌশল অবলম্বন করতে দেখা গেছে। প্রায়ই দেখা যায়- ইসলামী সংগঠন বা সংগঠনের নেতাকে জড়িয়ে আজগুবি শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। অথচ পুরো প্রতিবেদন জুড়ে শিরোনামের পক্ষে একটি প্রমাণ বা তথ্যও থাকে না। যেহেতু পাঠকরা অধিকাংশ সংবাদের শিরোনাম পড়ে, তাই মিথ্যা ও আজগুবি শিরোনাম দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করা হয়।

এটিই স্বাভাবিক যে, সাধারণ পাঠকরা যা পড়ে তার অধিকাংশ বিশ্বাস করে। একটি মিথ্যা তথ্য প্রকাশিত হয়ে গেলে কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। যাদের বিরুদ্ধে এটি প্রচার করা হয়, তারা প্রতিবাদবার্তা দিলেও কর্তৃপক্ষের ভুল স্বীকার করা না করা সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে। সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম এর দায় স্বীকার করে প্রতিবাদ বার্তা প্রকাশ করলেও তা দায়সারা গোছের হয়ে থাকে। এতে অধিকাংশ মানুষ অন্ধকারেই থেকে যায়। অপপ্রচারের আসল উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়। একটা ঘটনার কথা না বললে নয়। একবার দেশের একটি জাতীয় পত্রিকা ছাত্রশিবিরের সাথে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ে লিড নিউজ করে। তখন ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে পত্রিকার সম্পাদকের সাথে দেখা করে কৈফিয়ত চাইলে সম্পাদক নির্লজ্জের মত হেসে বলেন, 'আমার পত্রিকার পার্পাস আমাকেই সার্ভ করতে হবে।' প্রতিবাদবার্তা ছাপাবেন বলে কথা দিলেও শেষ পর্যন্ত ছাপানো হয়নি। হিটলার ইতিহাসে ধিকৃত হলেও তার আত্মজীবনীতে যথার্থই বলেছেন-"সাংবাদিকতার এ উদারতা আমার চোখে অন্য আলোতে পুরো ব্যাপারটা ধরা দেয়। প্রতিপক্ষকে আক্রমণের জন্য ওরা গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বর ব্যবহার করে, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ওদের সম্পূর্ণ নীরবতায় আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি যে ওরা কত ধূর্ত এবং কী পরিমাণে ঘৃণ্যভাবে পাঠকদের ঠকিয়ে চলছে।"

www.pathagar.com

ছাত্রশিবিরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করাই যেন কিছু সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকের গুরু দায়িত্ব। তাদের মিথ্যা প্রচার দেখে মনে হয়- তাদের জন্মই যেন শিবিরের বিরুদ্ধে লেখার জন্য ও সরকারকে ধোয়া তুলসি পাতা হিসেবে প্রমাণ করার জন্য। তাদের জন্য খুব আফসোস যে, তারা তাদের বিবেককে অর্থ আর অন্ধ বিশ্বাসের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। এমন কিছু সংবাদ তারা শিবিরকে জড়িয়ে প্রচার করে যার সাথে শিবিরের কোন সম্পর্ক নেই। দেশের যেখানে যা ঘটছে সবকিছুর জন্যই দায়ী শিবির! সরকারও সেই রেফারেন্সে একের পর এক শিবিরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে চলছে। সব যে একই সূত্রে গাঁথা দেশবাসী তা ভালো করেই জানেন। দেশের মানুষ এসব মিথ্যাচার শুনতে শুনতে সংবাদ মাধ্যমগুলোকে বর্জন শুরু করছেন।

শিবির সভাপতির ওপর অকথ্য নির্যাতন ও ছাত্র ও জনতার আন্দোলন

ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. দেলাওয়ার হোসেনকে ডিবি পুলিশ তার বোনের বাসা থেকে গ্রেফতার করার পর ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যায়। তাকে গ্রেফতারের পর সারাদেশে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সাধারণ ছাত্র ও ছাত্রশিবিরের সকল স্তরের নেতাকর্মীরা। শিবিরের সভাপতি গ্রেফতারের পরদিন এইচএসসি পরীক্ষার ১ম দিন ছিল। সারাদেশ থেকে সেইদিনই হরতালের মত কঠোর কর্মসূচি প্রদানের জন্য দাবি থাকলেও কেন্দ্রীয়ভাবে ২ এপ্রিল সারাদেশে কেন্দ্রীয় সভাপতি গ্রেফতারের প্রতিবাদে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের আহবান করা হয়। পরদিন ১৮ দলও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও কেয়ারটেকার সরকার পুনর্বহালের দাবিতে হরতাল আহবান করে। ছাত্রশিবির তাদের ঘোষণা অনুযায়ী ছাত্রসমাজকে সাথে নিয়ে সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন করে।

সরকার ছাত্রশিবিরের দাবিকে উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় সভাপতিকে নিঃশর্ত মুক্তি না দিয়ে মামলার পর মামলা দিয়ে রিমান্ডের নামে নির্মম নির্যাতন অব্যাহত রাখে। ছাত্রশিবির বাধ্য হয়ে পুনরায় ১০ এপ্রিল প্রিয় নেতার নিঃশর্ত মুক্তি ও রিমান্ডের নামে নির্যাতনের প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ও ১১ এপ্রিল হরতালের আহবান করে। সমগ্র জাতি প্রত্যক্ষ করেছে যে, ছাত্রসমাজ ছাত্রশিবিরের আহবানে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়ে হরতাল সফল করেছে। এ হরতালে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির পক্ষের ছাত্রসংগঠনগুলো সমর্থন দেয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন ছাত্রসংগঠনের সভাপতির মুক্তির দাবিতে এই প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। প্রিয় নেতার মুক্তির দাবিতে সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় শান্তিপূর্ণ মিছিল সমাবেশ থেকে গ্রেফতার করা হয় অসংখ্য ছাত্রকে।

সরকারের নির্দেশে শিবির সভাপতির বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত ১২০টি মামলা দেওয়া হয়েছে। আরো শত শত মামলা প্রস্তুত করা হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায়। এ পর্যন্ত তাঁকে ৪৫ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। ২০ নভেম্বর পুলিশ আরো ১৭ দিনের রিমান্ড চেয়েছে। তিনি বর্তমানে গুরুতর অসুস্থ। তার শারীরিক অবস্থার এমন হয়েছে যে, তাকে পাঁজাকোলা করে আদালতে আনতে হয়েছে; নির্যাতনের ফলে তিনি তরল খাবার গ্রহণের শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। সীমাহীন নির্যাতনে তিনি অজ্ঞান হয়েছেন বেশ কয়েক বার। একটি পা পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। হাতের নখ উপড়ে ফেলা হয়েছে।

www.pathagar.com

তারা কেন্দ্রীয় সভাপতির কাছে জানতে চায় ছাত্রশিবিরের শক্তির উৎস কী? এই সংগঠনের টাকার উৎস কী? আমরা পরিষ্কার করে বলছি, আমাদের শক্তির উৎস হল মহান আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ যদি কারো জিম্মাদার হয়ে যান, তাদের কি আর কোন ভয় থাকে? শিবিরের অর্থের উৎস হলো সংগঠনকে ভালবেসে প্রত্যেক জনশক্তির দেয়া অর্থ। এ সংগঠনের প্রত্যেক জনশক্তির জানা আছে- দ্বীনের পথে অবিচল থাকার অপরাধে রাসূলের সাহাবীদের জীবনে নির্মম নির্যাতন নেমে এসেছিল। তাঁরা শত নির্যাতনেও আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন। সাইয়েদ কুতুব শহীদ ও জয়নাব আল গাজালীর মত মজলুম বীরেরা ছাত্রশিবিরের প্রেরণার বাতিঘর। নির্যাতন নিষ্পেষণ করে কোন ব্যক্তিকে চিরতরে নিঃশেষ করা যায়, কিন্তু তার আদর্শকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। আমাদের সকল জনশক্তির ধমনীতে শহীদের রক্ত। আমাদের আদর্শ হচ্ছে কালজয়ী আদর্শ মুহাম্মদ (সা) এর আদর্শ । যুগে যুগে এ আদর্শকে যারা ধ্বংস করতে চেয়েছে তারাই ইতিহাসের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়েছে, হয়েছে ঘৃণিত ও ধিকৃত। প্রিয় নেতার মমতাময়ী মায়ের আর্তনাদে শোকাহত আজ লক্ষ তরুণের মা। সবার প্রশ্ন, কেন এই নির্মম নির্যাতন? গ্রেফতারের পর প্রিয় মা'কে দীর্ঘদিন তার সন্তানের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয়নি। তার মা সুদূর ঠাকুরগাঁও থেকে ৫০০ কি:মি: পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন সন্তানের খোঁজে, কিন্তু নিষ্ঠুর প্রশাসন প্রিয় সন্তানকে একনজর দেখার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। তার মা তৈয়বা খাতুন এখন শুধু সন্তানের জন্য বিলাপ করেন। আর দোয়া করেন, আর কোন মায়ের অবস্থা যেন এ রকম না হয়।

জাতির কাছে প্রশ্ন, একটি ছাত্রসংগঠনের সভাপতির সাথে যদি এই আচরণ করা হয়, তাহলে এই দেশে কেউ কি নিরাপদ? এত রিমান্ড, নির্যাতন! কোথায় বাংলাদেশের মানবাধিকার? কোথায় বাংলাদেশের সরব মিডিয়া? ধিক তোমাদের জন্য। দেশবাসীর কাছে আমাদের প্রশ্ন, ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচার শুনেছেন, কোন প্রমাণ কি দেখেছেন? আজ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পেয়েছেন? সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, মাদক, ইভটিজিং, কোনটার সাথে কি শিবির নেতাকর্মীরা জড়িত? আমাদের অনুরোধ, আপনারা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করুন। ছাত্রশিবিরের কার্যক্রম সম্পর্কে, এই সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন। প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে শিবিরের বিরুদ্ধে এত অপপ্রচার কেন? তাহলে বলতে হয় স্বয়ং নবী (সা)ও যখন কালিমার দাওয়াত নিয়ে মানুষের কাছে গিয়েছিলেন তখন তাকে গণক, পাগল, জাদুকর ইত্যাদি উপাধি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি কি তার মিশন থেকে বিচ্যুত হয়েছেন? কুরআনে মু'মিনের ওপর নির্যাতনের কারণ বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে "তাদের অপরাধ হচ্ছে একটাই যে, তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'য়ালার ওপর ঈমান এনেছে।" (সূরা বুরুজ)

ছাত্রশিবির মজলুম হয়েও ধৈর্য ধারণ করছে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে গেছে। তবুও ফ্যাসিস্ট সরকার হাজারো নেতাকর্মীকে কারারুদ্ধ করেছে। এই সরকারের চক্রান্তের শেষ নেই! সরকার একদিকে গণজাগরণের নামে একদল ভ্রান্ত যুবককে দিয়ে স্বাধীনতা ও ইসলামকে সম্মুখ সমরে হাজির করে জাতির মধ্যে বিভক্তির রেখা টেনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উসকে দিচ্ছে; অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক বাংলা গড়ার ঢাকঢোল পেটাচ্ছে! হাজার বছরের ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে সত্য ও সুন্দরকে গলাটিপে নিঃশেষ করে নয়া ইতিহাস রচনার মহাপ্রলয়ঙ্করী আয়োজন চলছে তরুণ প্রজন্মের ধোয়া তুলে। দেশবাসী জানে,

www.pathagar.com

ছাত্রশিবিরের লাখো তরুণ নেতাকর্মীকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্মের কথা চিন্তাও করা যায় না। ছাত্রশিবির তরুণ প্রজন্মের অহঙ্কার। ছাত্রশিবিরের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার না দিয়ে জেল-জুলুম, হত্যা, গুমের যে রাজনীতির সূচনা আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট শুরু করেছে, তার পরিণাম শুভ হবে না। ছাত্রশিবির এমনই একটি দল- এই দলের প্রিয় নেতারা যখন নির্যাতনের শিকার হয়, কর্মীরা আরো বেশি ক্ষিপ্রগতিতে লক্ষ্য অর্জনের পথে এগুতে থাকে। নির্যাতনের সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে পুরোদমে, নতুন নেতৃত্ব তৈরি হয়।

গণতন্ত্রের খোলসে স্বৈরাচারী সরকার দেশে জনগণের মতপ্রকাশের পথকে বন্ধ করে এক দলীয় বাকশাল কায়েমের পথে এগুচ্ছে। সরকার প্রকারান্তরে নিরীহ জনতাকে প্রতিশোধ পরায়ণ হওয়ার জন্য উসকে দিচ্ছে। যা একটি দেশের জন্য কখনোই শুভকর নয়। যখন মানুষ তার মতপ্রকাশের অধিকার হারিয়ে ফেলে তখন ভিন্ন অবয়বে তার মতপ্রকাশ করতে চায়। স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হওয়ায় তখন সে মতপ্রকাশের জন্য ভিন্ন কোন পথ বেছে নেয়। বিনা কারণে প্রতিটি মিছিল, সমাবেশে যদি নির্বিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা করা হয়, তখন আন্দোলনরত কর্মীরা বেপরোয়া হওয়া স্বাভাবিক। সরকার ও সরকারের তল্পিবাহী গণমাধ্যম সন্ত্রাস উসকে দেয়ার জন্য মোক্ষম ভূমিকা রাখছে। অপরাধী না হয়েও যখন কোন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীকে শাস্তি পেতে হয়, তখন সে ব্যক্তি বা দল প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে সংঘাতে লিপ্ত হতে বাধ্য। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃংখলা দেখা দেয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই বিশৃংখলা কারো কাম্য হতে পারে না।

এ আন্দোলনের প্রতিটি জনশক্তিকে শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। যারা নেতৃবৃন্দের নির্দেশে জীবন দিয়েছে, পঙ্গুত্ব ও নির্যাতন সহ্য করে দিনের পর দিন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিনাতিপাত করেছে। যারা দুনিয়ার স্বপ্নস্বাধ ত্যাগ করে আল্লাহর মেহমান হিসাবে জান্নাতের পাখি হয়ে উড়ছেন। তারা বড়ই ভাগ্যবান। এর প্রতিদান পৃথিবীতে কি থাকতে পারে?

যে আন্দোলনের কর্মীরা নিরলসভাবে মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে যায়, সে আন্দোলনকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। দেশের ইতিহাসে ইসলামী ছাত্রশিবির তেমনি একটি আন্দোলনের নাম। ছাত্রশিবিরকে আদর্শিকভাবে পরাজিত করতে না পেরে বিরুদ্ধবাদীরা ষড়যন্ত্রকেই হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে।

ছাত্ররা আগামীর কারিগর। সেই কারিগরকে যদি যোগ্য নাগরিক হিসেবে গঠন করার পরিবর্তে রাষ্ট্রই তাদের নিঃশেষ করতে ভূমিকা রাখে, তাহলে সে জাতির কপালে দুর্ভোগ ছাড়া আর কী থাকতে পারে? এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আমাদের শিক্ষালয়গুলো কিছু জ্ঞানপাপীদের কাছে জিম্মি হয়ে গেছে। যাদের হিতাহিত জ্ঞান নেই। যারা বিনা দোষে ভিন্ন রাজনৈতিক মতদর্শের ছাত্রদের ছাত্রত্ব বাতিল বা সাময়িক বহিষ্কার করছেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন মতাদর্শের ছাত্রকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দানে বাধা প্রদান করছেন। দুঃখজনক হলেও শিক্ষাঙ্গনে আজ এসব ঘটে চলছে।

www.pathagar.com

যারা ক্ষমতা লিপ্সু, ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করতে যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাদের লাগাম টেনে ধরতে হবে। টেনে হিঁচড়ে তাদের মসনদ থেকে নামাতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে আগামী প্রজন্মের বাসযোগ্য ঠিকানা। যেখানে থাকবে না হানাহানি, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যায়-অবিচার।

সম্প্রতি প্রশাসন ও সরকারি দলের সাথে শিবিরের সংঘর্ষের কিছু ঘটনা ঘটেছে; যা ছাত্রশিবিরের মত একটি দায়িত্বশীল ছাত্রসংগঠন সমর্থন করে না। কতিপয় গণমাধ্যম ও প্রশাসন কেবল শিবিরকেই দায়ী করেছে; ঘটনার সূত্রপাত কোথা থেকে হয়েছে, তা বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছে। এসব ঘটনার নেপথ্যে কে বা কারা? যদি একজন অসহায় মানুষ নির্যাতন সহ্য করতে করতে জীবনহানির প্রান্তিক সীমায় গিয়ে আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করে তাহলেও কি তাকে দায়ী করা উচিত? ছাত্রশিবির বিশ্বাস করে মজলুমের ফরিয়াদ পৃথিবীর কেউ শুনতে না পেলেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা ঠিকই শোনেন। ছাত্রশিবির আরো বিশ্বাস করে যে, তাদের ওপর জুলুম নির্যাতনই ঘটনার শেষ নয়। তাই তাড়াহুড়া না করে আল্লাহ ও রাসূল (সা) এর পথ ধরেই ছাত্রশিবির সকল নির্যাতনের সমুচিত জবাব দেবে। চলতি পথে যে সকল বাধা আসবে সকল বাধাকে মাড়িয়ে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে যুবসমাজকে সাথে নিয়ে এই সংগঠন সত্য ও সুন্দর আগামী গড়ার মধ্য দিয়েই সকল অবর্ণনীয় নির্যাতনের সমুচিত জবাবকে নিশ্চিত করবে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

ইতিহাস ঐতিহ্য ও মুসলিম জাগরণ

আমি নিজে জীবনে ইতিহাস অনেক পড়েছি। আমি পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস পড়েছি। মুসলিম ইতিহাস পড়েছি। জাপান, রাশিয়ার ইতিহাস পড়েছি। ইউরোপ আমেরিকার ইতিহাস পড়েছি। আমি আরবদের ইতিহাস পড়েছি। শুধু বলা যায় আফ্রিকার গ্রেটার পার্টের ইতিহাস আমার পড়া হয়নি। ইতিহাস পড়ে বুঝলাম ইতিহাস হলো একটা বড় শিক্ষক। মানুষ কী কী ভালো কাজ করেছে এবং সেটা কারা করেছে, তাদের কী যোগ্যতা ছিল, কোন কোন পরিস্থিতিতে সফল হওয়া যায় তা ইতিহাস পাঠে জানা যায়। এখানে ব্যক্তিগত একটা বিষয় থাকে যে লোকটা কত যোগ্য। আবার পরিস্থিতির একটা ব্যাপার থাকে। অনেক সময় যোগ্য লোকও পরিস্থিতির কারণে অনেক কিছুই করতে পারে না। পরিস্থিতি অনুকূল হলে কম যোগ্য লোকও পারে। এগুলোর ইতিহাস পড়লে আমরা জানতে পারি যে যারা কোনো বড় কিছু অর্জন করছে তাদের কী কী যোগ্যতা ছিল এবং তাদের সময়ের পরিস্থিতিটা কেমন ছিল। কোন পরিস্থিতিতে তারা সেসব করতে পেরেছিল।

তেমনিভাবে আবার মানুষের ব্যর্থতাগুলো জানা যায়। ব্যক্তির দোষের কারণে ইতিহাসে কী কী জিনিস ফেল করছে আবার পরিস্থিতির কারণে কারা কারা ফেল করেছে সেগুলো জানা যায়। কাজেই ইতিহাস একটা বড় শিক্ষক। কোনো ব্যক্তির যেসব বিষয় অবশ্যই পড়তে হবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে সাহিত্য আর একটা হচ্ছে ইতিহাস। আরো অনেক কিছু আছে যা পড়তেই হবে। সেটা আমি এই স্টেজে বললাম না। কিন্তু এই দুইটা পড়তে হবে। সাহিত্য জীবনের দর্পণ। জীবনকে জানা যায়। একটা সমাজ কেমন ছিল তা জানা যায়। কোন সমাজটা কেমন তা জানা যায়। যেমন, এটা মনে করা ঠিক হবে না যে শরৎচন্দ্র পড়লে আমি খালি উপন্যাস পড়লাম। তা না, আমি ভিন্ন সমাজকেও বুঝলাম। ওই সময়ের হিন্দু সমাজের দ্বন্দ্বগুলোও

www.pathagar.com

বুঝলাম। তৎকালীন হিন্দু সমাজকে জানলাম। একই কথা সত্য সবার ক্ষেত্রে। শেক্সপিয়ার পড়লে আমরা জানতে পারি ওই সময়ের সাহিত্যের উপজীব্য কী ছিল? সেই সমাজটা কেমন ছিল? সেখানে বড় লোকেরা কেমন ছিল? সাধারণ মানুষরা কেমন ছিল? কী কী ধরনের প্রশ্ন তাদের সামনে ছিল?

তেমনি ইতিহাসও খুবই বড় শিক্ষক। আমাদের ইতিহাস ও সাহিত্য এই দুইটা লাগবে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের ব্যাপকভাবে এই দুইটার চর্চাই কমে গেছে। ধর্মের পড়াশুনা নাই। ধর্মকে তো ফিলোসফিই বলা যায়। একদিকে ফিলোসফি আরেক দিকে ধর্ম নিজে একটা ফিলোসফি। এটাও আবার মানুষ পড়ছে না। সাহিত্য এবং ইতিহাসও কম পড়ছে আগের তুলনায়। তারা পড়ছে বিজনেস। বিজনেস মানে কী করে একাউন্টিং হিসাব করতে হবে? কী করে প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে? কী করে এগুলো বিক্রি করতে হবে? এগুলো তারা শিখছে। আর অবশ্যই সায়েন্স শিখছে যে সায়েন্সের মাধ্যমে টেকনোলজি তৈরি কর যাবে। যে সায়েন্সের মাধ্যমে বিশ্বের ন্যাচারের অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যে এগুলো কেন হয় সেগুলো জানা যাবে। সূত্র বের করা যায়, কারণগুলো জানা যায়। কিন্তু তারপরেও এই সায়ন্স আর বিজনেস পড়ে মানুষ হওয়া যায় না। এ দ্বারা রোবট হওয়া যায়। বর্তমানে বিশ্ব অধিকাংশ মানুষ কিন্তু কম বেশি রোবট। হতে পারে ব্যতিক্রম এখনো আছে এশিয়ার কিছু কিছু দেশে। কিংবা যদি বলি মুসলিম ওয়ার্ল্ডের, আফ্রিকার কিছু কিছু দেশ এখনো তারা রোবট হয়নি। কিন্তু বাকি বিশ্ব রোবট হয়ে গেছে। ইউরোপ রোবট হয়ে গেছে। আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া রোবট হয়ে গেছে। এই হচ্ছে অবস্থা। আমরা তো রোবট চাই না। যদি রোবট না চাই তাহলে আমাদের ফিলোসফি বা ধর্ম পড়তে হবে। সাহিত্য পড়তে হবে। ইতিহাস পড়তে হবে।

ইতিহাস ডিসটরশন করা যায় না। ইতিহাসের ওপর কোনো যোগ বিয়োগ করা যায় না। ইতিহাস হচ্ছে যা ঘটেছে এবং কারা ঘটিয়েছে এদের কথা। কী ঘটেছিল তার কাহিনি। এটা সাহিত্য নয়। এখানে গল্প বানাবার কোনো অবকাশ নাই। ইতিহাস আর সাহিত্য এক জিনিস নয়। ইতিহাস গল্প করা যাবে না। ইতিহাস মাস্ট বি ফ্যাক্টচুয়াল। এখানে আমাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে দিলাম বা কমিয়ে দিলাম এগুলো চলবে না। ইতিহাস হলো একটা এলাকার ইতিহাস। ইতিহাস আফটার অল মানুষ নিয়ে ডিল করছে। একটরসরা ডিল করছে যে একটরসরা এটা ঘটিয়েছে। ঐ একটরসরা তো ঐতিহ্য ছিল। যারা একটরস ছিলেন তাদের তো একটা ঐতিহ্য ছিল। যেমন নেপলিয়ন। সে ঐতিহ্য তো ইতিহাসে এসে গেছে। নেপলিয়নের সঙ্গে নেপলিয়নের ঐতিহ্য আসছে। নাস্তিকের সাথে নাস্তিকের ঐতিহ্য আসছে। একজন ধর্মবিশ্বাসী লোকের সাথে তারও ঐতিহ্য আসছে। সুতরাং ইতিহাস মানে যদি একটরসের কাহিনি হয় তাহলে এর সঙ্গে একটরসদের যে ঐতিহ্য তার যে ব্যাকগ্রাউন্ড, যার মাধ্যমে সে লেখাপড়া করেছে, যে ধর্মের পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে অথবা যে কালচারে সে মানুষ হয়েছে সেগুলো সরাসরি নয়ত পরোক্ষভাবে আসছে। আমি সরাসরি বলতে পারব না যে এগুলো ইতিহাসের সরাসরি অংশ। তবে এগুলোর আলাদা একটা ইতিহাস হতে পারে। যেমন আজকাল আমরা বলি ইতিহাস আবার শ্রমিক ইতিহাস। আমরা আলাদা করে পড়তে পারি হিস্ট্রি অব উইমেন। তেমনি ভাবে হিস্ট্রি অব কালচার বলতে পারি। হিস্ট্রি অব ট্র্যাডিশন, ঐতিহ্য পড়তে পারি। সেটা অন্য বিষয়।

শান্তির মিনার

www.pathagar.com

কিন্তু মূল ইতিহাস বলতে যেটা বোঝা যায় তা রাজনৈতিক ইতিহাসকে বলা হয়। সেটা হচ্ছে কিভাবে বিভিন্ন সাম্রাজ্য হলো, রাষ্ট্র হলো। কী কী যুদ্ধ হলো, কারা এর একটরস। ইতিহাস বলতে আমরা এটা বুঝি। কিন্তু ইতিহাসকে যদি আমরা খুবই বৃহৎ অর্থে নেই তাহলে এর মধ্যে সব কিছু এসে যাবে। যেমন সাহিত্যের ইতিহাস বলে আমরা সবটা সাহিত্যে নিয়ে নিলাম। ঐতিহ্যের ইতিহাস বলে আমরা ঐতিহ্যের ইতিহাস নিলাম। গানের ইতিহাস বলে সব গানের আলোচনা শুরু করলাম। সেই দিক থেকে যদি দেখা হয় তাহলে ইতিহাস আর জীবন, ইতিহাস আর ঐতিহ্য, ইতিহাস আর সাহিত্য সব এক হয়ে যাবে। ইতিহাস আর ধর্ম এক হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা করা বোধহয় ঠিক হবে না। মূল ইতিহাস হলো রাজনৈতিক (পলিটিক্যাল) ইতিহাস। আর ঐগুলোও ইতিহাস কিন্তু মার্জিনাল। ইতিহাসের মূল অংশ হচ্ছে রাজনৈতিক। আমি এটাও বলব প্রত্যেকটা আলাদা করে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ইতিহাস বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর এটাকে আমরা বলছি ইতিহাস। একটাকে কালচার বলছি। কিন্তু কালচার বললে তো সেটা ছোট হচ্ছে না। ইতিহাস বলা মানে এই নয় যে কালচার ছোট। বা কালচার বলা মানে এই নয় যে কালচার বড় ইতিহাস ছোট। ইতিহাসের জায়গায় ইতিহাস। কালচারের জায়গায় কালচার। সাহিত্যের জায়গায় সাহিত্য। ধর্মের জায়গায় ধর্ম। এই অর্থে কোনোটাই ছোট হচ্ছে না। প্রত্যেকের আলাদা একটা ক্ষেত্র আছে। আবার একটা মিটিং পয়েন্টও আছে। একটা আরেকটাকে ওভারল্যাপ করতে পারে। ঢুকতে পারে। ইনক্লুড করতে পারে। কিন্তু আমরা যদি ইতিহাসের কথা বলি বর্তমানে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে, যেমন যদি বলি উপমহাদেশের ইতিহাস তাহলে আমরা কী দিয়ে শুরু করব? সে কী কী করেছিল তা আসবে বা সে কোন ধর্মের লোক ছিল সেটা আসবে। সে যদি কোনো মহৎ কর্ম করে থাকে সেটা এসে যায়। শাহজাহানের কথা বলতে গেলে তাজমহলের কথা বাদ যাবে না। কিন্তু মূলত এটা রাজনৈতিক ইতিহাস। এই ইতিহাসের মধ্যে তাদের জীবনের অনেক কিছু চলে আসবে। তারা যে সাহিত্য করছে সে সাহিত্য এসে যাবে এখানে। যেমন আকবরের সঙ্গে তার দরবারে যারা ছিলেন সেগুলোর উল্লেখ চলে আসবে। আকবর নামা লিখেছেন আবুল ফজল তার কথা চলে আসবে। তবুও আমি বলব রাজনৈতিক ইতিহাসের ভেতর যদি আমরা আলাদা বিভক্তি না করি তাহলে এর মধ্যে সব কিছু মিশ্রিত হয়ে যাবে। এক হয়ে যাবে। তাহলে তো আর ভিন্নতা থাকবে না। ভিন্ন করে স্টাডি করার অবকাশ থাকবে না তার।

আমার মনে হচ্ছে, আমাদের বর্তমান শিক্ষার একটা ব্যর্থতা এখানে সেকুলারিজম থেকে অনেক কিছু আসছে। রোবট হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার কারণে। আধুনিক সভ্যতার মূল ভিত্তি হচ্ছে সেকুলারিজম। যেটা এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্টের ফল। এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্টেরর দুটি কথা ছিল। একটা ছিল খোদায়ী কোনো ব্যাপারে আমরা জড়িত না। এর সব হচ্ছে বৈশ্বিক ব্যাপার। আমরা সব করব। আরেকটা কথা ছিল তাদের রেশনালিজম। সব কিছু যুক্তির ওপর। এখানে ঐশ্বরিক কোনো ব্যাপার নাই। রাষ্ট্রের সঙ্গে এগুলোর কোনো যোগাযোগ নাই। এ ধারণা থেকেই এক সময় সেকুলারিজম শব্দটা পপুলার হয়। এর ফলেই ক্রমে ক্রমে মানুষের শিক্ষা থেকে ধর্ম বাদ পড়ে গেল। বিশেষ করে পশ্চিমে এটা বাদ পড়ে যায় এবং মোরালিটির গুরুত্ব কমে যায়। এর ফলেই মানুষ পরবর্তীতে আরো দেখা গেল তারা এই স্বার্থপরতা মধ্যে বলতে লাগল, শ্লোগান দিল টাইম ইজ মানি। তার মানে সময় অন্য কোনো

শান্তি মিনার
www.pathagar.com

কাজে নষ্ট করা যাবে না। মানির কাজে ব্যবহার করতে হবে। যা দিতে হবে মানির জন্য দিতে হবে। তাই যদি হয় তাহলে আমাকে এমন করতে হবে যে ব্যবসাটাকে শিখতে হবে বেশি করে। যা অর্থ দেয় তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেটা করতে গিয়েই মানুষ বিজনেস সায়েন্সে চলে গেল। পিওর সায়েন্স, টেকনোলোজির সাইডে ছিল কিছুটা। কোনোটাই খারাপ না। যদি সব কিছু মিলে হতো। ধর্ম, নৈতিকতাকে সঙ্গে নিয়ে যদি করা হতো। কিন্তু বাদ দেয়ার কারণে এগুলো একেবারে একপেশে হয়ে গেল। একতরফা একমুখী হয়ে গেল। একমুখী হওয়ার কারণেই মানুষ শেষ পর্যন্ত রোবট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ছেলে মেয়েরাও। আমি যখন ইয়ং ছেলেমেয়েদের দেখি, মনে হয় না যে তাদের জীবনে কোনো উচ্চ লক্ষ্য আছে। তাদের সামনে লক্ষ্য হচ্ছে একটা সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। একটা সুন্দর ছেলেকে বিয়ে করতে হবে। ঘুরে বেড়াতে হবে, মজা করতে হবে। তারা মজা করাই বলে। খাও দাও, ভোগটোগ করে মরে যাও। এর বেশি কোনো লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাব্যবস্থাও দিচ্ছে না। সায়েন্সে, বিজনেসে কোথাও নাই হায়ার মোরাল কোর্স। এটা একমাত্র আছে রিলিজিয়ন অথবা এথিকসে। আর ইতিহাসে কিছু পাওয়া যায়। সাহিত্যে পাওয়া যায়। কাজেই রোবট এই কারণে হয়ে গেছে এবং হচ্ছে।

যদি এর থেকে ফিরে আসতে হয় আমার মনে হয় ধর্মেই ফিরে আসতে হবে। এটা বলতে আমি এই বোঝাচ্ছি না যে ধর্ম বলতে ইসলাম সবখানেই। আমি অবশ্যই ইসলাম চাই। তারপরও আমি বাস্তববাদী বলেই মনে করি যেখানে হিন্দু ধর্ম ডমিনেন্ট সেখানে হিন্দু ধর্মেই ফিরে আসতে হবে। বৌদ্ধদের বৌদ্ধ ধর্মের দিকেই ফিরে আসতে হবে। খ্রিস্টানদের খ্রিস্টান ধর্মের দিকে ফিরে আসতে হবে। কেননা আমি কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে পারব না। আমি যদি পরিবর্তন চাই তাহলে সবখানেই ধর্মে ফিরে আসতে হবে। কেননা আমরা মুসলিম বিশ্বে করলাম কিছুটা কিন্তু আমরা তো বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারব না। টিকতেও হয়ত বা পারব না। এই জন্য বিশ্বব্যাপী এটা দরকার। একটা আন্দোলন দরকার ধর্মে ফিরে যাওয়ার। খ্রিস্টানিটির মধ্যে, হিন্দুদের যদি এরকম উদ্যোগ থাকে আমি এটাকে স্বাগত জানাই। বিজেপির মতো হওয়া উচিত না যেখানে এন্টি মুসলিম একটা পার্ট আছে। বরং এরকম হতে হবে যে হিন্দু ধর্মের প্রাকটিস তারা পুরা করবে। নৈতিক মূল্যবোধ পুরা নেবে, আইন থাকলে তাও নেবে। কিন্তু অন্য ধর্মের লোকদের তারা হিউম্যান রাইট দেবে। ইসলামের ক্ষেত্রে একই কথা। এরকম একটা জিনিস সম্ভব। আমার মনে হয় পোপ বর্তমানে যে সব কথাবার্তা বলছেন তা এরকমই। ব্যাক টু ফ্যামিলি ভ্যালুস, রিজেক্ট সেকুলারিজম এরকম কথাই বলছেন তিনি। চার্চ অব ক্যান্টারবারি তিনিও একথাই বলছেন। যেগুলো তারা এখন বলছেন হয়ত বস্তুবাদের, সেকুলারিজমের, নাস্তিকতার প্রভাব তারা বেশি অনুভব করছে।

তার প্রভাব এই রোবটের মতো লোকগুলোর ওপর কতটা পড়বে যদি বেসিক শিক্ষা সংশোধন না করা হয়? হ্যাঁ, তারা পারবেন যদি তাদের দাওয়াতটা খুব বেশি হয়। তাদের সত্যিকার মুভমেন্ট, সেখানে দাওয়াত থাকবে, যেমন আমরা বলি দাওয়াতের কথা। যেমন ইসলামিস্টরা যতই ক্রটিপূর্ণই থাকুক তারা বলে যে আমাদের দাওয়াত দিতে হবে, লোকদের কনভিন্সড করার চেষ্টা করতে হবে। আমর বিল মারুফ করত হবে। নেহি আনিল মুনকার করতে হবে। খ্রিস্টান ধর্মের তাৎপর্যও তাই। দাবি তো তাই। ইসলামে বলা আছে আমরু বিল মারুফ কিন্তু

শান্তির মিনার

www.pathagar.com

খ্রিস্টান ধর্মে এই মূল কথাটা নাই বলা যাবে না। নিশ্চয়ই ঈসা (আ) এটাই চেয়েছেন যে ধর্মের কথা অন্যদেরকে বল। এটা তো হতে পারে না যে, বলো না। চার্চের এ ব্যাপারে অনেক দায়িত্ব। তাদের ভালো লোকদের অনেক ডিউটি আছে এটা করার।

গোটা বিশ্বেই একটা ব্যাক টু রিলিজিয়ন, ব্যাক টু মোরালিটি, ব্যাক টু এথিকস এটা হতে হবে। না হলে মানুষের মুক্তি নাই। মানুষ একেবারেই বর্বর হয়ে যাচ্ছে, স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। চিট, বাটপার, লোভী হয়ে যাচ্ছে। অত্যাচারী হয়ে যাচ্ছে। জাতির ওপর জাতির অত্যাচার, ব্যক্তির ওপর ব্যক্তির অত্যাচার, শ্রেণীর ওপর শ্রেণীর অত্যাচার। সব সম্পদই একমাত্র গিয়ে আমেরিকার–এটা কী করে হলো? এটা তো অত্যাচারেরই অন্য নাম। কাজেই অনেক মৌলিক প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত।

আমাদের দেশে ইতিহাস চর্চা হচ্ছে না তা বলব না। হচ্ছেও বলব না। হচ্ছে এই অর্থে বলব যে, আমরা যে ইতিহাস পড়ি, উপমহাদেশের যে ইতিহাস পড়ি সেটা মোর অর লেস কিছু ফেয়ার রাইটার আছেন যারা লিখছেন, কিছু রাইটার হয়ত বা বিকৃত করছেন। কিন্তু বেশির ভাগ লেখকই ভালো লিখেছেন। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের কোথাও কোথাও যে সব বিকৃতি চলে আসছে সে সব দূর করতে হবে। একদল সাহসী লোককে এটা করতে হবে। বাংলাদেশের পরে জন্ম নিয়েছে এমন লোক তা করতে পারবে, আগের লোকেরা পারবে না। তাদেরকে এটা করতে হবে।

ইতিহাস তো আপন গতিতে চলে–এটা একটা কথার কথা। এটা একটা বক্তব্য। যেমন টাইম ইজ মানি। এটাও একটা বক্তব্য। এই বক্তব্য কী সঠিক? আমরা জানি টাইম ইজ নট অনলি ফর মানি। টাইম ইজ অলসো ফর হেল্পিং আদারস। টাইম ইজ অলসো ফর ইবাদত। অলসো ফর সার্ভিং প্যারেন্টস। তেমনিভাবে অনেক শ্লোগান আছে যার সত্যিকার ভিত্তি নাই। ইতিহাস আপন গতিতে চলে এটা এই অর্থে ঠিক যে কোনো এক ব্যক্তি ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ইতিহাসে কোটি কোটি একটরস, লোক জড়িত। সুতরাং আপন গতিতে চলে মানে একটা ছোট গোষ্ঠী এটা বদলাতে পারবে না ঠিক। রেকর্ডিং ভুল হতে পারে কিন্তু কেউ না কেউ সেই রেকর্ডিং চ্যালেঞ্জ করবে। যেমন আওরঙ্গজেব নিয়ে অনেক কথা আছে। কিন্তু পরবর্তীতে হিন্দু ঐতিহাসিকরাই বলছেন এগুলোর অনেক কিছুই মিথ্যা। তেমনিভাবে আমি মনে করি ইতিহাস নিজের গতিতে চলে এই অর্থে যে কোনো এক ব্যক্তি এটাকে বদলাতে পারে না। কারোর হাতে এটার নিয়ন্ত্রণ না। একটা পার্টিও এটা নিয়ন্ত্রণ করে না। একটা পার্টি এটা বদলাতে পারবে না। যতই করা হোক সে একটা গতিতে ফিরে আসবে। কোটি লোকের যে একটা গতি, কোটি লোকের যে একটা মিলিত চিন্তা এটা রিফলেকশন আলটিমেটলি করবেই।

আমার মনে হয় ইতিহাস আমাদের পড়ানো হচ্ছ না বোধ হয়। মনে হচ্ছে এসএসসিতেও ইতিহাস খুব ভালো করে নেই। তাদের বোধহয় সীমাবদ্ধতাও আছে, এত সাবজেক্ট কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়াবে–এসব রেয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও আমি ঠিক কী বলব জানি না, কিন্তু ইতিহাস পড়তে হবে এটা আমি জানি। কিছু হলেও পড়তে হবে। আর উপরের দিকে ইতিহাস থাকতে হবে। আমার মনে হয় গ্র্যাজুয়েশন কোর্সে যে সাবজেক্টই পড়ুক একটা অংশ ইতিহাসের ওপর পড়া উচিত। যেমন আমি শুনেছি হার্ভার্ডে যে যে সাবজেক্টেই পড়ুক ইতিহাস

www.pathagar.com

যেহেতু বেসিক একটা নলেজ এটা পড়তে হবে। এখন আমাদের কোনো কোর্স যদি একশ ত্রিশ ক্রেডিটের হয় তার মধ্যে আমরা যা পড়াচ্ছি সবটাই পড়ালাম। কিন্তু অর্ধেক অর্থাৎ ৬৫ ক্রেডিট এ পড়ালাম। বাকিটা আমরা দশটা সাবজেক্ট পড়ালাম। তাহলে সেটা একটা ব্রডার পারসেপশন হবে। এই জিনিসটা করতে হবে। কিভাবে করতে হবে, কবে হবে জানি না। কিন্তু করতে হবে। ইতিহাসকে উপেক্ষা করা যাবে না। সাহিত্য উপেক্ষা করা যাবে না। সাহিত্যও কিছু না কিছু পড়তে হবে।

ঐতিহাসিকভাবেই মানতে হবে কালচারের ভিত্তি ধর্মই ছিল। এটা না মানা মানে বাড়াবাড়ি। হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম প্রাথমিকভাবে। মুসলিমদের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম আর অন্যরা মাইনর গ্রুপ। খ্রিস্টানরা তো অনেক পরে এসেছে। বৌদ্ধ ধর্মই বৌদ্ধদের কালচারের ভিত্তি ছিল। পরবর্তীকালে একটা কালচার এসেছে পশ্চিমা থেকে। সেটা সবাইকে কমবেশি প্রভাবিত করেছে। তা ড্রেস প্যাটার্নে, ভাষায় বিনোদনে প্রভাব পড়েছে। খেলাধুলায় প্রভাব রাখছে। চিন্তায় হয়ত বা প্রভাব রাখছে। যেটুকু ভালো এটুকু হয়ত বা বাদ দেয়া যাবে না। কিন্তু যা মন্দ তা গ্রহণ করাই উচিত না। নেয়াও উচিত না। বজায় রাখাও উচিত না।

সুতরাং আমাদের বর্তমানে কালচারে একটা মিকচার হচ্ছে। দেশে একটা মিক্সড কালচার করার চেষ্টা করা হচ্ছে যেন এখানে হিন্দু ধর্ম ইসলাম মিশে যায়। এরকম একটা ব্যাপার বা এর কাছাকাছি যেন চলে আসে ধর্ম হিসেবে। এখানে মঙ্গল প্রদীপ দিয়ে শুরু করা হবে। আর্ট কলেজ বেসিক্যালি হিন্দু থটভিত্তিক হবে বা হিন্দু প্রাকটিসভিত্তিক হবে। এই রকম। কিন্তু আমি মনে করি মানুষের বেসিক পরিচয় হচ্ছে ধর্ম। কোরআনও তা বলে। আল্লাহপাক সূরা বাকারাতে বলেছেন, লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন–যে তোমরা মরো না যতক্ষণ না তোমরা মুসলিম হয়েছ। অবাক লাগে যে আল্লাহতায়ালা বললেন না যে, আমেরিকান বা পাঞ্জাবি বা ভারতীয় হয়ে মোরো না। বা বাঙালি হয়ে মোরো না। এটা প্রমাণ করে রাব্বুল আলামীনের কাছে মূল পরিচয় হচ্ছে মুসলিম পরিচয়। অমুসলিমের ক্ষেত্রেও তাই। হিন্দু ধর্ম একজন হিন্দুর আসল পরিচয়। এই পরিচয়ের ভিত্তিতে যদি বাংলাদেশে দুইটা কালচার থাকে তাতে সমস্যা নাই। এ রাষ্ট্রে কয়েকটা কালচার থাকতেই পারে। ভারত এক রাষ্ট্রে অন্তত বিশটা ভাষা আছে। কী সমস্যা এতে? যে ভাষা বেশি চলে সেটা রাষ্ট্রভাষা হলো। তেমনি আমার মনে হয় এটা এখানকার লোকজন মানতে পারছে না। ইসলাম যারা মানে না মুসলিম আইডেন্টিটির মধ্যে যে কোনোরকম আপস নাই এটা তারা বুঝতে পারে না। আমার অন্য আইডেন্টিটি আছে। আমি একই সঙ্গে কিশোরগঞ্জের মানুষ। একই সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ। একই সঙ্গে বাংলাভাষী। এটা মানতে পারছে না এরা। এখানে তারা মিক্সড আপ করতে চাচ্ছে। অথচ এটা অযথা। যেমন একটা দেশে সবাই ডাক্তার হওয়ার দরকার দেনই। সবাই ডাক্তার না হলে ঐক্য হবে না বা সবাই ইঞ্জিনিয়ার না হলে ঐক্য হবে না–এটা ঠিক না। তেমনি সবাই মুসলিম হতেই হবে এটাও কথা না। কাজেই ভিন্ন কালচারকে মেনে নেয়াই ছিল ভালো। কিন্তু এটা একদল সেকুলার ইচ্ছা করে ইসলামকে দুর্বল করার জন্য বাঙালি কালচার এবং বাঙালিত্বকে বড় করে দেখাচ্ছে। বাঙালিত্বও একটা জিনিস। কিন্তু এটা মৌলিক না। বিশ্বাস যেমন মৌলিক, এক আল্লাহর বিশ্বাস, আখেরাতে বিশ্বাস যেমন মৌলিক কোন ভাষায় কথা বললাম এটা অতটা মৌলিক না। বিশ্বাসই মানুষের কার্যকে, সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেই বিশ্বাস আসছে ধর্ম থেকে।

www.pathagar.com

যে মূল্যবোধ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে সেটা আসছে ধর্ম থেকে। আমি কী মাছ খেলাম এটা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। আমি এদেশের তৈরি সবজি খেলাম এটা আমার ওয়ে জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। এটা ভুল ধারণা। কিন্তু এটাকেই কিছু লোক এস্টাবলিস্ট করতে চাচ্ছে। এই বিষয়টাকে মৌলিখভাবে চ্যালেঞ্জ করা দরকার। এটা করছে মূলত তারা যারা ইসলামকে সহ্য করতে পারছে না। এটা করছে যারা নাস্তিক বা নাস্তিকের কাছাকাছি তারা। যারা লেফটিস্ট, যারা না বুঝে মনে করছে আমাদের আর কিছু করার নাই, এখন ইসলাম বিরোধিতা আমার একমাত্র কাজ। যেহেতু আমাদের কিছু করার নাই আমরা কী প্রতিষ্ঠা করব? সোসালিজম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। কমিউনিজম সম্ভব না। তাহলে আমরা একটা কাজ নিলাম ইসলাম বিরোধিতা করার। তাদের যে ব্যর্থতা সেটা তো ঠিক, কিন্তু ব্যর্থতা তারা মানতে পারছে না। তাদের উচিত ছিল ইসলামাকে বিচার করা। বিচার করে যদি এটা গ্রহণযোগ্য হয় গ্রহণ করা। কিন্তু সেই বিচার তারা করতে পারছে না। অন্ধ বিদ্বেষ দ্বারা তারা পরিচালিত। সেই পরাজয় তারা মানতে পারছে না।

ইসলাম বলে মুনকার গ্রহণ করো না। শিরক আর ফায়েশা গ্রহণ করো না। এই তিনটা জিনিসকে বর্জন না করে আমরা অন্য কিছু নিতেও পারি সাবধানতার সঙ্গে। যদিও নেয়া কোনো বিজয়ী জাতির পরিচয় না। বিজয়ী জাতি নিজে থেকে ইনোভেট করে। ভারত থেকে যে কালচারটা আসছে তার অর্ধেকটা হচ্ছে শিরক ভিত্তিক আর অর্ধেকটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন, বোম্বে হয়ে আসছে। এই দুইটা আমাদের মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অবস্থাটা এরকম যে ওরা জিততে পারছে না। কিন্তু আমরাও জিততে পারছি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে আমি বিশ্বব্যাপী যে ফেনমেনা দেখছি তা হলো ইসলামের প্রচার প্রসার বাড়ছে। এমনকি বাংলাদেশেও আমি দেখছি ইসলামের প্রচার প্রসার বাড়ছে। এটা আলটিমেটলি উইন করে যাবে। লেফটের ভিত্তিটা দুর্বল। পজেটিভ কোনো ভিত্তি নাই। লা ইলাহা শুধু চলে না ইল্লাল্লাহ ছাড়া। ওদের শুধু লা ইলাহা আছে, লা ইসলাম আছে। কিন্তু তার পরিবর্তে কিছু নাই। সেকুলারিজম কোনো পজেটিভ আইডিয়া নয়। এটা বলে ধর্ম থাকবে না রাষ্ট্রে। ডেমোক্রেসি ইসলামেও আছে। স্টাইলে সামান্য কিছু বেশ কম হতে পারে। আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে জিতে যাবে ইসলামিস্টরা যদি তারা অনেকটা তিউনিসিয়া মিসরের মতো বুদ্ধিমান হয়।

সময় একটা বিষয় চলে যায়। আমাদের জীবনে মনে হয় যে অনেক সময় চলে গেছে। রাসূল (স) এর পরে ইতিহাসে চৌদ্দশ বছর চলে গেছে। তাদের সাকসেস এটুকু সাতচল্লিশের পরে এখানে প্রধানত মুসলিম আইডেন্টিটি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে একটা তীব্র অন্ধ জাতীয়তাবাদ চলে আসল। সেটা আমাদের মুসলিমত্ব কমিয়ে দিল। কমিউনিস্টদের সফলতা হচ্ছে এখানে যে তারা আমাদের মুসলিমত্ব ভুলাতে পারছে। কমাতে পারছে। তবে এখন তাদের এই প্রচেষ্টা থমকে গেছে এ কারণে যে ইসলামিস্টরা আবার কমবেশি জেগে উঠেছে। তাদের মধ্যে একটা ছোট হলেও ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ তৈরি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপীই ইন্টারন্যাশনাল ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপের প্রভাব পড়ছে।

লেখক : সাবেক সচীব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.pathagar.com

ঈমানের জাগরণ ও শাহাদাতের উজ্জীবন

সূচনা

মিল্লাতে ইসলামীর পুনঃ জাগরণের আন্দোলনে যারা সক্রিয় বা যারা সামান্যতম অনুভূতিও রাখেন তাদেরকে ঈমান ও শাহাদাত এ দুটি শব্দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হবে। এ দুটি শব্দের বিন্দুর মধ্যে রয়েছে দুটি সিন্ধু। একটি দৃশ্য আর একটি অদৃশ্য। একটি কাণ্ড আর একটি মূল। ঈমান যদি রূহ হয় তবে বলা যায় শাহাদাত উহার দেহ। আমার কাছে মনে হয় ঈমানের জাগরণ ও শাহাদাতের উজ্জীবন এর মধ্যেই মুসলমান উম্মাহর জীবন নিহিত আছে। আলোচিত প্রবন্ধে এ বিষয়ে আমি আলোকপাত করার ইচ্ছা পোষণ করছি আর সাহায্য কামনা করছি ঐ প্রভুর নিকট যার হাতে রয়েছে জীবন ও মরণের বাগডোর। এবার আমি আলোচনায় যেতে চাই- ঈমান কী আর উহার দাবি কী এবং সে দাবি পূরণে আমাদের করণীয় কী হওয়া উচিত?

ঈমানের পরিচয়

ঈমান হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়, গোটা ইসলামের প্রাসাদ এ ঈমানের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তামাম পয়গম্বরদেরও দাওয়াতের মূল জিনিস-ঈমান। হে প্রভু আমরা শুনলাম, তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে একজন আহবানকারী ঈমানের দিকে আহবান করছে। ঈমান একটি জীবন্ত বিষয়। এর হ্রাস বৃদ্ধি, সুস্থতা অসুস্থতা, পছন্দ অপছন্দ এমনকি জীবন মৃত্যু রয়েছে। ইহা মুমিনের গোটা জীবন ও জীবনের সব কিছুর নিয়ামক শক্তি। যে বিশ্বাস গোটা জীবনের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না ইহাকে ঈমান নামে অভিহিত করা জীবনকে মরণ আর

www.pathagar.com

মরণকে জীবন নামে ডাকার মতই অসত্য। এ ঈমান যেন পবিত্র সে বিশাল বৃক্ষ যার শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে সৃষ্টির অতল তলে, তার বিস্তৃত প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বেষ্টন করে রেখেছে মহা আকাশের মহাশূন্যতাকে।

আল্লাহ সোবহানুতায়ালা বলেন

আপনি লক্ষ্য করবেন, আল্লাহ তায়ালা বর্ণিত দৃষ্টান্তের প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি মুহূর্ত ঈমানের হাতে বন্দী। ইহাই আজাদির জামানত। ঈমানের নিকট আত্মসমর্পণকারীদেরকে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোন শক্তির নিকট আর আত্মসমর্পণ করার প্রয়োজন নেই। ঈমান তাদের হৃদয়ে জাগ্রত করে দুর্নিবার এক শক্তির। আকাশ তাদের পদ চুম্বন করে, জমিন তাদেরকে কুর্নিশ করে। তাদের জন্যে নেই কোন দুঃখ বেদনা, নিরাশা হতাশা, পরাজয় ও গ্লানি। বেদনার অনলকুণ্ডে তাদের জন্যে রয়েছে সুখের জান্নাত। অতলান্ত সাগরের তলদেশে অবস্থিত জলচরের পেটের গহিন অন্ধকারে বন্দী মু'মীনের জন্যর ঈমান এনেছে আশার নূর। ওহুদের কঠিন রণ প্রান্তরে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় ৭০ জন মুজাহিদের লাশ সামনে নিয়ে আহত, রক্তাক্ত, রণক্লান্ত ও অশ্রুসিক্ত রাসূলে আরবী (সা) কে আল্লাহ তায়ালা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- মু'মিনেরা অপরাজেয়।

তোমরা দুর্বল হয়ো না, হতাশ হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু'মীন হও। সূরা আলে ইমরান- ১৩৮। এই ঈমানই হচ্ছে সে সম্পদ ও প্রাচুর্য যার কাছে সমগ্র পৃথিবী এক কড়ির মূল্যও বহন করে না। একজন নাককাটা, কুৎসিত কৃতদাসও যদি ঈমানের দৌলত গ্রহণ করে মু'মীন হয় তবে সারা দুনিয়ায় খ্যাত প্রতাপশালী একজন মুশরেকের চাইতে বেশি মূল্য বহন করে। অর্থাৎ একজন গোলাম মুমীনও দুনিয়াখ্যাত একজন মুশরেকের চাইতে শ্রেষ্ঠ (বাকারা) ইহা গায়েবের বিষয়। দৃশ্যমান জগতের ভাল ও মন্দ করার ক্ষমতার ওপর অবিশ্বাস ও সবকিছুর একমাত্র ক্ষমতা ঐ আল্লাহর ওপর যিনি গায়েব। মুমিনেরা এ গায়েবের ওপর ঈমান আনে। (সূরা বাকারা-০২)।

ঈমানের অবস্থান

মুখে কতগুলি বুলি আওড়ানোর নাম ঈমান নয়। তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাত এর স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলো হৃদয়ে গেঁথে নেয়ার নাম। পাথর কেটে যেভাবে নাম খোদায় করে, হৃদয়ের মধ্যে ঈমানিয়াতের বিষয়কে সেভাবে ধারণ করতে হবে। তাইত প্রথম যুগের মু'মীনদেরকে তপ্ত মরুতে শুয়ে রাখা হয়েছে; উত্তপ্ত তেলের কড়াইয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তাদের লাশ শত টুকরায় বিভক্ত করা হয়েছে কিন্তু তাদের ক্বালবের জমিনে ঈমান দাঁড়িয়েছিল পাহাড়ের মত। ঈমান সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা বলছে আমরা ঈমান এনেছি। না তোমরা ঈমান আননি বরং তোমরা ঈমানের দিকে ঝুঁকেছ বলা যাবে; এখনও ঈমান তোমাদের হৃদয়ে গেঁথে যায়নি।

ঈমানের দাবি

ঈমানের এ বিশাল মহী যাদের হৃদয়ে রয়েছে গ্রোথিত সে সকল মু'মীনদের নিকট এর দাবি রয়েছে অনেক অনেক। এর মধ্যে থেকে দু'একটি দাবি আলোচনায় আনতে চাই।

www.pathagar.com

এস্তেক্বামত

একটি ঈমানের দাবি হলো এস্তেক্বামত বা দৃঢ়তা। ঈমান ঘোষণা দেয়ার পর মু'মীনকে ঈমানের ময়দানে দাঁড়াতে হবে জীবন মরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে। কোন আঘাত, নির্যাতন, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, হতাশা নিরাশা, আলো আঁধার, সুখ-দুখ, হাসি-কান্না, জেল-জুলুম, জীবন মরণ কোন কিছুই তাদেরকে ঈমান থেকে এক চুল হেলাতে পারবে না। তারা হবে এতই দৃঢ় ও আপসহীন যে এদের মাথার ওপর করাত টানা যাবে, হাড্ডি থেকে গোশত তুলে নেয়া যেতে পারে, এমনকি এদের জীবন্তদেহ থেকে এক একটি অঙ্গ খুলে ফেলা যাবে কিন্তু যাবে না এদের কলিজা থেকে ঈমানের মানিক বের করে আনা। নবীজি (সা) বলেন, ঈমানের কঠিন ময়দানে তোমরা ঐ দৃঢ়তার সাথে দাঁড়াও করাতের নিচে মাথা রাখার পর এবং শূলিতে চড়িয়ে দেয়ার সময় ও ঈসা (আ) এর সাথীরা (হাওয়ারিগণ) যে এস্তেক্বামত ও দৃঢ়তার নজির রেখেছেন।

তোমরা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) এর সাথীদের পথ গ্রহণ কর যাদেরকে করাত দিয়ে চিরা হয়েছে আর শূলে চড়ানো হয়েছে।

শাহাদাত ফরজে আইন

মু'মীনদের নিকট ঈমানের অপরিহার্য দাবি শাহাদাত। শাহাদাত এ শব্দটি অতি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ সাক্ষ্যদান, হাজির হওয়া কসম করা। ইসলাম এ শব্দটি তাদের জন্য প্রয়োগ করে যারা ন্যায়ের জন্য জীবন দান করে। একজন মু'মীনের সমগ্র জীবনের প্রকাশ ও জীবনাচরণ হবে ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত। তার জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বিষয়; হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ, সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক লেনদেন, রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি, সাংস্কৃতিক রুচিবোধও মননশীলতা, অবসর ও বিনোদন, শয়ন ও জাগরণ সবকিছুই ঈমানের শাহাদাত ঘোষণা দেবে। মু'মীনের জীবন চলার প্রতিটি কদম, হাতের প্রতিটি সম্পর্শ, চাহনির প্রতিটি পলক, জিহবার প্রতিটি বুলি, লিখনীর প্রতিটি আঁচড়, ব্যয়ের প্রতিটি কপর্দক, সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত, রক্তের প্রতিটি ফোঁটা এবং হৃদয়ের প্রতিটি অনুভূতি ঈমানের জন্য নিবেদিত।

ঈমানের দাবিতে বসে থাকা নয় উহার দাবি কোরবানি, উহার দাবি শাহাদাতের হক্ব। ঈমানের ময়দানে শাহাদাত বরণ করা মু'মীনদেও ওপর ফরজে আইন।

আল্লাহ বলেন, হে মু'মীনগণ। তোমরা আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষ্য হযে দাঁড়াও। সমগ্র জীবনব্যাপী শাহাদাতের এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। উহার জন্য জীবনের সহায় সম্পদ সবকিছুকে লুটিয়ে দিতে হবে।

শাহাদাত নবুওয়তের দায়িত্ব

এ শাহাদাত নবুওয়তের অন্যতম দায়িত্ব। নবীগণকেও এ দায়িত্বের ওপর কিয়ামতের আদালতে প্রশ্ন করা হবে। তাদেরকে শাহাদাত দানের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, হে নবী আমি আপনাকে পাঠিয়েছি শাহাদতের দায়িত্ব দিয়ে। সমগ্র নবুওয়তি জীবন তিনি শাহাদাতের ময়দানে তিল তিল করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

হাজ্জাতুল বিদার আখেরি ভাষণে সোয়া লক্ষ সাহাবীকে নবীজি (সা) প্রশ্ন রাখেন, তোমরা শাহাদাত দাও আমি দ্বীনের আমানত পৌছে দিয়েছি কিনা? তারা বলেন, নিশ্চয়ই আমরা সাক্ষী দিচ্ছি আপনি রিসালাতের পয়গাম পৌছে দিয়েছেন। আপনি উম্মতের নিকট উপদেশ বানী পৌছিয়েছেন। আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনিই গোমরাহির পর্দা ছিন্ন করেছেন, আপনি আমানতকে যথার্থভাবে পৌছে দিয়েছেন।

শাহাদাত উম্মতে মুহাম্মদীর (সা) দায়িত্ব

শাহাদাত উম্মতে মুহাম্মদীর (সা) জাতীয় দায়িত্ব। মধ্যমপন্থী এ উম্মত মানবজাতির জন্যে শাহেদ হবে আর আখেরি রাসূল (সা) তাদের ওপর শাহেদ। নবীজি (সা) তোমাদের জন্যে সাক্ষ্য আর তোমরা সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্যে শাহেদ হও। কোরআনের মাধ্যমে আরোপিত এ দায়িত্ব পালনে গাফিলতির কোন সুযোগ নেই। জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের মর্যাদা শাহাদাতে হক্বের সাথে সম্পৃক্ত। জাতি হিসেবে আমাদের এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে প্রয়োজনে বাতিলের বিরুদ্ধে হক্বের জন্য আমাদের শক্তি, সম্পদ, যোগ্যতা, আমাদের জবান ও কলম, আমাদের সন্তান ও প্রিয় বস্তুনিচয় এমনকি আমাদের শিরায় প্রবাহিত সমস্ত রক্ত শাহাদাতের এ ময়দানে উজাড় করে দেব। তাদের গোলা বারুদ, মারণাস্ত্র, জেল, জুলুম, ফাঁসির মঞ্চ যেন আমাদের ভড়কে দিতে না পারে।

শাহাদাতের কঠিন ময়দান

ইবাদাতের ময়দানে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনুপস্থিত হলেও শাহাদাতের ময়দানে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্য। ব্যক্তিগত জীবনের ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতা কুফরীয় শক্তি সব সময় মেনে নেবে কিন্তু ইবাদাতের দাওয়াত তারা বরদাস্ত করবে না। মানবজাতির ইতিহাস এ সাক্ষ্য বহন করছে যে, সমস্ত সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে শাহাদতের ময়দানে। তামাম পয়গম্বর মজলুম হয়েছেন এ ময়দানে। এ ময়দানেই নবীদের পাথর মারা হয়েছে। জীবন্ত পয়গম্বরকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে। হাত-পা বেঁধে ফেলে দেয়া হয়েছে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মহা সাগরে' নির্মমভাবে নিক্ষেপ করা হয়েছে ধাউ ধাউ আগুনে। পৈতৃক ভিটামাটি থেকে জনমের তরে মুহাজির করা হয়েছে। শত শত পয়গম্বরকে কতল করা হয়েছে এ জমিনে। এ এক নিষ্ঠুর বেরহম ময়দান। এ মনযিল অতিক্রম করে যেতে হবে বিজয়ের শেষ মনযিলে। আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা রয়েছে মজলুমদের সাথে যারা আমার কারণে মজলুম হয়েছে স্বীয় দেশে, একদিন তারাই হবে সে জমিনের উত্তরাধিকারী আর নেতৃত্ব পাবে তাদের হাতে।

শাহাদাতাদের ময়দানে ব্যর্থতা

আজকের বিশ্বের চলমান জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় আমরা যদি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করি, তবে কিয়ামতের কঠিন আদালতে আল্লাহ তায়ালার সামনে আমাদের জওয়াব দেয়ার কিছুই থাকবে না। অপর দিকে আমাদের বক্তব্য, আমাদের লিখনি, আমাদের আমল, আমাদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড যদি ঈমানের স্থলে কুফরির সাক্ষ্য প্রদান করে তবে আমরা কিয়ামতের দিন জালেম বলে সাব্যস্ত হব।

নবীজি (সা) আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে বাদি হবেন, নবীজি বলবেনা- হে প্রভু। আমার উম্মাতের লোকেরা কোরআন ছেড়ে দিয়েছিল। আর গ্রহণ করেছিল অন্য জিনিস।

www.pathagar.com

নবীজি (সা) সাহাবীদের বলেন, এমন একদিন আসবে যেদিন তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে, তোমাদের জৌলুস অন্যদের চাইতে বেশি হবে কিন্তু এরপরও তোমরা হয়ে যাবে দুনিয়ার স্রোতে ভাসমান ফেনা। কেউ তোমাদের মূল্য দেবে না, তোমরা দুনিয়ায় মূল্যহীন ও অসহায় হয়ে যাবে। ক্ষুধার্ত নেকড়ে যেমন বকরীর পালের ওপর হামলা করে তোমাদের ওপর দুনিয়ার বাতেলরা এভাবেই হামলা করবে। সাহাবীরা এর কারণ জানতে চাইলে নবীজি (সা) বলেন:

নবীয়ে করীম (সা) বলেন, দুনিয়ার মায়া ও মৃত্যুর ভয় এ দু'টি জিনিস উম্মতের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ

এক. **দুনিয়ার মায়া :** পৃথিবী অতি মায়াময় ও ছলনাময়। আমাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী, পরিজন, সন্তান-সন্ততি, ব্যবসা বাণিজ্য, সাজানো সংসার খোদার রাহে দায়িত্ব পালনে এক কঠিন বাধা। এগুলোর সাথে আমাদের জীবন চলার সম্পর্ক থাকবে কিন্তু খোদার দ্বীনের চাইতে এগুলোকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। মুসলমানদের কাছে আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা সবকিছুর চাইতে বেশি। আল্লাহ তাযালা সাবধান করে বলেছেন সন্তান ও মালের মোহাব্বত যেন দ্বীনের পথ থেকে তোমাদের গাফেল করতে পারে। এগুলো পরীক্ষার সামগ্রী। নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তান ও মাল সম্পদ পরীক্ষার বস্তু, আল্লাহর নিকট রয়েছে মহান সাফল্য।

দুই. **মরণের ভয় :** মৃত্যু সৃষ্টির অবধারিত রিমন। হাজারো আয়োজনে যেমন এর আগমন ঘটে না আবার হাজারো প্রতিরোধেও এর আগমন ঠেকানো যায় না। ইহা আল্লাহর সিদ্ধান্তের নাম। একে ঠেকানো এক অসম্ভব ব্যাপার। তারপরও সমগ্র সৃষ্টির কলিজার ভেতর এ মওতের ভয় বাসা বেঁধে আছে যুগ যুগ ধরে। জীবনের জন্যে মরণ একবার আসবেই। মৃত্যুর ভয়ে ভীতু জাতিরা মানব ইতিহাসে কোন অবদান রাখেনি। পৃথিবীর ইতিহাসতো সাহসীদের ইতিহাস। যারা মৃত্যুর টুঁটি চেপে ধরেছে, মরণের মিছিলে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে আর শ্লোগান দিয়েছে আল্লাহু আকবর, জীবন মৃত্যুর চাইতে আল্লাহ মহান। জীবন মৃত্যু সব কিছু স্পষ্ট কিতাবে লেখা রয়েছে এক চুলও অগ্রসর হওয়া অকল্পনীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, সবকিছুর ফয়সালা লেখা রয়েছে।

শহীদেরা অমর

শাহাদাতের পথে মরণত জীবনেরই আরেক নাম, উহা জীবনের চাইতেও রোমাঞ্চকর। যে মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে হায়াতের সমুদ্র। শহীদেরা অমর ও চিরঞ্জীব, তারা কখনও মরে না।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা তাদের মৃত বলো না যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে বরং তারা জীবিত; তাদের জন্যে প্রভুর কাছে রয়েছে জান্নাতের রিযিক। শাহাদাতের চূড়ান্ত সাক্ষ্য দিয়েছে শহীদেরা। তারা শাহাদাতের ময়দানে আপসহীন। জালেমেরা তাদর হাত কেটেছে, পা কেটেছে, কর্তিত অঙ্গ নিয়ে মিছিল করেছে। অথচ শহীদের খণ্ডিত হাত বলছিল কাবার মালিকের কসম। আমি কামিয়াব হয়েছি। আমি মরণের সাথেও আপস করিনি।

তাদের রক্তের শেষ বিন্দু বয়ে গেছে খোদার রাহে। তাদের জবানের শেষ আওয়াজ উচ্চারণ করেছে খোদার নামে। তাদের রক্তাক্ত লাশ বাতিলের অগ্রগতির পথে হিমালয়ের বাধা।

শান্তির মিনার
www.pathagar.com

তাদের রক্তের প্রতিটি কাতরা দ্বীনের দুশমনদের জন্য এক একটি রক্ত বোমা। নিজেদের স্বপ্ন ও ক্যারিয়ারের বিধ্বস্ত জমিনে তারা উড়িয়ে দিয়েছে দ্বীনের কেতন। বিভ্রান্ত দিশেহারা ও অচেতন কর্মীদের জীবনে তারা ফুঁকে দিয়েছে চেতনার আগুন। ঘুমন্ত মুসলিম জাতির জীবনে তারা আজ ভোরের নকিব। জাতির বধির কর্ণে তারা শুনিয়ে দিয়েছে ইসরাফিলের বজ্র নিনাদ। জাতীয় জীবনের নিরাশার অন্ধকারে তারা আকাশের ধ্রুবতারা। দ্বীনের কঠিন ও দুর্বহ ময়দানে অনেকেই যখন পালিয়ে যাবে তখন তাঁরাই দাঁড়িয়ে থাকবে বিপ্লবের ঝাণ্ডা হাতে। তারা কোন দিন ক্লান্ত হবে না, নিষ্ক্রিয় হবে না আর পেশ করবে না অজুহাতের ফিরিস্তি। তারাই দ্বীনি আন্দোলনের অমর কর্মী দল। এরাই দুর্গমতার বাধা উপেক্ষা করে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কাল থেকে কালান্তরে। একটি আন্দোলনে যখন এদের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন আন্দোলনের জীবনীশক্তিও বেড়ে যায়।

উপসংহার

বিংশ শতকের সভ্যতার কর্মক্লান্ত দিবাকর আজ যখন পাশ্চাত্যের আকাশে বিদায়ের পটে, একবিংশ শতকের সুবেহ সাদেক তখন প্রাচ্যের আকাশে হাতছানি দিচ্ছে । আমরা বিশ্ববাসী ঔৎসুক্য নয়নে মহাসাগরে বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য অবলোকন করছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশাল Titanic সব কিছুসহ কালের মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান। জাহাজের Captain দের একজন T.S.Eliot ঘোষণা দিয়েছে এখানে আর দাঁড়াবার, বসবাস কিংবা বিশ্রাম নেয়ার এক মুহূর্ত অবকাশ নেয়ার এক মুহূর্ত অবকাশ নেই। Here one can neither বিশ্ববাসীকে জরুরি Message দিয়ে তিনি বলেন Pray for us now, we are at the time of our death আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, বাঁচাও আমাদেরকে, আমরা মৃত্যু দ্বারে। কে তাদেরকে বাঁচাবে, নেশা ও যৌনাচারে আসক্ত এদের রক্তে রয়েছে AIDS এর ভয়ংকর জীবাণু। এদের আপনজনেরাও আজ তাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। মুসলমানদেরকে আজ সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভোগবাদ ও যৌনাচারের এ ভয়াল সমুদ্র থেকে মানবতাকে উদ্ধার করতে হবে। আর তাদের জন্যে প্রয়োজন দুটো জিনিস ঈমানের জাগরণ ও শাহাদাতের উজ্জীবন। মানবতার এ উদ্ধার কর্মীদল মুসলিম তরুণদেরকে রাসূলে পাক (সা) এর দুনিয়া কাঁপানো সাহাবায়ে কিরাম (রা) এর মত সে ঘোষণা উচ্চারণ করতে হবে যা আল্লাহ তায়ালা কোরআনে পাকে উল্লেখ করেন

হে প্রভু। আমরা তোমার ওপর ঈমান আনলাম আর শহীদদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে দাও। আমিন।

লেখক : বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক

www.pathagar.com

২৮ অক্টোবর:
ইসলামী আন্দোলনের অনিবার্য বাস্তবতা

প্রথম কথা

জীবনধারার দু'টি পরিক্রমা, একটি দুনিয়ামুখী অন্যটি পরকালমুখী। দুনিয়ামুখিতা আনন্দ-উল্লাস, হাসি-ঠাট্টা আর চাওয়া-পাওয়ায় ভরপুর। বিপরীতে পরকালমুখিতা মানেই দুনিয়াটা তার জন্য কারাগার। আর কারাগার তো হচ্ছে বাধ্য-বাধকতা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নিয়ম-কানুন মেনে চলার প্রতিফলন। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই আমাদেরকে ভাবতে হবে আমি কোন পথের যাত্রী হওয়ার জন্য প্রস্তুত। প্রস্তুতি ছাড়া দুনিয়ামুখী জীবন কোনভাবে সফল হলেও হতে পারে কিন্তু পরকালীন জীবনের আদলে পথ চলা প্রস্তুতি ছাড়া সফলতা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। আবেগের বশবর্তী হয়ে পথ চলা শুরু করা গেলেও কিছুটা পথ পেরিয়ে থমকে যাওয়াটা প্রায় নিশ্চিত। কারণ পরকালমুখী জীবনের জন্য আবেগ যতখানি প্রয়োজন তার চেয়ে বাস্তবকে উপলব্ধি করা একরকম জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ। আর ইসলামী আন্দোলন সেই আবেগ আর বাস্তবতার সমন্বয়ে নির্মিত এক হেরার রাজপথের নাম। নাম যেমন রাজপথ ঠিক তেমনি সেই পথে চলতে চাই চূড়ান্ত হিম্মত। "আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে, কেন বেছে নিলে এই পথ, কেন বেছে নিলে এই বিপদ, জবাবে তখন বলি, মৃদু হেসে যাই চলি, বুকে মোর আছে হিম্মত"। ২৮ অক্টোবর ইসলামী আন্দোলনের হেরার রাজপথের এক একটি স্পিড ব্রেকার। শক্ত হাতে অতিক্রম করতে পারলে সামনে আবার মসৃণ দীর্ঘ পথ। কোন অভিজ্ঞ চালক অথবা পথযাত্রী এই স্পিড ব্রেকারে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে? হ্যাঁ করে যিনি উচ্ছৃঙ্খল, লাগামহীন, নিজের এবং অন্যের জীবন সম্পর্কে যার সচেতনতার অভাব অপরিমেয়। সাময়িক আনন্দ আর উত্তেজনা উপভোগ করাই যার লক্ষ্য তার জন্য এই ২৮ অক্টোবর নামক স্পিড ব্রেকারগুলো বিরক্তি আর হতাশার উদ্রেক করে। বিবেকবান সচেতন আর কাঙ্খিত মনজিলে পৌঁছার দৃপ্ত

www.pathagar.com

শপথে বলীয়ান মানুষ তা করে না, করতে পারে না। আমরা তো সেই কাংখিত মনজিলে পৌছার অদম্য স্পৃহায় মগ্ন এক দল দৃপ্ত প্রত্যয়ী যাত্রী। যারা এখন প্রতেক্যটি দিন এক একটি ২৮ অক্টোবর অতিক্রম করছে।

২৮ অক্টোবর ২০০৬

সকাল ৭টার কিছু আগে স্লিপার পায়ে খুবই সাদামাটা অবস্থায় ৪৮/১-এ, পুরানা পল্টনের কেন্দ্রীয় অফিসে পৌছে যাই কলাবাগানের বাসা থেকে। নাস্তা করতে গিয়ে সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রদ্ধেয় মজিবুর রহমান মঞ্জু ভাইকে পেয়ে বিকেলের সমাবেশ সম্পর্কে প্রস্তুতি নিয়ে কিছুটা রুটিন আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সমাবেশকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের অঘটন ঘটতে পারে তখন পর্যন্তও মাথায় এমন কিছু আসেনি। হঠাৎ কেন্দ্রীয় অফিসের বাইরে প্রচণ্ড শোরগোল। একই সাথে মোবাইলে ফোন। পল্টন মোড়ে সমাবেশের মঞ্চ তৈরির কাজে নিয়োজিত ভাইদের উপর হামলা করেছে লগি-বৈঠাধারী আওয়ামীলীগের সাথে ১৪ দলের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা। বাইরে বের হয়ে দেওয়ান মঞ্জিলের কাছে যেতেই অসংখ্য আহত রক্তাক্ত ভাইদের নিয়ে আসতে দেখে খানিকটা হতভম্ব হয়ে সামনে এগিয়ে পল্টন মোড় পর্যন্ত পৌছে গেলাম। ততক্ষণে পুরো পল্টন এলাকা রণক্ষেত্র। আমাদের নিরস্ত্র ভাইয়েরা আওয়ামী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। জীবন বাজি রেখে সমাবেশস্থল, ঢাকা মহানগরী জামায়াত অফিস এবং ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যালয় রক্ষায় সম্পূর্ণ খালি হাতে গুলি, বোমা, চাইনিজ কুড়াল, রামদা, হকিস্টিক সর্বোপরি উদ্যত লগি-বৈঠার সামনে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছেন। অদৃশ্য কারণে প্রশাসন যেন সম্পূর্ণ নির্বিকার, হতবিহবল এক দর্শকমাত্র। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো আমাদের নিরস্ত্র ভাইদের ওপর মুহুর্মুহু গুলি আর টিয়ার সেল নিক্ষেপ করছে। সে যেন এক শিষ্টের দমন, আর দুষ্টের লালন। মুহূর্তেই সংবাদ এলো প্রিয় মুজাহিদের শাহাদাতের। বুঝতে বাকি রইল না শাহাদাতের মিছিল আরো দীর্ঘায়িত হবে হয়ত। হয়েছিলও তাই। সেদিন ২৮ অক্টোবর আমরা হারিয়েছি অনেক কিছু কিন্তু আমি আজও বিশ্বাস করি আমরা পেয়েছি তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। সেদিন আমার ধারণা ও বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হয়েছে যে ইসলামী আন্দোলনে আমাদের হারাবার কিছু নেই। মুজাহিদ, শিপন, মাসুম, আর জসীম ভাইয়েরা শহীদ হয়েছেন আর আওয়ামীলীগের আদর্শিক রাজনীতির ঐতিহাসিক অপমৃত্যু ঘটেছে। পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ আওয়ামীলীগের অমানুষিক লগি-বৈঠার সশস্ত্র হামলা আর লাশের উপর হৃদয়বিদারক নৃত্যের পাশাবিকতার ছবি হৃদয়ে ধারণ করে ঘৃণা প্রকাশ করতেই থাকবে।

আল্লাহর সাহায্য দেখেছি

আওয়ামীলীগ পরিকল্পিতভাবে সেদিন জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে সমূলে বিনাশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা তো ভিন্ন। হাজার-হাজার সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সামনে শুধু নিরস্ত্রই নয় কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদের মোকাবেলা করাটা নিছক আমাদের কোন কৃতিত্বের বিষয় ছিল না। সমাবেশ বিকেলে থাকায় আমাদের শুধু মঞ্চসহ অন্যান্য প্রস্তুতির সাথে সম্পৃক্ত ভাইয়েরাই পল্টন এসে পৌছেছেন। বাকি ভাইয়েরা আসার পথে ছিলেন। অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন আসার পথে। যা ছিল আওয়ামীলীগের সম্পূর্ণ পরিকল্পিত হামলা। সকল হামলা উপেক্ষা করে সমাবেশের জন্য ভাইয়েরা পল্টনে এসে জমায়েত হতে থাকেন। আর সাথে সমান ভাবে অব্যাহত থাকে ১৪ দলের সন্ত্রাসী হামলা। বুলেট শরীরে লেগে নিচে পড়ে যাওয়ার পর তা সংগ্রহ করে রেখে আমাকে দেখিয়েছেন অনেকেই। নিজের চোখকে বিশ্বাস করানো যাচ্ছিল না কোনভাবেই। ঠিক পায়ের কাছে শক্তিশালী বোমার

www.pathagar.com

বিস্ফোরণ ঘটলেও আমাদের ভাইয়েরা অনেকাংশই থেকে গেছেন অক্ষত। তীব্র প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন সামান্য ইটের টুকরা আর পথে কুড়িয়ে পাওয়া লাঠি দিয়ে। যেন কোরআনের সেই অমিয় বাণী - 'অমা রমাইতা ইজ রমাইতা, অলা কিন্নাল্লহা রমা'। আমরা যা ক্ষুদ্র কিছু দিয়ে প্রতিরোধ করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন তা এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করেছেন শত্রু পক্ষের উপর। আল্লাহর্ বান্দার জন্য চিরন্তন নিয়মও তাই। আমাদের চেষ্টা যেখানে শেষ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য তো সেখান থেকেই শুরু। আল্লাহর সেই সাহায্যই আমাদের কে সেদিন সমাবেশ সফল করতে সমাগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। আওয়ামীলীগ সেদিন চেয়েছিল আমীরে জামায়াত, তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের সফল কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল চারদলীয় জোট সরকারের তৎকালীন সফল সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদসহ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে হত্যা করতে। সমাবেশ পন্ড করে মঞ্চ সহ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিল শিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও জামায়াতের ঢাকা মহানগরী কার্যালয়। আমাদের ভাইয়েরা জীবন দিয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন, হাত, পা, চোখ হারিয়েছেন, বরণ করেছেন অনেকেই চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ব, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দেননি সন্ত্রাসীদের হাতে। যা আমাদের জন্য চিরদিন উৎসাহ আর অনুপ্রেরণার বাতিঘর হয়ে থাকবে। সবচেয়ে অবাক বিস্ময় লক্ষ করেছি যখন সমাবেশে আমীরে জামায়াত তার প্রধান অতিথির বক্তব্য শুরু করেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সর্বশেষ মরণকামড় দিয়েছিল ১৪ দলের অস্ত্রধারী ক্যাডাররা। মঞ্চের ঠিক সামনে নির্মাণাধীন একটি ভবনের ৭ম কি ৮ম তলা থেকে বৃষ্টির মত গুলি আর বোমা বাজি শুরু করে দিয়েছিল মঞ্চ টার্গেট করে। গা শিউরে ওঠার মত ব্যাপার যে, আমীরে জামায়াত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থেকে এবং কোন রকম উত্তেজনা ছাড়াই নিয়মমত বক্তব্য শেষ করেছেন তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে। তার সেই সংগৃহীত বক্তব্য আজও কেউ শুনলে অনুধাবন করতে পারবেন, এক দলের নেত্রী যেখানে লগি-বৈঠা দিয়ে হামলার নির্দেশ দেন সেখানে জামায়াতে ইসলামীর মত আদর্শিক সংগঠনের অভিভাবক তার নেতাকর্মীদেরকে কিভাবে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলার সাহস জোগান। বৃষ্টির মত বোমা আর গুলির জবাবে আমাদের ভাইয়েরা আল্লাহর উপর ভরসা করে নারায়ে তাকবির স্লোগান দিয়ে সাহসিকতার সাথে যেভাবে প্রতিরোধ করেছিল তা আমাদের কে যেন বদর, ওহুদ, তাবুক আর খন্দকের সেই যুদ্ধের কথাই মনে করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় আল্লাহর পথে বান্দাহর জন্য তার অবারিত সাহায্যের কথা।

২৮ অক্টোবর আজকের প্রেক্ষিত

একটি উপলব্ধি খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন মনে করি যে, এই ২৮ অক্টোবরটি ইসলামী আন্দোলনের শুরুও নয়, শেষও নয়। এ রকম ২৮ অক্টোবর এর আগেও এসেছে বর্তমানেও আছে হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে বলে ধরে নিতে হবে। এ চরম সত্যটি আমরা যেন বিস্মৃত না হই। এ তারিখটি শুধুমাত্র একটি দিন নয় কিংবা নয় শুধু ঘটনামাত্র। এটি ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের অনিবার্য ধারাবাহিকতা। যে ধারাবাহিকতা থেকে আমরা আমাদেরকে কোনভাবেই আলাদা রাখতে পারি না। এ ধারাবাহিকতার সাথে আমাদের সম্পৃক্ততা ঈমানেরই অপরিহার্য দাবি। কখনও কখনও আমরা আমাদেরকে এই ধারাবাহিকতার সাথে সম্পৃক্ততাকে প্রথম কিংবা শেষ মনে করি যা কোনভাবেই কাম্য নয়। কারণ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে হযরত ইসমাইল (আ) তার কোরবানি পেশ করার সময় দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন " ইনশাআল্লাহু মাআস সবিরিন", "আমাকে ধৈর্যশীলদের সাথে

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত পাবেন"। কোনভাবেই এটা প্রকাশিত হয়নি যে ধৈর্যশীলদের মধ্যে আমিই প্রথম কিংবা আমিই শেষ। বরং বিনয়ীভাবে এটাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে আমি ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চাই। ইতঃপূর্বেও অনেক ধৈর্যশীল এরচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করেছেন, ভবিষ্যতেও হয়তো করবেন। যার মধ্যে কোন অহংবোধের প্রশ্নই ওঠে না, উঠতে পারেনা। আজকে তো আমরা প্রতিটি দিন এক একটি ২৮ অক্টোবরের মত করে পার করেছি। আমরা কেউ জানিনা কতটা পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে। তবে আমরা এটা নিশ্চিত জানি, রাত গভীর হয়েছে ফজরের আজান হবেই ইনশাআল্লাহ। রাজপথে যখন চলতে শুরু করেছি মনজিল আমাদের মিলবেই। শুধুমাত্র কাঁটা বিছানো আর কর্দমাক্ত পথ পাড়ি দিতে হবে শক্ত হাতে। পল্টন প্রান্তরে আমরা সে দিন তা প্রত্যক্ষ করেছি। দায়িত্বশীল ভাইয়েরা যেমন জনশক্তিকে সাথে নিয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন ঠিক তেমনি জনশক্তিকেও দেখেছি সশস্ত্র-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার সাথে সাথে সীসাঢালা প্রাচীরের মত দায়িত্বশীলদেরকে ঘিরে রাখতেন গুলি-টিয়ারশেল আর হায়েনাদের অতর্কিত হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য। সে দৃশ্য চোখে না দেখলে নিজেকেও বিশ্বাস করানো কঠিন হতো। কত জনকে ধাক্কা দিয়ে সামনে থেকে ফেলে দিয়েছি সে ভাইটি আবার উঠে দাঁড়িয়ে সামনে থেকে লড়াই করেছেন্। আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে চোখের পানি ঝরিয়ে বলতেন ভাই- আমার শরীর বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর কসম শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আপনাদর শরীরে একটা ইটের আঘাতও লাগতে দেব না। নিজেকে সামলাতে না পেরে আবেগভরা কণ্ঠে চোখের বাঁধ ভাঙ্গা স্রোত নিয়ে দু'হাত তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর আকাশের দিকে তুলে ফরিয়াদ করছিলাম, আল্লাহ যে আন্দোলনে তুমি এমন জানবাজ কর্মী দিয়েছো সেই আন্দোলনকে তুমি না চাইলে এই পৃথিবীর সর্বশক্তি মিলেও আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও নিস্তব্ধ-নিথর করতে পারবেনা ইনশাআল্লাহ। শুধু আফসোস সামনে থেকেও শামিল হলো শহীদের সারিতে, শামিল হলো পেছন থেকেও আমিই থেকে গেলাম আজও এই হতভাগা গোনাহগার।

ঐই যে বলেছিলাম না আজ তো ২৮ অক্টোবর নেই। কিন্তু থামেনিত শহীদের মিছিল। আমাদের সামনে থেকেই তো চলে গেল শহীদ মনসুর, শহীদ খলিল, শহীদ আবুল আল ইকবালসহ আরো শত শত ভাই। হাত, পা, চোখ হারিয়েও বুক উঁচু করে পথ চলে আমাদের কত পঙ্গুত্ব বরণ করা গর্বিত ভাইয়েরা। যেন কিছুই হয়নি তার। কত স্বাভাবিক আর উচ্ছল জীবনের অধিকারী তারা, হবেনইতো, হওয়ারইতো কথা। দুনিয়াতে থেকেই শরীরের অংশ আগাম পাঠিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর দরবারে জান্নাতুল ফেরদৌসে। এর চেয়ে সুখের, আনন্দের আর কি হতে পারে। ক্ষোভে-দুঃখে মাঝে মাঝে নিজেকে সামলাতে পারি না যখন এই সুঠাম দেহটাকে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াই। লজ্জায়, অপমানে, কষ্টে বুকটা ভেঙে যায় এই ভেবে যে, আমাদেরই সামনে থেকে কত ভাই শহীদ হলেন, গুলিবিদ্ধ হলেন, মারাত্মক আহত হলেন। কত ভাই সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার হলেন, শুধু কি তাই রিমান্ডের নামে নির্মম নির্যাতনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলায়ার হোসেন ভাইসহ জামায়ত এবং শিবিরের শত-শত ভাইকে পঙ্গু করে দেয়া হলো। দেশের ৬৮ টি কারাগারে যেখানে বন্দী থাকার কথা ২৯ হাজার, সেখানে জামায়াত-শিবিরের ভাইদের গ্রেফতার করে আজ তার সংখ্যা দাড়িয়েছে ৭১,০০০ হাজার। অর্থাৎ ধারণ ক্ষমতার প্রায় আড়াই গুণ বেশি। ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে কাটছে কারাগারে আটক ভাইদের জীবন। রাজনৈতিক নেতা, ভি.আই.পি বন্দী, ইসলামী চিন্তাবিদ, ও পেশাদার অপরাধীদের রাখা হচ্ছে একই সেলে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ধারণ ক্ষমতা মাত্র ২৬৮২ জন। অথচ সেখানে এখন বন্দীসংখ্যা সাড়ে

www.pathagar.com

৭ হাজারের (১৬-০১-১৪)। দেশের ৬৮টি কারাগারের মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার ও দুটি হাই সিকিউরিটি সেল। ৫৫টি বিভিন্ন জেলা সদরে রয়েছে ছোট-ছোট কারাগার। সে সব কারাগারেও এখন রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যাই বেশি। ৭১ হাজার বন্দীর অর্ধেকই জামায়াত-শিবির ও বিরোধী জোটের নিরপরাধ নেতা-কর্মী। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত কারাবন্দীদের অনুমোদিত ধারণক্ষমতা রয়েছে ৮৩ জনের। সেখানে বর্তমানে আছে ৯৮৯ জন। যা অনেকটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সিদ্ধান্তের শিকার।

২৮ অক্টোবর আমাদের করণীয়

ক. আমার কি ভূমিকা থাকার কথা ছিল, আমি কি ভূমিকা রেখেছি।

খ. আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এরকম ২৮ অক্টোবর একের পর এক আসছে, আরও হয়ত আসবে তার জন্য আমার প্রস্তুতি কতটুকু ঈমানের দাবি পূরণের জন্য।

গ. ২৮ অক্টোবরের মত কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনায় সফলতা কিংবা ব্যর্থতার চূড়ান্ত মাপকাঠি নির্ধারণ করার মানসিকতা পোষণ করা সমীচীন নয়। আমাদের চূড়ান্ত সফলতা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। সে ক্ষেত্রে আমার নিজের আন্তরিকতার পরিচ্ছন্ন পরিমাপ করতে পারাটাই সফলতা।

ঘ. একটি আদর্শিক আন্দোলনে নৈতিক মানের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই আমার নিজেকে ভাবতে হবে আমি সেই নৈতিক মান অর্জনে চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করতে কতটা প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির সমন্বয় ঘটাতে পেরেছি। যার উপর নির্ভর করছে আগামী দিনের ২৮ অক্টোবরের সফলতা কিংবা ব্যর্থতা।

সর্বোপরি এরকম ২৮ অক্টোবরের মত ঐতিহাসিক ঘটনায় আমার নিজের প্রতি যেন কোনভাবেই আস্থার সংকট তৈরি না হয় যে কি হওয়ার কথা ছিল আর কি হল? মনে রাখতে হবে একজন ঈমানদার হিসেবে আমরা আমাদের সাধ্যের মধ্যে থেকে সম্ভব সবটুকু চেষ্টার প্রতিফলন ঘটাবো। বাকি ফলাফল নির্ধারণ করার দায়িত্ব তো আমাদের মহান মা'বুদের। আদর্শিক আন্দোলনের ফলাফলের দিকে আমার যতটা নজর থাকবে তার চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে নিজেকে ত্রুটিমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে। কেননা বিশ্বাসীদের কাছে জয়-পরাজয় বড় কথা নয় বরং সংগঠনের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিজেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পছন্দমত করে উপস্থাপন করতে পারাটাই মূলত প্রকৃত সফলতা।

পরিশেষে

বারবার বলতে ইচ্ছা করে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এরকম একটি ২৮ অক্টোবর নয় বরং হয়ত আমাদের জন্য জীবনের পরতে পরতে অসংখ্য ২৮ অক্টোবর অপেক্ষা করছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো আমি একটি ২৮ অক্টোবরকে নিজের জীবনের জন্য কতটুকু শিক্ষণীয় করে গ্রহণ করতে পেরেছি। পরবর্তী কোন ২৮ অক্টোবরের জন্য আমার প্রস্তুতি কী? শহীদ মুজাহিদ, শহীদ মাসুম, শহীদ হাফেজ শিপন, শহীদ জসীম কিংবা ২৮ অক্টোবরের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী শহীদ মাওলানা বেলাল, শহীদ মনসুর, শহীদ খলিল, শহীদ আবুল আলা ইকবাল এর মত নৈতিক ও ঈমানী চেতনার প্রস্তুতি সমাপ্ত করতে পেরেছি? হয়ত পেরেছি হয়ত না। সেই প্রস্তুতি গ্রহণে এই লেখাটি যদি আমিসহ আমাদেরকে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করে তবেই না আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে পরিতৃপ্তি অর্জন করা সম্ভব হবে, ইনশাআল্লাহ।

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতিতে ইসলামপন্থীরা অবশ্যই ফ্যাক্টর

শেখ হাসিনা বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মানবেন না, সেটা তিনি পরিষ্কার বলে আসছেন। এর জন্য তিনি বিস্তর রক্তক্ষয় ঘটিয়েছেন। আরো ঘটলেও তিনি এই অবস্থান থেকে নড়বেন না। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর পদে রেখেই তিনি নির্বাচন করতে পারেন, সেই ইঙ্গিত রাজনীতিতে নানাভাবে তিনি দিয়ে রেখেছেন। যদি তিনি সদয় হয়ে নিজে ক্ষমতার দণ্ড হাতে না রাখেন তাহলেও তাঁকে নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনের ওপর তাঁর দাপট ও ক্ষমতা পুরোপুরি বহাল রয়েছে। তিনি জানেন বাংলাদেশের বর্তমান সহিংস রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং বিরোধী দল ও মতকে দমন, পীড়ন, হত্যা ও খুনোখুনির যে ইতিহাস তিনি সৃষ্টি করেছেন, এরপর যারা ক্ষমতায় আসবেন তাঁরা তাঁকেই আদর্শ বলে মেনে নেবেন। কিন্তু এর ফল তাঁর ও তাঁর দলের জন্য ভাল হবে না। ফলে সহজে ক্ষমতা ছাড়বার কোন পরিস্থিতি তিনি রাখেননি।

এই অবস্থান থেকেই তিনি চারটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে সম্মতি দিয়েছেন। কারণ এটা প্রমাণ করা তার জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, নির্বাচিত সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন সম্ভব। অর্থাৎ তিনি যেভাবে ক্ষমতায় থাকতে চান সেভাবেই রাষ্ট্রের কলকব্জা তাঁর নিয়ন্ত্রণে রেখে সুষ্ঠু, পরিচ্ছন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কোনই অসুবিধা হবার কথা নয়। বলাবাহুল্য দেশের সকলে তা মানছে না। বিএনপির তো মানার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু যাদের তিনি বোঝাতে চান তারা দেশের মানুষ নয়, বিদেশের সেই সব শক্তিধর দেশ– যারা চায় নির্বাচন হোক– তারা শেখ হাসিনার ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে, যেন বিরোধী দলের সঙ্গে

www.pathagar.com

তাদের একটা সমঝোতা হয়। বিদেশী কূটনৈতিক মহলকে বোঝাতে চান তিনি ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করলে নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্যই হবে। বিএনপির তত্ত্বাবধায়কের দাবি অতএব মেনে নেবার কোন দরকার নাই। চারটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন দেওয়া এবং হার মেনে নেওয়ার পেছনে এই রাজনীতিটাই কাজ করেছে। এখন কূটনৈতিক মহল তাঁকে বিশ্বাস করছে কি না সেটা সামনের দিনগুলোতে আমরা আরো পরিষ্কার ভাবে বুঝব।

দীর্ঘ দিন ধরেই শেখ হাসিনা যুক্তি দিচ্ছিলেন সাংবিধানিক বৈধতার আলখাল্লা পরা একনায়কী ও ফ্যাসিস্ট ক্ষমতার অধীনে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব। তাঁর মন্ত্রীরা তাঁর এই মন্ত্র নানান ভাবে প্রচার করছিলেন। চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্মতি দেবার পেছনে নির্বাচিত সরকারের অধীনে নির্বাচন করবার পক্ষে ন্যায্যতা তৈরিই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অনেকে দেখছি, দাবি করছেন, তিনি সফল হয়েছেন। কিন্তু কার কাছে? শুধু তাদের কাছে যারা মূলত চৌদ্দ দলের সমর্থক। এর বাইরে 'নিরপেক্ষ' কেউ যদি ক্ষমতাসীন দলের ঔদার্যে বিমোহিত হন তাঁরা বড়জোর ভাল মানুষ। ঝুটঝামেলা চান না। তবে আঠারো দলীয় জোটের কাছে এর কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। এই কাণ্ডজ্ঞানটুকু তারা এখনো হারায় নি যে চারটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন আর জাতীয় সংসদের নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল। তবে এই নির্বাচনের অন্য কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে কি না সেটা বিচার করতে হলে আমাদের আরো একটু গভীরে যেতে হবে। যাঁরা গুরুগম্ভীর ভাবে বলছেন স্থানীয় ইস্যু নয়, মূলত জাতীয় রাজনীতিই সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে ছায়া ফেলেছে, তাঁদের কথা খুবই শিশুসুলভ ও হাস্যকর শোনায়। স্থানীয় হিসাবনিকাশ বা ব্যক্তির ভাবমূর্তি ভূমিকা রাখার পরেও স্থানীয় নির্বাচনে– বিশেষত সিটি করপোরেশনের ভোটাভুটির ক্ষেত্রে অবশ্যই জাতীয় রাজনীতি ছায়াপাত করে। ছায়াপাত করতে বাধ্য। বিশেষত যখন সকল পক্ষ খেয়ে-না-খেয়ে সচেতন ভাবে স্থানীয় নির্বাচনকে দলীয় নির্বাচনে পরিণত করবার জন্য নির্বাচনী আইন ভঙ্গ করে নেমে পড়েছিল।

১৬ জুন প্রধান কয়েকটি পত্রিকা কী শিরোনাম করেছে দেখা যাক : 'আঠারো দলের বিপুল বিজয়' (নয়া দিগন্ত), 'চার সিটিতেই বিএনপির বিজয়' (প্রথম আলো), 'চার সিটিতেই আ'লীগের ভরাডুবি' (যুগান্তর), 'চার সিটিতেই বিএনপি বিজয়ী' (ইত্তেফাক), 'বিএনপির বিশাল জয়' (সমকাল), 'BNP takes 4 cities by storm' (নিউ এইজ), 'Four-Zero : BNP-backed mayor aspirants triumph over AL-blessed rivals in four city polls' (ডেইলি স্টার)। দেখা যাচ্ছে কোন গণমাধ্যমই একে স্থানীয় নির্বাচন গণ্য করছে না, বরং একে ধরে নিয়েছে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিযোগিতা হিশাবে। আসলে সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-চরিত্রের দিক থেকে জাতীয় নির্বাচনের চরিত্রই পরিগ্রহণ করেছিল। এটা জানার পরেও স্থানীয় নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনই ছায়াপাত করেছে বলার কোনই অর্থ নাই। যদি তাই হয় তাহলে জাতীয় রাজনীতিতে আসলে কী ঘটছে এবং তার আলাদা কোন তাৎপর্য আছে কি না সেই দিকেই আমাদের নজর দিতে হবে।

সমাজে রাজনৈতিক মেরুকরণের সহিংস ভিত্তি শেখ হাসিনা শুধু পাকাপোক্তই করেন নি, তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে বিচার বিভাগকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে হয়। কিভাবে বিরোধী

www.pathagar.com

চিন্তা ও মতকে দমন করতে হয়। তিনি পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার যে অগণতান্ত্রিক, গণবিরোধী ও ফ্যাসিস্ট রূপান্তর ঘটিয়েছেন তা অসামান্যই বলতে হবে। বাংলাদেশে ছাপা ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের ভিড়কে তাঁর তোয়াক্কা করতে হয় নি। ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামের আতঙ্কে দিশেহারা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীলদের তিনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে বিএনপি, জামায়াত ও হেফাজতে ইসলাম দেশকে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্রে পরিণত করতে যাচ্ছে। মেয়েদের তারা বোরখা পরিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দেবে, শরিয়া আইন চালু হয়ে যাবে, অমুসলিম নাগরিকেরা আর নিরাপদ থাকবেন না। তাঁর আমলে 'সংখ্যালঘু' নাগরিকদের জনপদ ও উপাসনালয়ের ওপর কারা বিভিন্ন সময় হামলা করেছে তার কোন নিরপেক্ষ তদন্ত তিনি করেননি। সরকারি দলের লোকজনের ভূমিকা থাকার অভিযোগ ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক কারণে যেসব নাগরিকের অবস্থান নাজুক তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের ঔদাসীন্য ছিল প্রকট। মনে হয়েছে এই ধরনের ঘটনা সরকার ঘটতে দিয়েছে। তাঁর সমর্থক গণমাধ্যমের মিথ্যা ও অপপ্রচারের মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে তিনিই এখনো সংখ্যালঘুদের একমাত্র রক্ষক। বিএনপি ও ইসলামপন্থীরাই সংখ্যালঘুদের একমাত্র শত্রু। তারাই সাম্প্রদায়িক। যেহেতু তারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র ইতোমধ্যে তাঁর প্রতিভার গুণে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবার পরেও এই সত্য আড়াল করবার জন্য এই ইসলামবিরোধী প্রচার দারুণ ফলদায়ক, সেটা মানতেই হবে।

তাঁর অনুমান হচ্ছে, কঠোর ইসলামবিরোধী ও ইসলামবিদ্বেষী প্রচার, সংস্কৃতি ও রাজনীতিই তাঁর ক্ষমতায় থাকার জন্য সহায়ক। তাঁর এই অনুমান ভুল বলা যাবে না। অবাধ দুর্নীতি ও কুশাসন সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে সুশীলসমাজসহ শহুরে মধ্যবিত্তের সমর্থন অস্বীকার করবার কোনই উপায় নাই। তাঁর বিরুদ্ধে এই শ্রেণির নিরর্থক গজগজানি রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ কোন মূল্য বহন করে না। এই শ্রেণীর সমর্থনই ফ্যাসিবাদকে ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিশাবে গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান ভিত্তি হয়ে রয়েছে। আগামী দিনেও থাকবে বলে আমরা অনায়াসে অনুমান করতে পারি। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের লড়াই যে ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, বরং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, এই সত্য প্রতিষ্ঠিত নয়। সেটা প্রতিষ্ঠিত হতে না পারার কারণ শুধু শেখ হাসিনা ও চৌদ্দদলীয় জোট নয়; বেগম খালেদা জিয়া এবং আঠারো দলীয় জোটও বটে।

এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই তিনি ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন। গণহত্যা সংঘটিত করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। হেফাজতে ইসলামকে নির্মম ও নিষ্ঠুর ভাবে দমনের নীতির মধ্য দিয়ে নিজের রাজনৈতিক শত্রু-মিত্র পরিচ্ছন্ন করেছেন। দেশে-বিদেশে তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে ধারণাও পোক্ত করতে পেরেছেন। প্রমাণ করতে পেরেছেন একমাত্র তিনিই এই দেশে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেকোন ধরনের রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী বা প্রবণতাকে নিষ্ঠুর ও কঠোর ভাবে দমন করতে সক্ষম। এটাও তিনি কমবেশি প্রমাণ করতে পেরেছেন বেশির ভাগ গণমাধ্যমই তাঁর পক্ষে। তিনি দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা অবৈধ ভাবে গায়ের জোরে বন্ধ করে দিতে পারেন। মাহমুদুর রহমানকে কারাগারে নিয়ে অকথ্য নির্যাতন করতে পারেন। তাঁর পক্ষে কোন সম্পাদক সংবাদপত্রের স্বাধীনতার

www.pathagar.com

প্রশ্নে নিঃশর্ত কোন অবস্থান নিয়ে দাঁড়াবেন না। কিংবা দাঁড়ালেও তার মধ্যে বিবিধ ভেজাল মিশ্রিত থাকবে। যেসব সম্পাদক সম্প্রতি দৈনিক আমার দেশ বন্ধ ও মাহমুদুর রহমানকে নির্যাতনের বিরোধিতা করেছেন তাঁদের অনেককে দেখছি আবার মাহমুদুর রহমানকে ইনিয়েবিনিয়ে সমালোচনা করে তাঁদের পার্থক্য ও দূরত্ব বজায় রাখার কোশেশ করছেন। মাহমুদুর রহমানের ওপর প্রথম আলো রীতিমতো তিন দিন আমার দেশ ও মাহমুদুর রহমানের সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে লেখালিখি করেছে। তাদের শত্রু ফ্যাসিবাদ বা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা নয়। বরং তারাই, যাদের শেখ হাসিনা তাঁর প্রধান দুশমন বলে গণ্য করেন। আর এভাবেই গণমাধ্যমগুলো তাদের ফ্যাসিস্ট চরিত্র নগ্ন করে দেখায়। শেখ হাসিনাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না, তাঁর গোলামদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুবই পরিষ্কার। যে কারণে নির্ভয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনকে সম্প্রতি তিনি আরো মজবুত করে নিয়েছেন, এই আইন প্রয়োজনে যেকোন গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে তিনি ব্যবহার করবেন। তিনি জানেন রাজনৈতিক ভাবে তাঁর বিরোধীশক্তি শুধু নয়, এমনকি তার নিজের পক্ষের গোলামরাও যদি সমালোচনা করে, তিনি কঠোর হাতেই তা দমন করবেন। তাঁকে জোর করে ক্ষমতায় থাকতে হবে অথবা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আবার ফিরে আসতে হবে।

হয়ে যাওয়া চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অবশ্য ভাবেনি যে তারা চারটিতেই খারাপ ভাবে হারবে। কারচুপির কোন পরিকল্পনা ছিল না, সেটা দাবি করা মুশকিল। আসলে নির্বাচনের ফলাফল গণনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপক্ষের কাছে চলে গিয়েছিল এবং গণমাধ্যমে তা প্রচারিত হচ্ছিল। ফলে কারচুপির জায়গা বা মুহূর্ত বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না। এর অসুবিধা টের পেয়ে রাজশাহীতে খায়রুজ্জামান আপত্তিও তুলেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন মিডিয়া ক্যু হচ্ছে (প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০১৩)। অর্থাৎ ফলাফল আগে প্রচারিত হওয়াতেই তাঁর আপত্তি। মোসাদ্দেক হোসেনের সমর্থকেরা বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন বোঝা যাচ্ছে। এতে তারা কারচুপি থেকে রক্ষাই শুধু পান নি, সংঘাত ও সহিংসতার যে সম্ভাবনা রাজশাহীতে ছিল, তা-ও মোকাবিলা করতে পেরেছেন সফল ভাবে।

২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অনুষ্ঠিত এই চার সিটি করপোরেশন (রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) নির্বাচনে যারা মেয়র পদে জয়ী হয়েছিলেন, তারা এবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। গত ১৫ জুনে এবারের পরাজিত চার প্রার্থী তখন মেয়র পদে বিজয়ী হয়েছিলেন। বিএনপি-সমর্থিত মেয়র প্রার্থীরা তখন পরাজিত হয়েছিলেন। এবার বিএনপি শুধু সিলেটে প্রার্থী বদলায়। তা ছাড়া আগের তিন প্রার্থীই বহাল থাকে।

শেখ হাসিনার ঘোর সমর্থকদের মধ্যে হাহাকার উঠেছে। প্রথম আলোয় একজন লিখেছেন, 'ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি, সাংগঠনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায়' বিদায়ী চার মেয়র 'এগিয়ে ছিলেন'। এই ধরনের ছেলেমানুষি মন্তব্যের পেছনে অনুমান হচ্ছে ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান জানাবার সুযোগ পেলে জনগণ তা বিবেচনা করবে না, তাদের বিবেচনা করতে হবে প্রথম আলোর হাস্যকর 'সৎ ও যোগ্য' প্রার্থীর সুশীল ধারণা। প্রার্থীরা যেহেতু ভদ্রলোক ছিলেন, এলাকায় কাজ করেছেন, অতএব তাদেরকে ভোট দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা হারলেন কেন? না, তারা ঠিকই হেরেছেন আওয়ামী লীগের কারণে।

www.pathagar.com

তো আওয়ামী লীগ খারাপ কী কাজ করল? তার ফিরিস্তি হিশাবে দশটি কারণ দেখানো হয়েছে। যথা– ১. অতি আত্মবিশ্বাস; ২. ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব; ৩. সাংগঠনিক দুর্বলতা; ৪. বিরোধী দলের শক্তিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা; ৫. মিত্রদের সঙ্গে অসহযোগিতা; ৬. জাতীয় পার্টির অসহযোগিতা; ৭. কাজের চেয়ে কথা বেশি; ৮. বিএনপিকে মৌলবাদীদের দিকে ঠেলে দেওয়া; ৯. সব কিছুর দায় জামায়াতের ওপর চাপানো; এবং ১০. শেয়ারবাজার, পদ্মা সেতু, হল-মার্ক প্রভৃতি কেলেঙ্কারির জবাব না পাওয়া, ইত্যাদি। (দেখুন 'আওয়ামী লীগের পরাজয়ের দশ কারণ' ১৬ জুন ২০১৩)। বিস্ময়কর হোল কোথাও রাষ্ট্রের চরিত্রের গণবিরোধী রূপান্তর এবং তার কারণে জনগণের মনোভাবে কোন পরিবর্তন ঘটেছে কি না সে সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও একটি বাক্য নাই। সেটা দূরে থাকুক এমনকি ক্ষমতাসীনদের নির্বিচার দমনপীড়ন, মানবাধিকার লংঘন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম-খুন, পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থার খোলনলচে বদলে দেওয়া, যুদ্ধাপরাধের প্রহসনমূলক ও বিতর্কিত বিচার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা, অন্যায় ভাবে দৈনিক আমার দেশ, দিগন্ত টেলিভিশন ও ইসলামিক টিভি বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ একটি ইস্যুরও উল্লেখ নাই যা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের দিক থেকে প্রাসঙ্গিক– যেসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের জন্য লড়াই করা ছাড়া গণমানুষের আর কোন গত্যন্তর নাই। যদি আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা ভাল হবার পরেও তাদের ভোট দিয়ে জনগণ জয়ী না করে তাহলে তার প্রধান কারণ হচ্ছে চৌদ্দদলীয় জোটের মধ্যে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিরোধী যে চরিত্রের নিদর্শন এই সরকারের শাসনামলে জনগণ দেখেছে, তা তারা পছন্দ করে নি। চৌদ্দ দলের সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট দিয়ে আবার জয়যুক্ত করবার কোন সঙ্গত যুক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ খুঁজে পায় নি। চৌদ্দ দল বিচারব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে, জাতীয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সর্বনাশ ঘটিয়েছে এবং গণতান্ত্রিক বিধিবিধান ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে নষ্ট করে চলেছে। শুধু দুর্নীতিবাজ ও ইসলামবিদ্বেষী হিশাবে নয়, চৌদ্দ দল বরং জনগণের নাগরিক ও মৌলিক মানবাধিকার হরণকারী হিশাবে নিজের যে রূপ প্রদর্শন করেছে, তার কাফফারা তাকে দীর্ঘ দিন গুনতে হবে। ইসলামবিদ্বেষ আঠারোদলীয় জোট ও হেফাজতে ইসলামের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, নির্বাচনে তা অবশ্যই প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু এই দুটো বিষয় ছাড়াও রাষ্ট্র ও সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের ধরনে যে নেতিবাচক ক্ষয় ঘটেছে, তার উপলব্ধি অবশ্যই জনগণের বিবেচনার মধ্যে ছিল। সাধারণ মানুষ এই ক্ষয়ের উপলব্ধি কিভাবে নিজ নিজ জায়গা থেকে করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে, সেটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেটা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলা ঠিক হবে না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলেই এই উপলব্ধির চরিত্র ও মাত্রা বোঝার দরকার আছে। তার দ্বারাই বোঝা যাবে আগামী জাতীয় নির্বাচনে, যদি আদৌ নির্বাচন হয়, আসলে কী হতে যাচ্ছে।

যাঁরা বলছেন চার সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের হেরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আগামী নির্বাচনেও ক্ষমতাসীনদের হার হওয়া; এত দ্রুত এই সিদ্ধান্ত টানা ঠিক বলে মনে হয় না। ঠিক যে চৌদ্দ দলের ভরাডুবি হয়েছে। কিন্তু অবিশ্বাস্য দমন-পীড়নের পরেও ক্ষমতাসীনদের প্রার্থী কম ভোট পেয়েছেন মনে হয় না। দ্বিতীয়ত যে দল বা জোটের প্রার্থীকে জনগণ ভোট দিয়েছে তারাও গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষের দল নয়। মনে রাখা দরকার বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি ছাড়া এখনো অবধি এমন কোন প্রস্তাব পেশ করেনি

www.pathagar.com

যাতে স্রেফ ক্ষমতায় যাওয়া ছাড়া সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন ইতিবাচক রূপান্তর তারা ঘটাতে চায়। সাংবিধানিক রাজনীতির অধীনে থেকে সেটা সাংবিধানিক ভাবেও ঘটানো সম্ভব। কিন্তু এই গোড়ার রূপান্তর ঘটাতে আঠারো দল ইচ্ছুক বা সক্ষম কি না সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

তবে এটা সত্য যে সিটি নির্বাচনকে ঘিরে আঠারো দল ও হেফাজতে ইসলামের মধ্যে যে সমঝোতা আমরা দেখছি, তা আকস্মিক গড়ে ওঠে নি এবং তা ক্ষণস্থায়ী কিছু নয়। হেফাজতের ৬ এপ্রিল ও ৫ মের কর্মসূচির জের এখনো কাটে নি। সিটি করপোরেশন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। হেফাজত সিটি করপোরেশান নির্বাচনে বুঝিয়ে দিয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। আঠারোদলীয় জোটের গণসমর্থনের ভিত্তি সম্প্রসারিত করবার ক্ষেত্রে হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচির প্রতি বেগম খালেদা জিয়ার সতর্ক সমর্থন বিএনপির রাজনীতির জন্য ইতিবাচক হয়েছে ও হবে সন্দেহ নাই। রাজনীতির দিক থেকে বিএনপির জন্য এটা নতুন চ্যালেঞ্জও বটে। বিএনপিকে দেখাতে হবে ইসলাম প্রশ্নের মোকাবেলা মানে একটি ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্র কায়েম করা নয়, বরং রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে বাংলাদেশের পরিগঠনে যাকে এতকাল উপেক্ষা ও অস্বীকার করা হয়েছে, তাকে স্বীকার ও আত্মস্থ করা। ইসলামপন্থীদের বোঝাবার দায় বিএনপি বহন করতে সক্ষম কি না স্পষ্ট নয়। আঠারো দল বাংলাদেশের রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইসলামের ভূমিকা আসলে কিভাবে দেখে এবং কিভাবে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের দিক থেকে শুধু নয় ইসলামের দিক থেকেও সার্বজনীন আদর্শ হিশাবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ইনসাফের ধারণা আত্মস্থ করতে চায়– সেই প্রশ্নের মীমাংসা না হলে জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক নিছকই সুবিধাবাদী ও কৌশলমূলক হয়ে থাকবে। এই রাজনীতির কোন ভবিষ্যৎ নাই। ইসলাম প্রশ্নকে উপেক্ষা করা কারো পক্ষেই বাংলাদেশে আর সম্ভব নয়। কিন্তু এই সম্পর্ক নিছকই কৌশলগত জায়গায় আটকে রাখা যাবে না। সেটা হবে কপটার্থে রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহারের খারাপ উদাহরণ। চৌদ্দ দল ও তথাকথিত সুশীল সমাজের সমালোচনা এই কারণেই অনেকের কাছে যথার্থ মনে হয়।

সুশীল রাজনীতি ইসলাম আতঙ্কে কিভাবে ভোগে তার একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করব। গত ১৪ জুন ডেইলি স্টার প্রথম পাতায় একটি ছবি ছেপেছে। টুপি ও পাঞ্জাবি পরা কিছু নাগরিক একটি মাইক হাতে কিছু একটা প্রচার করছেন। নিচে ডেইলি স্টারের ক্যাপশন হচ্ছে `alleaged activists of Hefajat-e Islam campaign for the BNP-backed mayoral candidate in Khulna yesterday'। আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে হেফাজতে ইসলামের কর্মী হিশাবে 'অভিযুক্ত'রা বিএনপির সমর্থিত প্রার্থীর জন্য প্রচার করছে। 'অভিযুক্ত' কথাটা ফৌজদারি বা আইনি শব্দ। টুপি ও পাঞ্জাবি পরার কারণে নাগরিকেরা 'অভিযুক্ত'। কী অপরাধ করেছেন তাঁরা? তাঁরা হেফাজত করেন। যেকোন প্রার্থীকে যেকোন নাগরিক সমর্থন দিতে পারেন, সেটা প্যান্ট-শার্ট পরেই হোক কিম্বা হোক টুপি-পাঞ্জাবি পরে। কিন্তু টুপি-পাঞ্জাবি পরা সুশীল পত্রিকার চোখে অপরাধ। কোন প্রার্থীকে কোন ধর্মপ্রাণ মানুষ সমর্থন করলেই সেটা অপরাধ হয়ে যাবে।

এর নিচে খবরের হেডলাইন হচ্ছে BNP, allies count on Hefajot clout. Plot to forge partnership, exploit religion in JS। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে

www.pathagar.com

বিএনপি জোট হেফাজতের সমর্থনের ওপর নির্ভর করছে। তারা জোট বাঁধার 'ষড়যন্ত্র' করছে, যাতে ধর্মকে ব্যবহার করতে পারে। বিএনপি, জামায়াত ও হেফাজতের মধ্যে দূরত্ব কমে আসছে এতে সুশীলসমাজ আতঙ্কিত। কিন্তু কাছে আসাটা এখনো কৌশল মাত্র। অতি আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে সুশীলসমাজের পত্রিকাগুলো যেসব কথা বলছে তার কোন ভিত্তি নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণশক্তির গঠন ও বিকাশের দিক থেকে নীতিগত ঐক্যের জায়গাগুলো কী হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা জরুরি হয়ে পড়েছে।

চার সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ফলাফল সেই তাগিদ যদি জোরদার করে তাহলে বাংলাদেশ কিছুটা এগিয়ে যেতে পারবে। আশা করি।

লেখক : বিশিষ্ট কলামিস্ট

শান্তির মিনার

www.pathagar.com

ভারতীয় পানি আগ্রাসন : ফারাক্কা থেকে টিপাইমুখ

প্রফেসর ড. তারেক শামসুর রেহমান

বাংলাদেশ বড় ধরনের ভারতীয় পানি আগ্রাসনের সম্মুখীন হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে বাংলাদেশের মানুষ যখন গঙ্গার পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তখন নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তিস্তার পানি না পাওয়া এবং টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে। ৭ মে ২০০৯ সংবাদপত্রের খবর, রাজশাহীর কাছে পদ্মা নদীর প্রবাহ বন্ধ হওয়ার পথে। এ অঞ্চলের পানির অন্যতম প্রধান উৎস পদ্মা নদী এখন শুধু বালুচর। কোথাও কোথাও হচ্ছে শস্য চাষ। চলছে গবাদি পশু। ১৯৯৬ সালের পানি চুক্তি অনুযায়ী ভারত ফারাক্কা পয়েন্ট দিয়ে প্রয়োজনীয় পানি ছাড় না করায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে রংপুর থেকে পাঠানো অপর এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে। তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে প্রতিবেশী ভারতের অনৈতিক ঢিলেমি, হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির ফলে এ নদীর বাংলাদেশ অংশ জুড়ে এখন মরুভূমির প্রতিচ্ছবি। একই সাথে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ বাংলাদেশের জন্য সৃষ্টি করেছে অশনি সংকেত।

ভারতের 'পানি আগ্রাসন' বুঝতে এ দু'টি সংবাদই যথেষ্ট। বাংলাদেশ আজ ভারতের পানি আগ্রাসনের সম্মুখীন। বাংলাদেশকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে ভারত। ভারতের এ 'পানি আগ্রাসন' একদিকে যেমন বাংলাদেশকে বঞ্চিত করছে তার ন্যায্য অধিকার থেকে, অন্যদিকে কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে ভারত বাংলাদেশকে 'চাপ' এর মুখে রেখে তাদের স্বার্থ আদায় করে নিতে চাইছে। ভারতের এ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় সহযোগিতা করছে বিশ্বব্যাংক ও এডিবিতে কর্মরত কিছু ভারতীয় বংশোদ্ভুত কর্মকর্তা। কিন্তু বাংলাদেশের পানি সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আগ্রহী নয় ভারত। ভারত বাংলাদেশের এই 'জীবন মরণ সমস্যা'কে কোনদিন সমস্যা হিসেবে দেখেনি। বরং উপহাস করেছে। যেখানে সার্ক এর আওতায় বহুপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধানের একটি উদ্যোগ নেয়া যেতো, সেখানে তা না করে সমস্যাটিকে 'জিইয়ে' রেখে ভারত তার স্বার্থ উদ্ধার করে নিতে চায়।

বাংলাদেশে প্রবাহিত অধিকাংশ নদীর উৎসস্থল হচ্ছে ভারত। ভারত হয়ে বাংলাদেশের

www.pathagar.com

প্রবহমান নদীর সংখ্যা ৫৪টি। ভারত শুধুমাত্র গঙ্গার পানিই এককভাবে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে না, বরং ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার পানিও প্রত্যাহার করে নিতে চাইছে। ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যার মাধ্যমে ভারত ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রত্যাহার করে নেবে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য হবে এক বড় ধরনের হুমকি। আর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণকাজ শেষ হলে, বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল পরিণত হবে মরুভূমিতে। ভারতের এ 'পানি আগ্রাসন' আজ বাংলাদেশের নিরাপত্তাকে বড় ধরনের ঝুঁকির মাঝে ফেলে দিয়েছে। ভারত আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে বাংলাদেশকে তার পানির ন্যায্য পাওনা থেকে শুধু বঞ্চিতই করছে না, বরং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

গঙ্গা পানি চুক্তি

গঙ্গা একটি আন্তর্জাতিক নদী। গঙ্গার উৎপত্তি হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ ঢালে ২৩ হাজার ফুট উচ্চতায় দক্ষিণ পূর্ব ও তারপর পূর্ব দিকে। ভারতের মধ্য দিয়ে প্রায় এক হাজার মাইল অতিক্রম করে গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। চীন, নেপাল ও ভারতের হিমালয় অঞ্চল থেকে কয়েকটি উপনদী উত্তর দিক থেকে গঙ্গায় পড়েছে। বলা ভালো, গঙ্গার পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র চীন, ভারত ও বাংলাদেশ এবং মেঘনা ভারত ও বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর সমন্বয়ে বাংলাদেশে স্বাদু পানির যে নদীপ্রবাহ বিদ্যমান, তা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নদীপ্রবাহ। গঙ্গার পানি বন্টন নিয়ে দু'দুটো চুক্তি হয়েছে। একটি ১৯৭৭ সালে, অপরটি ১৯৯৬ সালে। ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর আরো কেটে গেছে ১২ বছর। কিন্তু আমরা কী পেয়েছি? ২০০৬ কিংবা ২০০৮ সালে বাংলাদেশ কী পরিমাণ পানি পেয়েছে, তার হিসাব না হয় বাদই দিলাম। ২০০৮ সালের পানির হিস্যার যদি পরিসংখ্যান দেই, তা কোন আশার কথা বলে না। গঙ্গার পানি চুক্তি কার্যত এখন অকার্যকর। চুক্তি করে বাংলাদেশ কখনই লাভবান হয়নি এবং আগামীতে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা কম।

আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

গঙ্গার তথাকথিত পানি চুক্তি যখন বাংলাদেশকে তার পানি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে, ঠিক তখনই ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রকল্প খোদ ভারতেরই বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এই বিশাল নদী সংযোগ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে ভারতের অভ্যন্তরে ৩৭টি নদীকে ৯ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ ৩১টি খালের মাধ্যমে সংযোগ প্রদান করে ১৫০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করার জন্য। প্রকল্পটির মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্রের পানি নিয়ে যাওয়া হবে গঙ্গায়। সেখান থেকে তা নিয়ে যাওয়া হবে মহানন্দা এবং গোদাবরিতে। গোদাবরির পানি নিয়ে যাওয়া হবে কৃষ্ণায় এবং সেখান থেকে পেনার এবং কাবেরীতে। নর্মদার পানি নিয়ে যাওয়া হবে সবরমতিতে। এই বিশাল আন্তঃঅববাহিকা পানি প্রত্যাহার প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হবে ২০১৬ সালের মধ্যে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের ওপর মারাত্মক আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্পের কারণে বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থায় ভয়াবহ প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। এ প্রকল্পে বাংলাদেশের যে সব ক্ষতি হতে পারে তা নিম্নরূপ : (১) ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বর্তমানে পাওয়া প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দীর্ঘদিন ধরে পাওয়া পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে। (২) বাংলাদেশ

www.pathagar.com

শুষ্ক মৌসুমে তার মিঠা পানির মোট ৮৫ শতাংশই ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গা নদী থেকে পায়। এককভাবে ব্রহ্মপুত্র থেকেই পাওয়া যায় মোট প্রয়োজনের ৬৫ শতাংশ পানি। সুতরাং ভারতের পরিকল্পনামত পানি প্রত্যাহার করা হলে তা আমাদের দেশের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। (৩) ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থ পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নেতিবাচক প্রক্রিয়া হবে। ভূ-উপরিস্থ পানি কমে গেলে ভূ-গর্ভস্থ পানি বেশি পরিমাণে উত্তোলন করা হবে এবং এতে আর্সেনিক সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। (৪) মিঠা পানির মাছের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবং জলপথে পরিবহন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৫) পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কোনো কৃষি প্রকল্প হাতে নিতে পারবে না। পানির অভাবে কৃষি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৬) পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আরও আশংকা করছেন দূষিত নদীগুলোর পানি অপেক্ষাকৃত দূষণমুক্ত অন্য নদীগুলোর পানিকেও দূষিত করে তুলবে। বর্তমানে পরিবেশ দূষণের শিকার নদীগুলোর পানি অপেক্ষাকৃত দূষণমুক্ত অন্য নদীগুলোর পানিকেও দূষিত করে তুলবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গঙ্গার দূষিত পানি অন্য নদীর পানিকে দূষিত করে তুলবে। বর্তমানে পরিবেশ দূষণের শিকার নদীগুলোর পানি অন্য নদীগুলোতে মেশালে এ অঞ্চলের পরিবেশ দূষিত হবে। (৭) এসবের চেয়েও মারাত্মক বিষয় হচ্ছে প্রকল্পে নির্মিতব্য বড় বড় বাঁধ গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

টিপাইমুখ বাঁধ

বাংলাদেশের জন্য আরেকটি দুঃখজনক খবর হচ্ছে টিপাইমুখ বাঁধ। বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় ধরনের আতঙ্কের। ভারতের টিপাইমুখ হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টে যে হাই ড্যাম নির্মাণ করা হবে তার উচ্চতা ১৫৬২ মিটার। এর পানি ধারণক্ষমতা ১৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০০ মেগাওয়াট। এটি নির্মিত হবে প্রায় বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষে, আসামের করিমগঞ্জের বরাক নদীর ওপর। এ বরাক নদী হচ্ছে সুরমা ও কুশিয়ারার মূল ধারা। সুরমা ও কুশিয়ারা পরে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করছে আমাদের বিশাল মেঘনা। ইতোমধ্যে ভারত টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করায় মরে যাচ্ছে প্রমত্তা সুরমা। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী উজানে পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের সুরমা নদীর পানি প্রবাহ গত ১০ বছরে শতকরা ৮০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায়, ভারতের বরাক নদী বাংলাদেশের সুরমা, কুশিয়ারা অমলশীদে এসে মিলিত হয়েছে। বরাক, সুরমা ও কুশিয়ারা এ তিন নদীর মিলনস্থল অমলশীদ এক সময় অনেক গভীর ছিল। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমান অনুযায়ী, বর্তমান শুষ্ক মৌসুমে বরাক নদী থেকে প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে ৮৩ দশমিক ৫৯ ঘনমিটার পানি প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ পাঁচ বছর আগে এ প্রবাহের পরিমাণ ছিল ৩০০ ঘনমিটার। পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্ষা মৌসুমে ভাঙন রোধে বরাক নদীর দুই তীরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে ধীরে ধীরে সুরমা নদীর প্রধান প্রবাহ কুশিয়ারার দিকে ঘুরে গেছে। এতে বলা হয়, সুরমার ভাটিতে কমপক্ষে তিন কিলোমিটার মরে গেছে।

বাংলাদেশের পানি হিস্যা ও আন্তর্জাতিক পানি ব্যবহারের আইনগত দিক

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে একটি নদী যদি ২/৩টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাহলে ঐ নদীর পানিসম্পদের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। যে কোন আন্তর্জাতিক নদীর ওপর তীরবর্তী রাষ্ট্রের অধিকার সমঅংশীদারিত্বের নীতির ওপর নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক নদী সম্পদের তীরবর্তী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুষম বন্টনের নীতি আজ স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সম্পর্কে ১৮১৫ সালে ভিয়েনা সম্মেলন ও ১৯২১ সালে আন্তর্জাতিক দানিয়ুব নদী কমিশন কর্তৃক প্রণীত আইনে এই নীতির উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবীতে প্রায় ২১৪টি নদী রয়েছে যে নদীগুলো একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। মোট ৯টি নদীর কথা জানা যায়, যা ৬টি বা ততোধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এসব নদী হচ্ছে-দানিয়ুব, নাইজার, নীল, জায়ার, রাইন, জাম্বেজী, আমাজান, লেকচাদ ও মেকং। এক্ষেত্রে কোন একটি একক দেশই এ পানি সম্পদ ভোগ করেনি।

মেকং নদী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মোট ৬টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই দেশগুলো হচ্ছে-লাওস, থাইল্যান্ড, চীন, কম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম ও বার্মা বা মিয়ানমার। এ দেশগুলোর মধ্যে বৈরিতা দীর্ঘদিনের। রাজনৈতিক ব্যবস্থাও ভিন্ন। কিন্তু তবুও দেশগুলো মেকং নদীর পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের একটি সমঝোতায় উপনীত হয়েছিল। নিজ দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত অংশের ভিত্তিতেই পানির ভাগ-বাটোয়ারা হয়েছিল। রিওগ্রানডে ও কালোরাডো নদী মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এ দু'টি নদীর পানির ব্যবহার নিয়েও দেশ দুটোর মধ্যে বিরোধ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে তারা পানির হিস্যা নির্ধারণ করেছে। ভারত যে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প হাতে নিয়েছে, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে এ ধরনের প্রকল্প অবৈধ। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের সবক'টি নদীই আন্তর্জাতিক নদী। তাই এসব নদীর একতরফা পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পানি প্রত্যাহার আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বেআইনি এবং অগ্রহণযোগ্য।

আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক আইন সমিতির হেলসিংকি নীতিমালার ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রতিটি অববাহিকাভুক্ত রাষ্ট্র, অভিন্ন নদীসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনকে বিবেচনায় নেবে এবং তা অবশ্যই অন্য রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি না করেই হতে হবে। ১৯৯২ সালের ডাবলিন নীতিমালার ২ নং নীতিতে বলা হয়েছে, পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা অবশ্যই সবার অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। কিন্তু আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভারত একটি অস্বচ্ছ ও স্বেচ্ছাচারমূলক পদ্ধতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহ কনভেনশনের ৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রতিটি রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহে পানি তার নিজের ভৌগোলিক এলাকায় যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে ব্যবহার করবে। এছাড়া ভারত এ প্রকল্পের মাধ্যমে জলপ্রবাহ কনভেনশনের আরও কিছু বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন করেছে যেমন-(১) প্রতিটি রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহের পানি ব্যবহার করার সময় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর যাতে কোন বড় ধরনের ক্ষতি না হয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (অনুচ্ছেদ-৭(১)। (২) জলপ্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম ক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, পারস্পরিক সুবিধা লাভ এবং সৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহের সংরক্ষণ ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেবে (অনুচ্ছেদ-৮)। (৩) রাষ্ট্রসমূহ নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত বিনিময় করবে (অনুচ্ছেদ-৯)। (৪) অপর রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন প্রকল্প গ্রহণের আগে অবশ্যই তাকে সময়মত অবহিত করতে হবে। ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, টিপাইমুখী বাঁধ কিংবা গঙ্গার পানি প্রত্যাহার আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনেরও সুস্পষ্ট লংঘন। জীববৈচিত্র কনভেনশনের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ

www.pathagar.com

অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে কোন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের আগেই জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন প্রতিটি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করতে হবে। কিন্তু ভারতের প্রস্তাবিত প্রকল্পের কোন বিস্তারিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রক্রিয়ার কথা শোনা যায়নি। আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষভাবে জলজ প্রাণীর আবাসভূমি হিসেবে ব্যবহৃত জলাভূমি বিষয়ক কনভেনশনের (রামসার কনভেনশন) ৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে কনভেনশন উদ্ভূত বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহ পরস্পর পরামর্শ করবে এবং একই সঙ্গে জলাভূমির এবং সেখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের সংরক্ষণের স্বার্থে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নীতিমালা ও বিধিবিধান প্রণয়ন করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারত একতরফা পানি প্রত্যাহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলাভূমিগুলোকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা নিচ্ছে, যা এ কনভেনশনের সুস্পষ্ট লংঘন।

বাংলাদেশের ক্ষতি

ভারতের 'পানি রাজনীতি' তথা বাংলাদেশকে তার ন্যায্য ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে গঙ্গা থেকে পানি প্রত্যাহার ও টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করায় বাংলাদেশ এক বড় ধরনের পরিবেশ ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। নদী ব্যবস্থায় এসেছে বড় ধরনের পরিবর্তন। পলি পড়ে উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং উজানে পানি প্রত্যাহারের কারণে দেশের ২০টি নদী ইতোমধ্যে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এর মধ্যে ১৩টি মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেছে। কার্যত এগুলো এখন মৃত নদীতে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশে পানির অভাবে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা নিচের একটি পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাবে। (১) উত্তরাঞ্চলে প্রায় ২ কোটি মানুষ সেচের পানির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। (২) দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ৪ কোটি মানুষ ও এক-তৃতীয়াংশ এলাকা সেচের পানির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (৩) গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের ৬৫ শতাংশ এলাকায় সেচ দেয়া সম্ভব নয়। (৪) অতিরিক্ত লবণাক্ততার জন্য জমির উর্বরা শক্তি কমে গেছে। (৫) দেশের প্রায় ২১ শতাংশ অগভীর নলকূপ ও ৪২ শতাংশ গভীর নলকূপ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। (৬) গঙ্গার পানি চুক্তির (১৯৯৬) পর বাংলাদেশে গঙ্গার পানির অংশ দাঁড়িয়েছে সেকেন্ডে ২০ হাজার ঘনফুটের কম। অথচ ফারাক্কা বাঁধ চালুর আগে শুষ্ক মৌসুমেও বাংলাদেশ ৭০ হাজার কিউসেকের চেয়ে কম পেতো না। (৭) প্রায় ১৫০০ কি. মি. নৌ পথ বন্ধ হয়ে গেছে। (৮) ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় হাজার হাজার হস্তচালিত পাম্প অকেজো হয়ে গেছে। (৯) ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের বিষাক্ত প্রভাবে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলায় টিউবওয়েলের পানি খাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। (১০) বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় প্রচলিত ধান উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। (১২) মাছের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। (১৩) লবণাক্ততার কারণে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের প্রায় ১৭ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক সমীক্ষায় উল্লেখ করেছে যে, ফারাক্কায় বাঁধ দেয়ার কারণে বাংলাদেশের প্রায় ৯৩ হাজার ৩০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রত্যেক বছরে লোকসানের পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

সমাধান কোন পথে

ভারতীয় পানি আগ্রাসন যে বাংলাদেশকে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশ যদি আগামী ২০ বছর পরের পরিস্থিতি চিন্তা করে এখনই একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ না করে, তাহলে এ দেশ ২০৩০ সালের দিকে

www.pathagar.com

বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পানি সংকট পারমাণবিক সঙ্কটের ভয়াবহতাকেও ম্লান করে দেবে। পানির অভাবে এ দেশে বড় ধরনের সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হবে, যা পার্শ্ববর্তী দেশকেও আক্রান্ত করতে পারে। তাই সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ করতে হবে। ভারতেরও পানি সঙ্কট হয়েছে, এটা অস্বীকার করা যাবে না। উভয় দেশের এই যে সঙ্কট, তার সমাধান করতে হবে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা রেখে এবং বহুপাক্ষিক সমঝোতার ভিত্তিতে। পানি সমস্যা দ্বিপাক্ষিকভাবে সমাধান করা যাবে না। নেপালে জলাধার নির্মাণ করে হিমালয়ের পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা গেলে শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় পানি প্রবাহ ১ লাখ ৩০ হাজার কিউসেক থেকে ১ লাখ ৯০ হাজার কিউসেক পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাতে করে বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ই লাভবান হবে। তাছাড়া জলাধারের সাহায্যে নেপাল প্রতি বছর প্রায় সাড়ে দশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম, যা নেপাল বাংলাদেশেও রফতানি করতে পারবে। ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৭ সালে, অর্থাৎ ১৯৭৭ সাল থেকে ৫০ বছর পর। এ ৫০ বছরে জনসংখ্যা বাড়বে তিনগুণ। মোটামুটি হিসাবে পানির প্রয়োজনও বাড়বে তিনগুণ। কিন্তু ১৯৭৭ সালে আমরা যে পানি পেয়েছিলাম, ৫০ বছর পর পর্যন্ত পেতে থাকবো তার থেকে কম। আরো একটি কথা বিশ্বব্যাংক প্রণীত 'বাংলাদেশ কান্ট্রি ওয়াটার রিসোর্সেস এসিসট্যান্স' নামে একটি ধারণাপত্রের কথা শোনা গিয়েছিল দু'বছর আগে। তথাকথিত এ অঞ্চলের পানি উন্নয়নের নামে এ ধারণাপত্র তৈরি করা হয়েছিল। ওই ধারণাপত্রে গঙ্গার পানি প্রবাহের অপ্রতুলতাকে স্বীকার করে ব্রহ্মপুত্রের পানির ওপর ভিত্তি করে পানি উন্নয়নের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। এটি মূলত ভারতীয় আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনাকেই সমর্থন করে। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের এ ধারণাপত্র সমর্থন করতে পারে না। গঙ্গার পানি বন্টন নিয়ে যেমনি আগামীতেও আলোচনা হবে, তেমনি ব্রহ্মপুত্রকে কেন্দ্র করেও আলোচনা হতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা পানির অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলকে ন্যুনতম ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। আমি ২০৩০ সালকে সামনে রেখে একটি দীর্ঘমেয়াদি পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব রাখছি। সেই সাথে আন্তর্জাতিক নদীর পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের স্বার্থে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও চীনের পানি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পানি ফোরাম গঠনেরও প্রস্তাব করছি। একই সাথে সার্ক সনদে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা বিষয়টি সংযুক্ত করার দাবি করছি। মনে রাখতে হবে পানি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এ নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

লেখক : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

www.pathagar.com

ওরা বাংলাদেশকে '৩২ নম্বর' মনে করে

দুশ্চরিত্র প্রতিবেশী করিমউল্লাহ মাস্টারের সতীসাবিত্রী স্ত্রী রোকেয়া বেগম যদি তার স্বামীকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ে বাধ্য করেন কিংবা নিজে সারা রাতই নামাজ পড়েন কিংবা বিপথগামী সুধাময় বাবু যদি প্রাসাদে স্ত্রী রেখে সারা দিন ময়লা শুঁড়িখানায় মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকেন, তার পরেও কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলার অধিকার অন্যের নেই, যতক্ষণ না বাড়া ভাতে ছাই দেয়।

প্রচণ্ড হতাশা থেকে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে, নাথিং ডুইং ফ্রন্ট'। ফরাসি বিপ্লবের আগে রাজা ষোড়শ লুই গরিব-মিসকিনদের সামনে মধ্যাহ্নভোজ করে দেখাতেন, তিনি কত মহান রাজা! এ দিকে সীমাহীন লুটপাট আর অত্যাচারে ফরাসিদের ত্রাহি ত্রাহি। আসল কথা, যে মহান, তার প্রচারের দরকার হয় না। যে দল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, তাদের কোনো সার্টিফিকেট লাগে না। হুজুর ভাসানীর মতো সৎ নেতার আজ বড়ই অভাব। বর্তমান জাতীয় সংসদের অশালীন ভাষা দেশের মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস ও উত্তেজনা জাগিয়ে তুলতে পারে। সুরঞ্জিতবাবুদের কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। সংসদ টিভির বদৌলতে মানুষ সবই দেখছে। কিছু বক্তৃতা একমাত্র সুধাসদন এবং ৩২ নম্বরেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় হওয়া সত্ত্বেও গণভবন এবং সংসদকে এরা ৩২ নম্বর ভাবেন। কারো কারো বক্তব্য স্রেফ মানসিক বিকারের সাক্ষ্য বলে মনে হতে পারে। বেশির ভাগ আওয়ামী লীগারই দেশটাকে ৩২ নম্বরের বাইরে মনে করলে সংসদে ও বাইরে এই পর্যায়ের বিকার শুনতে হতো না। সংসদ সদস্যদের অনেকেই যোগ্য কী না সেটাও প্রশ্ন। তারা সংসদীয় কার্যক্রম এবং সংসদের ভাষা সম্পর্কে অনেকটা অন্ধকারে। বিগত সাড়ে চার বছরে সংসদকে পারিবারিক কনভেনশন সেন্টার বানিয়ে

www.pathagar.com

ব্যক্তিপূজা এবং বিরোধী দলের ওপর আক্রমণে করের যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে, তাতে মিনিটে ৪২ হাজার টাকা হিসাব করলে হয়তো পদ্মা সেতুর অর্ধেক খরচ জোগান দেয়া যেত। তার পরেও আমরা কী অবিশ্বাস্য রকমের প্রতিবাদহীন! বুদ্ধিজীবীদের বিরাট অংশের অবস্থা গর্তজীবী! মিডিয়ার উল্লেখযোগ্য অংশের অবস্থা বিপজ্জনক! যা হোক মেধাহীন ও বাচাল সংসদ যদি আবারো ক্ষমতায় আসে, দেশ সঙ্কটের মুখোমুখি না হওয়ার কোনোই কারণ দেখছি না। শীর্ষস্থানীয় নেতানেত্রীদের অনিয়ন্ত্রিত মুখ যত দিন বন্ধ না হবে, অপু উকিলদের জিহ্বা বন্ধ হবে না। জিএসপি ঘটনার এক দিন পর সংসদে আত্মসমালোচনার বদলে বিরোধী দলের কাঁধে দোষ চাপানোর অর্থ, মোটেও এরা রাজনীতিবিদ নন। এদের বিশ্বাস, নিজেরাই কেবল সত্যবাদী, অন্যেরা সব মিথ্যাবাদী! বিশ্বব্যাংকের পর জিএসপি স্থগিত কেন, এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়গুলোতে আঙুল সরাসরি সরকারপ্রধানের দিকে। তাদের অভিযোগ, কাজের কাজ কিছুই হয় না। বিশ্বব্যাংক আর জিএসপির মতো দুটো গলাধাক্কার পরেও পচে যাওয়া জিহ্বাগুলো বন্ধ না হওয়ার কারণ বিপথগামী 'অভিভাবক'। এ জন্য দায়ী তারাও যারা প্রতি পাঁচ বছর পরেও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে থাকেন। আমার ভয়, বিরোধী দল ৮৫ ভাগ সিটে জিতলেও একই ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি হতে পারে। তখনো যদি শেখ হাসিনা দেশে থাকেন কিংবা বিশেষ কারণে দারুণ ঝামেলায় না পড়েন, তাহলে ধরে নেবো– তার ভূমিকা হতে পারে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ। জ্ঞানগর্ভ কলামিস্টরা যতই সাফাই লিখুন, করের টাকা ধ্বংস করে সংসদে অপু উকিলের অশালীন বক্তৃতার উৎস কী, তা দেখতে হবে। কাউকে জরিমানা করলে আগে উৎসে হাত দিতে হবে। এত দিন বলতেন খালেদার কথা, এখন বলছেন দু'জনেরই জেলে যাওয়ার কথা, এখানে দেশ এবং মানুষের সাথে এর কোনোই সম্পর্ক নেই। সুতরাং দুটো কথা স্পষ্ট– ১. নিজে জানেন, কেন তাকে জেলে যেতে হতে পারে এবং ২. তিনি এমন এক রাষ্ট্রনায়ক যার মাথায় ব্যক্তিগত চিন্তা প্রাধান্য পায়।

রাজনীতির নর্দমায় দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ, রক্ত, ঘায়ের ছড়াছড়ি! বেশির ভাগ রাজনীতিবিদই মিলিয়নিয়ার যারা সংসদে ব্যবসায়ের চিন্তা নিয়েই আসেন। সংসদ এখন সেই অশালীন ভাষার বিদ্যাপীঠ যেখানে জিয়াপরিবার আর ইউনূস ধোলাই ছাড়া আর কোনো কাজ আছে বলে মনে হয় না। শীর্ষস্থানীয়দের বক্তব্য থেকে সুড়সুড়ি পেয়ে অন্যরা অমানুষে পরিণত হতে পারে। স্বৈরাচারী আইয়ুবের 'বেসিক ডেমোক্র্যাসি'র পর এখন এটা কোন ধরনের গণতন্ত্র?

যার ওয়ার্ড কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ, সেই অপু উকিলকে সৃষ্টি করেছে তার দল। বিরোধী দল তো সংসদেই ছিল না। শাম্মি আক্তার যা বলেছেন, তা হলো– নিউটনের তৃতীয় সূত্র অর্থাৎ 'ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়'। সংসদে এদের গালাগালি শুনে ১০ হাজার মাইল দূরে বসে অবর্ণনীয় লজ্জায় বারবার শিউরে উঠি। বিপথগামী সন্তানের জন্য দায়ী বিপথগামী বাবা-মা। বোতল খাওয়া বা জন্মের পদ্ধতি কিংবা ধর্ম বা জাত তুলে যেকোনো বক্তব্যই কোনো-না-কোনো আইনে অপরাধ। কেউ যখন খালেদা জিয়ার গোলাপি শাড়ি বা চা বাগানে জন্ম এবং কারো কোলে ওঠার কথা বলেন; সেটা মানহানি, যখন হরতালের বিরুদ্ধে বলেন সেটা রাজনৈতিক, যখন উত্তম-মধ্যম দেয়ার কথা বলেন, সেটা তার মেধাহীনতা। মেধাহীন ভোটারেরা বারবার নির্বাচন করে মেধাহীন সংসদ। ব্যক্তিপূজা এবং পারিবারিক

www.pathagar.com

রাজতন্ত্রের প্রতি আসক্তি হেরোইনকেও ছাড়িয়েছে। সংসদ তো রাজনীতির রেড ডিস্ট্রিক্ট হতে পারে না। আর তোফায়েল-মতিয়ারা উত্তেজিত হয়ে আরো বেশি প্রতিহিংসার রাজনীতির চর্চা করেন। ৪২ বছরের দূষিত জাতি আজ '৭১-এর চেয়েও বিপজ্জনক অবস্থানে বলে আশঙ্কা হচ্ছে।

৩২ নম্বরের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা এবং শেরেবাংলা নগরের পার্লামেন্ট ভিন্ন হলেও তারা কি তা মনে করেন? গণতন্ত্রবাদীদের হাতে চতুর্থ এবং পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের শ্লীলতাহানির কতটুকু সমালোচনা আমরা করেছি? আইয়ুব-ইয়াহিয়াও রক্ষা পাননি। অথচ একমাত্র সাগর-রুনির ঘটনাই প্রমাণ করল, কত বড় বড় অন্যায় করেও পার পেয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা! লিমনের পা কেটে ফেলে আবার তারই বিচার করছে সরকার। রায়ের কপির খবরই নেই, 'হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে' সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চুদুরবুদুর পাস (শব্দটি স্পিকার কর্তৃক অনুমোদিত)। দুটো সংশোধনীতেই যেন কেয়ামত পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার পাকা ব্যবস্থা। এ দিকে প্রফেসর ইউনূস যখন বয়স প্রশ্নে আক্রান্ত তখন '৭৫-এর ২৫ জানুয়ারিতে আজীবন রাষ্ট্রপতি থাকার জন্য চতুর্থ সংশোধনী পাস করে বয়স সম্পর্কিত সব প্রশ্ন নস্যাৎ করেছেন নেতা নিজে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৫তম সংশোধনী। শেখ মুজিব এবং ইউনূস নিজ নিজ প্রতিভায় ভাস্বর হলেও ইউনূসের বেলায় বয়স প্রশ্নটা অবশ্যই প্রতিহিংসা। ফলে ৩২ নম্বরের রাজনীতির চিন্তা দিয়ে ২০১৩-এর সংসদ পরিচালনার ফসল উসকে দিচ্ছে সজ্ঝাত।

রাষ্ট্রধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা

একেশ্বর এবং বহু-ঈশ্বরবাদ নিয়ে যারা ব্যবসায় করে, কিছুতেই তাদের রাজনীতিবিদ বলা উচিত নয়। বর্তমান সরকারের আমলে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা অতীতের যেকোনো রেকর্ড ছাড়িয়েছে। রাষ্ট্রধর্ম বহাল রেখে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন, তারা হয় পাগল কিংবা শিশু। আবার ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতাকে যারা গুলিয়ে ফেলেন, তারা মানসিক প্রতিবন্ধী। অসাম্প্রদায়িক জাতির ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার প্রয়োজন নেই; কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ জাতি যদি সাম্প্রদায়িক হয়, তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ দিকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। সুতরাং নাস্তিকদের প্রভাবিত গণজাগরণ মঞ্চের দাবির মুখে ধর্মভিত্তিক দল বাতিল করা কিংবা সংখ্যালঘু ইস্যুতে বারবার ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি আনা দুরভিসন্ধিমূলক। 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বহাল থাকলে দেশটা অসাম্প্রদায়িক হতে পারে কিন্তু কখনোই ধর্মনিরপেক্ষ নয়। যে সরকার মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে ধর্মহীনদের সমর্থন দেয়, সেই সরকারের রাষ্ট্রধর্ম বলে কিছু থাকে না। বৌদ্ধবিহারের দুর্ঘটনা সাম্প্রদায়িক। তেমনি হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা দাবি অসাম্প্রদায়িক। এর কারণ, এ দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। ১৩ দফা দাবি কুরআন এবং সুন্নাহভিত্তিক হওয়ায় ৬ মে হেফাজতের ওপর যে আঘাত হানা হলো, সেটা ধর্মবিরোধিতার শামিল। কারা কুরআন পুড়িয়েছে কিংবা মধ্য রাতে মুসল্লিদের কারা কানে ধরিয়ে বের করে দিলো, বিষয়গুলোর বিচার বিভাগীয় তদন্ত এত দিনেও হলো না কেন? রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রেখে জাতিকে অসাম্প্রদায়িকতার নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। তবে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করাটা মুসলিম ভোটের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মমতার সাম্প্রদায়িক কৌশলতুল্য। নাস্তিক কমিউনিস্টরা যখন বৌদ্ধবিহারের ঘটনায় কান্নাকাটি করে হেফাজতের ঘটনাকে বলে ধর্মদ্রোহী, তখনই প্রমাণ হয়ে যায়, এরা ধর্মব্যবসায়ী ধুরন্ধর

www.pathagar.com

মমতা ব্যানার্জির চেয়েও উন্মাদ। সরকার যদি অনড় থাকে, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানাতে সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম তুলে ফেলতে হয়। ধর্ম নিয়ে ছলচাতুরী ত্যাগ করতে হবে। জাতীয় স্বার্থের বাইরে কারো ধর্মীয় পরিচয় কিংবা নামাজ না পড়ে বোতল খেয়ে ঘুমিয়ে থাকা নিয়ে যেকোনো বক্তব্যই অশ্লীল এবং সাম্প্রদায়িকতায় সুড়সুড়ি। সুতরাং মানুষকে আর বিপথগামী না করতে সরকারকে ভাষার ব্যবহারে সংযত ও সাবালক হতে হবে।

নির্বাচন

৫৭টি ওয়ার্ডের দায়িত্বে ৫৭ এমপি? মেয়র নির্বাচনে যদি ১৫ হাজার নিরাপত্তাকর্মী লাগে, সেখানে জাতীয় নির্বাচনের চেহারা কী হতে পারে? আমাদের ভয়, জাতীয় নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছে নতুন কারবালা। 'গণতন্ত্রে'র হাতে যখন মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত, স্বৈরতন্ত্রের সাথে তখন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। ইয়াহিয়া খানের কাছে যা প্রত্যাশা করিনি, ৪২ বছরেও তা ফিরে পাইনি। আইয়ুব আমলের শাসকেরা ছিলেন জনতার চেয়ে দ্বিগুণ দুর্বল। তখন জীবন থেকে নেয়ার মতো সরকারবিরোধী ছবি দেখানো যেত। এখন এসব দুঃস্বপ্ন। বিস্ময়কর হলো, যে দলটি নির্বাচনের সূত্র ধরে দেশ স্বাধীন করে ফেলল, তারাই নির্বাচন নিয়ে জাতির সাথে বারবারই আইয়ুব-ইয়াহিয়ার মতো প্রতারণায় লিপ্ত হচ্ছে। '৬৯-এ মুজিব বলেছিলেন, নির্বাচন না দিলে অসহযোগ আন্দোলন হবে... প্রধানমন্ত্রী হতে চাই না, আমি মানুষের অধিকার আদায় করতে চাই। '৭০-এর নির্বাচনের আগে যখন প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে লাখ লাখ মানুষ মরল, মওলানা ভাসানী মাত্র ১৫ দিন নির্বাচন পিছিয়ে দিতে বললে, মুজিবের সাফ জবাব 'না'। ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে ৭ মার্চের ভাষণে পাকিস্তানিদের গালে কষে চড় লাগালেন মুজিব। নির্বাচন প্রশ্নে পিতা ও কন্যা আপসহীন। ৩০৩ দিন হরতাল এবং ২৮ অক্টোবরের ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়ে শেখ হাসিনাও ১/১১ এনে নির্বাচনে বাধ্য করলেন সবাইকে। অথচ যে যায় লঙ্কা, সেই হয় রাবণ। সংসদে সুরঞ্জিত বাবুর অশনিসঙ্কেত আইয়ুব খানকেও হার মানালো। সরকারি দল নির্বাচনে না গেলে শূন্যতার কারণে ক্ষমতায় থাকার জন্য সুপ্রিম কোর্ট নাকি প্রধানমন্ত্রীকেই অনুরোধ করবেন, অর্থাৎ ২+২=৪। উইকিলিকসের ফাঁস হওয়া ক্যাবলে জানা গেছে তখনকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত অসম্ভব ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন, 'শেখ মুজিব মোগলদের মতো অসম্ভব ক্ষমতাধর, আজীবন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পাঁয়তারা করছেন।' ড. আকবর আলি খানও এরই প্রতিধ্বনি করলেন। বরাবরই গণতন্ত্রের পিতা ও মানসকন্যার অবস্থান হলো, 'বিশ্বের সবাই ভুল, তবে শেখ পরিবার সব কিছুরই উর্ধ্বে'। দুঃখের বিষয় ১৯৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি গণতন্ত্র বিলুপ্ত করে এক দল এক ব্যক্তির শাসন কায়েমের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়েছিল আওয়ামী লীগসহ সব দল। নির্যাতকের কাজই হলো, নির্যাতিতদের মধ্যে সর্বক্ষণ ঝগড়া লাগিয়ে রাখা, যেন নির্যাতনের কথা ভুলে থাকে। সহস্রাব্দের স্বৈরাচারীদের অন্যতম নায়ক জাতীয়তাবাদী হিটলারের সাফল্য প্রচুর। জার্মান জাতীয়তাবাদের স্বার্থে পরাশক্তির বিরুদ্ধে তিনি বিশ্বযুদ্ধে জড়ালেন, যা নিয়ে বহু গবেষণা... কিংবা মাহাথিরের গঠনমূলক স্বৈরাচারকে ইতিবাচক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই শেখার আছে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন করা গণতন্ত্রবাদীদের হাতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে যে স্বৈরাচারের সূচনা, এমনকি আইয়ুব-ইয়াহিয়া শাসনের সাথেও এর তুলনা বৃথা। তখন একটি লাশ পড়লে ইতিহাস সৃষ্টি হতো; যেমন, আসাদ ও মতিউর। এখন শত শত লাশ পড়লেও কিছুই হয় না; যেমন, সাঈদীর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে পুলিশের গুলিতে শত শত লাশ। ইতিহাস বলে,

www.pathagar.com

ইংরেজসহ যারাই এই অঞ্চলে স্বৈরাচার করেছে, মুসলিম লীগ, কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভার মতো বিরোধী দলগুলোকে আমলে নিয়েছে। সম্রাট বাবর থেকে আওরঙ্গজেব, বাঙালির চিন্তাচেতনা তখন থেকে ৮০০ বছরের রাজতন্ত্রে দূষিত। '৭৩-এর পর এই সরকার রাজতন্ত্রের নতুন মাত্রা যোগ করতে আবারো মরিয়া। কিন্তু এর বিরুদ্ধে যেকোনো কণ্ঠই নস্যাৎ করে দেয়ার নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে শাসক।

নির্বাচন হতে না দেয়ার বিষয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর অনড় বক্তব্য অস্বীকার করা হোক বা না হোক, এটা স্পষ্ট, নির্দলীয় নির্বাচন হচ্ছে না। ক্ষমতার জন্য শাসকেরা যেকোনো মাত্রার শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর। অথচ একটি পদ্মা সেতু দিয়েই সব অক্ষমতার পরীক্ষাই ফেল। বাধ্য করলে কেবল তখনই কাজ হয়, এমন সরকার প্রত্যাশিত নয়। অপর দিকে, এমন নিষ্ক্রিয় বিরোধী দলও বাংলাদেশের ইতিহাসে নেই। সেই সুযোগেই বারবার হামলে পড়ে পশ্চিমের স্বার্থপর পুঁজিবাদীরা। টেবিলে বসায় ক্ষমতা বনাম সম্পদ ও সার্বভৌমত্ব। যখন সুযোগ ছিল, ক'টি সংবাদপত্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিবাদ করেছে? মিডিয়া যখন সরকারের হয়ে যায়, জাতির কণ্ঠস্বর তখন পুরোপুরি নিভে যায়। এত সন্দেহ থাকার পরেও লন্ডনের ডেইলি মিররকেই রেশমা নিয়ে তোলপাড় করতে হলো।

এই আওয়ামী লীগে এবিএম মূসার মতো সংসদ সদস্যদের অভাব হলেও আবুল হোসেনদের কোনো অভাব দেখিনি। আওয়ামী লীগ প্রমাণ করল, তারা মারকাট ব্যবসায় লীগ। জনপ্রতিনিধিদের অনেকের একমাত্র উদ্দেশ্য, সম্পদের পরিমাণ মোটাতাজা করা। ব্যাংক ও পুঁজিবাজার লুটের টাকায় বিদেশে আইল্যান্ড, বহুতল ভবন, মার্কেট ও ব্যাংক কেনার কথা জানা যায়। অনেকেরই সম্পদের পরিমাণ পশ্চিমা ধনকুবেরদের মতো বিশাল। অনেকেই দ্বৈত নাগরিক, পরিবার বিদেশে, মন চাইলে মাঝে মধ্যে দেশে আসে। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের নিকট সদস্যরা প্রায় ৯৯ ভাগই বিদেশে। কানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় লুটেরাদের নামে পাড়া পর্যন্ত গড়ে উঠেছে। এদের টাকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নিয়ে মহাবিপদ। দীর্ঘ দিন বিদেশে থেকেও যা সম্ভব নয়, এরা দেশে থেকেই মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে। নিষ্ক্রিয় বিরোধী দলের কারণে নির্বাচন নিয়ে যে ধূম্রজাল সৃষ্টি হলো, তা কাজে লাগাতে পারলে ২০২১ সাল পার হওয়া যাবে ক্ষমতা বাগিয়ে। আর এসব সম্ভব করতেই চুদুরবুদুর সংশোধনী।

তবে নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ইঞ্জিনিয়ারিং দেখলে মুজিব হয়তো আবারো বলতেন, হয় নির্বাচন, নয় অসহযোগ আন্দোলন! বিশ্বব্যাংকের ঋণ প্রত্যাহার এবং জিএসপি স্থগিত করা সেই সঙ্কেত, যে কথাগুলো দীর্ঘ দিন গুছিয়ে বলতে পারছে না প্রায় ৮৫ ভাগ ভোটার। আর নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন না দেয়ার এটাও কারণ।

মূল সমস্যার খোঁজে

মূল সমস্যা সেই কিতাব, যে কিতাব দানব সৃষ্টি করে। '৭২-এর সংবিধানে এমন সব শব্দ বসানো হয়েছে, যা স্বৈরাচার তৈরির জন্য যথেষ্ট। ড. কামাল থেকে সুরঞ্জিত বাবু... '৭২-এর সংবিধান এক নেতাকে মাথায় রেখে তৈরি হলেও তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী নন। তখন থেকেই ক্ষমতা যার, সংবিধান তার। অথচ ব্রিটেনে লিখিত সংবিধানই নেই। ২৩৩ বছর বয়সী মার্কিন

www.pathagar.com

সংবিধানের যে গঠন, ২৭টি সংশোধনীসহ তা আজ পর্যন্ত গর্ব করার মতো দলিল। এর সুফল ভোগ করছে সারা বিশ্বের মানুষ। দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটনের প্রশাসনে দুই কক্ষ এবং অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বাধীন রেখে পদে পদে ক্ষমতা চূর্ণবিচূর্ণ করার সুযোগ, যেন কোনো সরকারই দানব না হয়ে ওঠে। তবে আমাদের অদ্ভুত সংবিধান এবং 'হ্যাঁ জয়যুক্ত সংসদ' গণতন্ত্রের মুখে কালি ঢেলে দিয়েছে। একে কাঠের ঘোড়াও বলা যায়। সংশোধন করতে করতে এমনপর্যায়ে এসেছে, যা ক্রমেই অনেকের কাছে আসমানি কিতাবের আকার ধারণ করেছে। মাঝে মধ্যে 'ওহি' নাজিল হলে মানুষ পড়ে বিপদে। সুরঞ্জিতবাবুদের মতো অবতারের আলামত বাড়ছে। মন চাইলেই চতুর্থ, পঞ্চম, ১২তম এবং ১৫তম সংশোধনীর আবির্ভাব ঘটে। ১৫তম ঐশী বাণীর বিরুদ্ধে গেলেই মৃত্যুদণ্ডের বিধান। কোষাগারের কোটি কোটি পাউন্ড খরচ করে বিদেশের পত্রিকাতেও স্বর্গীয়বাণী প্রচারে উঠেপড়ে লেগেছে সরকার। তার পরেও আমরা '৬৯-এর মতো আন্দোলন না করে মানববন্ধন করার মতো কাপুরুষ। তার পরেও গণতন্ত্রকামী নেতানেত্রী গর্তজীবী জীবন বেছে নিয়েছেন। নির্বাচন প্রশ্নে মুজিব সে দিন সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে এতটাই বিশাল হয়ে উঠেছিলেন যে, শত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও '৭০-এর নির্বাচন না দিয়ে রক্ষা পায়নি ইয়াহিয়া খান। এর পরের ইতিহাস আমরা জানি। এই মুহূর্তে অসুস্থ, দুর্গন্ধময়, নষ্ট সংবিধানের খোলনলচে পাল্টে না দিলে অপরিসীম ক্ষমতাভোগীরা ধ্বংস করবে সার্বভৌমত্ব। তখন আমরা অন্য দেশের গোলাম হয়ে যাব। সুতরাং দুই কক্ষের হাতে ক্ষমতা এবং মেয়াদসীমাসহ একদলীয় সংসদের বিরুদ্ধে যেকোনো পদক্ষেপই সময়ের দাবি। অন্যথায় পরবর্তী সংসদ হতে পারে এই সংসদের আয়না। সবার আগে শিক্ষিত হতে হবে শিক্ষিতদের, যারা সাধারণ জ্ঞান দিয়ে শিক্ষিত করবেন ১৬ কোটি মানুষকে।

লেখক : নিউ ইয়র্ক প্রবাসী
মানবাধিকার কর্মী ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, সে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা এখন পৃথিবীর অনেক দেশই গ্রহণ করেছে। কিন্তু সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সে ব্যবস্থা বাতিল করে গায়ের জোরে এমন এক ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে যাতে তারা ছাড়া আর কারো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জিতবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ফলে বিগত বছরখানেক ধরে বিরোধী দল বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

১৯৯৫ সাল থেকেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মিলে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন শুরু করে। তখন আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের রাজনৈতিক আঁতাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আমাদের দেশের কার্যত এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে অনুরোধ করে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তার অধীনেই ১৯৯১ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। পরে আবারো তিনি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যান।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদিও খুব আশা করেছিলো যে তারাই বিজয়ী হবে। সে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও সুষ্ঠুতা সম্পর্কে সারা পৃথিবীতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। সারা দুনিয়ার নির্বাচন পর্যবেক্ষকেরা এক যোগে বলেছিলেন যে, ঐ নির্বাচন আশাতীত রকম সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়েছে। শেখ হাসিনাও সে নির্বাচন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে যখন দেখা গেলো আওয়ামী লীগ হেরে গিয়েছে এবং বিএনপি বিপুলভোটে জয়লাভ করেছে তখন ঐ নির্বাচনকে শেখ হাসিনা 'সূক্ষ্ম কারচুপি' বলে অভিহিত করেছিলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু সে সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কার্যত এই ব্যবস্থার প্রধান প্রবক্তা ছিলো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আর আওয়ামী লীগ পরে তা গ্রহণ করে। তখন জামায়াত ইসলামীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের একটা আঁতাত গড়ে ওঠে। সে আঁতাত শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ছিলো না তাতে আরো অনেক ইস্যু সংশ্লিষ্ট ছিলো। কিন্তু বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না। কার্যত এরকম ব্যবস্থা সম্পর্কে আগে কারো কোনো ধারণা ছিলো না। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের সরকারের সফল নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই ধারণা পোক্ত হয়। সম্ভবত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পৃথিবীর আর কোথায়ও এই ধরনের সরকারব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো না।

সে কারণে বিএনপি সম্ভবত উপলব্ধি করতে পারছিলো না যে এই ব্যবস্থার ফলাফল কী হবে, যদিও বিচারপতি সাহাবউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দৃষ্টান্ত তাদের সামনে ছিলো। ফলে ১৯৯৬ সালে দেশে একটি রাজনৈতি সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। যাতে বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাত্র তিন মাসের জন্য একটি নির্বাচনের আয়োজন করে। তাতে বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া স্পষ্ট ভাষায় জানান যে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই নির্বাচনের আয়োজন করা হচ্ছে। তিন মাস পর সংসদ ভেঙে দেয়া হবে। তখন নবপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে। সংবিধান সংশোধনের জন্য যে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা দরকার তা বিএনপির ছিলো না। আওয়ামী লীগ জামায়াত সংসদ বর্জন করেই যাচ্ছিলো। বেগম খালেদা জিয়া তাদের সংসদে এসে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা দিয়ে সংবিধান সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেটিও তারা মানেননি। ফলে ঐ সংসদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তখন নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ১৯৯৬ সালে। তাতেও আওয়ামী লীগ জামায়াত অংশগ্রহণ করেননি। ফলে ঐ নির্বাচন ছিলো কার্যত এক দলীয় নির্বাচন। অনেকেই তখন ১৯৯৬ সালের সেই নির্বাচনকে নানা নিন্দামন্দ করেন। কিন্তু ঐ সংসদে যেহেতু বিএনপির দুই তৃয়াংশের বেশি সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিলো তাই মধ্যরাত পর্যন্ত সংসদের অধিবেশন চালিয়ে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। আর তিন মাসের মধ্যেই কথা অনুযায়ী বেগম খালেদা জিয়া ঐ সংসদ ভেঙে দিয়ে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে এরশাদের জাতীয় পার্টিসহ কিছু ছোট দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে। তখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অতি ভালো ও গ্রহণযোগ্য ছিলো। ২০০১ সালে সংবিধান অনুযায়ী বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক সমীকরণে জামায়াতে ইসলামী বিএনপি'র সঙ্গে আঁতাত গঠন করে। এবং নির্বাচনে অংশ নেয়। জামায়াতের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের গাত্রদাহ তখন থেকেই শুরু। তারপর থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় সকল নেতাকে আটক করে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। শুধু মাত্র বয়সের কথা বিবেচনা করে ৯০ বছল বয়স্ক সাবেক জামায়াত নেতা

www.pathagar.com

অধ্যাপক গোলাম আযমকে ৯৯ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। এ যাত্রাও তত্ত্বাবধায়ক ইস্যুতে জামায়াতে ইসলামী বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধেই আন্দোলন করছে। এক্ষেত্রে জামায়াতের অবস্থান পরিষ্কার। তত্ত্বাবধায়ক আনার জন্য তারা এক সময় আওয়ামী লীগের সঙ্গে গাঁট ছড়া বেঁধে আন্দোলন করেছিলো। এখন বিএনপির সঙ্গে মিলে আন্দোলন করছে। দাবি একটাই- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনতে হবে।

এর কোনো বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগের শীর্ষ সারির প্রায় সকল নেতাই সংবিধান সংশোধন কমিটির বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখার বিষয়ে মত দেন। তাদের মধ্যে তোফায়েল আহমেদ থেকে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত পর্যন্ত প্রায় সকলেই ছিলেন। কিন্তু শেখ হাসিনা এই সত্য উপলব্ধি করেছেন যে, যে পরিমাণ লুণ্ঠন, নরহত্যা, লুটতরাজ তারা করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থায় নির্বাচন হলে তাদের পরাজয় অবধারিত। আর যদি পরাজিত হোন তাহলে এর সব কিছুর জন্যই তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। সেটা হবে শেখ হাসিনার সরকারের জন্য এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। শেখ হাসিনা সে অবস্থা মোকাবেলা করতে প্রস্তুত নন। যদিও বেগম খালেদা জিয়া তাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি কোনো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবেন না। বরং শেখ হাসিনার চারপাশ থেকে যখন তার সকল নেতা দূরে সরে যাবেন তখনো তিনি শেখ হাসিনার পাশে থাকবেন। পরে শেখ হাসিনার ইচ্ছায় তার কথা মতোই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা এক বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে অনুদানখোড় প্রধান বিচারপতির খাইরুল হক বাতিল করে দেন। তারপরও তিনি বলেছিলেন যে, এরপর পরবর্তী দুটো নির্বাচনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে। কিন্তু শেখ হাসিনা দেরি করেননি। সংসদে প্রায় বিনা আলোচনায়ই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে দেন।

এখন কার্যত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি জনগণের দাবিতে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কোনো কথাই আর এখন একজন সাধারণ নাগরিকও বিশ্বাস করেন না। তিনি নাকে মুখে অসত্য বক্তব্য দিয়েই যাচ্ছেন। প্রমাণহীন অভিযোগ করেই যাচ্ছেন। আজ এক কথা বলছেন কাল আর এক কথা বলছেন। কখনো এসব কথা অসংলগ্ন বলে মনে হয়। এসব গীত শুনতে শুনতে মানুষের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। আর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা গণদাবিতে পরিণত হয়েছে।

তার প্রমাণ আমরা দেখতে পেলাম টানা ৬০ ঘন্টার দু'দফা হরতালে। এই হরতালে কোথায় কে নেতা সাধারণ মানুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-সে কথা মনেও রাখেনি বা তাদের খোঁজও নেয়নি। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে জনতা এই হরতালে নেমে এসে সরকারকে প্রতিরোধ করেছিলো। জনগণের দেশ জনগণই দখলে নিয়ে নিয়েছিলো। সরকার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলো রাজধানীতে। যখন কোনো সরকার চাপতে চাপতে রাজধানীতে সরে আসতে বাধ্য হয় তখন তার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এটা আমরা ইরানে দেখেছি, মিশরে দেখেছি, আফগানিস্থানে দেখেছি। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হবে না। ১৮ দলীয় জোট নেত্রী বলেছেন সরকারের পতন না ঘটিয়ে জনগণ ঘরে ফিরবে না। জনগণ এখন সত্যি সত্যি ঘরের বাইরে। সরকারের পতনও খুব বেশি দূরে নয়।

লেখক : কলামিস্ট, সম্পাদক
দৈনিক দিনকাল

www.pathagar.com

বাংলাদেশের অবস্থান ভূ-রাজনীতি পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমাদের করণীয়

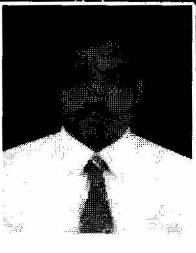

বাংলাদেশ তার সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই প্রতিনিয়ত কোন না কোন সমস্যা মোকাবেলা করেই চলেছে। কখনও ফারাক্কা সমস্যা, কখন সীমান্ত সমস্যা কখনও টিপাইমুখ সমস্যা আবার কখনও বা চলছে পার্বত্য এলাকার অশান্ত পরিবেশ এমনিভাবে অসংখ্য সমস্যা। দেশটি দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ আর লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করে কিন্তু স্বাধীনতা ছিল এক খণ্ডিত ভূ-খণ্ড নিয়ে। বঙ্গভঙ্গের যে বাংলা তার ৬৪ শতাংশ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলার ৩৬ শতাংশ বঞ্চিত হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম। সুতরাং বাংলাদেশ সূচনালগ্ন থেকেই বঞ্চনার শিকার আর এখন দেশটির বিরুদ্ধে চলছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের নগ্ন থাবা। ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো কিছু স্বার্থবাদী গোষ্ঠী এদেশকে গ্রাস করার জন্য মেতে উঠেছে উন্মাদ হলি খেলায়। তারা পদে পদে এদেশে অশান্তি সৃষ্টি করে ভূ-লুণ্ঠিত করতে চাচ্ছে এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে। তারা আষ্টেপৃষ্ঠে খামছে ধরেছে এ দেশের লাল-সবুজ পতাকাকে।

ভৌগোলিক ভাবে দেশটি দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত একটি জনবহুল দেশ। দেশটি ২০° ৩৪ উত্তরাংশ থেকে ২৬°৩৮ উত্তরাংশ এবং ৮৮° ০১ থেকে ৯২° ৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত যা দেশটির পরম (Absolute) অবস্থান নির্দেশ করে। অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশের রয়েছে বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ। বাংলাদেশ শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোট ASEAN, SAARC এর মত উদীয়মান আঞ্চলিক জোট,

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্বে আলোচিত দেশ ও Rising Country চীন এর মত দেশ এবং দক্ষিণে বিশাল জলরাশি Bay of Bengal এর মত অবস্থানিক প্রপঞ্চকের মধ্যে অবস্থিত যা তাকে বিদেশনীতি গ্রহণ থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছে (চিত্র-১)। এই সকল অবস্থানিক প্রভাব বলয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি, সৎ, যোগ্য দক্ষ জ্ঞানী ও জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার যার কোন বিকল্প আছে বলে আমি মনে করি না। অন্য দিকে একটি রাষ্ট্রের পরম অবস্থান (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাগত), সমুদ্র-উপকূলবর্তী অবস্থান (Sea –Side Location) সামরিক কৌশলগত অবস্থান (Stratagic Location), সন্নিহিত অবস্থান (Relative Location) সুসংহত হলে সেই রাষ্ট্রের প্রভাব বলয় বেড়ে যায় যা বাংলাদেশের অনুকূলে।

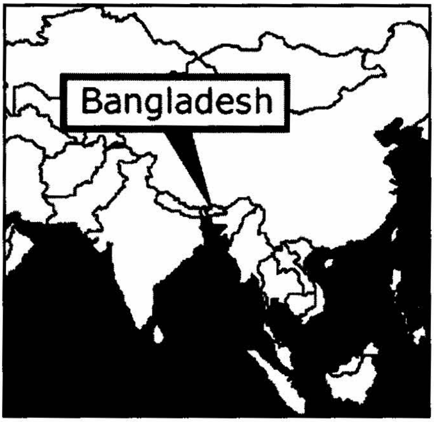

চিত্র- ১: বাংলাদেশের ভূ- রাজনীতিক অবস্থান

চিত্র-২: পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান

পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান ও ভূ-রাজনীতি

সম্পদ সম্ভাবনা আর সমূহ সমস্যায় সমাকীর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌম ভৌগোলিক এলাকা নিয়ে বিস্তৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের সবচেয়ে হালকা জনসংখ্যা অধ্যুষিত অথচ বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। দেশটির তিনটি পার্বত্য প্রশাসনিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত এ অঞ্চলটির অধিকাংশ ভূমিই পাহাড় ও বনভূমির অন্তর্ভুক্ত। উঁচু নিচু পাহাড় পর্বত, পার্বত্য নদ-নদী, উর্বর উপত্যকা, দুর্গম ঘন চিরহরিৎ বনভূমি বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী অঞ্চলটিকে দান করেছে এক অনন্য নিসর্গ ও বৈচিত্র্যময়তা।

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে প্রায় ২১° ২৫ থেকে ২৩° ৪৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১° ৫৫ থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের পর্বতসঙ্কুল জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা Chittagong Hill Tracts এর অবস্থান (চিত্র-২)। দেশের প্রশাসনিক তিনটি জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এর মোট ১৩১৪৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত (B.B.S.2009)।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত বিভিন্ন জাতি সত্তার অসমস্বত্ব উপস্থিতি আর বর্তমান বিশ্বের দুই উদীয়মান পরাশক্তি চীন ও ভারতের বিশেষ কাছাকাছি অবস্থান এবং

www.pathagar.com

এখান থেকে অনায়াসে বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারত মহাসাগরের উন্মুক্ত নীল জলভাগে প্রবেশের সুবিধার সম্ভাব্যতা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশ্বে ভূ- রাজনৈতিক দিক থেকে করে তুলেছে বিশেষ গুরুত্ববহ। অন্যদিকে এলাকাটির বিপুল ভূমি সম্পদ, প্রায় অব্যবহৃত পানিসম্পদ জনভারাক্রান্ত আর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদ ক্ষুদ্রায়তন বাংলাদেশের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে এক অপরিহার্য মহামূল্যবান অঙ্গে পরিণত করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশী জাতির জন্য ভবিষ্যৎ সম্পদ সম্ভাবনার এক অপরিমেয় এবং অফুরন্ত ভাণ্ডার, সম্ভাবনার প্রতিশ্রুত প্রান্তর বা Land of Promise যেন নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় গড়ে তুলেছে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তনের বিশালতায় বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-দশমাংশ হলেও জনসংখ্যার হিসেবে ঐ অঞ্চলে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২ শতাংশ লোক বসবাস করে। এ জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ মঙ্গোলীয় জাতি সমূহের অন্তর্ভুক্ত (যা প্রধানত মিয়ানমারের আরাকান থেকে আগত) এবং বাকি প্রায় ৪০ শতাংশ বাংলা ভাষাভাষী নতুন বসতি স্থাপনকারী সমতল ভূমির লোক। পাহাড়ি জাতিভুক্ত মোট জসনসংখ্যার আবার ধর্ম ভাষা ও জাতিতাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রায় ডজন খানেক উপ জাতিতে বিভক্ত, যাদের পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং আচরণিক দিক দিয়ে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের বৃহত্তম পাহাড়ি এবং বনাবৃত অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত তিনটি প্রশাসনিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত। বৃটিশ রাজত্বকালে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকারের ২২তম প্রশাসনিক এ্যাক্ট বলে বৃহত্তম চট্টগ্রাম জেলাকে বিভক্ত করে "পার্বত্য চট্টগ্রাম" নামের একটি আলাদা প্রশাসনিক জেলা গঠন করা হয়। (Shelley, 1992) ১৯৮২ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটিমাত্র বৃহত্তম জেলা ছিল। ১৯৮৩ সালে রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এই তিনটি প্রশাসনিক পার্বত্য জেলায় বিভক্ত হয়। যা বর্তমানে Chittagong Hill Tracts এলাকা নামে সমধিক পরিচিত (Shelley, 1992 & Rob. 1997) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনসংখ্যা নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস এবং জাতি তাত্ত্বিক ভিন্নতার মধ্যেই ঐ এলাকাটির বর্তমান অশান্তি এবং বিচ্ছিন্নবাদিতার কারণ নিহিত রয়েছে (যদিও ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তিস্বাক্ষরিত হয়েছে তবুও এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া জরুরি যেমন কতটুকু শান্তি স্থাপিত হয়েছে? আদৌ কি শান্তিচুক্তি কার্যকর হয়েছে? দলমত নির্বিশেষে দেশের মানুষ এই চুক্তি গ্রহণ করেছে কিনা (ইত্যাদি) পার্বত্য চট্টগ্রামই বাংলাদেশের একমাত্র অঞ্চল যেখানকার মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অবাঙালি এবং অমুসলিম, অঞ্চলটি মূলত একটি মিশ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত, বিভিন্ন জাতি উপজাতি, নানা গোত্র ও ভাষাভাষী এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বহু সংস্কৃতি বিশিষ্ট জনসংখ্যার একটি এলাকা, নৃতাত্ত্বিক এবং জাতিতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে একথা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী কোন জনগোষ্ঠীই এখানকার মূল আদিবাসী (Aboriginis) বা ভূমিপুত্রের (Son of the Soil) দাবিদার হতে পারে না (Lew in, 1869, Khisha 1964, Bernol 1960 and Ahmed 1990) এসব গবেষণা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জনগোষ্ঠীই আগে বা পরে পার্শ্ববর্তী অথবা দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল বা সমতল ভূমি থেকে দেশান্তরী হয়ে ঐ অঞ্চলে আশ্রয় নেয়

www.pathagar.com

এবং নিবাস গড়ে তোলে। শতশত বছর ধরে পাশাপাশি অবস্থান করলেও এসব বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বহুলাংশে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে তবে তাদের মধ্যে কোন কোন উপজাতীয় সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্যাবলীর কিছু কিছু গ্রহণ করে নিয়েছে। যেমন- চাকমারা বাঙালিদের ভাষা এবং খ্যাদাভ্যাস এবং টিপরারা হিন্দু ধর্ম এবং লুসাই বোমরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। কালের বিবর্তনে এই সকল পরিবর্তন পাহাড়ি এ্লাকায় নিয়ে ভাববার অবকাশ রেখেছে কিন্তু আমরা কতটুকু এটা নিয়ে ভাবছি সেটাই এখন ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্বত্য এলাকায় বর্তমানে প্রায় অর্ধেক জনগণই বাঙালি। সুতরাং বাঙালি ও পাহাড়িদের মধ্যে একদিকে নেই যেমন সখ্য অন্যদিকে বিদেশী চক্রান্ত পাহাড়ি এলাকার শান্তি স্থাপনে প্রধান অন্তরায় বলে আমি মনে করি। নিম্নে তালিকার মাধ্যমে পার্বত্যা এলাকার জনগোষ্ঠীদের একটি তালিকা প্রদান করা হল।

জনগোষ্ঠীর নাম	শতকরা হার
বাঙালি	৫০%
চাকমা	২৪%
মারমা (মঘ)	১৪%
টিপরা (ত্রিপুরা)	৬%
মুরং	১.২%
তনচংঙ্গা	১.৯%
অন্যান্য	১.৯৯%

Source : Statistical Year book of Bangladesh 2001

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যৎ সম্পদ সম্ভাবনার এক অপরিমেয় এবং বিপুল ভাণ্ডার বা সম্বাবনার প্রতিশ্রুত প্রান্তর, এতদসত্ত্বেও বাঙালি পাহাড়িদের মধ্যে সুন্দর/মধুর সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হওয়ায় সকল সম্ভাবনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে, বাঙালি জনসংখ্যা ৫০% হওয়া সত্ত্বেও সেখানে বাঙালিরা মনে হয় নিজ দেশে বঞ্চনার শিকার, অথচ বাংলাদেশের সংবিধানের ৩য় অনুচ্ছেদের ৩৬ এবং ৪২ ধারায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দেশের মানুষের যে কোন জনকে বাংলাদেশের সার্বভৌম এলাকার যে কোন স্থানে যাতায়াত, বসতিস্থাপন, জমি খরিদ বা সম্পত্তি গড়ে তোলার মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) প্রদান করেছে। (... every citizen shall have the right to move freely throughtout Bangladesh , to reside and settle in and place there in and to leave and re- enter Bangladesh" (36/3)" every citizen shall have the right to acquire, hold, transfer or other wise dispose of property "(42/3)" বাংলাদেশের সংবিধানের এই ধারা দুইটির দ্বারা বাংলাদেশের সার্বভৌম অঞ্চলভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের ভুমি সম্পদসহ যে কোন সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার, বাণিজ্য এবং বিনিময়ের আইনানুগ অধিকার জাতি, ধর্ম বর্ণ ভাষা ভেদে, যে কোন বাংলাদেশীর জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও অতীতে বিশেষ করে বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে নাই। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দুর্গম পার্বত্য ভূমিরূপ, শিক্ষার অভাব, জনসংখ্যার অপ্রতুলতা আর তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর ঔদাসীন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে (Rob,1990) সুতরাং সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষণ এবং সরকার ও জনগণের সঠিক ও উন্নয়নমুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্পদবহুল পার্বত্য এলাকায় সুদূরপ্রসারী শান্তি স্থাপন সম্ভব।

ভূ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দেশের সবচেয়ে অরক্ষিত অথচ আঞ্চলিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভোগোলিক এলাকা। সমাজতান্ত্রিক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বর্তমান এককেনিদ্রক বিশ্বব্যবস্থার (Uni-Polar Global System) অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে এশিয়ায় ভারত এবং চীন ভবিষ্যৎ নব্য পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছে। এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত মহাসাগরের প্রবেশপথে বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে মাত্র কয়েক কি.মি. দূরে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশের সার্বভৌম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অত্যধিক তাৎপর্যময় ভৌগোলিক অবস্থান জুড়ে বিরাজ করছে। ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অনুবর্তী পশ্চভূমি হিসাবে এবং চীন, ভারত ও দ:পূ: এশিয়ার আসিয়ান (ASEAN) ভুক্ত অর্থনৈতিক শক্তি প্রায় সমদূরবর্তী প্রভাব ভূমি (VICINAL lAND) এশিয়ার এই ত্রিভুজ ভূ-ভাগটি বিশেষ ভূ-রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও গুরুত্ব বহন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এই গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ভূ-ভাগের বিশেষ তাৎপর্যময় স্থানে অবস্থিত।

আয়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি লেবানন, সাইপ্রাস, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, নাউরু, কাতার, লুক্সেমবার্গ, মোনাকো কিংবা সিসিলি অপেক্ষা বড়। অঞ্চলটি সকল দিক দিয়ে ভূমি পরিবেষ্টিত। সবচেয়ে নিকটতম সমুদ্র উপকূল দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে মাত্র ১৩/১৪ কি:মি: পশ্চিমে কক্সবাজার জেলার উখিয়ার কাছে অবস্থিত। পার্বত্য রাঙ্গামাটির পশ্চিম প্রান্তের কাউখালী থেকে মাত্র ৩০ কি:মি: দূরে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার সংকীর্ণ একফালি ভূ- ভাগ যা কোন স্থানেই পূর্ব পশ্চিমে ৫০/৫৫ কি: মি: এর চাইতে বেশি প্রশস্ত নয় যা পার্বত্য চট্টগ্রামকে সমুদ্র থেকে পৃথক করে রেখেছে (যেখানে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার অবস্থিত)। চট্টগ্রামের বন্দর যা কর্ণফুলী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে তার নাব্যতা এবং সমস্ত চট্টগ্রামের বন্দর কলকারখানা এবং নগরীসহ সমস্ত জেলা, পার্শ্ববর্তী কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষ্মপুর এবং চাঁদপুর জেলার বিদ্যুতের সম্পূর্ণ সরবরাহ এই কর্ণফুলীর পানির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া নৌপরিবহন এবং কৃষির জন্য সেচব্যবস্থায় (কক্সবাজরার ও চট্টগ্রাম জেলায়) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রবাহিত কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা, শঙ্খ ইত্যাদি নদীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সব দিক দিয়ে বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব সহজেই অনুভব করা যায়। অন্য দিকে দুর্গম এবং পার্বত্য ঘেরা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান চট্টগ্রাম বন্দর, প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর সোনাদিয়া (কক্সবাজার) চট্টগ্রাম মহানগর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার ভূ-ভাগকে ভূ-রাজনৈতিক ও অবস্থানগত দুর্ভেদ্যতা দান করেছে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতা চট্টগ্রাম অঞ্চল (যাকে

www.pathagar.com

দেশের প্রাণ বলা হয়) কৌশলগতভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি সহজভেদ্য (Strategically) ঐ এলাকাকে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত দুর্বল ও প্রতিকূল বৈশিষ্ট্য দান করবে, এমনকি বারবার নব্য উদীয়মান (প্রতিবেশী) রাষ্ট্র কর্তৃক ঐ এলাকার সার্বভৌমত্ব বিলীন হতে পারে। বাংলাদেশের সুন্দরী কন্যা নামে খ্যাত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে সুরক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে যে কোন উপায়ে বাংলাদেশের অখন্ড হিসেবে ধরে রাখা খুবই প্রয়োজন এটা না হলে আধিপত্যবাদী শক্তিগুলো মাতা চাড়া দিয়ে উঠতে দ্বিধা করবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূ-রাজনৈতিক (Geo-Politics) গুরুত্ব বহন করে, সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলটির সন্নিহিত অবস্থান (Vicinal or relative location) অত্যন্ত প্রতিকূল। একমাত্র পশ্চিমের বাংলাদেশের ঘন বসতিপূর্ণ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়া এলাকাটির উত্তর পূর্ব-কিংবা দক্ষিণ-পূর্বাংশের ভারত এবং মিয়ানমার অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত দুর্গম। পার্বত্য বনাবৃত এবং জনবিরল অনুন্নত ভূ-ভাগের সমষ্টি মাত্র। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি উত্তর পূর্ব দিকে ভারতের মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা (যা Seven Sister নামে পরিচিত) ছাড়িয়ে প্রায় ৬৫০ কি:মি: দূরে চীনের উইনান প্রদেশের সীমান্ত অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার প্রায় ১১০ কি:মি: সীমান্ত ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সংলগ্ন পার্বত্য রাঙ্গামাটির ২৪০ কি:মি: সীমানা ভারতের মিজোরাম (Lusici Hills) ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভক্তি নির্দেশ করে এবং পার্বত্য বান্দরবান জেলার প্রায় ১১৫ কি: মি: সীমান্ত রেখা মিয়ানমারকে বাংলাদেশ থেকে আলাদা করেছে (Bangaldesh Administrative Map prepared by graph osman,dhaka,1992) পার্বত্য চট্টগ্রামের আকৃতি অসংবদ্ধ (Non-Compact) এবং দীর্ঘায়তন (Elongate) প্রান্তের তুলনায় অঞ্চলটির কয়েকগুণ বেশি দীর্ঘ। এই সকল ভূ- পারিসরিক বৈশিষ্ট্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ- রাজনৈতিক দুর্বলতার দিক বলে বিবেচ্য। চট্টগ্রামের উত্তর দক্ষিণে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ কি: মি: এবং অপ্রশস্ত স্থানের বিস্তৃতি প্রায় ৪০ কি:মি: (চন্দ্রঘোনা থেকে মিজোরামের পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত)। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে (কাপ্তাই কিংবা চন্দ্রঘোনা) সড়ক পথে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের দূরত্ব ৫০/৬০ কি:মি: কিন্তু বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় নাইক্ষ্যংছড়ি থানার শেষ প্রান্ত (পূর্বাংশ) থেকে নিকটতম সমুদ্র উপকূলের দূরত্ব মাত্র ১৪/১৫ কি:মি: (Rob,1997) সুতরাং চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্ত এলাকার অবস্থান থেকে সমুদ্রের এই নৈকট্য সমগ্র অঞ্চলটিকে দান করেছে বিশেষ ভূ- কৌশলগত গুরুত্ব।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত অবস্থানের কারণেই পার্শ্ববর্তী অনেক দেশেই আজ এ অঞ্চলটি গ্রাসের পাঁয়তারা শুরু করেছে। অঞ্চলটির একদিকে যেমন রয়েছে বিশালাকৃতির পাহাড়ি অবস্থান অন্য দিকে (পশ্চিমে) রয়েছে বর্তমান বিশ্বের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু বিশাল জলরাশি। নৌশক্তি বর্তমান বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রধান ও অন্যতম প্রপঞ্চক। এমন হতদরিদ্র পিতার যদি কোন সুন্দরী কন্যা থাকে সেই বাবা যেমন সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে, তেমনি বাংলাদেশের কতগুলো সুন্দরী কন্যা আছে যাদের কারণে বাংলাদেশ সর্বদা তটস্থ থাকে, পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের মধ্যে অন্যতম, ভারতের Seven Sister প্রদেশগুলির উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ভারতের জন্য খুবই প্রয়োজন কেননা এই সকল প্রদেশগুলি দূরে হওয়ায় কলকাতা বন্দরের সাথে বাণিজ্যিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা খুবই

www.pathagar.com

কঠিন, অন্য দিকে উদীয়মান শক্তি চীন বঙ্গোপসাগরে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইলে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল উত্তম জায়গা, কারণ এটার মাধ্যমে চীনের সাথে দূরত্ব যেমন কমবে তেমনিভাবে জাতিতাত্ত্বিক মিলও আছে। সুতরাং অঞ্চলটি মিশ্র জনসংখ্যা এবং বিপুল ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব নানা আঞ্চলিক এবং দূরবর্তী আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহকে অঞ্চলটির ওপর নজর রাখতে উৎসাহিত করছে। এই কারণে ভারত মহাসাগরে এবং সংলগ্ন ভৌগোলিক এলাকায় নিজেদের প্রভাব বলয় তৈরি করতে বা ধরে রাখতে ভারত, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন গোষ্ঠী তৎপর। বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদানের নামে এক শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতাবাদী জন গোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। যদি তা সত্যই হয়ে থাকে তবে তা বাংলাদেশের জন্য মোটেই সুখকর খবর নয়। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভারতের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে রাখতে যা করতে এবং শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে প্রখর নজর রেখে চলেছে এবং "মানবাধিকার প্রশ্ন" তুলে বাংলাদেশের ওপর চাপ ফেলতে চাচ্ছে। সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের (বিশেষ করে পাকিস্তানে) কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ গুলির ওপর পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এবং খন্ডিত শক্তি রাশিয়া এবং উদীয়মান শক্তি চীন নতুন করে নজর রাখতে শুরু করেছে, চীনের অগ্রসরমান অর্থনীতি ও সামরিক শক্তির কারণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় নৌ মহড়া মালাবার একারসাইজ" গত ০৯.০৯.০৭ তারিখে ভারত, জাপান, সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলিয়ার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হল। সম্ভবত এর মূল কারণ হতে পারে বাংলাদেশকে বুঝিয়ে দেয়া যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামকে ব্যবহার করে চীন যাতে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশিতে প্রবেশ না করতে পারে। সম্প্রতি প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার (নভেম্বর ২০০৮) তার তেল, গ্যাস ক্ষেত্রগুলো ভারত ও চীনের মাধ্যমে উন্নয়নের ও বিতরণের চুক্তি স্বাক্ষর করা। মিয়ানমার বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঠিক দক্ষিণে অবৈধভাবে বাংলাদেশের নাকের ডগায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান করে যা বাংলাদেশের জন্য মোটেই সুখবর নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে বাংলাদেশের অস্তিত্বের স্বার্থ। জনসংখ্যার চাপে ভারাক্রান্ত বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিপুল জনসংখ্যার পুনর্বাসনের জন্য এই অঞ্চলটি অতীব প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই অঞ্চলটি এক সময় হতে পারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। প্রাচীন এই ভূ-ভাগে সম্ভবত বিপুল পরিমাণ খনিজসম্পদ অনাবিষ্কৃত রয়েছে। ব্যাপক বনাঞ্চল, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনাময় উৎস, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, অবারিত পর্যটন সম্ভাবনা প্রভৃতি এই অঞ্চলকে বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত করেছে। ভূ-রাজনৈতিকভাবে অঞ্চলটি বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর, বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম, বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার এবং বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত চট্টগ্রাম অঞ্চলকে (কক্সবাজার সহ) কৌশলগত নিরাপত্তা (Strategic Security) বা ভূ-রাজনৈতিক আড়াল (Strategic defence) দান করেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রামের প্রায় সকল নদী (কর্ণফুলীসহ) পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে প্রবহিত হওয়ার ফলে এই অঞ্চলটির বিচ্ছিন্নতা বা অশান্ততা বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষি জমির পানি সরবরাহ, নৌ যোগাযোগ, চট্টগ্রাম বন্দরের নাব্যতা এবং কাপ্তাই থেকে সরবরাহকৃত জলবিদ্যুতের অস্তিত্ব, কর্ণফুলী

www.pathagar.com

কাগজ কলের টিকে থাকা প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে বিপন্ন করে তুলবে, সর্বোপরি এই এলাকার গরিব জনগণকে টিকিয়ে রাখার সাথে সাথে বাংলাদেশের সাবভৌমত্ব এই অঞ্চলের সাথে বহুলাংশে মিশে আছে। অন্যদিকে মিয়ানমারের বিভিন্ন জাতিসত্তা বিশেষ করে কারেন, রোহিঙ্গা, মণি, চিন, মগ ইত্যাদি উপজাতীয়রা বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধে লিপ্ত। এই প্রেক্ষিত মিয়ানমারকে নিজের স্বার্থে বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকার ওপর বিশেষ নজর রাখতে হচ্ছে। তবে দীর্ঘ দিন সামরিক শাসন, বহির্বিশ্বের সাথে খারাপ সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে অভাবগ্রস্ত মিয়ানমারের পক্ষে এই মহূর্তে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে আধিপত্য ভূমিকা সম্ভব হবে না।

হাঙ্গর আকৃতির প্রতিবেশী দেশ ভারত তার নিজ স্বার্থেই সদা বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেই চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে ভারতের ভীষণ রকমের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত স্বার্থ জড়িত। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় ভারতীয় কংগ্রেস পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতভুক্তি দাবি তুলেছিল (Tayeb 1966 and Ahmed 1958) বর্তমানে ভারত এশিয়ার অন্যতম শক্তি এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য পরাশক্তি, বঙ্গোপসাগর থেকে নিয়ে ভারত মহাসাগরে ভারত আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সুস্পষ্টভাবে সক্ষম হয়েছে। (Bindra 1982and Rob 1997) ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যে (Seven Sister of India) বর্তমানে ব্যাপক স্বাধীনতাকামী আন্দোলনে ভারত বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারত চীনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে ভারতের এই অঞ্চলটির কৌশলগত এবং ভূ-রাজনৈতিক দুর্বলতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে, চীন মাত্র ২/৩ দিনের মধ্যে বৃহত্তর আসামের উত্তরাংশ (ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাংশ) দখল করে নেয়। অন্য দিকে ভবিষ্যৎ শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী নেপাল কিংবা বাংলাদেশ ভবিষ্যতে এ ধরনের সংঘাতে চীনের পক্ষ নিলে ভারতের ঐ অসুবিধাজনক ভূ-কৌশলগত অঞ্চলটির অস্তিত্ব সম্পর্ণরূপে বিপন্ন হতে পারে। (Rob,1997) সুতরাং ভারতকে তার এই সকল অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হিমশিম খেতে হয়। এমতাবস্থায় উঠতি নৌ শক্তির দেশ ভারত বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল দিয়ে সামান্য পথ (পার্বত্য) অতিক্রম করে পৌঁছে যেতে পারে সাতবোন রাজ্য গুলোতে, তাই সাতবোন রাজ্য গুলিকে ধরে রাখার জন্য ভারতের যে বাসনা তা বাস্তবায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামই হচ্ছে তাদের একমাত্র ক্ষেত্র, এই কারণে ভারত সর্ব শক্তি দিয়ে কৌশলে তার ভূ-কৌশলগত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে চায়। এই কারণেই হয়ত ভারত বার বার কোন জাতীয়তাবাদী সরকারকে চাপের মধ্যে রাখতে জঙ্গি সমস্যা, ফারাক্কা ইস্যু, টিপাইমুখ সমস্যা এবং চাকমা সমস্যাকে চাবি হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে, সুতরাং অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল।

অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর চীন ধীরে ধীরে বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজকে প্রস্তুত করছে। এমতাবস্থায় চীনকে যদি ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের নীল জল রাশিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে সবচেয়ে যোগ্যতম স্থান হচ্ছে বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকা কেননা এখানে চীনের সাথে আছে জনসংখ্যার মধ্যে জাতিতাত্ত্বিক মিল এবং কম দূরত্ব। এমতাবস্থায় চীন এই এলাকার ওপর

www.pathagar.com

প্রভাব বিস্তার করার জন্য বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র এটা কোন দিক থেকে গ্রহণ করবে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে বাংলাদেশের সরকারযন্ত্রের, সামান্য ভুলের কারণে হয়তো এই সম্ভাব্য এলাকাটি এক সময় সমগ্র জাতির দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আমাদের করণীয়-

১. সম্পদ সম্ভাবনা আর সমূহ সমস্যায় সমাকীর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের এক দশমাংশ সার্বভৌম ভৌগোলিক এলাকা নিয়ে বিস্তৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের সবচেয়ে হালকা জনসংখ্যা অধ্যুষিত অথচ বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। দেশটির তিনটি পার্বত্য প্রশাসনিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত এ অঞ্চলটির অধিকাংশ ভূমিই পাহাড় ও বনভূমির অন্তর্ভুক্ত। উঁচু নিচু পাহাড়- পর্বত, পার্বত্য নদ-নদী, উর্বর উপত্যকা, দুর্গম ঘন চিরহরিৎ বনভূমি বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী অঞ্চলটিকে দান করেছে এক অনন্য নিসর্গ ও বৈচিত্র্যময়তা। সেখানে বসবাসরত সকল উপজাতি-বাঙালি-অবাঙালি-হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ তাবৎ জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী নাগরিকের সার্বিক অধিকার ও ইজ্জতের সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা রক্ষা এবং সর্বোপরি জীবন-জীবিকার নিশ্চিয়তা বিধানে যথাযথ রাজনৈতিক, সামাজিক, মানবিক ও সাংবিধানিক সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতীয় ও পশ্চাৎপদ ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ দেশের সকল জনগণের সব ধরনের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৩. বাংলাদেশের কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-ভাগের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বিরোধী যে কোন ধরনের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী অপতৎপরতা কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

৪. দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে, জাতীয় অখণ্ডতা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে, পাহাড়ি এলাকায় জাতিগত দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে , পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথাচড়া দিয়ে উঠতে পারে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে, সর্বোপরি বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে দেশ বঞ্চিত হতে পারে এমন সকল প্রকার তৎপরতা রাজনৈতিক ভাবে সমাধানের সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. পার্বত্য জেলা গুলোর দিকে সুদৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে বাঙালি-পাহাড়িদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি একটি দুষ্টুক্ষতের মতো জাতিকে উত্ত্যক্ত ও জ্বালাতন করে

www.pathagar.com

আসছে দীর্ঘকাল যাবৎ। ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত একটার পর একটা ঘটনা, মীমাংসার একটি যুক্তিসংগত ও উভয় পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য ফর্মুলা উদ্ভাবনের মাধ্যমে দীর্ঘকালীন ব্যর্থতা দূর করণের লক্ষ্যে আন্তরিকতার সাথে সৌহার্দ্যের উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৭. পার্বত্য এলাকায় সংঘটিত নানা উস্কানি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস সৃষ্টিকারী অপতৎপরতা রোধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে সরকার, বাঙালি ও উপজাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. দেশ গঠনে দেশপ্রেমিক সৎ, যোগ্য এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকার এবং সুশিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী যার কোন বিকল্প নেই এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পার্বত্য এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে গণশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যৎ সম্পদ সম্ভাবনার এক অপরিমেয় এবং বিপুল ভাণ্ডার ও সম্ভাবনার প্রতিশ্রুত প্রান্তর, এতদসত্ত্বেও বাঙালি-পাহাড়িদের মধ্যে সুন্দর/মধুর সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হওয়ায় সকল সম্ভাবনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে এমতাবস্থায় সম্পদ সম্ভাবনা এই এলাকার ভূগর্ভস্থ ও উপরিস্থ সকল সম্পদের সুষম উন্নয়ন ও বন্টনের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যা প্রকারান্তে সমগ্রদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

১০. পার্বত্য এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করত হবে।

১১. পার্বত্য এলাকার দুর্গম এলাকায় যাতায়াতের লক্ষ্যে নতুন নতুন রাস্তা-ঘাট বিনির্মাণ এবং কাপ্তাই লেক এলাকায় নৌ-পথ উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. পার্বত্য এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি কল্পে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান সহ প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।

১৩. পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিতে সংবিধানের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সহিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে।

১৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত অবস্থানের কারণেই পার্শ্ববর্তী অনেক দেশেই আজ এ অঞ্চলটি গ্রাসের পাঁয়তারা শুরু করেছে। অঞ্চলটির একদিকে যেমন রয়েছে বিশালাকৃতির পাহাড়ি অবস্থান অন্য দিকে (পশ্চিমে) রয়েছে বর্তমান বিশ্বের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু বিশাল জলরাশি। নৌশক্তি বর্তমান বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রধান ও অন্যতম প্রপঞ্চক এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত অবস্থানকে সুসংহত করণের লক্ষ্যে নৌ-শক্তি বৃদ্ধিসহ

www.pathagar.com

সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সুবাতাস বইতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শেষান্তে বলা যেতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রামের রয়েছে ভূ-কৌশলগত অবস্থান যা তাকে বর্তমান অশান্ত ও আধিপত্য বিস্তারকারীদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। যে সকল জ্ঞানী, বিবেকবান মানুষ, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে চিন্তা করেন তারা এ এলাকাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত না হয়ে পারেন না। কথায় আছে "রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে উলু খাগড়ার জীবন যায়" ঠিক এমনই একটি দশা আমাদের। নব্য শক্তিধর ভারত ও চীন এবং বিশ্বের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জনসংখ্যাবহুল দক্ষিণ এশিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার করার খায়েশে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, যার গ্যাঁড়াকলে পড়ে বাংলাদেশ আজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অস্থিরতার মুখোমুখি, দেশকে আজ "অকার্যকর" শব্দটির উৎস খুঁজে বের করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করতে হয়, আর আমরা যখন দেখি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, পাশ্চাত্য রাষ্ট্র বহুদিন থেকেই সুপারিশ করে আসছে প্রমুখ ঐ সব রাষ্ট্র বাণিজ্যিক সুবিধা ও আর্থিক লাভের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসলেও অত্যন্ত চতুরতার সাথে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা নিরাপত্তার কথা বেমালুম ভুলে যান। বিশ্ব রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য পরিবর্তনের আলোকে চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও ক্ষমতা ঠেকাতে এবং এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ভারসাম্য শক্তির বর্ধন হিসেবে ভারতকে অখণ্ড ও শক্তিশালী রাখার জন্যই সম্পূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক কারণেই ভারতের পক্ষে এমন অবস্থান হয়তো। সে দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারত - মার্কিন সাম্প্রতিক কালের পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারত এই সুযোগে তার উত্তর-পূর্বাংশের রাজ্যগুলোর (Seven Sister) ওপর প্রভাব বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের অত্যন্ত ভূ-কৌশলগত এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর খবরদারি জোরদার করার প্রয়াস নিতে পারে। এমনকি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হানতে পারে, সুতরাং বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোর দিকে সরকারের সুদৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে বাঙালি-পাহাড়িদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন জরুরি। এই সকল কাজ করার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেমিক সৎযোগ্য এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকার এবং সুশিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী যার কোন বিকল্প নেই। ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত পার্বত্য চট্টগ্রাম যেমন বাংলাদেশের অপরিহার্য অংশ ঠিক তেমনি ভাবে অপরিহার্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্র এলাকায় শান্তি আনয়ন, যা কোন একক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়, প্রয়োজন দল-মত নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক
ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

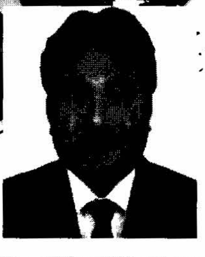

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা একটি প্রেরণা একটি ইতিহাস

১২ই ডিসেম্বর ২০১৩ ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়। এই দিনটি ইতিহাসে একটি কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই দিনে বিশ্বের ইতিহাসে একজন নিরীহ, নিরপরাধ মানুষকে রাষ্ট্রীয় আয়োজনের মধ্য দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ইতিহাস হয়ত একদিন প্রমাণ করবে এটি ছিল একটি রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড। দার্শনিক সক্রেটিসকে হ্যামলক বিষ প্রয়োগে হত্যার রায় দিয়েছিল আদালত। আদালতই যিশু খ্রিস্টকে (হযরত ঈসা আ.) শূলে চড়িয়ে হত্যার রায় দিয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয় আদালতের নির্দেশেই। হাজার বছর পর এসে প্রমাণিত হয়েছে তিনটি রায়ই ভুল রায় ছিল। বিচার-ইতিহাসে এ ধরনের রায়ের অসংখ্য নজির রয়েছে- যার ভিত্তিতে কথিত অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যার পর প্রমাণিত হয়েছে, আদালতের দেয়া রায়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ছিল না। জামায়াত নেতা জনাব আবদুল কাদের মোল্লার বিষয়েও হয়তো ভবিষ্যতে এমনটি বলা হতে পারে- যে রায়ের ভিত্তিতে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে তা সঠিক ছিল না। এই জন্যই আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্বদ্যিালয়ের অধ্যাপক ম্যাকলোয়েন চার্লস মানুষের দুর্দশার চিত্র আঁকতে গিয়ে বলেছেন, "আমার মতে ইতিহাসের কোন যুগেই কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়নি, প্রশাসনের সামনে বিচার বিভাগ কখনো এতটা অসহায়ত্ব বোধ করেনি, এ বিপদ অনুভব করা এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে কখনো চিন্তা করার এতটা তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়নি-যতটা আজ দেখা দিয়েছে।"

পৃথিবীর সকল নীতি নৈতিকতা, মানবাধিকার, সব উপেক্ষা করে যাকে হত্যা করা হয়েছে তিনি-একাধারে একজন রাজনীতিবিদ, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, লেখক, ইসলামী

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব ও সদালাপী প্রাণপুরুষ। বিশ্বের কোটি-কোটি মানুষের হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা আর চোখের অশ্রু সিক্ত, হয়ে আমাদের প্রাণ-প্রিয় নেতা এই ভুবন ত্যাগ করেছেন। এই দিন শুধু একজন আবদুল কাদের মোল্লাকেই হত্যা করা হয়নি, হত্যা করা হয়েছে মানবাধিকার, সত্যপন্থা, কল্যাণ সুন্দর আর ন্যায়ের প্রতীক আবদুল কাদের মোল্লাকে। যিনি নিজেই তার দীর্ঘ সাফল্যমণ্ডিত কর্মের আবিষ্কারক। যিনি ২ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে ফরিদপুর জেলার, সদরপুর উপজেলার, জরিপারডাঙ্গী, গ্রামে পিতা- মোঃ সানাউল্লাহ মোল্লা এবং মাতা বাহেরুন্নেসা বেগম এর ঘরকে আলোকিত করে এই পৃথিবীতে আগমন করেন।

মেধাবী আবদুল কাদের মোল্লা শিক্ষাজীবন শুরু করেন ১৯৫৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি লাভ করার মধ্য দিয়ে, আর প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৭৭ সালে শিক্ষা প্রশাসন থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি। সেই পথ ধরে কর্মজীবনের পরতে পরতে রাখেন সাফল্যের স্বাক্ষর। জনাব আবদুল কাদের মোল্লা ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঢাকার বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মধ্যে দিয়ে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক, এবং একই প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে। এরপর তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সংস্কৃতি কর্মকর্তা, ১৯৭৮ সালে রিসার্চ স্কলার হিসাবে বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। লেখালেখি ও সাংবাদিকতায় পারদর্শী জনাব আবদুল কাদের মোল্লা ১৯৮১ সালে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে সাংবাদিকতার পেশার সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। সেখানেও যেন হারবার নয়। তিনি ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে পরপর দুই বছর ঢাকা ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (ডিইউজে) এর সহসভাপতি নির্বাচিত হন। তিনিই তার কর্মময় জীবনের সাক্ষী। তার পরিচয় তিনি নিজেই। চলনে-বলনে, সহজ-সরল আর সাদাসিধে, বুদ্ধি-বাগ্মিতায় অসাধারণ, কর্মপ্রাণ চঞ্চলতায় যেন সর্বত্র বিরাজমান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও নিরহংকার, পরোপকারী এবং সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত। যিনি একবার তার সাহচর্য পেয়েছেন তিনি তাকে ভুলতে পারবেন না। কারাগারে অসংখ্য ভক্ত অনুরক্ত থেকে তার আচার ব্যবহারের প্রশংসা শুনেছি। দ্বীনের দায়ী হিসেবে সারা বাংলাদেশে নয়, বরং ছুটে বেড়িয়েছেন -সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাপান, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর অনেক প্রান্তে। মিথ্যা কালিমা আর ষড়যন্ত্রের কালো কাপড় কি সেই আলোকচ্ছটাকে আবৃত করতে পারে? যেই শির আজন্ম এক পরওয়ারদিগার ছাড়া কারো কাছে নত হয়নি, ফাঁসির আদেশে সেই শির দুনিয়ার কোন শক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে পারে? শাহাদাতের পূর্বে আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদের জবানীতে এমন সাহসী উচ্চারণ উদ্দীপ্ত করেছে সারা বিশ্ববাসীকে। তিনি বললেন-"বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। আমি অন্যায়ের কাছে কখনও মাথা নত করিনি, করবো না। দুনিয়ার কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রাণভিক্ষা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। জীবনের মালিক আল্লাহ। কিভাবে আমার মৃত্যু হবে তা আল্লাহই নির্ধারণ করবেন। কোন ব্যক্তির সিদ্ধান্তে আমার মৃত্যু কার্যকর হবে না। আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ীই আমার মৃত্যুর সময় ও তা কার্যকর হবে। সুতরাং আমি আল্লাহর ফয়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবো।"

www.pathagar.com

কাজেই এ দুনিয়ায় কিভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হবে এটা চিন্তার নয়। বরং আসল চিন্তার বিষয় হলো ঈমানকে কিভাবে বাঁচানো যাবে কিভাবে থাকা যাবে আল্লাহর আনুগত্যের গণ্ডির মধ্যে। যদি দুনিয়ায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঈমান হারিয়ে ফেলে তাতো বিরাট এক ব্যর্থতা। তাহলে সে ঈমানের মূল্য কী? আর ঈমান বাঁচাতে যদি দুনিয়ায় প্রাণ বিসর্জিত হয় তাহলে এ এক মহা সফলতা। এমন মৃত্যু সত্যিই গৌরবের। এই মৃত্যুকে অভিনন্দন। শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা সত্যিই অনেক সৌভাগ্যের অধিকারী। তার মর্যাদা আসলেই ঈর্ষনীয়।

সুতরাং প্রাণের জন্য উৎসর্গিত ঈমান আর ঈমানের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ বড়ই ব্যবধান। হযরত রাশেদ বিন সা'দ জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কবরে সকল মুমিনের পরীক্ষা হবে, কিন্তু শহীদের হবে না, এর কারণ কী? হুজুর (সা.) জবাবে বলেন, তার মাথার ওপর তলোয়ার চমকানোই তার পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট।' জন্ম থেকে শাহাদাত পর্যন্ত জনাব আবদুল কাদের মোল্লা একটা নাম, একটি প্রেরণা,একটা জীবন্ত ইতিহাস। রাজনীতি সচেতন জনাব আবদুল কাদের মোল্লা অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই তিনি কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি এ সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকার পর মাওলানা মওদূদী (র) লিখিত তাফহীমুল কুরআন পড়ে আলোকিত জীবনের সন্ধান পেয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ছেড়ে তিনি তৎকালীন সময়ে মেধাবী ছাত্রদের সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ পূর্বপাকিস্তান শাখায় যোগদান করেন। চৌকস নেতৃত্বের অধিকারী জনাব মোল্লা ছাত্রসংঘের শহীদুল্লাহ হল সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি, ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারি ও একই সাথে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে জামায়াতে যোগ দেন এবং সর্বশেষ তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

জনাব আবদুল কাদের মোল্লা বিভিন্ন মেয়াদে চার চারবার কারাবরণ করেছেন। আইয়ুব সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের দায়ে ১৯৬৪ সালে প্রথমবারের মত তিনি বাম রাজনীতিক হিসেবে গ্রেফতার হন। ১৯৭২ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন কিন্তু স্থানীয় জনতার বিক্ষোভের মুখে পুলিশ তাকে স্থানীয় পুলিশ স্টেশন কাস্টোডি থেকেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়! জেনারেল এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কারণে আবদুল কাদের মোল্লাকে আবারও আটক করে রাখা হয়। পরে উচ্চ আদালত তার এ আটকাদেশকে অবৈধ ঘোষণা করলে চার মাস পরে তিনি মুক্ত হন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন করায় তৎকালীন বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে আটক করে।

যাকে তথাকথিত যুদ্ধাপরাধী বানিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তিনি যুদ্ধাপরাধ তো দূরের কথা স্বাধীনতার স্বপক্ষে একজন যোদ্ধার প্রস্তুতিই নিয়েছেন। এবার শুনুন জনাব আবদুল কাদের মোল্লা সেইফ হোমে জিজ্ঞাসাবাদের '৭১ সালে তার ভূমিকা নিয়ে যা বললেন তিনি- "২৩ মার্চ, ১৯৭১ ওই দিন আমরা ১২টার সময় জেসিও সম্ভবত উনার নাম ছিল মফিজুর রহমানের ডাকে আমরা বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ পড়ুয়া ছাত্র এবং স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র একত্রিত হই। মফিজুর রহমান সাহেব আমাদেরকে বললেন, তিনি বিকাল থেকেই

www.pathagar.com

আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দেবেন এবং সেই লক্ষ্যে তিনি কিছু কাঠের তৈরি ডামি রাইফেল জোগাড় করেছেন। তিনি আরো বললেন, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। তাই আমাদেরকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। আমরা ওইদিন বিকালে তার পরামর্শ মতো ৩০/৪০ জন একত্রিত হই। তিনি প্রাথমিক পরীক্ষা নেয়ার পর ২/১ জন বাদে প্রায় সবাই প্রশিক্ষণ নেবার জন্য মনোনীত করেন এবং ঐদিন থেকেই আমরা পিটি, প্যারেড শুরু করি। তিনি প্রথম তিন দিন আমাদেরকে ডামি রাইফেল দেন নাই। পরে ২০/২১টি ডামি রাইফেল আমাদেরকে দেন এবং এই রাইফেলগুলো দিয়েই আমরা প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে থাকি।"

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। কিন্তু রাতের একান্তে নিভৃতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের বিবেককে যদি প্রশ্ন করেন, আপনি কি কসাই কাদেরকে হত্যা করেছেন? আমার মনে হয়, উত্তর হবে 'না'। আপনি জামায়াত নেতা কাদের মোল্লাকে হত্যা করেছেন। যিনি এখন আপনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। এক সময় তিনি আপনার রাজনৈতিক মিত্র ছিলেন। একসময় একান্ত নিভৃতে ডেকে রাজনৈতিক সলা-পরামর্শও করেছেন তার সাথে। আবদুল কাদের মোল্লা সেইফ হোমে জিজ্ঞাসাবাদেও বলেছেন- "১৯৯৬ সালের জুন মাসের নির্বাচনে জামায়াত এবং বিএনপি আলাদাভাবে নির্বাচন করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একপর্যায়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং আমাকে বললেন আমরা তো সরকার গঠন করলাম, আমাদের কিছু পরামর্শ দেন। বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দীন খান আলমগীর মুখ্যসচিব ছিলেন এবং তিনি আমাকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে রিসিভ করেন। আমি তখন প্রধানমন্ত্রীকে কিছু গঠনমূলক পরামর্শ দেই যা শুনে তিনি আমাকে সাধুবাদ দেন। একইভাবে তিনি পরে আমাকে আরো দুবার ডেকেছিলেন। এখন আমি মনে করছি দীর্ঘদিন যাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন করলাম, মিটিং মিছিল করলাম, সুসম্পর্ক রাখলাম, সখ্যতা রেখে চলেছি তারা এখন শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য দীর্ঘ ৪০ বছর পর আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জাতির জিজ্ঞাসা যে কুখ্যাত, হত্যাকারী, কসাই কাদের কে জাতি চিনত, তাহলে আপনি কি সেই কসাই কদেরের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন? আমরা রাজনৈতিক চোরাবালিতে এতটাই আটকে গেছি তা সত্যিই জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। শেখ হাসিনা আজ তার শত্রু কাদের মোল্লাকে হত্যা করেছেন শুধু রাজনৈতিক কারণে আর প্রভুদের খুশি করতে। আর বিরোধীদলীয় নেত্রী আজ তার রাজনৈতিক জোট মিত্র কাদের মোল্লার মৃত্যুতেও প্রকাশ্য সমবেদনা জানাতে পারেননি, তাও রাজনৈতিক কারণেই। যদিও হয়ত তিনি ব্যথিত। শেখ হাসিনার হয়ত এখন বিস্মিত!! কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে এত কুরটনার পর তিনি যে আজ পৃথিবীবাসীর নিকট বিখ্যাত আর এত জনপ্রিয়। ফরিদপুরের গ্রামের আবদুল কাদের মোল্লার মৃত্যু এখন সারা পৃথিবীর মুসলিম উম্মাহর প্রেরণা। যিনি অর্থবিত্তে ধনী অথবা দুনিয়ার ক্ষমতাশালী কোন ব্যক্তিও ছিলেন না। কিন্তু এমন সৌভাগ্য জীবনের অধিকারী তিনি হলেন সারা পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার গায়েবানা জানাজায় অংশ গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছে। কেয়ামত পর্যন্ত কোটি মুসলমান তার জন্য দোয়া করতে থাকবে। তাহাজ্জুতে চোখের পানিতে জায়নামাজে ভাসাবে। এমন গৌরবের মৃত্যু কতজনের ভাগ্যে জোটে!! আর এদেশের মানুষ অনেক জাতীয় নেতার মৃত্যুও দেখেছে, ভালো করে জানাযা পড়ার লোকও আসেনি। আইন করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকা যায়, স্যালুট আদায় করা যায়, কিন্তু মানুষের ভালবাসা অর্জন করা যায় না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি, যে কারাগারে আপনি আবদুল কাদের মোল্লা কে বছরের পর বছর আটকে রেখেছিলেন, সেই কারাগারের কর্তৃপক্ষ যাদের কে দায়িত্ব দিয়েছেন মোল্লা সাহেবের খেদমত কারার জন্যে তাদেও অনুভূতির কথা। অবাক হয়ে যাবেন এই মানুষগুলোর কথা শুনলে! আপনি অবাক হবেন তাদের কান্না দেখলে! কাদের মোল্লার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আর ভালবাসা দেখলে! আমি কারাগারে কিছু দেখে এসেছি। আবদুল কাদের মোল্লাকে যেদিন কাশিমপুর থেকে ফাঁসির রায় কার্যকরের জন্য ঢাকা আনা হয়েছে, সেদিন পৃথিবীবাসীর সাথে অসংখ্য হাজতি-কয়েদি নির্বাক হয়ে চোখের পানি ঝরিয়েছে। এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা কয়জনের ভাগ্যে জোটে? আবদুল কাদের সাহেবের কারাসঙ্গীরা তার মৃত্যুর বেদনায় এখন কাতরাচ্ছে! চাঁদা তুলে গোশত বিতরণ করে তার জন্য দোয়া করছে।

কিন্তু বেদনার হচ্ছে আবদুল কাদের মোল্লার সন্তানেরা আর আব্বা বলে কাউকে ডাকতে পারবে না। সহধর্মিণী আর স্বামী ফিরে পাবেন না। কিন্তু চোখের পানি কি বৃথা যাবে? বায়তুল্লাহর পবিত্র গেলাপ ধরে রোনাজারি, আর সারা পৃথিবীর ব্যাপী আহাজারি ফরিয়াদ কথা বলবে। আমরা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাই, তার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে যেভাবে ধৈর্যের পাহাড় রচনা করেছেন তার বিনিময়ে আল্লাহ যেন তাদের কে জান্নাতে একসাথে থাকার সুযোগ করে দেন। কারণ শহীদেরা ৭০ জন পর্যন্ত সুপারিশ করে জান্নাতে নিতে পারবে। শহীদ পরিবারের জন্য এটি মাবুদের পক্ষ থেকে সুসংবাদ।

"আন্তর্জাতিক সংস্থা ও পরিবারের দাবি : বিচার বিভাগের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কাদের মোল্লাকে হত্যা করা হয়েছে- এমনই মন্তব্য করেছেন কাদের মোল্লার আইনজীবী, পরিবারের সদস্য, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহল ও বিভিন্ন সংস্থা। কথিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গত বছর ৫ ফেব্রুয়ারি জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইন সংশোধন করে আপিল করে সরকার। আপিল বিভাগের দ্বিধাবিভক্ত রায়ের ভিত্তিতে গত ১৪ ডিসেম্বর রাতে তড়িঘড়ি করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়। কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় হওয়ার পর থেকেই জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সংস্থা রায়ের বিষয়ে প্রশ্ন তুলে তা কার্যকর করা থেকে সরকারকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের কথিত অভিযোগে আটক, বিচার প্রক্রিয়া, সরকার পক্ষের অনুসন্ধান ও তথ্য-প্রমাণ, তদন্ত কর্মকর্তা ও সরকারি আইনজীবীদের আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা, বারবার আইন সংশোধন করে ফাঁসির উপযোগী করা, অপরাধ নয় আওয়ামী লীগ ও শাহবাগীদের দাবিই বিচার্য বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করা, সাক্ষী নিয়ে সরকার পক্ষের লুকোচুরি খেলাসহ ফাঁসির রায় আদালতে সরকার পক্ষের জবরদস্তিমূলক আচরণে বিচারের মানদণ্ড নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা। ফরিদপুরের আবদুল

www.pathagar.com

কাদের মোল্লাকে মিরপুরের কুখ্যাত কসাই কাদের রূপ দিয়ে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পর আইনজীবীরা আদালত ও সরকার পক্ষের কাছে যেসব প্রশ্ন করেন কোনো উত্তর পাননি সেগুলো হলো- আদালতে মোমেনা পরিচয় দিয়ে যে মহিলা কাদের মোল্লার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি একাত্তরে নির্যাতিতা ও স্বজন হারানো মোমেনা নন। প্রকৃত মোমেনা আদালতে সাক্ষ্য দিতেই আসেননি। মিরপুরের 'কসাই কাদের' ও ফরিদপুরের মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডারের বাসায় থাকা কাদের মোল্লা এক ব্যক্তি নন। কাদের মোল্লা যদি মিরপুরের বহুল আলোচিত 'কসাই কাদের' হন তাহলে তিনি কী করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলে থেকে পড়া লেখা করে ৭১ সালে পাস করে বের হন? মেধাবী ছাত্র হিসেবে স্বীকৃতির পর কি করে সরকার তাকে ওই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে উদয়ন স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ দেন? মাত্র এক বছর পর প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার মর্যাদায় তাকে কি করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক পদে চাকরি দেয়া হয়? কোনো সাক্ষীই নিজ চোখে আবদুল কাদের মোল্লাকে একাত্তরে অপরাধ করা তো দূরের কথা, মিরপুর এলাকাতেই দেখেননি। শোনা কথার ভিত্তিতে ও ধারণামূলক বক্তব্যের ভিত্তিতে কাউকে ফাঁসি দেয়া যায় কি? এসব প্রশ্নের জবাব এখনও পাওয়া যায়নি।

বিচারকদের নিয়ে প্রশ্ন-আপিল বিভাগের বিচারপতি এসকে সিনহা ও শামসুদ্দীন চৌধুরী মানিকের বিরুদ্ধে বিচারের শুরুতেই আপত্তি পেশ করেন কাদের মোল্লার আইনজীবীরা। আলোচিত স্কাইপ কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, বিচারপতি এসকে সিনহা বিচারবহির্ভূতভাবে জামায়াত নেতাদের ফাঁসি দেয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের প্রভাবিত করেন। তিনি ট্রাইব্যুনালের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমকে ফাঁসির রায় দেয়ার বিনিময়ে আপিল বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়ারও আশ্বাস দেন। স্কাইপ কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশিত বিচারপতি এসকে সিনহার এ ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম। সেই সঙ্গে এ কথোপকথন প্রভাবশালী ম্যাগাজিন দি ইকোনোমিস্ট-এ প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত, সেনাসমর্থিত ওয়ান-ইলেভেন সরকারের আমলে পদত্যাগের জন্য বঙ্গভবনে চায়ের দাওয়াত পেয়েছিলেন এ বিচারপতি। অপরদিকে বিচারপতি শামসুদ্দীন চৌধুরী মানিক জামায়াত নেতাদের ফাঁসির দাবিতে সভা-সমাবেশও করেছেন। জামায়াত নেতাদের ফাঁসির দাবিতে লন্ডনে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা সভায় তিনি বক্তব্যও দিয়েছেন। যা বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। এসব ঘটনা উল্লেখ করে আপিল বিভাগে আপত্তি দেয়ার পরও বিচার কাজে অংশ নেন আলোচিত এ দুই বিচারপতি। আইনজীবীরা বলেন, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী একজন বিচারককের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক ন্যায় বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা করে আবেদন করলে সেই বিচারক নিজ থেকেই সরে পড়েন। ওয়ান-ইলেভেন সরকারের সময় সংসদ ভবনের বিশেষ কোর্টে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচারের সময়ও আওয়ামী লীগের আইনজীবীরা সংশ্লিষ্ট বিচারকের প্রতি ন্যায়বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করে অনাস্থা আবেদন করেছিলেন। বিচারক তাৎক্ষণিকভাবেই বিচারকাজ থেকে সরে দাঁড়ান। সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে অনাস্থা দেয়ার পরও বিচারপতি এসকে সিনহা ও বিচারপতি শামসুদ্দীন চৌধুরী মানিক আপিল বিভাগে কাদের মোল্লার আপিল শুনানিতে অংশ নেন। পরে আপিলের রায়ে দেখা যায় যে, এই দুজনই কাদের মোল্লার ফাঁসির রায়ের পক্ষে মত দেন। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান

www.pathagar.com

অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, কাদের মোল্লা শুধু ন্যায় বিচার থেকেই বঞ্চিত হননি। হত্যার শিকারে পরিণত হয়েছেন। মিরপুরের কসাই কাদের আর ফরিদপুরের কাদের মোল্লা এক ব্যক্তি নন। তথ্য প্রমাণসহ আইনজীবীরা এ দাবি করেন। হাসবে মিরপুরের কসাই কাদের-'আমি ফরিদপুরের কাদের মোল্লা। সরকার আমাকে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে হত্যা করতে যাচ্ছে। আমার হত্যাকাণ্ডের পর আমি কিয়ামত পর্যন্ত কাঁদতে থাকব। আর হাসবে মিরপুরের কসাই কাদের'। কথাগুলো আবদুল কাদের মোল্লার। আওয়ামী লীগ নেতা ও সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনির মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে দেয়া একটি ছোট্ট চিঠিতে এমন অনুভূতিই প্রকাশ করেছিলেন কাদের মোল্লা। সরকার তাকে মিরপুরের কুখ্যাত কসাই কাদের সাজিয়ে হত্যা করতে যাচ্ছে এমন কথাই বলেছেন তিনি। গোলাম মাওলা রনি তার এ চিঠিটি ফেসবুকে ছেড়ে দেয়ার পর বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায় তা। (সুত্র : দৈনিক আমার দেশ) কাদের মোল্লা আর কসাই এক ব্যক্তি নন। এমন বক্তব্য দিয়ে মিডিয়ায় ঝড় তুলেছেন আওয়ামী লীগের সাংসদ গোলাম মাওলা রনি। এমন সত্য উপলব্ধির জন্য তাকে সাধুবাদ জানাই।

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা ভাইয়ের সাথে অসংখ্য স্মৃতি আজ নাড়া দেয় প্রতিনিয়ত। ২০০৯ সালে আবদুল কাদের মোল্লা ভাই সৌদি সরকারের রয়েল গেস্ট হিসেবে আর আমি ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে পবিত্র হজ্জ পালন করতে যাই। মোল্লা ভাইয়ের সাথে মদিনায় সাক্ষাৎ। তার সফর ছিল সংক্ষিপ্ত। তাই মদিনায় একটি কমিউনিটি সেন্টারে একটি মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মোল্লা ভাই ছিলেন প্রধান অতিথি আর আমি ছিলাম বিশেষ অতিথি। অনুষ্ঠানে আমি যখন সারাদেশে আমাদের ভাইদের উপর জুলুম নির্যাতন এবং শহীদ ভাইদের ঘটনা বর্ণনা করছিলাম তখন উপস্থিত সবাই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। আমি মোল্লা ভাইকে অনেকবার চোখের পানি মুছতে দেখেছি। আলোচনায় তিনি বললেন "বাংলাদেশে শিবিরের যুবক-তরুণেরা জীবন দিচ্ছে দ্বীনের জন্য। সুতরাং আপনারা শুধু দান খয়রাত করলে মুক্তি পাবেন না। কারণ আপনারা এমন জায়গায় আছেন যেখানে রাসূল (সা) শুয়ে আছেন। বদর, ওহুদ, সব এখানেই। সুতরাং দ্বীনের পথে ত্যাগ কুরবানী ছাড়া আমাদের মুক্তি মিলবে না।" আজ তিনি নিজেই সারা পৃথিবীর মুসলিম উম্মাহর কাছে একটি প্রেরণা, একটি ইতিহাস, এই দুঃসাহসিক দুর্জয় পথে দুরন্ত সাহস।

শাহাদতের জন্য মোল্লা ভাইয়ের মন কেমন পাগলপারা ছিল এই ঘটনা থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর পল্টন ট্র্যাজেডি প্রতি বছরই এই দিবসটি অত্যন্ত মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিনই সবাই কাঁদবে আওয়ামীলীগ বৈঠার আঘাতে যারা শহীদ আর গাজী মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে তাদের জন্য। আর খুনিরা কেয়ামত পর্যন্ত মানবতার অভিশাপ পেতে থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। খুব সম্ভব ২০০৯ সালের ২৮ অক্টোবর ইঞ্জিনিয়ারস ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ইসলামী ছাত্রশিবির আয়োজন করে আলোচনা সভার। সকল অতিথিবৃন্দ উপস্থিত, আলোচনা সভা শুরু হয়ে গেছে। ঠিক মাঝখানে আমাদের প্রিয় মোল্লা ভাই প্রোগ্রামে এসে হাজির। আমি দাঁড়িয়ে রিসিভ করে বললাম সরি মোল্লা ভাই আপনি আসছেন এ জন্য মোবারকবাদ। কারণ মোল্লা ভাই আমাদের দাওয়াতি মেহমানের মধ্যে ছিলেন না। তবু তিনি নিজ উদ্যোগে আলোচনা সভায় হাজির হয়েছেন। বলতে না

www.pathagar.com

বলতে তিনি বললেন, শুন ২৮ অক্টোবর ২০০৬ আমি ঐ প্রোগ্রামে অনুপস্থিতির বেদনা আমাকে সব সময় তাড়িয়ে বেড়ায়। পল্টনে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। যেখানে আমাদের ভাইয়েরা শহীদ আর গাজী হয়েছে। ঐ দিন আমি ঢাকায় ছিলাম কিন্তু আমীরে জামায়াত আমাদের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে সব খোঁজ খবর রাখতে বললেন। এই জন্য আমি পল্টনে ছিলাম না। সেদিনের এই অনুপস্থিতির বেদনা থেকে তোমাদের দাওয়াত না পেয়েও বেদাওয়াতে এখানে উপস্থিত হয়ে গেলাম। এই কথাগুলো মোল্লা ভাই স্টেইজে বসে বসে বললেন। তখন বুঝতে পারিনি কিন্তু আজ সারা পৃথিবী জানে তিনি কত গভীরভাবে শাহাদাতের চেতনাকে লালন করতেন। মোল্লা ভাইয়ের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মোল্লা ভাই আল্লাহর দরবারে তার মৃত্যু যেন বৃহস্পতিবারে হয় তার কামনা করতেন। আর তার নামাজে জানাজা যেন তাহাজ্জুতের সময় হয়। বলুন তো আবেদন শুনে আমার কাছে জটিলই মনে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই প্রিয় বান্দার সেই ফরিয়াদও কবুল করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। এই সরকার তার ফাঁসি প্রথম দিন ১১ ডিসেম্বর কার্যকর করতে চেয়েছিল কিন্তু তা আদালতের নির্দেশের কারণেই হয়নি। কিন্তু তার ফাঁসি ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারই হয়েছে। আল্লাহ তার প্রিয় বান্দার ফরিয়াদ অনুসারে বৃহস্পতিবার রাত ১০.০১ মিঃ বান্দার ফরিয়াদ কবুল করে শাহাদাদের অমিয় সুধা পান করালেন।

দ্বিতীয়ত জানাজার নামাজ প্রশাসন ফরিদপুরে ৫টার সময় ঠিক করেছে। কিন্তু শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার কফিন আগেই পৌঁছে যাওয়ায় তার নামাজের জানাজা ৪টার সময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দার ফরিয়াদ অনুসারে তাহাজ্জুতের সময়েই তাকে মাবুদের সান্নিধ্যে তুলে নিলেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার ভাই সত্যই শাহাদাতের জন্যই তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন।

এই জালেম সরকার তার পরিবারকে মোল্লা ভাইয়ের কফিন শেষবারের মত দেখতে সুযোগ দিল না। অংশগ্রহণ করতে দিল না তার জানাজায়। মোল্লা ভাইয়ের ফাঁসির পর পরই তার পরিবার আত্মীয় স্বজন যখন মগবাজারের বাসা থেকে ফরিদপুরের উদ্দেশে রওয়ানার জন্য বের হয়েছে ঠিক তখনি ছাত্রলীগ, যুবলীগ পুলিশ একযোগে তাদের বাসার সামনে গাড়ির বহরে হামলা চালিয়ে আহত করে অনেককেই। শুধু তাই নয় পুলিশ আহতদের উল্টো গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এভাবে চলতে থাকে গভীর রাত পর্যন্ত। এতে শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা ভাইয়ের স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন কেউ-ই শেষ বারের মত আর তাকে দেখতে পেল না। মানুষ কত নিষ্ঠুর, কত পাষাণ, কতটুকু পশুর মত হলে এমন আচরণ করতে পারে? কিন্তু এমন অবস্থায়ও মোল্লা ভাইয়ের সহধর্মিণীর ধৈর্য আমাকে হতবাক বানিয়ে দিল! বাসায় হামলার ঐ মুহূর্তে আমি ফোন দিলাম ভাবীকে উনারা ফরিদপুরে যাবেন কিনা, কারণ গাড়ি তদারকির দায়িত্ব আমার ছিল। উত্তরে অবিচল স্বাভাবিককণ্ঠে আমাকে বললেন, এই পরিস্থিতি আমি ছোট বাচ্চা, ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে যাবো কিভাবে? যারা আমাদের নিরাপত্তা দেয়ার কথা বলেছে তারা আমাদের ওপর হামলা করছে। যাকে আল্লাহ কবুল করার সেতো চলে গেছে এখন আর যেয়ে কী হবে? তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠে এই কথাগুলো বলছেন আর আমি চোখের পানি মুছছি। আর ভাবছি আল্লাহ যাকে ধৈর্য দান করে শুধু তারাই ধৈর্যধারণ করতে পারে। নচেৎ এমতাবস্থায় সবর করা কঠিন নয় কি?

www.pathagar.com

সত্যিই, জনাব আবদুল কাদের মোল্লাসহ আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদদের ঈমানী দৃঢ়তা দ্বীনের পথিকদেরকে উৎসাহিত করছে। জনাব আবদুল কাদের মোল্লা ভাইয়ের মৃত্যু পরওয়ানা জারি করার পরও কিন্তু দ্বীনের এই মুজাহিদকে এতটুকু হতাশাও আচ্ছন্ন করতে পারেনি, আলহামদুলিল্লাহ। এই জাতীয় সাহসী বীর মুজাহিদ এখন মাওলানা মওদূদী, সাইযেদ কুতুব, আর হাসান আল বান্নার কাতারে দন্ডায়মান। দ্বীনের পথে সংগ্রামরত বিশ্বের অসংখ্য মুজাহিদের জন্য এগিয়ে যাবার প্রেরণা। শাহাদাতের রাতে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের জনাব আবদুল কাদের মোল্লা তার স্ত্রী পুত্র, মেয়ের কাছ থেকে এভাবেই শেষ বিদায় নিয়েছিলেন, "আমি তোমাদের অভিভাবক ছিলাম। এ সরকার যদি আমাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাহলে সেটা হবে আমার শাহাদাতের মৃত্যু। আমার শাহাদাতের পর মহান রাব্বুল আলামীন তোমাদের অভিভাবক হবেন। তিনিই উত্তম অভিভাবক। সুতরাং তোমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। ইসলামী আন্দোলনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে আমার হত্যার প্রতিশোধ নিও। শুধুমাত্র ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধেই আমাকে হত্যা করা হচ্ছে। শাহাদাতের মৃত্যু সকলের নসিবে হয় না। আল্লাহতায়ালা যাকে শহিদী মৃত্যু দেন সে সৌভাগ্যবান। আমি শহিদী মৃত্যুর অধিকারী হলে তা হবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। আমার প্রতিটি রক্তকণিকা ইসলামী আন্দোলনকে বেগবান করবে ও জালেমের ধ্বংস ডেকে আনবে। আমি নিজের জন্য চিন্তিত নই। আমি দেশের ভবিষ্যৎ ও ইসলামী আন্দোলন নিয়ে চিন্তিত। আমি আমার জানামতে কোন অন্যায় করিনি।

পরিবারের সদস্যদের তিনি আরও বলেন, তোমরা ধৈর্যের পরিচয় দেবে। একমাত্র ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমেই আল্লাহতায়ালার ঘোষিত পুরস্কার পাওয়া সম্ভব। দুনিয়া নয়, আখেরাতের মুক্তিই আমার কাম্য। আমি দেশবাসীর কাছে আমার শাহাদত কবুলিয়াতের জন্য দোয়া চাই। দেশবাসীর কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিও। বিদায় বেলায় স্ত্রীর সঙ্গে শেষ কথা বলেন তিনি, 'ধৈর্য ধরো, আল্লাহর ওপর ভরসা রেখো। তোমার হক যথাযথভাবে আদায় করতে পারিনি বলে ক্ষমা করে দিও।' প্রতি-উত্তরে স্ত্রী বলেছেন- 'দীর্ঘদিন কারাবন্দি থাকায় আপনার সেবা করতে পারিনি। বিদায়বেলায়ও পাশে থাকতে পারছি না। জীবন চলার পথে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কোন অন্যায় হয়ে থাকলে মাফ করে দিবেন।' এ সময় খানিকটা আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হলেও কাদের মোল্লা ছিলেন দৃঢ়, অবিচল।" এই দৃঢ়চিত্ততা কেবল আল্লাহর উপর ভরসাকারী ঈমানদারগণই দেখাতে পারেন। কারণ তারা জান্নাতের বিনিময়ে দুনিয়ার সব বিসর্জন দিতে পারে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়। হযরত উম্মে হারেসা বিনতে সারাকা থেকে বর্ণিত, "তিনি হুজুর (সা.) এর দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি হারেসা সম্পর্কে কিছু বলবেন না? জঙ্গে বদরের পূর্বে একটি অজ্ঞাত তীর এসে তাঁর শরীরে বিঁধে যায় এবং তিনি শহীদ হন। যদি তিনি জান্নাতবাসী হয়ে থাকেন তাহলে আমি সবর করবো, অন্যথায় প্রাণ ভরে কাঁদব। হুজুর (সা.) জবাব দিলেন, হারেসার মা, বেহেশতে তো অনেক বেহেশতবাসীই রয়েছেন, তোমার ছেলে তো সেরা ফেরদাউসে রয়েছেন।"

সারা পৃথিবীতে আজ মুসলমানরা নির্যাতিত। বিশেষ করে আজ জামায়াত ও ইখওয়ান এই দুটি আন্দোলন সবচেয়ে বেশি মজলুম। উভয় সংগঠনই কঠোর পরীক্ষা ও প্রতিকূলতার বিভিন্ন মনজিল অতিক্রম করেছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, দুনিয়াতে হকের বিজয়ের জন্য যখনই কোন

www.pathagar.com

ব্যক্তি বা দল সাহসিকতার সাথে মাথা উঁচু করেছে তখনই তাদেরকে এসব মনজিল অতিক্রম করতে হয়েছে। ইখওয়ানের প্রথম মুর্শিদে আমকে তার পূর্ণ যৌবনে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে যেরূপ নির্দয় ও হৃদয়বিদারক ভাবে হত্যা করা হয়। আবদুল কাদের আওদা শহীদ ও তার সংগীদেররক ১৯৪৫ সালে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে। এসব অমূল্য জীবনের অকাল পরিসমাপ্তি শুধুমাত্র নীল উপত্যকারই ক্ষতি হয়নি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ অদ্যাবধি এ ক্ষতির জন্য তড়পাচ্ছে। বাংলাদেশেও হয়ত একদিন শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার মৃত্যু নিয়ে অনেক অনুশোচনা করবে। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন একটি কঠিন সময় অতিক্রম করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমান প্রবাহ আমাদের জীবনে নতুন হলেও আন্দোলনে তা অনেক পুরাতন। কুরআন, হাদীস, রাসূলের সিরাত, সাহাবীদের জীবনী অধ্যয়ন করলে আমাদের সামনে সেই ইতিহাস প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ১৯৮২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী বামদের হামলায় নবীনবরণে ছাত্রশিবিরের ৩ জন শাহাদাত আর অসংখ্য আহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে ১৫ই মার্চ সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায় শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা "শোক করিয়া লাভ নাই, শহীদি খুনের নজরানা চাই" এই শিরোনামে লিখেছিলেন -"আমি কিন্তু এত হিংস্রতা, এত নিষ্ঠুরতা, এতটা অমানবিক আচরণে মোটেই বিস্মিত হই নাই। তিনজন শহীদের জন্য শোক করারও তেমন কিছু দেখি না। বরং অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, আমার মনে হইয়াছে ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই অগ্রসর হইতাছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, পশুত্বের বিরুদ্ধে মানবতার অমানুষদের বিরুদ্ধে মানুষের সর্বোপরি কুফরির বিরুদ্ধে ইসলামের সংগ্রামের ইতিহাসের এইভাবেই রক্তের অক্ষরে লেখা। কোন নবীই এই পথ এড়াইতে পারেন নাই, কোন মুজাদ্দিদের জন্যই ভিন্ন পথ ছিল না। কোন ইমামও অন্য প্রকার পুষ্প আচ্ছাদিত পথের কথা চিন্তাও করেন নাই। সুতরাং এই যুগেও যাহারা ঐ একই পথের যাত্রী বলিয়া দাবি করেন তাহাদের পথ ভিন্নতর কিছু হইবে কেমন করিয়া। ইসলামের গোটা ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে যেন আমার মনে হয় ইসলাম নামক শ্যামল সতেজ গাছের রং সারের অভাবে যখনই ফিকাব পিঙ্গল হইয়া গিয়াছে তখনই শহীদের তাজা রক্তের সার দিয়া গাছটিকে আরো তরতাজা করিয়া ফুলে ফলে সুশোভিত করা হইয়াছে। সুতরাং ভয়ের কিছু নাই। শঙ্কার কিছু নাই। আক্ষেপের কিছু দেখতেছি না বরং দিব্যদৃষ্টিতে যেন দেখতেছি এই দেশেই ইসলামের কালেমা খচিত বিজয়ী মিনারের চূড়ায় পতপত করিয়া উড়িতেছে।" যিনি এমন ঐতিহাসিক কথাগুলো লিখেছেন তিনি নিজেই আজ বিশ্বের খবরের পাতায় শিরোনাম। তিনি নিজেই তার জীবন উৎসর্গ করে সত্যের সাক্ষী হয়ে গেলেন আজ।

শহীদেরা তাদের মাবুদের সাথে তামাম জিনিসের বিনিময় করে শুধু একটি বাক্যের ভিত্তিতে "রাদিয়া আল্লাহু আনহুম অরাদু আন্হ"। যারা এই মহৎ কাজে নিজেদের জান-মাল, পিতা, পুত্র, ভাই বেরাদর, স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের মায়া এবং ঘরের আরাম-আয়েশ, বিলাস ব্যসন সবকিছুই বিসর্জন দিতে পারে, তাদের চেয়ে বেশি আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের অধিকারী আর কে? সাফল্য ও বিজয়ের সিংহদ্বার তাদের জন্য ছাড়া আর কার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে? তাদের শক্তির উৎস অনেক গভীর থেকে প্রোথিত। শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা ১৮৮২ সালে শহীদ দিবস উপলক্ষে লিখেছেন:- মানুষকে যদি মানুষের মত বাঁচিতে হয় তাহা হইলে এই মানুষ খেকো আদর্শকে দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্ত হইতে চিরতরে উৎখাত করিতে

www.pathagar.com

হইবে, নির্মূল করিতে হইবে। এই রক্তপিপাসু অনুসারীদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে গড়িয়া তুলিতে হইবে প্রতিরোধ। বাংলার প্রতিটি জনতাকে এই বন্য আদর্শের আসল চেহারা আর অনুসারীদের আসল চরিত্র বুঝাইতে হইবে। দেশকে বাঁচাইতে হইলে সর্বোপরি ঈমান আকিদা লইয়া বাঁচিতে চাহিলে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সাথে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। ঈমানদার প্রতিটি মানুষকে আজ অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। অন্যথায় শুধু বুক চাপড়াইয়া শহীদদের জন্য শোক করিয়া কোন লাভ নাই। আজ গজলের কলিগুলি বড় আবেগে-আপ্লুত কণ্ঠে গাহিতে ইচ্ছা করিতেছে-

"তোরি দেশের বাঁকে বাঁকে
লক্ষ্য শহীদ আজো ডাকে
তবুও কি তুই রইবি বেহুঁশ
আজি একথার জবাব যে চাই।"

জবাব দিতে হইলে মুখের কথায় অথবা মিটিং মিছিল আর প্রতিবাদ সভায় কাজ হইবে না। ঈমানের আলোতে প্রজ্বলিত বক্ষের তাজা শহীদি খুনের নজরানা চাই। আজ জীবিত আবদুল কাদের মোল্লার চাইতে শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা অনেক বেশি শক্তিশালী। জেল-জুলুম-নির্যাতন, হত্যা, গুম, খুন চালিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যায় না, বরং দ্বীনের বিজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। যারা আবদুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করে এদেশকে কলোনিভুক্ত করার স্বপ্ন দেখছে, শহীদদের রক্তের শপথ নিয়ে বাংলার তৌওহীদি জনতা তা বুখে দাঁড়াবে ইনশাল্লাহ। হে আরশের মালিক তুমি শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাসহ সকল শহীদকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দাও। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে এই জমিনকে দ্বীনের জন্য কবুল করো, আমাদেরকে তাদের দেখানো পথে কবুল করো। ইহকালের একই কাফেলায় আমরা যেমনি ছিলাম, জান্নাতেও তেমনি থাকার তাওফিক দিও।

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

প্রিয়তমা জীবনসাথী বোনটি,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আমার পূর্বের বার্তা প্রকাশিত হওয়ার পর খুব সম্ভব ~~[illegible]~~ আলকায়েদা-র আমীরদের থেকে কোন সংবাদ পৌঁছানোর পরই তারা সেটা আমাদের দিতে পারে। এটাই নিয়ম।

সরকারের মতামত কোন বিষয় না। তাই কোন সময় তারা এই বন্দীবিনিময় দ্রুত করে ফেলার উদ্যোগ নিতে পারে। আমার মনে হচ্ছে তারা ব্রিটিশ নির্বাচনের পূর্বে চাইবে না। যদি হয়েও তাহলে তাদের নীতির কোন পরিবর্তন হওয়ার দুনিয়াবী দৃষ্টিতে কোন সম্ভাবনা নেই। ~~[illegible]~~ তাহলে আমাদের যদি নিতেই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ইংল্যান্ড-বিরোধী এর সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ~~[illegible]~~ তাহলে ভিন্ন কথা। অন্য-আমাদের [illegible] চিন্তা নিয়মানুযায়ী [illegible]

এসিভিটি-ডব্লিউ এস

www.pathagar.com

২

না। অনেক সময়েও যে যন্ত্রণার
কারণ হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ
হযরত (সঃ) এর সাহাবাদের বেলায় একাধিক
বার এমন সাহাবীদের মৃত্যু নিশ্চিত
জেনে হত্যা করেছে। আল্লাহ অবশ্য
ঐ সমস্ত সাহাবাদের শাহাদাত সত্য
ও ইসলামী বিপ্লবের কাজে ত্বরান্বিত
করেছেন। আমার জানামতে আল্লাহর
কি করেছেন তা তো আমার জানা
নেই।

অতএব আশা করছি, তোমরা ধৈর্য-সহিষ্ণু মুক্তির
দিন এলে আন্তরিক দোয়ায় শুভ সাহায্য
দেন নাই ইসলামী আন্দোলন মুজাহিদদের
কাছেও দিয়েছিল। এমন মর্মান্তিক ঘটনা এর
জামায়াত কর্মীরা অনেক আমার দেশে
দেখিয়েছেন। এত কুরবানী
যে জামায়াত এর কর্মীরা
এবং বিশেষ ত্যাগের স্মৃতি রক্তঝরা
স্মৃতিতে সংরক্ষিত। আমি যে তোদের
থেকে বলে আসছি, আমাদের বিরুদ্ধে
সমস্ত ষড়যন্ত্র পাকিস্তান আছে, একাত্তর

www.pathagar.com

৬

সবাই দুটোই করেছে একসাথে হয়। আওয়ামী
চাইলেও সময়ের স্রোত পেছনে ফেরাতে পারবে না। কারণ
তাদের ভেতরের কাছ আত্মসমালোচনা বিলীন হয়েছে
এবং অহমিকা পেয়েছে।

● আদর্শ নীতি - নৈতিকতা প্রশ্নে বলা যায়/
আমাদের সব জোটগুলোর সাধারণ
সম্পূর্ণ অবস্থান যে আদর্শ
প্রবীণ হয়েছে এই আমাদের দেশের
প্রেক্ষিতে স্বাধীন সার্বভৌমত্ব সমান্তরাল অস্তিত্ব
ধারণ সহযোগিতা করছে তাতে সাধারণ
মানুষের নীতি নৈতিকতার আর দরকার?
বিরোধীদলীয় সরকার থেকে প্রশাসনের
ভূমিকায় অবস্থান আন্দোলন
নিরপেক্ষ মানুষদের হতাশ করেছে—
সেই উদ্দেশ্যে তাতে সাধারণ মানুষ
বিবেচনার আমরা অন্তত: একেবারে শেষ
হবার কোন কারণই সমীচীন নয়। তবে
একটি আশাবাদ যে আমাদের জাতির
হতে আমাদের যে সত্য অবস্থানে দৃঢ়
সম্পাদনা দেখা হয়েছে, যে প্রতিটি মানুষ

এসিপ্রিল ভেট

www.pathagar.com

৪

ধরকে দেয় আবশ্যক না। অনুমতির
দেবী আমার এবং [illegible] সম্ভব না।
[illegible] আমি এবং [illegible] [illegible]
আগুন আল্লাহর রাস্তায় এবং আমার
মৃত্যু শুধু জালেমের সাজানো [illegible] কাজী
হবে - ইনশাআল্লাহ আল্লাহতায়ালা অবশ্যই
প্রতিদান দান ইনশাআল্লাহ আখেরাতে।

● কাজেই [illegible]-আর-[illegible] ১৭ থেকে
২৪ [illegible] [illegible] অবস্থান। [illegible] নই
আমাকে [illegible] কারাগারের লোকজন এবং
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]-[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] আল্লাহর [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আল্লাহর [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আল্লাহর [illegible]
[illegible] [illegible]। আল্লাহর [illegible]
আমাকে ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার

www.pathagar.com

৫

গ্রহণ শুরুতে আবিষ্কারের জন্য প্রস্তুতি
থাকা উচিত। কারণ [illegible]
[illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible]
নিয়েছে।

* সম্প্রতি: ৩০ ৬৬ সালে [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] দিয়েছিলেন। "[illegible] [illegible]
[illegible]" [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible]
[illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] দিয়েছে। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

ভাইরোসিড

www.pathagar.com

রাসূলে করীম (সা.) বারবার বলিয়াছেন —
কাহারও শহীদ হওয়া কামনা করো না,
~~[illegible]~~ যখন শহীদ হবেন, আমাকে নিয়ে
তাদের আমার জীবন এক সাহাবীর মাধ্যমে
করেছেন। আল্লাহর পথে শহীদ, মুহাম্মদ (সা.)
এর পথে শহীদ। এ ব্যাপারে সন্দেহ করার
অবকাশ থাকে না।

● এখন যদি সিদ্ধান্ত ~~[illegible]~~ কাজটির দশ-
বেশি লোকের দেখা আমার জীবনে
কোন সুযোগ নাও দিতে পারে। যদি
মৃত্যু হয় দেশের জন্য কাহারও
এবং জীবিত থাকার সুযোগ
ঘটে। ~~[illegible]~~ আমার প্রশ্নের
উত্তরগুলো দিয়ে যদি আমার
শহীদ হতে হয়, দেশের আমাদের —
জাতির প্রয়োজনেই যেন থাকে। তাহলে
অবশ্যই খবর দেয়া হবে।

www.pathagar.com

৭

● আমাদের ছাত্রদের যে আসল মেধাশক্তি রয়েছে
তাদের আমাদের সম্পদ। যেসব মেধাসম্পন্ন
শিক্ষার্থী ~~[illegible]~~ এ দেশের বাইরে
চলে যায় তাদের এ দেশে ফিরিয়ে আনা-
প্রয়োজন। সুবিধার অভাবে তারা বিদেশে
চলে যাচ্ছে, ইতোমধ্যেই আমরা
তাদের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে
মেধাপাচার রোধ হবে। বিদেশে তাদের আদর
প্রয়োজন নেই আমার, কারণ তারা-
আমাদের হবে, প্রত্যেকের যদি
উন্নত পরিবেশের মাধ্যমে মেধাবীদের
ছাত্রদের উৎসাহিত দিতে হবে।

● আমাদের মধ্যে ছাত্রদের গবেষণার জন্য
যে কোনো উপায়ে একটি সুষ্ঠু বিষয়ে
আমাদের ব্যবস্থা করতে। গবেষণায়
ছাত্রদের কাজ দিতে।

এসিভিট-ডব্লিউ এস

www.pathagar.com

৮

* সোনালী, হে সোনালী

তোমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ... আদায় করতে পারলাম, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। আমার আমানত করে দিও। তোমরা এত কিশোরদের ভোর পর্যন্ত যদি সত্যাশ্রয়ী হও আল্লাহর দ্বীনের এত সুন্দর খাদিমে তোমরা আল্লাহর দরবারে মর্যাদা তোমাদের নিশ্চিত হবে উজ্জ্বল হবে। আমার তুমি সোনা ছেলে, তাই মনে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠার মুহূর্তে আল্লাহর আমার কথা যেন দিও। মানুষ আল্লাহর এবং রাসূল করীম (সা:) এর মুহাব্বত দিয়ে আমার সকল সুন্দর হয়ে দেও।

খুশি আল্লাহর কাছে শিরকে দোয়া রইল।

তোমাদের স্নেহের
[illegible]

কাশিমপুর কারাগার পার্ট-২
০৫/১২/২০১০

[illegible]

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির একটি একক ও অনন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং নেতৃত্ব তৈরির কারখানা

শিবিরের আত্মপ্রকাশ সময়ের অনিবার্য বাস্তবতা

কোন প্রেক্ষাপট ছাড়া কোন ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম নেয় না তেমনি কোন প্রয়োজন ছাড়া কোন সংগঠন জন্মও হয় না। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠা ছিল তৎকালীন সময়ের এক অনিবার্য দাবি। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সামগ্রিক প্রেক্ষাপট এ ধরনের একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনিবার্য করে তোলে ।

দেশে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, রাহাজানি, টেন্ডারবাজি, ব্যাংক ডাকাতি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, মেধা ও সম্পদ পাচার নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়। জনগণের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর কোন নিরাপত্তা ছিল না। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে একদলীয় শাসন কায়েমের জন্য চাপিয়ে দেয়া হয় বাকশালতন্ত্র। জুলুম নির্যাতনের স্টিম রোলারে পিষ্ট সর্বস্তরের ছাত্রজনতা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা পরাধীনতায় পর্যবসিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের মাধ্যমে জালিমশাহীর পতন ঘটে। কিন্তু শেষ হয়নি ষড়যন্ত্র। গণতন্ত্র মুক্তি পেলেও যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে গড়ে তোলার জন্য সৎ ও যোগ্য লোক তৈরির কোন সুনির্দিষ্ট পকিল্পনা ছিল না। ছিল না দেশ পরিচালনার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য। ছাত্ররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ হলেও তাদেরকে দেশ গঠনের উপযোগী করে তোলার কোন পথ তখন ছিল না। এমতাবস্থায় দেশগঠনের জন্য সৎ, যোগ্য, মেধাবী ও দক্ষ নেতৃত্বের

www.pathagar.com

বিকাশে এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের মহান ও পবিত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

নব যাত্রার শুভলগ্ন থেকেই ছাত্রশিবিরকে থামিয়ে দেবার জন্য চক্রান্ত শুরু হয়। ইসলাম বিরোধী শক্তি ছাত্রশিবিরের এ আত্মপ্রকাশকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ছাত্রশিবিরের ওপর চলে অত্যাচার, অবিচার, জেল, জুলুম, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, অপপ্রচার ও হত্যাযজ্ঞ। কোনভাবেই তারা ছাত্রশিবিরকে এগুতে দিতে চায়নি। তাদের সন্ত্রাসের কারণে ১৮০ জন শিবির নেতা-কর্মীকে জীবন দিতে হয়ছে; আহত ও পঙ্গু হয়েছে শত শত ছাত্র। সকল ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে গাঢ় তমসার পথ চিরে চিরে ছাত্রশিবির আজ এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ছাত্রশিবির আজ একটি আন্দোলনের নাম। ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্রসমাজের বিপ্লবের স্পন্দন। আগুনঝরা বারুদের পল্লবিত বৃক্ষের নাম ছাত্রশিবির। অসংখ্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা, প্রত্যাশা, স্বপ্ন আজ শুধুই ছাত্রশিবিরকে কেন্দ্র করে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার প্রতিটি জনপদ, নদী-খাল-বিল, উপত্যকায় আজ ছাত্রশিবিরের জয়গান- 'পদ্মা, মেঘনা, যমুনার তীরে আমরা শিবির গড়েছি।'

ছাত্রশিবির বাতিলের আতঙ্ক ধরানো একমাত্র উচ্চারণ। উত্তাল আগ্নেয়গিরির উদগিরীত লাভা আজ সমস্ত অন্যায়কে মুছে দিতে চায়। ছাত্রশিবির তার গতি দিয়ে প্রতিরোধ করে বাতাসে গতি, স্রোত দিয়ে থামিয়ে দেয় সমুদ্রের উত্তাল গর্জন আর আকাশের অসীমকে খোদার রাজ্যের সীমানায় টেনে নামিয়ে নিতে চায়। অপ্রতিরোধ্য এই সংগঠনটি হচ্ছে ছাত্রশিবির। অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি প্রচণ্ড দ্রোহের নাম। ছাত্রশিবির বাংলাদেশের একমাত্র শহীদি কাফেলা। বিপ্লবী ফেনিল তরঙ্গের এক উচ্ছসিত স্রোতই হচ্ছে ছাত্রশিবির। ছাত্রশিবির আজ যৌবনের প্রতীক, উচ্চকিত শ্লোগান আর মুষ্টিবদ্ধ হাতের অবলম্বন আজ ছাত্রশিবির। হতাশ, বৈরী ও ঘুণে ধরা ছাত্রসমাজের সর্বশেষ আশাস্থল হচ্ছে শিবির। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার এক অপ্রতিরোধ্য কাফেলার নাম ছাত্রশিবির। সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু নেতৃত্বের উৎসস্থল হচ্ছে ছাত্রশিবির। বাতিলের ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদের জন্য ছাত্রশিবির হচ্ছে ভূমিকম্প। অন্যায়, অসত্য ও জীর্ণতার বিরুদ্ধে শিবির হচ্ছে একটি চলমান সাইক্লোন। নতুনের কেতন উড়ায় ছাত্রশিবির। বিজয়ের জয়গান গায় ছাত্রশিবির। মেধাবী ছাত্রদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান ছাত্রশিবির। নতুন আবিষ্কারে উদ্বেল তারুণ্যের উৎসাহ ছাত্রশিবির। যেখানে মেধা, মননশীলতা আর মূল্যেবোধের জয়গান সেখানেই ছাত্রশিবির। শিবির মেধাহীন, সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্ররাজনীতির বিপরীতে সৎ, যোগ্য, খোদাভীরু ও জবাবদিহিতামূলক নেতৃত্ব বিকাশের কারখানা। ছাত্ররাজনীতিতে শিবির ইতিবাচক, গঠনমূলক ও সুষ্ঠু ধারার ছাত্ররাজনীতির প্রবর্তক। সর্বোপরি ইসলামী ছাত্রশিবির একটি একক ও অনন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

ইসলামী ছাত্রশিবির

ইসলাম-শান্তি Peace, ছাত্র-Student, শিবির-Tent তাঁবু বা ঘাঁটি। ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এমন ছাত্রদের তাঁবু বা ঘাঁটি হচ্ছে ইসলামী ছাত্রশিবির। shibir কে বিশ্লেষণ করলে ..s-student, h-honest, i-intellectual, b-brightness,i –inspiration, r-respectful.

www.pathagar.com

ইসলামী ছাত্রশিবিরের লক্ষ্য

আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল (সা) এর নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী মানবজীবনের সার্বিক পুনর্বিন্যাস সাধন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।" এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দাওয়াত, সংগঠন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্রসমস্যার সমাধান এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ-এ ৫ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে শিবির তার কর্মতৎপরতা পরিচালনা করে।

শিবির কেন প্রতিষ্ঠিত?

আল্লাহর এ জমিনে সকল প্রকার জুলুম ও নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করে আল কোরআন ও আল হাদীসের আলোকে ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের সৌধের ওপর এক আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মহান ও পবিত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠিত হয়। চমক লাগানো কোন সাময়িক উদ্দেশ্য হাসিল তার লক্ষ্য নয়।

ছাত্রশিবির একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

ছাত্রশিবির এমন এক বিশ্ববিদ্যালয় যে বিশ্ববিদ্যালয় একজন শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের ডিগ্রি প্রদান করে থাকে যেমন কর্মী, সাথী, সদস্য। A university is an institution of higher education and research, which grants academic degrees at all levels (bachelor, master, and doctorate) in a variety of subjects. বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির এমন এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষার্থী তার মেধা মনন ও প্রতিভা বিকাশের যাবতীয় উপকরণ পেয়ে থাকে। যেসব উপায় উপাদান ও বৈশিষ্ট্য থাকলে কোন প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলা যায়, Hermonious Development of Body, Mind and Soul-এর সবগুলো শর্তই শিবিরের কর্মসূচি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে বিদ্যমান ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৫টি দফার মধ্যে ৪র্থ দফাটি হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্রসমস্যা সংক্রান্ত। দফাটি হচ্ছে : আদর্শ নাগরিক তৈরির উদ্দেশ্যে এবং ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবিতে সংগ্রাম ও ছাত্রসমাজের প্রকৃত সমস্যার সমাধানের সংগ্রামের নেতৃত্ব প্রদান করা।

এছাড়াও ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সিলেবাস, নিয়মিত পাঠ্যচক্র, সামষ্টিক পাঠ, স্টাডি সার্কেল, স্টাডি ক্লাস, নিয়মিত অধ্যয়ন, শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষা মূল্যায়ন ও পরীক্ষা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গনে পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষক ও লাইব্রেরি ব্যবস্থা।

ছাত্রশিবির স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন?

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি ছাড়াও ইসলামী ছাত্রশিবিরের এমন অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শিবিরকে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসংগঠন থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

সৃষ্টি-স্রষ্টা সম্পর্ক-অধিকার ও দায়িত্ব সচেতন

স্রষ্টার সম্পর্ক, স্রষ্টার অধিকার ও সৃষ্টি কর্তব্যজ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার পূর্ণতা লাভ হয়। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপন এবং একে অপরের ওপর দায়িত্ব ও অধিকারের বিষয়টি সম্পর্কে জানার সুযোগ নেই। অন্যদিকে ছাত্রশিবির শিক্ষার্থীকে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও দায়িত্ববোধ শিক্ষা দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

সমন্বিত সিলেবাস

এ সিলেবাসটি সমন্বিত সিলেবাস। সিলেবাসটিকে প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে নৈতিক মানোন্নয়ন ও মূল্যবোধ বিকাশের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মানবিক ও নৈতিক বিকাশের সুযোগ নেই। অন্যদিকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সিলেবাস অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী প্রচলিত শিক্ষা লাভের পাশাপাশি তার নৈতিক ও মানসিক প্রতিভা বিকাশ করতে সক্ষম হয়।

স্তরভিত্তিক সিলেবাস

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিটি শ্রেণীর জন্য সিলেবাসের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড় বড় ছাত্রসংগঠনগুলোর তাদের নিজস্ব জনশক্তির মান উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সিলেবাস ভিত্তিক কার্যকর অধ্যয়নের কোন ব্যবস্থা নেই। বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলো অধ্যয়নের ব্যবস্থা থাকলেও তা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় না। পক্ষান্তরে ইসলামী ছাত্রশিবিরের স্কুল ছাত্রদের জন্য Book list ছাড়াও কর্মী, স্কুল কর্মী, সাথী ও সদস্যদের জন্য পৃথক স্তরভিত্তিক সিলেবাস রয়েছে।

উচ্চতর অধ্যয়ন

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন উচ্চতর অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে তেমনি ইসলাম ও জীবন জগতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গভীর অধ্যয়নের জন্য শিবিরেও একটি পৃথক উচ্চতর সিলেবাস আছে। শিবিরের সদস্য ভায়েরা সদস্য হবার পর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর গভীর জ্ঞান অর্জন ও পারদর্শিতার জন্য উচ্চতর সিলেবাস নির্ধারণ করে থাকে। এ ধরনের উচ্চতর অধ্যয়ন এর কোন পদ্ধতি অন্য কোন ছাত্রসংগঠনে নেই।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কাঙ্ক্ষিত মানের হওয়া উচিত। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সেই প্রত্যাশিত কোন সম্পর্ক নেই। ব্যক্তি স্বার্থ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নীতিবোধহীন অস্বস্তিকর এক সম্পর্কের ভেতরে ছাত্ররা আজ শিক্ষা গ্রহণ করছে। ফলে তারা মৌলিক কিছুই শিখতে পারছে না। এ জন্যই সায়েন্স ল্যাবরেটরি স্কুলের এক শিক্ষককে তারই দু'ছাত্র গুলি করে হত্যা করেছে। ইসলামী ছাত্রশিবির এধরনের অপরাধ প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

রিপোর্টিং

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী, সাথী ও সদস্যদের প্রতিদিন ব্যক্তিগত রিপোর্ট লিখতে হয়। ব্যক্তিগত Report এর মাধ্যমে প্রতিটি কর্মীকে জ্ঞান ও আমলের দিক থেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা, তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে উপযোগী করা, নৈতিক ও আত্মিক দিকসহ সকল দিক থেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যে Report এর ব্যবস্থা আছে তা আর কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা ছাত্রসংগঠনে নেই। ইদানীং কোন কোন কিন্ডারগার্টেনে ব্যক্তিগত ডায়েরি লেখার ব্যবস্থা থাকলেও তা ছাত্রশিবিরের কর্মসূচি থেকে অনুসৃত। এছাড়াও শিবিরের প্রতিটি ইউনিট প্রতিমাসে তাদের মাসিক কাজের Report তৈরি করে থাকে। ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক কাজের Report পর্যালোচনা ও পরামর্শ দানের জন্য ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। রাসূল (সা) বলেছেন, যার আজকের দিন গতকালকের চেয়ে উন্নত হল না সে অভিশপ্ত।

www.pathagar.com

ছাত্রবাছাই ও অন্তর্ভুক্তির অনন্য পদ্ধতি

আমাদের কর্মপদ্ধতির দাওয়াত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কৌশলগত পদ্ধতি চরিত্রবান, নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন, সমাজে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রভাবশালী ছাত্রদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এই শ্রেণী যদি সংগঠনের দাওয়াত গ্রহণ করে তবে অন্যান্য ছাত্ররা কম সময়ের মধ্যেই দাওয়াত গ্রহণ করবে। কেননা এ শ্রেণীর ছাত্ররা বাকি সকল ছাত্রের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। টার্গেট নির্ধারণের পর পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্প্রীতি স্থাপন এবং ক্রমধারা অবলম্বন করতে হয়।

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসমাজের অধিকার ও দাবি-দাওয়া আদায়ের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। কাগজ কলম খাতাসহ শিক্ষা উপকরণের দাবিতে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে বহু কর্মসূচি পালন করে শিবির। শিবির প্রতিনিয়ত ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রশিবির ছাত্রসংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে সেখানেই শিবির আরো বেশি ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় ঠিকানায় পরিণত হয়েছে।

শিক্ষানীতির জন্য আন্দোলন

শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ৪৪ বছর পরও বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মূল্যবোধ ও চেতনার আলোকে দেশে কোন শিক্ষা-নীতি প্রণীত হয়নি। বরং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। শিবির বরাবরই এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে প্রথমত শিবিরের জনশক্তি ও সাধারণ জনগণকে সচেতন করে জনমত সংগ্রহের জন্য জাতীয় শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন, স্থানীয় সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, গোলটেবিল বৈঠক, বুকলেট প্রকাশ, পুস্তিকা প্রকাশ, শিক্ষা স্মরণিকা প্রকাশ ও Workshop, গ্রুপ মিটিং ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া প্রতি বছর ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে ১৫ আগস্টকে "ইসলামী শিক্ষা দিবস" হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। ২০০২ সালে দেশব্যাপী শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ঢাকায় জাতীয় বিজ্ঞান মেলা, জাতীয় সেমিনার, বিজ্ঞান মেলা, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, মেধাবী ছাত্রদের সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রীর সরাসরি প্রশ্নোত্তর, শিক্ষাসামগ্রী প্রদর্শন, Understanding Science Series প্রদর্শনী এবং "আমাদের শিক্ষা সংকট : উত্তরণের উপায়" শীর্ষক বুকলেট প্রকাশসহ বহুবিধ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়।

শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছে। শিক্ষাখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ দেয়া উচিত অনেক সময়েই তা দেয়া হয়নি। পাঠ্যপুস্তকে ব্রাহ্মণ্যবাদের আসর, দেরিতে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ দলীয়করণ, ইতিহাস বিকৃতি ও জাতিকে স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি, বিপক্ষ শক্তি হিসাবে বিভক্ত করার গভীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শিবির সব সময় সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে। মিছিল, মিটিং, ছাত্রধর্মঘট, সমাবেশ বিক্ষোভ, ঘেরাও, লিফলেট, প্রচারপত্র বিতরণ ইত্যাদি কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে ভূমিকা পালন করেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বৈষম্যের প্রতিবাদ

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা বরাবরই অবহেলিত। এবতেদায়ীর জন্য আওয়ামী সরকারের

www.pathagar.com

কোন বাজেট ছিল না। তাদের ফ্রি-বই বিতরণ ও বৃত্তির ব্যবস্থাও ছিল না। একটি মাত্র মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড। একটি মাত্র প্রশিক্ষণ Institute পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য ভাল ব্যবস্থা নেই। মাদ্রাসা ছাত্ররা B.C.S পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। বিপুলসংখ্যক ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাকে সমন্বয় করার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার মধ্যে বিরাট ব্যবধান করে রাখা হয়েছে। শিবির তার জন্মলগ্ন থেকেই মাদ্রাসার এ বৈষম্য দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামী শিক্ষা দিবস উদযাপন

শিবির এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার গলদ তুলে ধরে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ দিন থেকে ১৫ই আগস্টকে ইসলামী শিক্ষা দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। ১৯৬৯ সালের এ দিনে ইসলামী শিক্ষার পক্ষে কথা বলতে গিয়ে জীবন দিতে হয়েছে শহীদ আবদুল মালেককে। প্রতি বছর এ দিনকে সামনে রেখে সারা দেশে শিক্ষা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, ইসলামী শিক্ষার পক্ষে স্বাক্ষর অভিযানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকে। একটি ছাত্রসংগঠনের এটি একটি ব্যতিক্রম উদ্যোগ।

সৃজনশীল প্রকাশনায় শিবির

ইসলামী ছাত্রশিবিরের একটি সমৃদ্ধ প্রকাশনা বিভাগ রয়েছে। আধুনিক রুচিসম্মত এবং সামাজিক চাহিদানির্ভর বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রী এই বিভাগ থেকে প্রকাশ করা হয়। তথ্যবহুল দাওয়াতি কার্যক্রম, উপহার আদান প্রদান এবং সুস্থ বিনোদন চর্চায় শিবিরের প্রকাশনা সামগ্রী অনন্য। এই প্রকাশনা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে নববর্ষের ৬ প্রকার ক্যালেন্ডার, ৪ প্রকার ডায়েরি, অসংখ্য ক্যাসেট এবং বহু রকমের কার্ড, ভিউকার্ড, স্টিকার, মনোগ্রাম, কোটপিন, চাবির রিং, চিঠির প্যাড ইত্যাদি প্রকাশনীর মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের মাঝে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। শিবিরের প্রকাশনা সামগ্রী সর্বস্তরের মানুষের কাছে একটি অপরিহার্য সৌন্দর্যের প্রতীক। তথ্যবহুল, গবেষণালব্ধ, বহু রং ও ডিজাইনের ক্যালেন্ডার ও ডায়েরি দেশ ও বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। মনোরম সমসাময়িক প্রচ্ছদ নিয়ে মাসিক ছাত্রসংবাদ, নতুন কিশোরকণ্ঠ, Perspective, ত্রৈমাসিক-At a Glancce বের হয়, যা ইতোমেধ্যই পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। নতুন কিশোরকণ্ঠ ও Youth Wave ম্যাগাজিন হিসাবে বের হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানসামগ্রী প্রকাশনা

দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার পশ্চাদপদতা দূর করার জন্য ইসলামী ছাত্রশিবির প্রকাশ করেছে পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যার ওপর রেফারেন্স বই ও চার্ট পেপার। এ বইগুলো এস.এস.সি/দাখিল, এইচ.এস.সি/আলিম ও ডিগ্রির প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনন্য ও অপরিহার্য শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বহুরঙা ও দ্বিমাত্রিক চিত্রসহ সম্পূর্ণ ডি.টি.পি তে ও ইলাস্ট্রেটেড ডিজাইনে ছাপানো এ উচ্চমানের বইগুলো বাংলা ভাষায় ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ প্রয়োজন এবং একাডেমিক শিক্ষার যথার্থ তথ্য উপকরণ দিয়েই এই Understanding Science Series প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে

একটি দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এ দেশের ইসলামী

www.pathagar.com

সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে শিবিরের রয়েছে নিজস্ব সাহিত্য সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। জ্ঞান অর্জন ও মেধা বিকাশের পাশাপাশি একজন ছাত্রকে মানসিক বিকাশের জন্য এবং তার মধ্যে সহজভাবে ইসলামের জীবন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য রয়েছে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে ছাত্র ও যুবসমাজকে রক্ষা করে তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতে হলেও প্রয়োজন পরিশীলিত সংস্কৃতির আয়োজন। সাহিত্য সংস্কৃতি মানেই অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, পাশ্চত্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্ধ অনুকরণ এই ধারণার পরিবর্তন করতে শিবির বদ্ধপরিকর। ইসলামী ছাত্রশিবির সে জন্যই ইসলামী সাংস্কৃতির এক বিরাট জগৎকে গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সাইমুম, প্রত্যয়, বিকল্প, উচ্চারণ, পাঞ্জেরী ও টাইফুন ইত্যাদি শিল্পীগোষ্ঠীর সমগ্র দেশেই সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে।

ছাত্রকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড : ছাত্রদের কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় শিবির তৎপর। বাড়ি থেকে দূরে অবস্থানকারী ছাত্রদেরকে লজিং-এর ব্যবস্থা করে দেয়া, বেতন দানে অক্ষম ছাত্রদেরকে বেতন প্রদান, বই ক্রয়ে সহযোগিতাসহ, মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, ফ্রি কোচিং, বিনামূল্যে প্রশ্নপত্র বিলি এবং কর্জে হাসানা প্রদান করে থাকে।

লেন্ডিং লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা : শিবির তার কর্মীদেরকে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরই তার বই শিবির পরিরচালিত লেন্ডিং লাইব্রেরিতে বিনামূল্যে বই প্রদান করতে উৎসাহিত করে। এছাড়াও শিবির বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্লাসের বই লেন্ডিং লাইব্রেরির জন্য সংগ্রহ করে থাকে। ফেরত দেয়ার শর্তে বই গরিব ও উপযুক্ত ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

ছাত্রসংসদ নির্বাচন : একটি ছাত্রসংগঠন হিসেবে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বমূলক কোন প্রতিযোগিতা থেকে শিবির পিছিয়ে থাকতে পারে না। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজদের মূল কাজের পরিমাণ যাচাই করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। শুধু নির্বাচনে অংশগ্রহণই আমাদের কাজ নয়, নির্বাচনের আগেও আমাদেরকে মৌলিক বা বুনিয়াদি কাজ করতে হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে কেন্দ্রীয় সভাপতি অনুমতি নিতে হয় এবং প্যানেলে কে কোন পদে নির্বাচন করবে সেটাও কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্ধারণ করে থাকেন। আমরা নিজেদের মূল কাজ বাদ রেখে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি না।

কোচিং ও গাইড : বাজারে প্রথম শ্রেণীর গাইড ও কোচিং বলতে যা বুঝায় সেগুলো ইসলামী ছাত্রশিবিরের। বুয়েট, কৃষি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ইসলামী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিকসহ দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিবিরের গাইড এবং কোচিং রয়েছে। এছাড়াও ক্লাস কোচিং, বৃত্তি কোচিংসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কোচিং রয়েছে। বাজারের অন্যান্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত কোচিং এর মতো নয়। ছাত্রদেরকে ভর্তি উপযোগী করার জন্য ছাত্র-কল্যাণমূলক মনোভাব নিয়ে এ কোচিং পরিচালিত হয়।

নকল প্রবণতা থেকে মুক্ত : ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্রদেরকে নকল প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। শিবিরের সাথী ও সদস্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছাত্ররা নকল করতে পারে

www.pathagar.com

না। কেউ নকল করলে তার সাথী বা সদস্য পদ বাতিল করা হয়। কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নিলেও শিবির তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অন্য কোন ছাত্রসংগঠনে তা কল্পনা করা যায় না।

স্পিকার্স ফোরাম

ছাত্রশিবির মেধাবী ছাত্রদের যোগ্যতার বিকাশে এবং সুপ্ত প্রতিভার পরিস্ফুটনের জন্য স্পিকার্স ফোরামের মাধ্যমে ভাল বক্তা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যোগ্যতা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রচেষ্টা নিয়ে থাকে।

I.T-তে শিবির

শিবির তার জনশক্তিকে I.T সচেতন করার জন্যও উদ্যোগ নিয়েছে। শিবিরের Website www.shibir.org, শিবির ডিজিটাল বুক-১ বের করেছে। কিশোরকণ্ঠ ও Youth Wave এর মাধ্যমে ডিজিটাল ম্যাগাজিন হিসেবে বের করে। কিশোরকণ্ঠের Website, www.kishorkantha.com শিবিরের Report কে ডাটাবেজ করা হয়ে থাকে। প্রকাশনা, দাওয়াহ ও তথ্য বিভাগে ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলছে।

সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

ইসলামী ছাত্রশিবির সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। সংকট ও দুর্যোগ মুহূর্তে ত্রাণ বিতরণ, উদ্ধারকাজ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, শীতবস্ত্র বিতরণ বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বাঁধ নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ডেঙ্গু প্রতিরোধ, রক্ত দান ও ব্লাড গ্রুপিংসহ নানাবিধ সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শিবির সাধারণ ছাত্রজনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে সমাজসচেতন করে গড়ে তোলা, সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিবির সে কাজটি প্রতিনিয়তই করে থাকে। অন্য কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসংগঠনের এ ধরনের উদ্যোগ খুবই গৌণ।

বিজ্ঞানবিত্তিক ৫ দফা কর্মসূচি

আমাদের কর্মপদ্ধতি রচিত হয়েছে কুরআন সুন্নাহ, ও যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার এ যুগের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখা হয়েছে। এ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে প্রয়োজন ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পানে ধাবিত হওয়ার একটি নিরেট পথ তৈরি করার জন্য। বাংলাদেশে যদি কোন ছাত্রসংগঠনের জন্ম দিতে হয় তাহলে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে শিবিরের কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশলকে অনুসরণ করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক পরিবেশ

শিবিরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ জান্নাতি পরিবেশ। এদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্ত্রের ঝনঝনানি, সন্ত্রাস, ছিনতাই, সংঘাত, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অশ্লীলতা, বেহায়াপনার সয়লাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছাত্রসমাজ। ফেনসিডিল, হেরোইন, ইত্যাদি নেশাজাত দ্রব্য নতুন প্রজন্মকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একজন

শান্তির মিনার
www.pathagar.com

ছাত্র আর একজন ছাত্রকে নির্দ্বিধায় আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করে না। আল্লাহর মেহেরবানিতে নৈতিক অবক্ষয়ের এ প্রচণ্ড ধাক্কা শিবিরকে স্পর্শ করতে পারেনি। শিবিরের একজন কর্মী নিজেদের হাতে নিহত হয়েছে এমন কোন ঘটনা কল্পনাও করা যায় না; কোন কর্মী অন্য কর্মীর গায়ে হাত দিয়েছে এমন কোন ঘটনাও নেই। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদের মাঝে রয়েছে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, প্রেরণা ও উৎসাহ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, শুভাকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসা। তদুপরি নিঃস্বার্থভাবে অপরের জন্য ত্যাগী মনোভাব ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক পরিবেশকে উচ্চ শিখরে উন্নীত করেছে।

ভারসাম্যপূর্ণ সংবিধান

আমাদের সংবিধানে ৫০টি ধারা, তিনটি অধ্যায় ও পরিশিষ্ট আছে। এটি উপধারা বিবর্জিত, সংক্ষিপ্ত, নাতিদীর্ঘ, সহজ-সরল, সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়ের সমন্বয়। এ সংবিধানে ক্ষমতার একটি সুন্দর ভারসাম্য রয়েছে। কেন্দ্রীয় সভাপতি কার্যকরী পরিষদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি তার সকল কাজের জন্য কার্যকরী পরিষদের কাছে দায়ী থাকবেন। কার্যকরী পরিষদ ও কেন্দ্রীয় সভাপতির মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতাবিরোধ দেখা দেয় এবং একে অপরের রায় মেনে নিতে না পারেন তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে সংগঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

জবাবদিহিতা

আমাদের সংগঠনে প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহির চেতনা থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও দায়িত্ব পালনে উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের কাছে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা আছে। সংগঠনের জনশক্তি, সম্পদ, সংগঠনের মর্যাদা ইত্যাদি আমানত। সে আমানতের খেয়ানত যেন না হয় সে জন্য দায়িত্বশীলগণও জবাবদিহির চেতনা নিয়েই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উমর ফারুক রা. এর লম্বা জামা দেখে খুৎবারত অবস্থায় সাহাবীরা তাকে কিভাবে লম্বা জামা পেলেন তার উত্তর দেয়ার পর বাকি খুৎবা দেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।

বায়তুলমাল

সংগঠন পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটি সংগঠনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা থাকে। ইসলামী ছাত্রশিবির পরিচালনার জন্যও অর্থের প্রয়োজন হয়। তাকে আমরা বায়তুলমাল বলে থাকি। অন্যান্য সংগঠনে অর্থ উঁচু স্তর থেকে নিচের দিকে নাজিল হয় আর আমাদের সংগঠনে নিচ থেকে উপর দিকে মিরাজ হয়। শিবিরের সর্বস্তরের জনশক্তি সংগঠনের বায়তুলমালে এয়ানত দিয়ে সংগঠনকে গতিশীল রাখতে সহায়তা করে। প্রত্যেকটি কর্মী প্রতিমাসে সামর্থ্য অনুযায়ী এয়ানত দেন, শিবিরের প্রতিটি ইউনিটে যে শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে তারাও প্রতিমাসে একটা নির্ধারিত পরিমাণ এয়ানত দিয়ে থাকেন।

আত্মসমালোচনা

আমাদের এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিটি ছাত্র প্রতিদিনই নিজেই নিজের সমালোচনা করে থাকে। মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। প্রতিদিনের ত্রুটির জন্য সে আল্লাহর কাছে তওবা করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে। পরবর্তী দিনগুলো যেন আরো সুন্দর হয় এ জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এভাবে সে নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে পরিশুদ্ধ করে।

www.pathagar.com

ত্যাগ ও কোরবানির এক অনুপম নজরানা

শিবির ত্যাগ ও কোরবানির এক অনুপম নজরানা পেশ করছে। ত্যাগ ও কোরবানির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন- তোমরা কি এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না! যে কারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে, আর কারা ধৈর্য ধারণ করেন।' শিবির নেতা-কর্মীদের উপর যখন জুলুম-নির্যাতন চালানো হয় তখন তারা বলতে শিখেছে- "নির্যাতন সহ্য করা আমার নবীর সুন্নাত"। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলামী ছাত্রশিবিরের ওপর যে জুলুম নির্যাতন চালানো হয়েছে তা যদি অন্য কোন সংগঠনের ওপর চালানো হতো তবে সেই সংগঠনকে খুঁজে পাওয়া যেত না। জুলুম-নির্যাতন নিস্পেষণ, হত্যা শিবিরকে আরো অনেক বেশি শক্তিশালী করেছে।

জনশক্তি শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত

শাহাদাত মুমিন জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ছাত্র আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। তারা শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত উচ্ছ্বসিত প্রাণ। আশফাকুর রহমান বিপুকে সাংবাদিকরা তার হাত হারানোর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি তো আমার জীবনই আল্লাহর রাস্তায় দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমার জীবন গ্রহণ করেন নাই এ জন্য আমি পরিতৃপ্ত নই। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ২৬ হাজার ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে আমার হাতটিকে কবুল করেছেন এজন্য আমি আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাই।"

ইসলামী নেতৃত্ব

Elder L. Tom Perry said, "We live in a world that is crying for righteous leadership based on trustworthy principles. "নৃবিজ্ঞান বলে মানুষ তার নিজ প্রয়োজনে এককভাবে জীবন পরিচালনার পরিবর্তে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস এবং পরিচালনা শুরু করেছে সেই আদিম সময় থেকে। তখনই দেখা দিয়েছে ঐ সমাজ পরিচালনার জন্য একজন পরিচালকের বা নেতার প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং সেই সমাজে ব্যক্তির বীরত্বই তাকে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেছে। কারণ মাঝি ছাড়া যেমন নৌকা চলে না তেমনি নেতা বা নেতৃত্ব ছাড়া সমাজ, দেশ, জাতি চলতে পারে না । "We are facing a vary decisive war and this war is truly intellectual war."এ যুদ্ধে বিজয়ী হতে হলে জ্ঞান বুদ্ধি ও দক্ষতার অস্ত্রে পূর্ণরূপে সজ্জিত হতে হবে। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির জ্ঞান বুদ্ধি ও দক্ষতার অস্ত্রে সজ্জিত গতিশীল ও ভিশনারি নেতৃত্ব তৈরির কারখানা হিসাবে ভূমিকা পালন করছে।

নেতৃত্বের পরিচয়

নেতৃত্ব শব্দের অর্থ ব্যাপক। ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Leadership যা lead শব্দ থেকে এসেছে। অর্থ পথ দেখানো (To guide) চালিত করা (To conduct) আদেশ করা (To direct) ইত্যাদি। A leader is he, who knows the way.goes the way and shows the way.নেতৃত্ব (Leadership) lead-to show the way by going

www.pathagar.com

first প্রথমে অগ্রসর হইয়া পথ দেখানো। Guidance given by going first or infront.leadership involve guiding or conducting a group of people সাধারণ অর্থে নেতৃত্ব হচ্ছে একজন ব্যক্তি মানুষের নানান গুণাবলীর সমাবেশের মাধ্যমে একটি দলের বা গোষ্ঠীর কিংবা একটি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সমন্বিত পরিচালনা।

নেতৃত্বের প্রামাণ্য সংজ্ঞা

Keith davis:-The leadership is the process of influencing group activities towards the accomplishment of the goal in a given situation. রবার্ট গোলেমবিউস্কি বলেন, "কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে জনগণকে প্রভাবান্বিত করার যোগ্যতাই হচ্ছে নেতৃত্ব।"রবার্ট ডাবিনের মতে, "নেতৃত্ব হচ্ছে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের কর্তৃত্ব অর্জনের অধিকার ও অনুশীলন।"

নেতৃত্বের সমীকরণ

L=f (l. f. s) অর্থাৎ L= Leadership (নেতৃত্ব) f = function (কার্যাবলী) l = Leader (নেতা) f = followers (অনুসারী) s = situation (অবস্থা)

Principles of Leadership

1.Know yourself and seek self-improvement 2. Be technically proficient 3. Seek responsibility and take responsibility for your actions 5. Make sound and timely 6. Set the example 7. Know your people and look out for their well-being. 8. Keep your workers informed 9. Develop a sense of responsibility in your worker 10. Ensure that tasks are understood, supervised, and accomplished 11. Use the full capabilities of your organization

leadership model follow USA"be, know, do"that means leader always awareness:

- ✓ Be prepared.
- ✓ First things first.
- ✓ Don't avoid problems. :
- ✓ Maintain focus on your purpose.

ইসলামী নেতৃত্বের সংজ্ঞা

Islam is the guide to eradicate all problems in social life. Allah (Swt) has addressed the believers as Ummah, which implies the necessity of leadership in Islam. Allah says to his Prophet Mohammad (Sm) "...I have perfected your religion for you, completed My favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion" (Surah Al-Maidah).

শান্তির মিনার
www.pathagar.com

ইসলামী নেতৃত্ব তিনটি শব্দের সমার্থের ধারক বাহক।
ক. খলিফা খ. ইমাম গ. আমীর
সুতরাং ইসলামী নেতৃত্ব বলতে বুঝি কুরআন, সুন্নাহর আলোকে একজন ব্যক্তির ঐ সকল আচরণিক গুণাবলি বুঝায় যা একটি সংগঠন তথা ইসলামী আন্দোলনকে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জনশক্তিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে।

Islamic Leadership Principles are primarily derived from the following key sources:1 The Holy Quran. 2 The Holy Prophet. 3 The Wise Caliphs. 4 Pious Followers

নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য

১. নেতা অবশ্যই জানবেন কখন, কিভাবে, কী করতে হবে। ২. মহান নেতা হচ্ছেন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ৩. ধৈর্য ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা। ৪. সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। ৫. পরিবেশ ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা। ৬. জ্ঞানের রাজ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন। ৭. দলীয় কারণে প্রচণ্ড আবেগ। ৮. শৃঙ্খলা বিধানের যোগ্যতা। ৯. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ। ১০. ক্ষমা করা। ১১. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী বাহিনী গঠন। ১২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার। ১৩. বক্তৃতায় পারদর্শিতা অর্জন। ১৪. দূরদর্শিতা ও মনোবল। ১৫. অন্যকে বুঝার কৌশল।

ইসলামী সংগঠনে নেতৃত্বের কাঠামো

ইসলামী সংগঠনে একটি বিশেষ নেতৃত্ব কাঠামো আছে। আল্লাহর রাসূল (সা) এর বাণী এবং আসহাবে রাসূলের অনুশীলন আমাদেরকে ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। রাসূল (সা) এর জীবনের শেষ ভাগে সাহাবাগণ মুসলিম উম্মাহ্‌র পরবর্তী নেতৃত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করেন। তারপর কে নেতা হবেন এটাই ছিল তাদের জিজ্ঞাসা। মূলত কোন ব্যক্তি নেতা হলে ভাল হবে রাসূল (সা) এর কাছে এটাই জানতে চেয়েছিলেন। রাসূল (সা) বলেছেন – "তোমরা যদি আবু বকরকে নেতা বানাও তাহলে তাকে পাবে আমানতদার, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এবং আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট। তোমরা যদি ওমরকে নেতা বানাও তাহলে তাকে পাবে শক্তিধর, আমানতদার এবং সে আল্লাহর ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্নামকারীর পরোয়া করে না। আর যদি আলীকে নেতা বানাও তাহলে তাকে পাবে পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে, সে তোমাদের সঠিক পথে চালাবে। (মুসনাদে আহমদ)

ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলি

১. বুদ্ধিভিত্তিক ও মানসিক শক্তি। ২. সমকালীন রাজনীতি ও বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা। ৩. যোগাযোগের দক্ষতা। ৪. উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। ৫. দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাবান হওয়া। ৬ দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতা। ৭. নেতা হবেন রহমদিল ক্ষমাশীল। ৮. নেতা হবেন অল্পে তুষ্ট এবং ত্যাগী। ৯ বৈরী শক্তির মোকাবেলায় বিজ্ঞানসম্মত পন্থা উদ্ভাবন। ১০. সময়ানুবর্তিতা। ১১. অগ্রাধিকার জ্ঞান। ১২. সংকট মোকাবেলায় সামর্থ্যবান মুত্তাকি এবং ত্যাগ-কোরবানিতে অগ্রগামী। ১৪. কথা ও কাজের সামঞ্জস্য।

মানুষ তাদের নেতাকে যেমনটি দেখতে চায়

১. জ্ঞানের অধিকারী, ২. প্রজ্ঞাবান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ৩. দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী ৪. অসাধারণ সততা

www.pathagar.com

ও যোগ্যতার অধিকারী ৫. চিন্তাশীল ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী ৬. নম্র, ভদ্র, বিনয়ী ও সুমধুর ব্যবহারের অধিকারী ৭. পরিস্থিতি মোকাবেলা ও সঙ্কট ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী ৮. ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের প্রতীক ৯. অধ্যবসায়ী, সাধক ও পরিশ্রমী ১০. সহনশীল, উদার ও পরিপক্ব।

নেতৃত্বের অভ্যাসগত বৈশিষ্ট্য :

ক. সময় কিভাবে ব্যয় হচ্ছে। খ. ফলাফলের ওপর গুরুত্ব প্রদান। গ. দুর্বলতা দূর করার দিকে নজর দিতে হবে। ঘ. কতিপয় প্রধান ব্যাপারে পরিশ্রম ও সাধনা কেন্দ্রীভূত করা উচিত যা ভাল ফল দেবে। ঙ. আল্লার ওপর নির্ভরশীলতা।

নেতৃত্ব ও অর্পিত দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে

ইসলাম একজন নেতাকে যে অধিকার ও কর্তৃত্ব দান করে তা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ মহান ওহির বাণীর মাধ্যমে এ দায়িত্ব ও অধিকার অর্পণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন: "এরা সেই লোক, যাদের দুনিয়ায় নেতৃত্ব ও ক্ষমতা দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত চালু করবে, ভাল কাজের হুকুম দিবে এবং মন্দের নিষেধ করবে। সব ব্যাপারে চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে।" (সূরা হজ্জ-২২:৪১) সুতরাং বুঝা যাচ্ছে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বা অর্পিত দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, কারণ আল্লাহ যাকে নেতৃত্ব প্রদান করবেন তাঁর কোন না কোন গুণের বা বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচনপদ্ধতি

ছাত্রশিবির নেতৃত্ব নির্বাচনে আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সা) এর প্রতি আনুগত্য। খোদাভীতি, আদর্শের সঠিক জ্ঞানের পরিসর, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা। শৃঙ্খলা বিধানের যোগ্যতা, মানসিক ভারসাম্য, উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তি,কর্মের দৃঢ়তা, অনড় মনোবল, আমানতদারিতা এবং পদের প্রতি লোভহীনতার প্রতি নজর রাখে ।

ইসলামে নেতৃত্বের মডেল ও মর্যাদা :

যুগে যুগে আম্বিয়া কেরামের যে দলটি দুনিয়ায় এসেছেন এবং মানবজাতিকে হেদায়াত ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন তারাই হচ্ছেন মানবজাতির সামনে নেতৃত্বের নমুনা। মানব জাতির সত্যিকারের কল্যাণের পথ তারাই নির্মাণ করে গেছেন। শেষ নবী খাতাম্মুন নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ (সা) হচ্ছেন মানবজাতির সামনে সর্বশেষ মডেল। মহা বিপ্লবের মহা নায়ক হিসেবে নেতৃত্বের এক অসাধারণ নজির তিনি স্থাপন করে গিয়েছেন। বিশ্ব ইতিহাসকে তিনি যতটা প্রভাবিত করে গেছেন আর কারও পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। বিশ্ব সভ্যতায় তার যে অবদান অন্যদের তার সাথে তুলনাও চলে না।

লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট

সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব তৈরির জন্য এবং কর্মীদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য লিডারশিপ ট্রেনিং ক্যাম্প, ১০ দিনব্যাপী শিক্ষাশিবিরসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব সরবরাহ

বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য । তবে সর্বপর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ নেতৃত্ব ও সংগঠক তৈরিতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সর্বদা চেষ্টা করছে ।

Intellectuality & Quality Development :

একজন ছাত্রকে প্রকৃত অর্থে একজন ভাল ছাত্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিবিরের ব্যক্তিগত Report এ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন নামে একটি কলাম আছে, পেপার পত্রিকা পাঠ ও শরীরচর্চার জন্যও কলাম রয়েছে। প্রতিদিন তা পূরণ করতে হয় । এছাড়াও শিবিরের সদস্য প্রার্থীদের জন্য Report এর পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য ব্যক্তিগত ডায়েরি Maintain করতে হয় । সেখানেও ব্যক্তিগত অধ্যয়নকে আরো বেশি গুরুত্বের সাথে দেখা হয়ে থাকে । ব্যক্তিগত লেখাপড়া ও সাংগঠনিক কাজের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করতে হয় ।

চেইন অব লিডারশিপ

যে কোন সংগঠন, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতার জন্য Chain of leadership অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্মলগ্ন থেকেই শিবির এক্ষেত্রে যথাযথ নজর দিয়ে আসছে। প্রতি বছরই নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠান, কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচন, সেক্রেটারি মনোন্নয়নের কোন নজির অন্যকোন ছাত্রসংগঠনের নাই। এমনকি তৃণমূল পর্যায়ের ইউনিটগুলোতেও এসময় প্রতি বছর কমিটি গঠন হয়ে থাকে। এ বিষয়গুলো অন্যান্য ছাত্রসংগঠন কল্পনাও করতে পারে না । এক্ষেত্রেও ইসলামী ছাত্রশিবির অনন্য ।

লেজুড়বৃত্তিতা নেই

ছাত্রশিবির কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে না। আজকের ছাত্ররাজনীতিতে সন্ত্রাসের জন্য লেজুড়বৃত্তিকে দায়ী করা হয়ে থাকে। শিবিরের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকরী পরিষদ গ্রহণ করে থাকে। সেক্রেটারিয়েট সংগঠনের মূল দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পরিকল্পনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজ করে থাকে । অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের নেতা নির্বাচন বা কমিটি গঠন Parents organisation এর প্রধানের মাধ্যমে হয়ে থাকে । কিন্তু শিবিরের নেতা নির্বাচন বা কমিটি গঠন সদস্য ভাইদের প্রত্যক্ষ ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে হয়ে থাকে । কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচন কমিশন আছে ।

লেখক শিবির

যুবসমাজের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে ও সাহিত্যামোদী ছাত্রদেরকে সংগঠিত করে লেখক শিবির গঠন করা হয় । সাহিত্য আসর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাময়িকী, দেয়ালিকা, পত্রিকা, স্মরণিকা ও সঙ্কলন প্রকাশের মাধ্যমে লেখার যোগ্যতা বৃদ্ধিতে শিবিরের কর্মসূচি রয়েছে ।

নৈতিক মান উন্নয়ন

শিবির কর্মীদের নৈতিক ও গুণগত দিক থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন করার জন্য রয়েছে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, ইসলামী সাহিত্য পাঠ ও বিতরণ, পাঠচক্র, আলোচনা চক্র, সামষ্টিক অধ্যয়ন, শিক্ষা শিবির, শিক্ষা বৈঠক, শববেদারি বা নৈশ ইবাদাত, ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ, দোয়া ও নফল ইবাদাত, গঠনমূলক সমালোচনা, আত্মসমালোচনা, কুরআন তালিম, কুরআন ক্লাস ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ।

www.pathagar.com

জনশক্তি স্তরবিন্যাস

আমাদের সংগঠনের জনশক্তিকে আমরা কর্মী, সাথী ও সদস্য-এ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। তার পূর্বে একজন ছাত্রকে শিবিরের সমর্থক হতে হয়। প্রতিটি ছাত্রকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। প্রত্যেকটি স্তরের জন্য রয়েছে পৃথক সিলেবাস। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাবার জন্য প্রতিটি জনশক্তিকে নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, শুদ্ধ তেলাওয়াত, নামায কাজা বন্ধ, ব্যক্তিগত আমল ও আচরণ সুন্দর করাসহ সাংগঠনিক যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। যোগ্যতার মাপকাঠিতে পরবর্তী উচ্চস্তরের জন্য নিজকে যোগ্য প্রমাণ করতে পারলে তাকে সে পর্যায়ে নেয়া হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে সদস্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তাকে শপথবাক্য পাঠ করতে হয়। সদস্যগণ হচ্ছেন সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তরের মূল জনশক্তি।

নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক

ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য নেতার পেছনে পেছনে ছোটা, চাটুকারিতা গ্রুপিং-লবিং আর অভ্যন্তরীণ সংঘাত আজ ছাত্ররাজনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ ইসলামী ছাত্রশিবির তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখানে নেতা ও কর্মীদের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, ভালবাসার সম্পর্ক। নেতার সাথে নেতা, কর্মীর সাথে কর্মীর সম্পর্ক ঈর্ষনীয়। ইসলামী আন্দোলনে নেতার আদেশ ও কর্মীর হক আদায় ও মর্যাদা দানকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

অনন্য নির্বাচনপদ্ধতি

ছাত্রশিবিরের রয়েছে এক ব্যতিক্রমধর্মী নির্বাচনপদ্ধতি। এখানে কোন প্রার্থী থাকে না; সবাই ভোটার, সবাই প্রার্থী। কারো পক্ষ বা বিপক্ষে গ্রুপ সৃষ্টি করা যায় না। কারো জন্য ভোট চাওয়া যায় না। নিজেকে ভোট দেয়া যায় না, নিজের জন্য চাওয়াও যায় না। তবে কেউ পরামর্শ চাইলে তাকে পরামর্শ দেয়া যায়; নিজে থেকে কাউকে পরামর্শও দেয়া যাবে না। এ ধরনের অনন্য নির্বাচনপদ্ধতি অন্য কোন সংগঠনে কল্পনাও করা যায় না।

নেতৃত্ব ও আনুগত্যের ভারসাম্য

নেতৃত্ব ও আনুগত্যের ভারসাম্য ইসলামী সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। এটি ইসলামী ছাত্রশিবির অনুসরণ করে থাকে। অন্ধ আনুগত্য নয় বরং সৎকর্মের ক্ষেত্রে আনুগত্য। ব্যক্তির পরিবর্তনে আনুগত্যের পরিবর্তন এখানে হয় না। নেতৃত্বের ও জনশক্তির প্রতি কর্মীদের রহমদিল ভালবাসা বিরাজিত থাকবে। নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সমন্বয় ইসলামী ছাত্রশিবিরের রয়েছে। এ ধরনের চমৎকার সমন্বয় আর কোন ছাত্রসংগঠনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটি শিবিরের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

পদের প্রতি লোভহীনতা

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি নিজেকে কোন কাজের যোগ্য বলে মনে করলে সে ঐ কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি অযোগ্য। নেতৃত্ব নিবাচনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি নজর রাখতে হবে তার মধ্যে (ধারা ৩২) বলা হয়েছে "পদের প্রতি লোভহীনতাকে অবশ্যই নজর দিতে হবে।" অন্যদের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে ঐ পদের জন্য যোগ্য প্রমাণিত করার জন্য প্রতিযোগিতা চলে। ফলে সৃষ্টি হয় গ্রুপিং এবং তা থেকেই সন্ত্রাস, হানাহানি ও রক্তপাত ঘটে এবং শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ হয় কলুষিত।

শান্তির মিনার

www.pathagar.com

গঠনমূলক সমালোচনা

প্রচলিত রাজনীতিতে অনেকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু বলতে ভয় পায়, না জানি তিনি কিভাবে নেবেন। কিন্তু ইসলাম গঠনমূলক সমালোচনাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। এক সাথে কাজ করতে ভুল-ত্রুটি আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে যার ত্রুটি তাকে ব্যক্তিগতভাবে ধরিয়ে দেয়ার একাধিকবার চেষ্টা করার পর সংশোধন না হলে অত্যন্ত দরদভরা মন নিয়ে বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। অন্যকে হেয়প্রতিপন্ন নয় বরং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করাই মূল লক্ষ্য।

পরামর্শ পদ্ধতি

শিবিরের প্রতিটি সিদ্ধান্ত পরামর্শের ভিত্তিতেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সংবিধান সংশোধনে ক্ষেত্রে কর্মীদেরও পরামর্শ আহ্বান করা হয় প্রতি বছর। এছাড়া সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইসলাম পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্তকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। পরামর্শের অনুপস্থিতি একনায়কত্ব ও স্বৈরাচারের জন্ম দেয়। ফলে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্তকে উপস্থিত সকলেই নিজের সিদ্ধান্ত বলে মনে করে এবং তা বাস্তবায়ন সহজ হয়; ভুল হলেও আল্লাহ মাফ করে দেন। শিবিরের এ ঐতিহ্য শিবিরকে আরো বেশি সুষমামণ্ডিত করেছে।

নেতা ও অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে রাসূল (সা)

"হে নবী তুমি বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন। আরো বল তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও (জেনে রেখ) আল্লাহ কাফেরদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল ইমরান : ৩১, ৩২) "তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আল্লাহ্‌ ও শেষ দিন সম্পর্কে আশাবাদী এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই এই আদর্শ।" (সূরা আহ্‌যাব : ২১)

ইসলামী নেতৃত্বের জবাবদিহিতা

Mohammad (Sm) says "Every one of you is a shepherd and every one of you is responsible for what he is shepherd of" (Sahih Al Bukhari) তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার তত্ত্বাবধান-(দায়িত্ব) সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। নেতা একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারী, মুসলিম) আর যে লোক নিজের খোদার সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয় করেছিল এবং প্রবৃত্তিকে খারাপ কামনা-বাসনা হতে বিরত রেখেছিল। জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। (সূরা নাযিয়াত ৪০-৪১)

নেতৃত্ব থেকে মুসলমানদের বিচ্যুতির কারণ

১. মুসলমানরা কুরআন হতে দূরে সরে আসা। ২. আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান না রাখা ৩. বিলাসপ্রিয় হওয়া। ৪. অন্যের সভ্যতা গ্রহণ করা। ৫. জ্ঞান চর্চা না করা। ৬. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা না হওয়া। ৭. ইসলাম হতে রাজনীতি আলাদা করা। ৮. ইসলামের ইতিহাস না পড়া। ৯. আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা না থাকা।

www.pathagar.com

নেতার ১০টি দোষাবলি

১. আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কথা না ভেবে লোক দেখানো কাজ করা। ২. অলস, কর্মবিমুখ ও দায়িত্বহীন মনোভাব। ৩. আত্মকে নিয়ন্ত্রণ ও আত্মদাম্ভিকতা। ৪. কর্মীদের প্রতি কঠোর মনোভাব। ৫. কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের অভাব। ৬. কর্মীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ। ৭. দায়িত্বকে ক্ষমতা মনে করা। ৮. কর্মীদের সঠিকভাবে পরিচালনা না করা। ৯. কথা ও কাজের মধ্যে মিল না থাকা। ১০. নিজের দোষ সহজে স্বীকার না করা।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে নেতৃত্ব

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে তাদের খলিফা বানাবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের বানিয়েছেন, যে দ্বীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন তাকে দৃঢ়তা দান করেছেন এবং তাদের ভীতিকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করবেন।" (সূরা আননূর-৫৫) ইসলামের ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশেদার যুগকে স্বর্ণযুগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই নেতৃত্ব দিয়েছেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আলী মুর্তজা (রা)। ইসলামের ইতিহাসে নেতৃত্বের এই স্বর্ণযুগ আজ স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এ চারজন খলিফা বিশ্বাসের জগতে যেমন ছিলেন দৃঢ় ঈমানের অধিকারী, তেমনি বাস্তব জীবনে ছিলেন আপাদমস্তক পরিচ্ছন্ন আমলের তথা সততার মূর্ত প্রতীক।

আন্তর্জাতিক ইস্যুতে নেতৃত্ব শিবির

কতিপয় আন্তর্জাতিক ইস্যুতে শিবিরের ভূমিকা উপমহাদেশের ছাত্ররাজনীতির ইতিহাসে শুভ্র,সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে ।মিশরের ইস্যু, আফগানিস্তানে রাশিয়ার দখলদারি, ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন, কাশ্মীরের স্বাধিকারের প্রতি সমর্থন, কুয়েতে ইরাকি হামলা, চেচনিয়ার স্বাধীনতার সংগ্রাম, বসনিয়া ও কসোভো ইস্যু ,ভারতের কুরআন অবমাননা ইস্যু, বাবরি মসজিদ ইস্যুসহ নানা ইস্যুতে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতৃত্ব শিবির

আন্তর্জাতিক সংস্থায় অংশগ্রহণ ও দিকনির্দেশনামুলক ভূমিকা পালনে শিবিরকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত সংগঠনে পরিণত করেছে। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বৎসরেই ওয়ামির (WAMY) সদস্য পদ লাভ করে। ১৯৮০ সালে শিবির ইফসুর (IIFSO) সদস্য পদ লাভ করে। ১৯৮৭ সাল থেকে ওয়ামি ও ইফসুর দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের পরিচালক এবং ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ইফসুর সেক্রেটারি জেনারেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা: সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের। বর্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবস্থান রত বাংলাভাষী মুসলমানদের যতগুলো সংগঠন গড়ে উঠেছে এসবের গড়ে ওঠা ও গতিশীলতার পেছনে সবচেয়ে সক্রিয় অংশ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রাক্তন নতা কর্মীগণ।

জাতীয় ইস্যুতে নেতৃত্ব শিবির

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির জন্মের পর থেকে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত শিবিরকে জাতীয়তাবাদী দলের জাতীয় স্বার্থবিরোধী

www.pathagar.com

পদক্ষেপসমূহের প্রতিবাদ করতে হয়েছে। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত এরশাদ সরকারের স্বৈরশাসনবিরোধী প্রতিটি আন্দোলনে শিবির ছিলো অন্যদের সাথে রাজপথে যুগপৎ আন্দোলনরত, ১৯৯০-৯১ তে এরশাদ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে অন্যদের সাথে শরিকও ছিলো সে আন্দোলন অন্যতম শরিক। ১৯৯১-র গণ অভ্যুত্থানের ফলে গণতান্ত্রিক পটপরিবর্তনের পর আবারও শিবিরকে রাজপথে নামতে হয়েছে জাতীয়তাবাদী দলের স্বৈরাচারী ভূমিকার বিরুদ্ধে। ১৯৯৬ এর পটপরিবর্তন পর আওয়ামী দুঃশাসন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে আন্দোলন চলছে এখানেও শিবিরের ভূমিকা সক্রিয়। জাতীয় ইস্যুসমূহের নামে উল্লেখযোগ্য ছিলো বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনে ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি, কুদরত ই-খোদা সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতাসহ ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২০০৬ সালে আওয়ামী একদলীয় স্বৈরাচারে রূপ নিলে দেশের অন্যসব ছাত্রসংগঠনসহ শিবির গড়ে তুলে "সর্ব দলীয় ছাত্র ঐক্য" ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত আওয়ামী দুঃশাসন, জুলুম, নির্যাতিন হত্যা, খুন, গুম ইত্যাদির মধ্য দিয়েও শিবির ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখে।

শিবির সব অপপ্রচার, হামলা, সন্ত্রাস, ও নির্যাতনের মোকাবেলায় TAD পলিসি বজায় রেখে চলছে। শিবিরের দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ সবসময়ই সহনশীলতা (Tolerance) এড়িয়ে যাওয়া (Avoidance) এবং উপায়ান্তর না পেলে আত্মরক্ষামূলক (Defence) ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আর এভাবে মৃত্যর মাঝে জীবনের সন্ধান করে ফেরাই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের এক অনন্য ঐতিহ্য ।

"আমাদের প্রত্যয় একটাই আল্লাহর পথে মোরা চলবো
নিকষ কালিমা ভরা আকাশে ধ্রুব জ্যোতি তারা হয়ে জ্বলবো।"

উপসংহার

ইসলামী ছাত্রশিবির পরিক্রমায় এ জাতিকে উপহার দিয়েছে একদল সৎ, যোগ্য ও মেধাবী নেতৃত্ব। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির একটি নাম, একটি ইতিহাস, আল্লাহর পথে দুঃসাহসী কাফেলা। শিবির পরিণত হলো তৌহিদি ছাত্র-জনতার আস্থা, কোটি মানুষের ভালোবাসা, স্বস্তি ও মুক্তির এক প্রিয় ঠিকানায়। শিবিরের এ অগ্রযাত্রা এবং জাতির প্রতি তার ভূমিকা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। মহান আল্লাহর কাছে সর্বস্তরের মানুষ এই প্রত্যাশাই করে। আজ সমাজ পরিবর্তনে প্রয়োজন সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্ব। এ নেতৃত্বের মডেল মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে যাদের প্রাধান্য দিয়েছেন বা বিশেষ মর্যাদা ও দায়িত্ব দিয়ে থাকেন তারা অন্যদের নিকট থেকে কাজ আদায় করে অন্যদের পরিচালনা করে থাকেন।

লেখক: কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

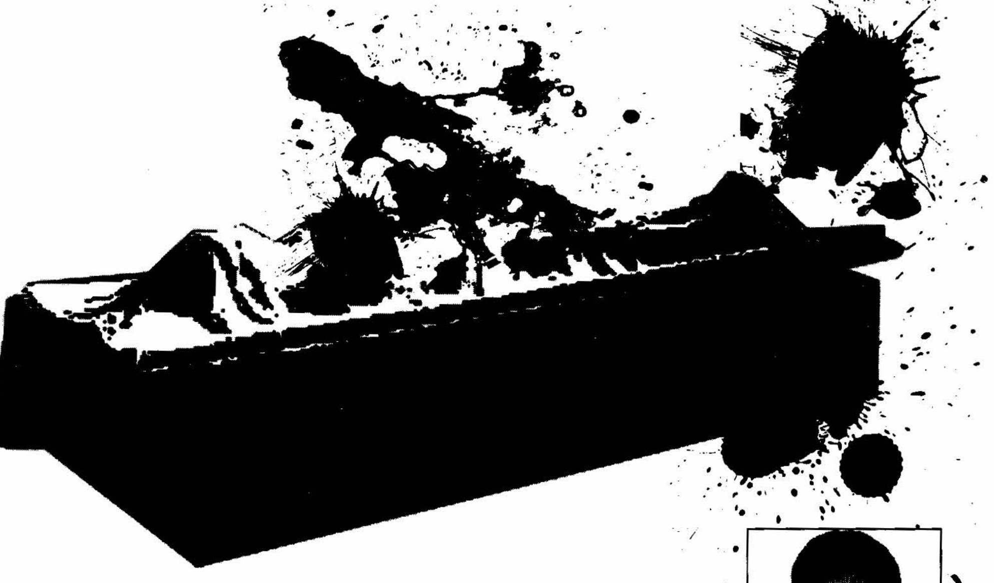

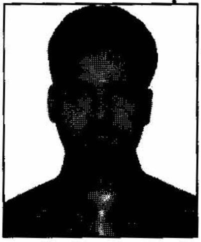

শাহাদাতের রক্তে সিক্ত জমিনে সুদৃঢ় বন্ধন

সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়দীপ্ত কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার নামে একটি স্মারক বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি পুলকিত এবং আনন্দবোধ করছি। আল্লাহর এই জমিনে দ্বীন কায়েমের প্রত্যয়ে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সংগ্রাম করে যারা কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী তাদের ওপর আওয়ামী জুলুমশাহীর গ্রেফতার নির্যাতন, দমন-নিপীড়নের মাঝেও রাজধানী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে একটি শহীদি স্মারক বের করতে পারছে সত্যিই এটি ইসলামী আন্দোলনের গতিশীলতার নির্ণায়ক।

হত্যা, জুলুম আর নিযার্তনের স্টিম রোলার চালিয়েও দেশপ্রেমিক নিবেদিতপ্রাণ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী আর সেই কর্মীদের পতাকাবাহী সংগঠনকে যে দমানো যায় না, শেষ করা যায় না এটি তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণারই বাস্তব চিত্র আজ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ঈমানী দীপ্ত সাহসী পথ চলায় প্রতিফলিত হচ্ছে। সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনে সূরা সফ এর ৮ নং আয়াতে ঘোষণা করেন- আর তারা তাদের মুখের ফুৎকারেই আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়; অথচ আল্লাহ চান তার এ নুরকে প্রজ্বলিত করতে, তা অস্বীকারকারীদের নিকট যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন। ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সাংগঠনিক জীবনের শুরু আমার নিজ এলাকাতেই ১৯৯৮ সালে ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালীন সময়ে। এর পর পড়াশুনার সুবাদে ফেনীতে থাকা অবস্থায় ১৯৯৯ সালে কর্মী হই এবং ২০০১ সালে সাথী ও ২০০৩ সালে সদস্য

www.pathagar.com

শপথ গ্রহণ করি। ২০০৪ সালে ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পাশাপাশি ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখাধীন সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়ার ছাত্র ও জনশক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ শাখার সাথে আমার পথচলা শুরু হয়। শুরুতে ৬৩নং ওয়ার্ড এর সভাপতি এপ্রিল ০৪ থেকে জুলাই ০৪ পর্যন্ত। আলিয়া শাখার অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব এরপর জুলাই ০৪ থেকে ডিসেম্বর ০৫ পর্যন্ত দেড় বছর সেক্রেটারি, ২০০৬ সাল সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর ২০০৭ এবং ২০০৮ এর জুন পর্যন্ত মতিঝিল থানার সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। ২০০৮ এর জুলাই-ডিসেম্বর মহানগরী পূর্ব শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক, ২০০৯ সাল সাংগঠনিক সম্পাদক, ২০১০ এর জুন পর্যন্ত ছয় মাস শাখার সেক্রেটারি এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর ১১ পর্যন্ত এ শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। বলা যায় পুরো ৮টি বছর এই গুরুত্বপূর্ণ শাখায় আমার পদচারণায় সুযোগ হয়েছে। সভাপতির দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ চারদলীয় জোটের হারতালের সমর্থনের মিছিল থেকে গ্রেফতার হই। ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক ১ বছরের সাজা এবং পরবর্তীতে কয়েকটি মামলায় জেলগেট থেকে শ্যোন এ্যারেস্ট করলে ৬ মাস কারাভোগ করতে হয়। কারাগারে থাকা অবস্থায়ই কেন্দ্রীয় এইচ.আর.ডি সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার মাধ্যমে মূলত মহানগরী পূর্ব শাখার সাথে আমার সাংগঠনিক জিম্মাদারির দৃশ্যত সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

সাংগঠনিক দায়িত্বের কারণে মহানগরী থেকে কেন্দ্রে স্থানান্তর হলেও এই শাখার বর্তমান দায়িত্বশীল আর জনশক্তি, সুধী শুভাকাঙ্ক্ষীদের অকৃত্রিম হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আমায় সিক্ত করেছে। সত্যিকার অর্থে আমি নিজেকে ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার একজন জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হতে গর্ববোধ করি। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। আর ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখাকে ইসলামী আন্দোলনের রাজধানী বলা হয়।

কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয়ে কাজ করা এই গুরুত্বপূর্ণ ময়দান সিক্ত হয়েছে শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম, হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন, শহীদ আব্দুল খালেক, সাইজুদ্দিন সহ আরো অনেকের। এ শাখার জনশক্তির ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন ভালোবাসা আর দুঃসাহসী ঈমানী চেতনা আন্দোলনের কাজকে গতিশীল করেছে। ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা যেন শাহাদাতের রক্তসিক্ত জমিনে জনশক্তির এক সুদৃঢ় বন্ধন।

বর্তমানে যারা এই ময়দানে কাজ করছে এবং অনাগত ভবিষ্যতে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়দীপ্ত কাফেলায় শরিক হয়ে এই শাখারই জনশক্তি হিসেবে কাজ করবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা রাজধানীর রাজধানী হিসাবে এই শাখাকে ইসলামী আন্দোলনের রাজধানীর করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ এবং সাহসী ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ। শহীদের রক্তে ভেজা এই ময়দানে কালেমার পতাকা একদিন বিজয়ী রঙে পতপত করে উঠবে আর সেদিন গোটা বাংলাদেশেই প্রতিধ্বনিত হবে নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার শ্লোগান এই প্রত্যাশায় আচরিত দোয়াই শুধু কাম্য।

লেখক : কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

যে স্মৃতি বেদনার, প্রেরণার ও সম্মুখে এগিয়ে যাবার

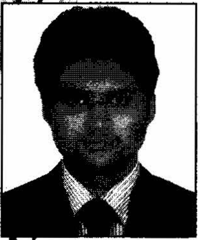

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদি নজরানা দিয়ে শিবিরের যে মিছিল শুরু হয়েছিল তা ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকবে এটা একেবারেই স্বাভাবিক। কেননা ইসলামের অতীত ইতিহাস তারই সাক্ষ্য বহন করে। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির একটি আদর্শিক ঠিকানার নাম। যে ঠিকানা জীবনের প্রতিটি, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রতিটি ক্ষেত্র, শহীদি রক্তে রঞ্জিত পথ, ত্যাগ কোরবানি এবং জীবনের শেষ পরিণতিকে স্বচ্ছতায় চিহ্নিত করে। এ পথ যেন তেন পথ নয়। কন্টাকাকীর্ণ, কঠিন, মজলুমের আর্ত- চিৎকারের পথ, যে পথ অঙ্কিত আজ শহীদি রক্তে রঞ্জিত হয়ে। যে পথ ধরে আজ শাহাদাতের পথ হচ্ছে অনেক দীর্ঘ। মজলুমের চিৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। বেদনার আঘাতে এ হৃদয় হচ্ছে ক্ষত বিক্ষত। নিস্পেষিতের রোনাজারিতে আজ যখন পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে তখনও এ কাফেলার বিপ্লবীরা এগিয়ে চলছে সম্মুখপানে। কখনো বেলাল (রাঃ), খাব্বাব ইবনে আরাত, খুবাইব ইবনে আদির পদচিহ্ন অনুসরণ করে। চেতনায় ত্যাগের সকল দৃষ্টান্ত লালন করে উদ্ভাসিত হবার প্রচেষ্টা। এ যেন শত জুলুমের মধ্যেও খুবাইব ইবনে আদির সেই উক্তি "আমার সমস্ত জীবনের বিনিময়ে আমার প্রিয় রাসূলের (সাঃ) একটি পশমও ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমি তা বরদাস্ত করতে পারব না।" বাংলাদেশের এই প্রেক্ষাপটে সেই চেতনাতেই তো আজ শত সহস্র যুবক উজ্জীবিত। তারা আজ চিৎকার করে, প্রতিবাদ করে, জীবন দিয়ে বলছে আমাদের জীবন থাকতে নেতৃবৃন্দের সামান্যতম কোন ক্ষতি মেনে নিতে পারি না।

তবুও মাঝে মধ্যে মনে হয় এ পথ যেন থমকে যাচ্ছে । দুর্দান্ত প্রতাপে চলা এ মিছিল থেমে যায় যায় ভাব আবারও না থেমে চলে। কেনইবা থামবে? এ মিছিল তো থামতে পারে না;

www.pathagar.com

থামবে না কোনদিন। কেননা এ মিছেলের মঞ্জিল তো অনেক দূর...। পাড়ি দিতে হবে রক্ত পিচ্ছিল পথ। এ পথের যাত্রীরা তো রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী। তবেই না মিলবে জান্নাত। জান্নাত যাদের অদম্য বাসনা, তাদের বুখতে পারে এ সাধ্য কার?

আর তাইতো ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে পথ চলছে এ কাফেলার মৃত্যুঞ্জয়ীরা। বাংলাদেশ এর রাজধানী ঢাকা। আন্দোলনের রাজধানীও ঢাকা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই রাজধানীতে শিবিরের গৌরবোজ্জ্বল পথ চলা। শুরু থেকেই ঢাকা শহর, এর পর ১৯৯০ থেকে মহানগরী উত্তর ও দক্ষিণ। পরবর্তীতে ২০০২ সালের ৩ অক্টোবর পুনরায় উত্তর ও দক্ষিণ কে ভাগ করে মহানগরীতে মোট ৪ টি শাখার যাত্রা শুরু হয়। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র পল্টন, মতিঝিল, রমনা সহ গুরুত্বপূর্ণ একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে ঢাকা মহানগরী পূর্ব। নানা দিক দিয়ে এ জনপদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয় (মগবাজার), ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যালয় (পল্টন) এই জনপদে বিদ্যমান। ত্যাগ কুরবানি এবং আন্দোলনের ময়দানেও পিছিয়ে নেই এই জনপদের বাসিন্দারা। ২০০৬ সালের আওয়ামী ববরতা ইতিহাসে কালো অধ্যায়, গণতন্ত্র হত্যার এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব ধ্বংসের অপতৎপরতা এই পল্টন ময়দানেই চালিয়েছিল। সেদিন জীবন উৎসর্গ করে যারা- এই আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার জন্য ভূমিকা রেখেছিলেন শহীদ সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম এবং শহীদ গোলাম কিবরিয়া শিপন এই জনপদেরই গর্বিত সন্তান এবং দায়িত্বশীল। ২০০৮-২০১৩ আওয়ামী অপশাসনের এক জ্বলন্ত দলিল। ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রের উদ্যোগে একটি স্মারক প্রকাশিত হচ্ছে। শ্রদ্ধেয় মিজান ভাইয়ের (কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক) নির্দেশে বাণী ও লেখা সংগ্রহের চেষ্টা করছিলাম। চিন্তাই করিনি যে আমাকেও লিখতে হতে পারে। আওয়ামী জুলুমের শিকার প্রাণপ্রিয় দায়িত্বশীল শামসুল আলম গোলাপ (কেন্দ্রীয় ছাত্রআন্দোলন সম্পাদক) ভাই হঠাৎ করে নির্দেশ দিলেন মহানগরী পূর্বের ভাইদের নিয়ে কয়েকটি ঘটনা লিখে দিতে হবে। থেমে গেলাম দুটি কারণে ১। যার জীবনে কয়েকটি ছররা গুলির আঘাত, মাঝে মাঝে টিয়ার শেলের যন্ত্রণা ছাড়া কিছুই নেই কী করে সে এই মজলুম ভাইদের ত্যাগের কথা সঠিকভাবে উপস্থাপন করব? ২। এই জনপদের আন্দোলনের ইতিহাস শিবিরের প্রতিষ্ঠাকালীন থেকেই আর আমি তো সেই জনপদের একজন নবীন মাত্র। সে কিনা নির্যাতিতদের অনেকের নামই শুনেছে তাদের অনেককে দেখেইনি। তবুও...

প্রিয় নেতার মুখে ত্যাগের বিবরণ

বুখারীতে বর্ণিত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমরা একদিন নবী পাকের (সা:) নিকট অভিযোগ করলাম (আমাদের দুঃখ, দুর্দশা, অত্যাচার, নির্যাতন, কষ্ট সম্পর্কে)। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চান না? তখন তিনি বললেন (তোমাদের ওপর কিইবা নির্যাতন এসেছে) তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের কারো জন্য গর্ত খোঁড়া হত এবং অতঃপর করাত এনে মাথার ওপর স্থাপন করা হত এবং তাদের দ্বিখণ্ডিত করা হতো । তারপরও তাদেরকে দ্বীন থেকে ফেরাতে পারতো না। কারো শরীর লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে হাড় থেকে মাংস ও স্নায়ু তুলে ফেলা হত। কিন্তু এতেও তাদের দ্বীন হতে ফিরাতে পারতো না। রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহর কসম এই দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ

www.pathagar.com

করবে তখন যেকোন উষ্ট্রারোহী সানা থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে অতিক্রম করবে। এই দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না এবং মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুব তাড়াহুড়ো করছো। রাসূল (সাঃ) নির্দেশিত সেরকম সমাজ বাস্তবায়নের জন্য দীপ্ত পথ চলা ভাইদের কয়েক জনের সামান্য কয়েকটি ঘটনা স্মৃতি থেকে খুঁজে নেবার চেষ্টা করছি।

যেদিন হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছিল

২০১৩ সেশন শুরু হয়েছে। ৪ জানুয়ারি মহানগরী পূর্ব শাখার সদস্য সমাবেশ শ্রদ্ধেয় এনামুল কবীর ভাই কেন্দ্রে। আমি এমন এক হতভাগা সভাপতি হিসেবে শপথ নিলাম। যাকে খুব বেশি অনুভব করছিলাম সে আমার পাশে নেই। মহানগরীর শ্রদ্ধেয় সেক্রেটারি রেজাউল হক রিয়াজ ভাই যিনি জালেমের কারাগারে বন্দি। যাকে জেলখানায় একবার দেখতে যেতেও পারলাম না। কয়েক বারই উদ্যোগ নিলাম কেউ যেতে দেয় না। সেশন মাত্র শুরু করলাম তাই বাধ্য হয়ে ভাইদের কথায় প্রাধান্য দিলাম। অন্য ভাইদের পাঠালাম কিন্তু মন কিছুতেই মানছে না। সেশনের কার্যক্রম চলছিলো পরিকল্পনার আলোকেই। হঠাৎ যেন সব কিছুই এলোমেলো হয়ে গেল। সেদিন ছিল ৫ ফেব্রুয়ারি। হরতালে সকালেই রামপুরা রোডে আবুল হোটেল থেকে হরতালের সমর্থনে রেজাউল করিম ভাইয়ের নেতৃত্বে মিছিল শুরু হবার সাথে সাথেই সরকারের পেটোয়া পুলিশলীগের হামলা। সাথে সাথেই মিছিল ছত্রভঙ্গ। একটি ডোবায় পথ ভুলে গিয়ে পড়লেন আমার সবচেয়ে নির্যাতিত ভাই। পুলিশের গুলি, বন্দুক দিয়ে, লাঠি দিয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী আমার সেই ভাই মহানগরীর অর্থ সম্পাদক শরিফুল ইসলামকে সেকি নির্যাতন- গুলির আঘাতে আমার ভায়ের সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত। একটি তাজা দাঁত হারালেন। তৃতীয় বারের মত গ্রেফতার হলেন। নির্যাতিত হয়ে জেলে গেলেন। খবর পাচ্ছিলাম আমাদের ভাই প্রচণ্ড অসুস্থ। কিছুই খেতে পারছেন না। সকলের বাধা উপেক্ষা করে দেখতে গেলাম। আরো কয়েকজন ভাই আসলেন দেখা করতে। সকলেরই একই প্রশ্ন কেনো আমি এই পরিবেশ এ কারাগারে গেলাম। ভাইদের এই আকুতি দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিলাম না। আল্লাহর কাছে হাত তুলে বললাম ইয়া আল্লাহ! আমার ভাইদের এই কষ্ট, নির্যাতন, ত্যাগ তুমি বৃথা যেতে দিও না।

যে স্মৃতি তাড়িয়ে বেরায় আজও

৮ এপ্রিল ২০১৩ হরতালের সমর্থনে মিছিল ২.৩০ মিনিটে দুপুরে খেতে বসেছি আমি, মহানগরী কলেজ কার্যক্রম সম্পাদক গোলাম সাদেক ভাই। মহানগরীর দপ্তর সম্পাদক রওশন ভাই তাড়াহুড়া করে বের হচ্ছিলেন। তিনি তখন আমার সবচেয়ে বড় সহযোগী এই ময়দান পরিচালনার। ভাইকে খেয়ে যেতে বললাম, উত্তর দিলেন এসে খাব। আমি কেন জানি জোর করে বসালাম এবং বললাম চলেন একসাথেই খাই। আবার কখন একসাথে খাব আল্লাহই জানেন। একসাথেই খেলাম। মিছিল শুরু করব হঠাৎ একটি পুলিশের গাড়ি। আমাদের ভাইরা যে যার মত আশপাশে সরে গেলেন। আমি এবং রিয়াজ ভাই একসাথেই দাঁড়িয়ে। আমাদের চোখের সামনে থেকেই সদা হাস্যোজ্জ্বল সকল জনশক্তির প্রিয় মুখ আমার ভাই রওশন জামানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্বার্থপরের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি উফ কী কষ্টের, যন্ত্রণার এবং বেদনার! নিজেকে এত বেশি অপরাধী মনে হচ্ছিল সে অপরাধ বোধ

www.pathagar.com

এখন আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। চারদিন মতিঝিল থানায় এবং ডিবি পুলিশের মিন্টু রোডের কার্যালয়ে আমার ভাইটির উপরে সেকি নির্যাতন যা শুনলে গা শিউরে ওঠে। যা জাহেলিয়াতের বর্বরতাকেও হার মানায়। ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে উপুড় করে শুইয়ে হেলমেট দিয়ে আরো যত বর্বরোচিত ও পৈশাচিক নির্যাতন যার কারণে আজও তার কোমরের নিচের অংশে অসংখ্য মাইক্রো ফ্রাকচার। যন্ত্রণাকে সংগী করে পথ চলছেন। যে বেদনা আজ স্মরণ করিয়ে দেয়, দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ। যার নির্যাতনের সংগী হয়েছিলেন রামপুরার থানা সভাপতি প্রিয় ভাই কামরুজ্জামান তানজীন এবং সেক্রেটারি প্রিয় ভাই আব্দুর রহমান।

যাকে নিয়ে ছিলাম উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কিত

২৮ শে ফেব্রুয়ারি সাঈদী হুজুরের বিরুদ্ধে দেয়া হল শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মিথ্যাচারের উপর ভিত্তি করে ফাঁসির রায়। প্রতিবাদে যাত্রাবাড়ীতে মহাসড়ক অবরোধ করলাম। আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুলিশ সেই চিরচেনা রূপে, জাতির জানমালের নিরাপত্তা যারা দিবে তারাই ভক্ষকের ভূমিকায়। সেই চিরচেনা টিয়ার শেল, রাবার বুলেট, গুলিবর্ষণ। এতক্ষণ আমার পাশেই যাকে দেখছিলাম লড়াকু সৈনিকের ভূমিকায় প্রতিরোধ তৈরি করছেন বীর দর্পে লড়ে যাচ্ছেন। কিছু সময় পরেই শুনলাম আমার সেই ভাই বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সাথী মনির হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে গ্রেফতার। ঢাকা মেডিক্যালে নেবার পর কোনরকম চিকিৎসা দিয়ে তাকে এ অবস্থায় রিমান্ড দেয়া হল। কারাগার হতে প্রতিনিয়ত যে খবর সবচেয়ে বেশি শংকিত করেছে রানা ভাই কিছু করেন, না হলে মনিরের পা কেটে ফেলতে হবে। হাসপাতালে ডাক্তার ম্যানেজ হয় তো জেল থেকে বের করা যায় না, বের করা যায় তো ডাক্তার ম্যানেজ হয় না। আর শঙ্কা এবং উৎকণ্ঠা মনির ভাইয়ের পা কি শেষ পর্যন্ত কেটে ফেলতে হবে? মাবুদ তুমি তো জানো, তোমার কাছেই তো সব বলেছিলাম। দীর্ঘ তিন মাস পর সে ভাইয়ের জামিন করালাম কাঠ খড় পুড়িয়ে অনেক চড়া মূল্যে। কিন্তু না, শতাব্দীর বর্বরোচিত, জঘন্য শাসক যে আমাদের ওপর। অত্যাচারীর খড়গহস্ত আমাদের করেছে জর্জরিত। আমার ভাই এই অবস্থায় জেল গেট থেকে পুনরায় গ্রেফতার। দীর্ঘ সময় পর আমার সেই ভাইটির জামিন হল। অপারেশন হল। আমরা শঙ্কামুক্ত হলাম। এ কাফেলার শত সহস্র নিবেদিত মজলুমের আহাজারিতে আল্লাহ আমার ভাইয়ের পা ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু এখনো সেই ভাই বিছানায়। সরকারি মাদ্রাসাইয় আলিয়ার সাথী ফুয়াদ কোমরের হাড় ভেংগে জেলে প্রেরণ করা হয়েছিল যার জন্য আমাদের অনেক ভাইয়ের বিনিদ্র রজনী কেটেছিলো উৎকণ্ঠায়,শংকায় এবং উদ্বেগে।

যাকে অনুভব করেছিলাম অনেক বেশি

২০১২, ২৬ ডিসেম্বর। আমরা মহানগরীর সভাপতি এনামুল ভাইসহ ফেনীতে শুধুমাত্র তোজাম্মেল ভাই ছাড়া। যিনি পরীক্ষার কারণে আমাদের সাথে যেতে পারেননি। সকালেও মিছিল করেছি একসাথে। সন্ধ্যায় খবর পেলাম মহানগরীর বাসায় পুলিশ এসে সদা শান্ত সেই ভাইটিকে নিয়ে গেছে পল্টন থানায়। মহানগরীর সভাপতি, সেক্রেটারি সহ নেতৃবৃন্দকে ধরিয়ে দিতে হবে। অস্বীকার করায় থানায় উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে সেকি নির্যাতন। প্রচণ্ড শীতেও পুলিশের শরীর থেকে টপটপ করে ঘাম পড়ছিল। শত নির্যাতনেও সেই ভাইটি অটল অবিচল থেকেছেন। দীর্ঘ ছয় মাস পর সেই ভাইটি আজ অংশ নিয়েছেন এই কাফেলার মিছেলে।

www.pathagar.com

এই অল্প সময়ে এত বেশি ভাই নির্যাতিত হয়েছেন যাদের কথা আলাদা করে বলতে পারছি না। বিশেষ করে মহানগরীর প্রচার সম্পাদক আব্দুল কাদের ভাই যাকে আমাদের মাঝে ফিরে পাব কিনা শংকিত ছিলাম। যার নখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল। গুম, ক্রসফায়ারের মত ভয় তাকে সত্য থেকে টলাতে পারেনি। এই মহানগরীর সাবেক সভাপতি ইয়াছিন আরাফাত ভাই যাকে ১ বছরের মিথ্যা কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। তাছাড়াও আলিয়ার সভাপতি ইমাম হোসাইন, বাহাবুল ইসলাম, রকিবুল হাসান শামীম, রিয়াজ উদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমান, বদরুল আলম রাসেল, আবুল খায়ের, শরীফুল ইসলাম, সানি, মারুফ, হোসাইন, জাকির হোসেন, রক্তিম, শরীফ (আলিয়া), আসাদ, সোহেল রানা মিঠু, মোস্তাফিজ, মুজিবুর রহমান, হাফিজুর রহমান, সানাউল হক, সাইফুল্যাহ খালেদ, শহীদুল ইসলাম সহ শত শত দায়িত্বশীল নেতা কর্মী জালিমের কারাগারে গিয়েছেন। নির্যাতিত হয়েছেন, নিপীড়িত হয়েছেন, আহত হয়েছেন, পুলিশের গুলিতে সমস্ত শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। ছাত্রলীগের হামলায় প্রচণ্ড নির্যাতিত হয়েও লড়ে চলেছেন অবিরাম। সত্যের পথে অটল অবিচলতার সাথে দীপ্ত শপথে বা কণ্ঠে শুধু শুনি আজ একি শ্লোগান-

“উহারা চাহুক দাসের জীবন
আমরা শহীদি দরজা চাই
নিত্য মৃত্যুভীত ওরা
মোরা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়াই।”

এই জনপদের প্রত্যেক জনশক্তি একই সুরে বলছে, দ্বীনকে বিজয়ের জন্য আমাদের সামনে একটাই রাস্তা খোলা রয়েছে তা হল লড়াই, লড়াই এবং লড়াই। এ ত্যাগের কোরবানির বিনিময়ে বিজয় আসবেই। ইনশাআল্লাহ।

ইয়া আল্লাহ, তুমি এ ত্যাগ, কোরবানি, কষ্ট, শত শত মায়ের নির্বাক চাহনি, নির্ঘুম রাত এবং অশ্রু বিসর্জন বৃথা যেতে দিও না, দিও না মাবুদ। তুমি তোমার দ্বীনকে বিজয় দান কর, আমিন।

লেখক: সভাপতি, ঢাকা মহানগরী পূর্ব

www.pathagar.com

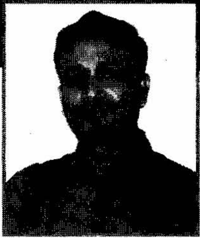

তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতা ও আমাদের সংস্কৃতিচর্চা

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবী এখন একটি গ্লোবাল ভিলেজ। থ্রিজি কিংবা ফোরজির কল্যাণে গোটাবিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। আকাশ-মাটি পুরোটা জুড়েই চলছে সংস্কৃতি ও বিনোদনের রমরমা বাজার। একসময় বিনোদন সংস্কৃতি ছিল পার্বণিক উৎসবের মতো। রাজা বাদশাহদের জলসাঘরে সঙ্গীত নৃত্যের আয়োজন থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে এসব ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন লোকজ অনুষ্ঠানই ছিল সাধারণ মানুষের বিনোদনের খোরাক। কিন্তু বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতায় বিনোদনের পুরো বাক্স এখন সকলের ঘরে ঘরেই শুধু নয়, মোবাইল ও ইন্টারনেট টেকনোলজির মাধ্যমে সকলের হাতের তালুবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে আমাদের শিশুরাও এখন সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে 'ইঁচড়েপাকা' শব্দকে টেক্কা দিয়ে অবাক হবার মতো নানা রকম কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এটা যতটা পজিটিভ ক্ষেত্রে দেখা যায় তার কোন অংশেই কম দেখা যাচ্ছে না নেগেটিভ সাইটে। অন্যদিকে খেলার মাঠসহ ক্রীড়াবিনোদনের স্থান, সময় ও পরিবেশ সংকুচিত হবার ফলে আমাদের স্বপ্নের নতুন প্রজন্ম কম্পিউটার, ল্যাপটপ এবং ভিডিও গেমসকে নেশার মতো আঁকড়ে ধরেছে। ফলে শারীরিকভাবেও যেমন তারা অনেকটা দুর্বল হয়ে গড়ে উঠছে তেমনি চিন্তাগতভাবেও তাদের অন্যরকম একটা অবস্থান তৈরি হচ্ছে। কারণ তাদের ব্যবহৃত বিনোদন মাধ্যমগুলো আমাদের দেশজ এবং স্বকীয় কালচারের ভিত্তিতে তৈরি নয়। পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় করতে চাইলে এখনই নতুনভাবে চিন্তা করার মোক্ষম সময়।

আধুনিকতা শব্দটি 'ওয়েস্টার্ন কালচার'-এর ফ্যাশনে উত্তর আধুনিকতার নামে প্রকারান্তরে চিন্তা ও বাহ্যিকতায় পশ্চিমাবিশ্বের প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রচলিত হয়ে আসছে। আর তারই একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবেই আমরা নিজেদেরকে মানিয়ে নিচ্ছি; এমনকি পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারক বাহক হিসেবে ভাবতে গর্ববোধ করছি। মুসলিম সংস্কৃতির মূলকথা ঈমান বা বিশ্বাস হলেও

www.pathagar.com

মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা ছিল মুসলমানদের হাতে। অথচ বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ এখন পুরোদমে পাশ্চাত্য জগতের অমুসলিমদের হাতে। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সংস্থা এসোসিয়েট প্রেস বা এপির সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত। ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল বা ইউপিআই একটি মার্কিন বার্তাসংস্থা। রয়টারের ঠিকানা বৃটেন এবং এএফপির সদর দপ্তর ফ্রান্সে। এ চারটি বার্তাসংস্থাই বিশ্বের সংবাদ প্রবাহের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ছাড়াও বিবিসি, সিএনএন, স্কাই নিউজসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সবগুলো কেন্দ্রই অমুসলিমদের দখলে। যে সব মানুষ উন্নয়নশীল বিশ্বে নিজেদের মতলব হাসিলের মত কাজ করতে করতে স্থানীয় জনগণের বোধ বিশ্বাস তথা স্বকীয় সংস্কৃতিবৃক্ষের শেকড়কাটার কাজ করছে এ সকল মিডিয়া তাদেরকে উদারপন্থী, মানবতাবাদী ও দেবতার আসনে আসীন করতে যথাসম্ভব সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল বিশ্বে তথা বিশেষত মুসলিমবিশ্বে যখন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা কোন দেশ বা দলের বিরুদ্ধে নির্যাতন চলে কিংবা কোন দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানগণ যখন নির্যাতিত হয় তখন তারা সে বিষয়ে নিশ্চুপ থাকে কিংবা তাদের কর্মসূচি ও অবস্থাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে জঙ্গিবাদের স্বপ্ন দেখে। অন্যদিকে সালমান রুশদি, তসলিমা নাসরিন কিংবা দাউদ হায়দারের মতো বাচ্চুগংসহ মুসলিম নামধারী ব্যক্তিদের টাকার বিনিময়ে খরিদ করে যখন স্বজাতীয় মুসলমানদের বোধবিশ্বাসে আঘাত হানে তখন তারা এ কর্মকাণ্ডকে ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বলে সমর্থন ও মদদ যোগায়। অবশ্য এটা তাদের দোষের কিছু নয়, কারণ তাদের মিডিয়া তাদের কথা বলবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন তারা বিশ্বমানবতাবাদী হিসেবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে চায়, তখনই এ বেদনা বেশি অনুভূত হয়।

আগেই বলেছি যে, একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চরম উৎকর্ষতার শীর্ষে অবস্থান করছে। পৃথিবী এখন ছোট হতে হতে হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। এ সময় আমাদেরকেও সংবাদ ও তথ্যপ্রযুক্তির দিকে অবশ্যই উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বর্তমানে সংবাদমাধ্যমে গণসচেতনতা তৈরি যেমন সহজ হয়েছে তেমনি হলুদ সাংবাদিকতায় বিভ্রান্ত হবারও সুযোগ অনেক বেশি। বিভ্রান্ত ও মিথ্যা সংবাদের জন্য ঘটে যায় হাজারো বিবাদ। হলুদ সাংবাদিকতা ও বিভ্রান্ত সংবাদ এতটাই মারাত্মক যে, এজন্য সংবাদসচেতন মুসলিম জনগোষ্ঠীও ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে ধাপে ধাপে বহুমুখী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষ করে অলিদ ইবনে উকবা (রা.) কর্তৃক প্রেরিত ভুল সংবাদের ভিত্তিতেই মহানবী (সা.) বনি মুস্তালিব গোত্রের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন। এছাড়া মারওয়ান কর্তৃক সংবাদ জালিয়াতির কারণে হযরত ওসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ড এবং একই প্রক্রিয়ায় কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসাইন (রা.) এর পরিবারের হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে মিথ্যা ও ভুল সংবাদ পরিবেশনের প্রেক্ষিতে স্পেন বিজয়ী সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর, তারিক বিন যিয়াদ এবং সিন্ধু বিজয়ী সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভাগ্যে জুটেছিল নির্মম পরিণতি, যা মুসলিম বিশ্বের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। গ্রানাডার মুসলমানদের নির্মম পরিণতি ও 'এপ্রিল ফুল'সহ আধুনিককালের হাজারো দুঃখজনক পরিণতির জন্য তথ্য বিভ্রাট ও হলুদ সাংবাদিকতাই দায়ী। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষতার যুগে শুধুমাত্র যোগ্যতা নয়, সততাসহ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সাংবাদিক, সংবাদপত্র

www.pathagar.com

পশ্চিমাবিশ্ব সংস্কৃতি বলতে চিত্তবিনোদনের উপায়কেই উপস্থাপিত করছে। কেননা বিশ্বাসের ভিতে আঘাত করতে বাধা যতটা প্রকট হবে, চিত্তবিনোদনের নামে অশ্লীল গান, নৃত্য, নগ্নতা, উলঙ্গপনা প্রভৃতির নেশায় বাগিয়ে নেয়া ততটা কঠিন নয়। তাইতো মডার্নিজম, সোসালিজম তথা আধুনিকতা ও সামাজিক আভিজাত্যের খোলসে যুবক-যুবতীর নগ্নতা, লিভটুগেদার, নারী দেহের উলঙ্গ প্রদর্শনী এসব নির্লজ্জতা ও রুচিহীনতাকে শিল্প সৌকর্যের নান্দনিক বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। সে প্রেক্ষিতে খেলাধুলা থেকে শুরু করে যে কোন আনুষ্ঠানিকতায় যে যতো নগ্নতা প্রদর্শন করতে সক্ষম সে ততো অভিজাত, উন্নত, উত্তরাধুনিক ও মুক্ত সংস্কৃতির সার্থক শিল্পী হিসেবে বিবেচিত। নারীদেহের নগ্ন উপস্থাপনাকে আধুনিক শিল্পের নান্দনিকতার পূর্ণাঙ্গ রূপ হিসেবে কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, নাটকে, সিনেমায় কিংবা অন্য কোন বিনোদন অনুষ্ঠানে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সত্যিকার অর্থে নারী সৌন্দর্যকে নান্দনিকতার মোড়কে নগ্নচিত্রে উপস্থাপিত করে নৈতিক পদস্খলনকে বাহন বানিয়ে শয়তান মানব মনে ছড়িয়ে পড়ে ।

বিশ্বাস সব সময়ই গতিময়তা পছন্দ করে থাকে। তাই মনের সামনে বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শিত হতে হতে যেটা হৃদয়গ্রাহী ও মনে ক্রিয়াশীল হবে সেটার প্রতিই সৃষ্টি হবে বিশ্বাস। আর বিশ্বাস সৃষ্টির প্রধান বাহন প্রচার বা মিডিয়া। যে জাতি সংবাদ ও তথ্যপ্রযুক্তি তথা গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে যত উন্নত সে জাতির বিশ্বাস, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, সভ্যতা তথা জীবনযাত্রা ততটা সমৃদ্ধ এবং সেই সমৃদ্ধ ইতিহাস ও আত্মবিশ্বাসের ওপর ভর করেই তারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। তাই মহানবীসহ (সা.) মুসলমানগণ শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়েই সচেতন ছিলেন না বরং রাজনীতি, সমাজ, দর্শন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সমরনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তারা সচেতনতার সাথে সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করেই পথ চলতেন। এমনকি চরম নির্যাতনের মধ্যে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পূর্বে মহানবী (সা.) মদীনার সঠিক অবস্থা অবগত হবার জন্য বিশ্বস্ত সাহাবী হযরত মুসাবকে (রা.) প্রেরণ করেছিলেন। যে যুগে কাগজের প্রচলন না থাকলেও তথ্য সংরক্ষণের জন্য মহানবী (সা.) ও সাহাবীগণ খুবই তৎপর ছিলেন এবং চামড়া, হাড়, গাছের ছাল, পাতা এমনকি পাথরে খোদাই করে তথ্য সংরক্ষণ করেছিলেন। সুতরাং বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্ষতা ও উত্তর আধুনিককালে সেই মুসলিম জাতি সংবাদ ও তথ্যপ্রযুক্তির অংগনে পিছিয়ে থাকবে তা কল্পনা করা যায় না।

বাংলাদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অভাব যতটা তার চেয়ে বেশি অভাব মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক। এ ধরনের নাগরিক তৈরি করতে পারলেই কাঙ্ক্ষিত সোনালি স্বপ্নের সোনার দেশ গড়া সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, বাংলাদেশ স্বাধীনতার চার দশক পার করলেও এ পর্যন্ত শিক্ষানীতি নিয়ে শুধু পরীক্ষা নিরীক্ষাই চলছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে সরকার ক্ষমতার মসনদে এসেছিল, তারাও এখন কুদরত ই খুদার সেই ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে ধর্মহীন শিক্ষানীতিকেই আরো আধুনিকতার মোড়কে গেলানোর সকল প্রয়াস সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশের মতো একটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের দেশে এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা কতটা কল্যাণকর হবে তা ইতোমধ্যে বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও চিন্তাশীল বিশ্লেষকদের মতামত থেকে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। ইসলাম প্রচারমাধ্যম বা মিডিয়াকে দাওয়াত বলে সম্বোধন করে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছে। সে হিসেবে

www.pathagar.com

এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া তথা সত্যসচেতন গণমাধ্যমের আজ বড় বেশি প্রয়োজন। আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তোলার জন্য বাংলাদেশে চলছে নানা ষড়যন্ত্র। নাস্তিক্যবাদ, পুঁজিবাদ, বিকৃত ধর্মীয় ও কুসংস্কারবাদী মতবাদ এর ওপর আঘাত হেনে চলেছে নানাভাবে। বাঙালি সংস্কৃতি বা মানবধর্ম নামে এদেশের মানুষকে ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে বিনোদন সংস্কৃতির মাধ্যমে আল্লাহ রাসুলের সরাসরি বিরোধিতা না করে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও প্রগতির নামে অশ্লীলতার প্রসার ঘটিয়ে নৈতিক অবক্ষয়ের বিষ ছাড়াচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান না নেয়া এবং এর পাশাপাশি ইসলামী সংস্কৃতির কোন মডেল না থাকায় দেশবাসী এ সংস্কৃতিকে গোগ্রাসে গিলছে, কেননা এ সংস্কৃতিসেবীদের অনেকেই মুসলমান নামধারী। তাদের নির্মিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্ ও রাসুলের (সা.) নামও উচ্চারিত হয়। অথচ এ সংস্কৃতি যে নৈতিকতার জন্য কত বড় মারাত্মক তা আজও কারো বোধগম্য হয়নি।

সংস্কৃতির এমন সংকটময় মুহূর্তে আমাদের নিজেস্ব সংস্কৃতি চর্চার গতিবেগ তাদের চেয়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে সামনে এগুনো দরকার। অথচ এখনও আমরা নিজেদের সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়ে সংশয়িত। আমরা কারা, আমাদের সংস্কৃতি কোনটি, এর প্রকৃতিই বা কেমন- এসব বিষয়ে আজো আমাদের পরিচ্ছন্ন ধারণা নেই। আমি এ উদাহরণ আগেও দিয়েছি যে, আজ অপসংস্কৃতি যখন ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে গোটা জাতির আহার যোগাচ্ছে (?) তখন তার উচ্ছিষ্টাংশ নিয়ে আমরা সবেমাত্র গবেষণা শুরু করেছি যে, এটা কেমন ধরনের ফল, জাতিসত্তাকে বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে এর বিকল্প কোন ফলের গাছ রোপণ করতে হবে কিনা? এতে কেউ প্রয়োজন অনুভব করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায়, কেউবা সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সংশয়িত হয়ে বিদায়াতের ফতুয়া দিয়ে ইসলামকে জাতির সামনে অত্যন্ত কঠিন ও ভয়ের বস্তু হিসেবে তুলে ধরছে।

পক্ষান্তরে যারা জাতিসত্তাকে বাঁচানোর তাকিদে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি তারাও ঐকমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ। ইসলামী মূল্যবোধের গান হলে তার গণ্ডি কতটুকু হবে? মিউজিক চলবে কিনা? চললে কেমন ধরনের মিউজিক ব্যবহার করা যাবে? নাটকে নারী চরিত্র চলবে কিনা? কবিতা ও সাহিত্যে প্রেম বিষয়ক কিছু বৈধ কিনা ইত্যাদি, ইত্যাদি প্রশ্ন। এতে কেউবা গানে মিউজিক, নাটকে নারী চরিত্র ও সাহিত্যে প্রেমকে অবৈধ ঘোষণা করছি, কেউবা মনে করি যে, আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার যুগে এগুলো ছাড়া সংস্কৃতিচর্চাই সম্ভব নয়। ফলে আজও আমরা জাতির সামনে সংস্কৃতির কোন মডেল দাঁড় করাতে পারিনি। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে তৈরি হয়েছে হাজারো ছিদ্রপথ, তাই সমকালীন বিশ্বেও প্রতিযোগিতামূলক আধুনিক জ্ঞান অর্জনের কোন বিকল্প নেই, সেটা হোক মিডিয়া কিংবা বিনোদন মিডিয়া। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শরিয়াতের আধুনিক গবেষণা এখন সময়ের দাবি। ১৯২৬ সালে এক বক্তৃতাতে জ্ঞান অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করে ইকবাল বলেন, "যারা নিজেরা সংবাদপত্র পড়তে অপারগ তারা যেন অন্যদের কাছ থেকে শুনে নেয়, কেননা সমকালীন বিশ্বে যে সব জাতি কর্মতৎপর রয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ জাতিই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে।' স্বকীয় আদর্শের প্রচার ও প্রসারে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে গণমাধ্যমের কাজ ও সংস্কৃতিচর্চা শুরু হয়েছে, এটা আমাদের জন্য বড়

www.pathagar.com

আশার দিক। ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীরা আন্তরিকভাবেই প্রচলিত অপসংস্কৃতির বিরোধী। অশ্লীলতা, বেহায়াপনাকে পারিবারিক ঐতিহ্যগতভাবেই মুসলিম সমাজে অপছন্দনীয়; সেইসাথে ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত ছাত্র ও যুবকদের পক্ষ থেকেও বিভিন্নভাবে একাজকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াস চলছে। অন্যদের তুলনায় অতি সামান্য আকারে হলেও তাদের প্রচেষ্টায় রাজধানী ও মহানগরীসহ দেশের প্রধান প্রধান শহরে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা, এনজিও, সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস চলছে। তাদের মাধ্যমে কিছু জাতীয় ইস্যু পালন ছাড়াও অপসংস্কৃতির প্রতিরোধে সাহিত্য সামগ্রীসহ গান ও নাটকের বেশ কিছু অডিও ভিডিও ক্যাসেটও প্রকাশিত হয়েছে, যদিও তা পুরোপুরি আধুনিক মানের হয়ে ওঠেনি। সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় নিয়মিত সাহিত্যসভা, লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনা, নাটক মঞ্চায়ন ও সঙ্গীতচর্চা প্রভৃতির ক্ষেত্রে অনেকটা আশার আলো ছড়াতে সমর্থ হয়েছে। দক্ষতা ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলেও যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব ও নিজেদের আস্থাহীনতা যেমন পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তেমনি অর্থনৈতিক সংকট, আলাদা নাট্যমঞ্চ সংকট, তথ্য সন্ত্রাসে বিভ্রান্তি হওয়া, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, রক্ষণশীল ইসলামপন্থীদের বাধা, আধুনিক প্রযুক্তির অজ্ঞানতা, সর্বোপরি সংস্কৃতির সঠিক মডেল না পেয়ে এ অভিযানে বিজয়ের টার্গেট না হয়ে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নেয়া হয়েছে। এসব সীমাবদ্ধতার ফলে এ প্রয়াস সাধারণ জনগণের মাঝে কাঙ্ক্ষিত আবেদন সৃষ্টিতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

নৈতিকতাসম্পন্ন জনসম্পদ ছাড়া সত্যিকার অর্থে কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মোটেও সম্ভব নয়। 'আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত' এ শ্লোগানকে মাথায় রেখে তাদের উপযোগী বিনোদন সরবরাহ না করতে পারলে ডোরেমনসহ অনৈকতাসম্পন্ন কার্টুন ও ভিডিও গেমস তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবেই। মানসম্মত সিরিয়াল না দিতে পারলে ভারতীয় চ্যানেলের সিরিয়ালে আমাদের নারীসমাজকে আটকে রেখে ঐতিহ্যবাহী পরিবারতন্ত্রকে চিরতরে ভেঙ্গে খান খান করে দিবে। অন্যদিকে হিন্দি ও কাটপেস্ট ফিল্মে আমাদের যুবসমাজকে যেমন ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিয়ে যাবে তেমনি ইন্টারনেটের অনৈতিক ওয়েবসাইটগুলো মুখিয়ে আছে যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় তৈরির জন্যে। এমতাবস্থায় বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে মানসম্পন্ন ও আদর্শিক প্রক্রিয়ায় বিনোদনের সংস্কৃতির সঠিক ধারণা উপস্থাপন, দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি সংগঠনসমূহকে আরো সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় অঞ্চলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এখন সময়ের দাবি। বিশেষ করে মিডিয়া অঙ্গনে লোক তৈরির জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা জরুরি। বিভাগীয় শহর ছাড়াও দেশের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে নিজস্ব বলয়ে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়তে উৎসাহিত করা। সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে জ্ঞানচর্চা আরো বৃদ্ধি করে যোগ্যতার ভিত্তিতে জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মজবুত সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিশ্বাসী ঘরানার মিডিয়া ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

অধ্যাপক নাজির আহমদ একটি বিপ্লবী চেতনার নাম

ইসলামী আন্দোলনের পথে নিজেকে যুক্ত করার পর থেকেই এ পথের প্রতিটি অনুষঙ্গ থেকে জীবন গড়ার পাথেয় পেয়েছি। রাজনীতির উত্থান, পতন, আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাত, দায়িত্বশীলদের সংস্পর্শ এসব কিছুই প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ দিয়েছে শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে এ পথে ঈমান নিয়ে টিকে থাকার। ছাত্রজীবনে আন্দোলনের কাজে জড়িত থেকে শপথ নেয়ার পর থেকে জীবনের এক নতুন দুয়ার উন্মোচিত হল। ইসলামী আন্দোলনের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনের সিপাহসলার কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচনে ভোট দেয়া ও সম্মেলনের যাবতীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চার হল।

১৯৯৮ সালের ঐ সম্মেলনটি ছিল খুব আলোচিত। সব সময় টঙ্গীতে সদস্য সম্মেলন হলেও ১৯৯৮ সালের ৩১ মে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলনের ভেন্যু ঘোষণা করা হয়েছিল রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে হওয়ায় সম্মেলনের স্থান নিয়ে বামপন্থীদের পক্ষ থেকে তুমুল বিরোধিতা ও সম্মেলন হতে না দেয়ার ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিল শিবির। তাই আগের দিনই আমাদেরকে ঢাকায় চলে আসতে বলা হলো। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো অনেকের আবেগের সাথে জড়িত সেই চিরচেনা, লাখো মানুষ গড়ার প্রশিক্ষণালয় আল ফালাহ মিলনায়তনে।

ঘড়ির কাঁটায় সকাল ৯টায় আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই সম্মেলন শুরু হল। কোরআন তেলাওয়াত, হামদ-নাত, তারপর কেন্দ্রীয় সভাপতির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী বক্তব্যের পরপরই নির্বাচনী সেশন। নির্বাচনী সেশন শুরু হবে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ অতিথিরা একে একে স্টেজ থেকে নেমে আসলেন। ১০টা বাজার ৪ মিনিট আগে সাদা পাঞ্জাবি, উপরে কোট পরিহিত শ্মশ্রুমণ্ডিত, আমাদের একান্ত আপনজন অধ্যাপক

www.pathagar.com

এ.কে.এম নাজির আহমদ আসন গ্রহণ করলেন। সাথে সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. কামারুজ্জামান, সাইফুল আলম খান মিলন ভাই। কামারুজ্জামান ভাই-এর ঘোষণায় ১৯৯৯ সালের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করতে শুরু করেন জামায়াতে ইসলামীর কার্যপরিষদ সদস্য, ছাত্রশিবিরের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এ.কে.এম নাজির আহমদ। তার মুখাবয়বে তখন একজন দৃঢ়চেতা, বীর, প্রাজ্ঞ, সত্যিকার মুজাহিদের ছবিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। স্বল্পভাষায় হৃদয় নিংড়ানো শব্দচয়ন, আর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর দিয়ে লাখো হৃদয় আলোড়িত করার অসাধারণ যোগ্যতা ছিল তার। সেদিন থেকেই স্যারকে আমার দেখা শুরু। আর তখন থেকেই শিবিরের সম্মেলন মানেই নাজির স্যারের উপস্থিতি। ধীরে ধীরে এই তৌহিদী বন্দরের লাখো নাবিকের হৃদয়ে জায়গা করে নেন এই প্রিয় মুখ।

আলোচনার শুরুতেই তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি। ১৯৩৯ সালে কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলা বোয়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (অনার্স) ও ১৯৬৩ সালে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬০ সালে ছাত্রজীবনেই ইসলামী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৫ সালে বৃহত্তর আন্দোলন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সালে কুমিল্লা জেলা আমীর ও পরবর্তীকালে কেন্দ্রের মজলিসে শূরা, কর্মপরিষদ, নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও সর্বশেষে ২০০৯ সাল থেকে নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কর্মজীবনে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ও কুমিল্লা কলেজ-এর ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি ৩৫টি ইসলামী পুস্তক রচনা করেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে ব্যাপক পরিচিত লাভ করেন।

কুরআন, হাদীসের ওপর নিয়মিত জ্ঞান চর্চা ও গবেষণা, ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে অনমনীয়তা ও সুদৃঢ় অবস্থান ছিল তার চরিত্রের একটি অনন্য গুণ। আদর্শগত বিষয়ে কোন আপসকামিতা যেমন তাকে কাবু করতে পারেনি; ঠিক তেমনি যে কোন সমস্যা সমাধানে রাসূল (সা:) এর সুন্নাহ অনুসরণ মধ্যমপন্থা অবলম্বন, পারিপার্শ্বিক বিবেচনায় বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল প্রয়োগ তাকে ইসলামী আন্দোলনের অতুলনীয় নেতৃত্বে পরিণত করেছে। তিনি স্বল্প ভাষায় প্রাঞ্জল শব্দ প্রয়োগকারী, চিন্তাশীল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। পাশাপাশি যে কোন সমস্যায় আল্লাহর অভিভাবকত্ব উপলব্ধি করে দৃঢ়চিত্তে মোকাবেলা করা ছিল তার বৈশিষ্ট্য, যা ইসলামী আন্দোলনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের জন্য শিক্ষণীয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত স্যারের সাথে মেশার ও কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তার পরিচালনায় স্টাডি ক্লাস ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক বৈঠকে তার অসাধারণ দারস ও জ্ঞানসমৃদ্ধ বক্তব্য ছিল খুবই আকর্ষণীয়। তার এ সকল প্রশিক্ষণ পেয়ে এবং তার সাথে কথা বলার পর অন্তরে এক অদ্ভুত শীতলতা ও প্রশান্তি অনুভব করতাম। ক্রমেই কুরআনকে জানার, বোঝার ও বাস্তবায়নের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতো। বৃহত্তর আন্দোলনের ক্রান্তিকালে তার ভূমিকার কারণে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই আন্দোলনকে মজবুতির সাথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি কালের সাক্ষী হয়ে প্রতিটি সংকটে সংগঠনের যথাযথ ভূমিকা রাখতে অনেক বেশি সহযোগিতা করেছেন।

www.pathagar.com

২০১০ সালে ছাত্রআন্দোলনের এক কঠিন সংকট মুহূর্ত আসে। দায়িত্বশীল হিসেবে তার কাছে আমাকে যেতে হয়েছে অনেকবার। প্রতিবারই তার কাছে যাওয়ার পর বটবৃক্ষের শীতলতার উপলব্ধি করেছি আমি। মনে হয়েছে আসলেই এই আন্দোলন ব্যক্তির বা মানুষের নয়। এটি আল্লাহর আন্দোলন। আন্দোলনের ব্যক্তিরা সঠিক ভূমিকায় থাকলে আল্লাহই তার হেফাযত করবেন। তার দূরদৃষ্টি বিচক্ষণতা ও সবরের সঠিক নির্দেশনা আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠনকে এগিয়ে নিতে অনেকটাই বড় ভূমিকা রেখেছে। সেই সময়ের দিকভ্রান্ত কিছু ভাই বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে এদিক সেদিক ছুটে গেলেও তার বক্তব্যে এক সুতায় হৃদয়গুলো গাঁথা হয়ে যায়। ২৫শে ডিসেম্বর ২০১০ সালে সমাপনী পরিষদে তার দেয়া বক্তব্য আন্দোলনের জন্য একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। সবাই উপলব্ধি করে সীসাঢালা প্রাচীর না হতে পারলে এই কাফেলা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বাতিল ছোট ছোট ছিদ্রগুলোকে গর্তে পরিণত করে ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সম্পদ এই ঐক্যের শক্তিকে নষ্ট করবে। আলহামদুলিল্লাহ্। তাই আর কোন সংগঠনের মতো এই সংগঠন খড়কুটোর ন্যায় স্রোতস্বিনী নদীতে হারিয়ে যায়নি। বরং তা মজুবতির সাথে ঈমানী শক্তি নিয়ে স্রোতের বিপরীতে অবিরাম এগিয়ে চলেছে। সংকট মোকাবেলার পাশাপাশি দাওয়াত প্রশিক্ষণের নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া ছিল আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আল্লাহর অশেষ রহমতে ছাত্রশিবির সেই চ্যালেঞ্জও দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করতে সমর্থ হয়েছে। ২০০২ সালে কুমিল্লা মহানগরীর যুগে যুগে একটি স্মারকের নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে তার কাছে একটি লেখা নেয়ার জন্য এসেছিলাম। এছাড়া মহানগরীর দায়িত্ব পালনরত অবস্থায়ও তাকে বেশ ক'বার কাছে পেয়েছিলাম। তবে মূলত ২০০৯-১০ এই তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।

নাজির স্যার-এর একটি অনন্য গুণ ছিল তিনি আন্দোলনের কর্মীদেরকে পিতার মত কল্যাণকামিতা আর স্নেহময়ী ভাষায় আগলে রাখতেন। আর তাই আমার মত বাবা ছাড়া সন্তানেরা তার কাছ থেকে বাবার স্নেহ পেয়ে আকুল হয়ে উঠতাম। মনের অজান্তেই আমাদের হৃদয়ে তার জন্য বাবার মতোই ভালবাসা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অনেকের মতোই বিশেষ স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছিলাম আমি। ২০১১ সালে ছাত্রজীবন শেষ করার পর বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হই। আন্দোলনমুখী থেকেই জীবনের বাকি সময়টুকু কাটিয়ে দেব সিদ্ধান্ত নি লেখালেখি করা। ইসলামী আন্দোলনে ষড়যন্ত্রগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দেয়া ও ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরাই আমার মিশন হবে। স্যারের সাথে কাটানো একান্ত মুহূর্তে তাকে জানালাম। প্রেসক্লাবে সংগঠনের প্রোগ্রামে তিনি আমাকে দেখা করতে বললেন। যথারীতি দেখা করব বলে জানালাম। হঠাৎ একদিন আমার নামে মগবাজারের একটি ঠিকানায় একটি চিঠি আসলো। প্রেরক বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ.কে.এ.নাজির আহমদ। একটি সেমিনারে আসার আমন্ত্রণপত্র। সাথে সেমিনারের প্রবন্ধ। প্রত্যাশিত জিনিসের সন্ধান পেয়েছি মনে করে অনেক খুশি হলাম। যথারীতি কাঁটাবনে সেমিনারের জন্য উপস্থিত হলাম। গিয়ে ডঃ উমার আলী, আবুল আসাদ, ডঃ মনজুরে এলাহীসহ আরো ১২ জন বিজ্ঞ অংশগ্রহণকারী দেখে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে একান্তে নিয়ে কুশলাদি জানার পর তিনি আমাকে তার সহজাত দৃপ্ত ভাষায় আমাকে এভাবেই উদ্দীপ্ত করলেন। আমরা তোমাকে বাছাই করেছি। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের এই যুগে টিকে

www.pathagar.com

থাকতে হলে জ্ঞানভিত্তিক যে আন্দোলন প্রয়োজন তার সাথী হবার জন্য। পরবর্তীতে খুবই চমৎকার আরো ২টি সেমিনারে আমি অংশগ্রহণ করি। কিন্তু মামলা-হামলার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার আর যাওয়া হয়ে পড়েনি। খুব অতৃপ্তি ও অপরাধবোধ কাজ করে এজন্য। যদিও স্যার গ্রেফতার হওয়ায় পরবর্তীতে সেমিনারটি করা আর সম্ভব হয়নি।

স্যার-এর প্রতি আন্দোলনের কর্মীদের ভালবাসা ছিল অনেক বেশি। তাই অন্য সবার মতো আমারও ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে যখন মনে হয় এই জুলুমবাজ সরকারের হয়রানি স্যার এর অসুস্থতার পেছনে একটি বড় কারণ। সকল মামলার জামিন থাকা সত্ত্বেও সত্তরোর্ধ্ব এই প্রবীণকে মানসিক, পারিবারিকভাবে যেভাবে হয়রানি করা হয়েছে তা খুবই নির্মম এবং অমানবিক। সর্বশেষ তার বাসায় রাতে পুলিশি অভিযানকালে তার নিরপরাধ পুত্রকে গ্রেফতার করার পর পরই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিছুদিন পর জ্ঞান ফিরলেও পুনরায় হার্টএটাক হলে হাসপাতালে তিনি প্রভুর সাথে মিলিত হলেন। সরকারের নিষ্ঠুরতম এ আচরণ ক্ষমার অযোগ্য। লাখো কোটি জনতার পক্ষ এহেন জুলুমবাজ সরকারের প্রতি ধিক্কার জানাই। এমনটি সরকারের অমানবিক আচরণ এর আরও একটি নজির আমরা দেখি তার জানাজার নামাজের সময়। লাখো মানুষের ঢল নামতে পারে এই আশংকায় সংক্ষিপ্তভাবে নামাজ শেষ করার ওপর চাপ দেয় স্থানীয় প্রশাসন। চরম প্রতিবন্ধকতার কারনে মনের আকুতি নিয়ে অনেকেই যেতে পারেননি তার শেষবারের মতো তাকে দেখতে, বিদায় দিতে। উপরন্তু ফিরে আসার পথে শোকাহত অনেকেই (২০ জন) পুলিশ আটক করে। ঈমানের পথে চলার এ কাফেলায় শরিক হওয়ায় তাদের অপরাধে। এমনই অপরাধে কিছুদিন আগে হত্যা করা হয় ইসলামী আন্দোলনের আরেক সিপাহসলার শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে। জুড়িশিয়াল কিলিং-এর মাধ্যমে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। কসাই কাদের সাজিয়ে আব্দুল কাদের মোল্লা কে ফাঁসি দেয়ার হীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে তারা। জানাযার নামাজে তার পরিবার ঘনিষ্ঠজন কাউকেই যেতে দেয়া হয়নি। সরকার এর এহেন আচরণ তার পতনকেই নিকটবর্তী করছে। এ সকল শহীদ ও নির্যাতিত নেতার প্রতিটি রক্তকণা আর তাদের জন্য তাদের দ্বীনি ভাই বোন ও স্বজনদের প্রতি মুহূর্তের ফেলা চোখের পানি-ই শত কোটি গুণ আযাব হয়ে সরকারের পতনকে সুনিশ্চিত করবে; ইনশাআল্লাহ।

মহান প্রভুর কাছে দোয়া–মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার এই দুই প্রিয় বান্দাসহ শাহাদাতবরণকারী সকল আন্দোলনের খেদমতকারীকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। তাদের জন্য চিরবসন্তের জান্নাতের সুশীতল ছায়ায় বাসস্থান নির্দিষ্ট করে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। ইসলামী আন্দোলন তাদের সব ছোট বড় প্রচেষ্টা শ্রম আর মেধার ফসল হিসাবে রেখে যাওয়া বই-পুস্তক গবেষণা ও বক্তব্য থেকে যেভাবে প্রাণশক্তি পেয়েছে, ইসলামী আন্দোলনের সকল পর্যায়ের কর্মী ও দায়িত্বশীলরা যেভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং হতে থাকবে। মহান রাব্বুল আলামীন তার প্রতিদান হিসেবে যুগ যুগান্তরে তাদের আমলনামায় লক্ষ কোটি গুণ সওয়াব পৌছে দিন। তাদেরকে সম্মানিত ও মর্যাদা দান করুন। এবং তাদের সাথে তাদের উত্তরসূরি হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের সকল প্রজন্মকে কবুল করুন। আমিন।

লেখক : সাবেক অফিস সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

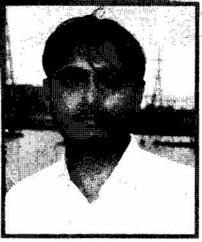

জুলুম : পীড়িতের অশ্রু পীড়কের পরাজয়

পৃথিবীর সবাই শান্তি চায়। তাবৎ রাষ্ট্রই চায় সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করতে। কিন্তু সুখ নামের সোনার হরিণটি কেন জানি অধরাই থেকে যায়! কারণ কী? কারণ হলো শান্তি কামনা করলেও অধিকাংশই পারে না শান্তির পথ অবলম্বন করতে। সুখ ও শান্তির দেখা পেতে হলে আবশ্যক মানুষের মধ্যে অধিকার ও ইনসাফ নিশ্চিত করা। পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির চর্চা করা। অধিকার ও ইনসাফ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল প্রশান্তি ছড়ায়। নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা পায়। সমাজে একে অপরের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় হয়। ধনী-গরিবের মধ্যে আস্থা গড়ে ওঠে। সম্পদ উন্নত ও রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হয়। সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় এবং অস্থিতির পরিবর্তে পরিস্থিতি শান্ত হয়। তখন কেউ অস্থিরতায় পতিত হয় না। সর্বোপরি উন্নয়ন-উৎপাদনে আমির-ফকির ও মালিক-শ্রমিক প্রত্যেকেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে ধাবিত হয়। পথ-পরিক্রমায় এমন কিছুর সৃষ্টি হয় না যা কারো কর্মস্পৃহাকে ভোঁতা কিংবা উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করে।

পক্ষান্তরে জুলুম এসবকে সুদূর পরাহত করে। সমাজের শান্তি ও স্থিতি এবং মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। ইসলাম তাই মানুষকে ইনসাফে উদ্বুদ্ধ করেছে। সতর্ক করেছে জুলুম ও অনাচার থেকে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহের অসংখ্য জায়গায় বিবিধ প্রসঙ্গে নানা উপায়ে ইনসাফের উপদেশ দেয়া হয়েছে। নিষেধ করা হয়েছে জুলুম ও বেইনসাফি থেকে। মানুষের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ এবং অনিষ্ট সাধন থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ কারও প্রতি যেমন জুলুম করেন না, তেমনি তিনি কারও কাছে তা প্রত্যাশাও করেন না। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন,

وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ

'আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি কোনো জুলুম করতে চান না।' (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত : ৩১)
আবু যর গিফারী রাদিআল্লাহ আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

'يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

www.pathagar.com

'হে আমার বান্দা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং একে তোমাদের মাঝেও হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পর জুলুম করো না।' (মুসলিম : ৬৭৩৭)

মানবেতিহাসের পরতে পরতে ইনসাফ নির্মূল হয়েছে। শেকড় গেড়েছে জুলুম ও অত্যাচার। শাসকরা যুগে যুগে জুলুম-অত্যাচার করেছে প্রজাদের ওপর। সবল নিপীড়ন চালিয়েছে দুর্বলের ওপর। বস্তুত পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে কেবল তাদের জুলুম ও উদ্ধত আচরণের কারণেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟

'আর অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যখন তারা জুলুম করেছে।' (সূরা ইউনুস, আয়াত : ১৩)

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন, فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

'সুতরাং ওসব তাদের বাড়ি-ঘর, যা তাদের জুলুমের পরিণতিতে বিরান হয়ে আছে'। (সূরা আন-নামল, আয়াত : ৫২)

নমরুদ-ফিরাউনের প্রেতাত্মা সর্বকালেই চেষ্টা করেছে শাসক ও পরিচালকদের কাঁধে সওয়ার হতে। তাই পূর্ব থেকেই সতর্ক করা হয়েছে জুলুমের এই অপরিণামদর্শী পথ থেকে। কিন্তু ইতিহাসের সবচে বড় শিক্ষা কেউ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। পৃথিবীর ধ্বংসপ্রাপ্ত বহুজাতির ইতিহাস রোমন্থনও পারে না তাই মানুষকে নিপীড়ন-নিষ্পেষণের নিন্দিত পথ থেকে বিরত রাখতে। অত্যাচারীরা সব সময়ই নিজের শক্তির মরীচিকার ধান্দায় পড়ে অত্যাচার চালিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিচ্ছেন,

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْءَازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَـٰظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

'আর তুমি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও। যখন তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে দুঃখ, কষ্ট সংবরণ অবস্থায়। অত্যাচারীদের জন্য নেই কোনো অকৃত্রিম বন্ধু, নেই এমন কোনো সুপারিশকারী যাকে গ্রাহ্য করা হবে। (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত : ১৮) আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

'আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই'। (সূরা আল-হজ, আয়াত : ৭১)

শুধু শাসক বা উপরস্থ পর্যায়েই নয়, আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে প্রতিটি স্তরে জুলুম পরিহার করতে হবে। যে কোনো ধরনের অনাচার থেকে সবাইকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় সবাইকে একদিন এমন বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে যার কাছে কোনো কারচুপি বা দুর্নীতি করে বাঁচার সুযোগ নেই। যিনি সব শাসকের শাসক এবং সব বিচারকের নির্ভুল বিচারক। কিয়ামতের সেই দিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে একাধিক হাদীসে। জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো, কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে।' (মুসলিম : ৬৭৪১)

অত্যাচারী যখন অন্যের প্রতি অনাচার চালায় তখন তার মনে হয় সেই বুঝি সর্বেসর্বা। তার শক্তি ও ক্ষমতা বুঝি চিরস্থায়ী। সে ভুলে যায় যে ওই অসহায় লোকটির পক্ষে আর কেউ না থাকুক, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা আসমানের অধিপতি রয়েছেন। মানুষের অক্ষমতা ও শক্তির

www.pathagar.com

দৌড় কতটুকু তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا

'আর যমীনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো যমীনে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না।' (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩৭)

ঘুড়ি যেমন আকাশে ওড়ার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে। মনে হয় পুরো আকাশই যেন তার। তাকে আর কারো হাতে বন্দি কিংবা কারো অধীন হতে হবে না। বাতাসের তালে তালে ইচ্ছেমাফিক কেবল সে ডানে-বামে উড়তে থাকে। অথচ তখন সে বেমালুম ভুলে যায় যে তার সুতোর গোড়া বাঁধা সেই নাটাইয়ে। তার স্বাধীনতা মূলত ঘুড়ি চালকের ইচ্ছার অধীন। মানুষও তেমনি জুলুম করার সময় নিজের অক্ষমতা ও ক্ষণস্থায়িত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়। দয়াময় আল্লাহ মানুষকে বারবার সুযোগ দেন জুলুম-অত্যাচার থেকে নিজেকে শুধরে নিতে। জুলুমের পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে। তারপরও যদি সে ফিরে না আসে তখন তার ও সব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেন। তখন অত্যাচারীর কোনো শক্তি বা ফন্দিই আর কাজে আসে না।

আবু মূসা আশ'আরী রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَيُمْلِى لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ

'আল্লাহ জালেমকে অবকাশ দেন। অবশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তার পলায়নের অবকাশ থাকে না।' (বুখারী : ৪৬৮৬)

আর যদি দুনিয়াতে কোনো কারণে সে পারও পেয়ে যায়, আখেরাতে কিন্তু তার পার পাওয়ার সুযোগ নেই, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ ٤٢ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ

"আর আপনি কখনো মনে করবেন না যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল, তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। ভীত-বিহ্বল চিত্তে উপরের দিকে তাকিয়ে তারা ছুটোছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে উদাস।" (সূরা ইবরাহীম, ৪২-৪৩)

বস্তুত সামাজিক শান্তি ও রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি অর্জন কেবল তখনই সম্ভব, যখন ধনী-গরিব, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি ইসলামের অনুপম সাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে রূপায়িত হবে। ইসলামে শ্রম যদি হয় ব্যক্তির দায়িত্ব, তবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব আগ্রহী প্রতিটি ব্যক্তির জন্য কর্মের সংস্থান করা। ব্যক্তির যদি দায়িত্ব হয় কাজে নিষ্ঠার পরিচয় দেয়া, তবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পদ ও মালিকানার সুষম বণ্টন করা। কাজ যদি হয় উৎপাদনের প্রধান স্তম্ভ তবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো, যারা কাজের মান বাড়াবে এবং তার প্রতি যত্ন নেবে। শ্রমিক যদি হয় প্রকৃত সম্পদ, তবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব খেটে খাওয়া লোকগুলোর ওপর চলমান জুলুম বন্ধ করা। তাদের মজুরি বৃদ্ধি এবং সমান সুযোগ ও স্বাস্থ্য রক্ষায় উদ্যোগ নেয়া। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সব ধরনের জুলুম ও অনাচার থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : সেক্রেটারী
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ঢাকা মহানগরী পূর্ব

www.pathagar.com

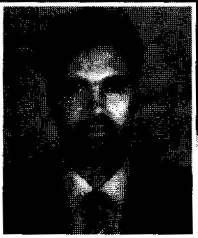

ইন্টারনেট : ঈমান, আখলাক ও বুদ্ধি-বিবেকের পরীক্ষা

ইন্টারনেট তথ্যজগতে একটি বিশাল আন্দোলন নিঃসন্দেহে। তবে এই তথ্যজগৎটি ঈমান আখলাক এমনকি বিবেক-বুদ্ধি পরীক্ষার একটি বিশাল ময়দানও বটে। যা শুভ ও কল্যাণকর তাও এখানে পুরোরূপে উন্মুক্ত, যা অশুভ-অকল্যাণকর তাও এখানে নানা ব্যঞ্জনে উপস্থাপিত। যে ইন্টারনেট ব্যবহার করে সে তার জিহ্বা নির্বাধভাবে ছেড়ে দিতে পারে, সে তার দৃষ্টি যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ঘুরাতে পারে, সে তার হাত দিয়ে যা চায় তাই লিখতে পারে। তাকে নিবারণকারী কেউ নেই, তাকে ধমক দেয়ারও কেউ নেই, না আছে কেউ থামিয়ে দেয়ার।

সে যদি ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়, পরিণামের প্রতি দৃষ্টি দেয়, তার প্রতিপালক তাকে দেখছেন এই বিশ্বাস হৃদয়ে জাগ্রত রাখে, তবে সে সফলতার সাথে প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সামনে এগুতে সক্ষম হবে।

আর যদি সে নিজের লাগাম ছেড়ে দেয়, তার খায়েশ যেদিকে তাড়িত করে সেদিকে ধাবমান হয়, ঈমান ও তাকওয়ার প্রহরী তার হৃদয় থেকে বিতাড়িত হয়, তাহলে আবর্জনার স্তূপে ঢুকে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা থেকে যায়, আর এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল অপদস্থতা, সুভদ্রতার মৃত্যু, নিকৃষ্টতা ও পঙ্কিলতায় নাক ঘর্ষণ।

ইন্টারনেট ও তার ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু পথ-পদ্ধতি রয়েছে, নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল।

www.pathagar.com

১. ইন্টারনেটের সদ্ব্যবহার

বুদ্ধিমানের কাজ হল ইন্টারনেটের সদ্ব্যবহার করা। নিজেকে অতিরঞ্জিত আকারে বিশ্বাস না করা; কেননা এ-ধরনের অতিবিশ্বাস নিজেকে ফেতনায় নিপতিত করতে পারে, যার করালগ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়া হয়ত অসম্ভব হয়ে উঠবে।

যদি কেউ ইন্টারনেটে কোনো কিছু পেশ করতে চায়, অথবা কোনো মন্তব্য ইত্যাদি করতে চায়, তাহলে উচিত হবে প্রথমে বিবেচনা করে দেখা, এর দ্বারা কোনো উপকার হবে কি-না, তাকে সতর্ক হতে হবে এর দ্বারা যেন মুমিনদের কোনো কষ্ট না পৌঁছে, মুমিনদের কোনো ক্ষতি না হয়। অতঃপর মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়ানোর সকল আকার-প্রকৃতি থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। অহেতুক কথা-বার্তা থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে। মানুষের অনুভূতি নিয়ে তামাশায় লিপ্ত হওয়া, একে অপরকে অপবাদ দেওয়ার ডালি খুলে-বসা, একদলকে অন্যদলের ওপর চড়াও করে দেওয়া ইত্যাদি থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

কোনো মন্তব্য অথবা কারো কথা খণ্ডন করতে হলে ইলমনির্ভর, আদব, সদয়ভাব ও শালীন ভাষায় করা জরুরি। কোনো কিছুতে অংশ নিতে চাইলে তা যেন হয় নিজস্ব ও সরাসরি নামে। সরাসরি নিজের নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভয় হলে উচিত হবে এমন কোনো বিষয় না লেখা যা অবৈধ, অশিষ্ট। যে দিন মানুষের অন্তরাত্মা উন্মুক্ত করে সবকিছু সম্মুখে নিয়ে আসা হবে সেদিন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়টি হৃদয়ে সজাগ রাখতে হবে।

২. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে দূরে থাকা

বুদ্ধিমানের উচিত শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে দূরে অবস্থান করা; শয়তান মানুষকে গোমরাহ করার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে সারাক্ষণ। সকল পথ ও পদ্ধতি সে ব্যবহার করে যায় তার কর্মসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। শয়তান মানুষের চিরশত্রু, যে শত্রু মানুষকে গোমরাহ করার মাকসুদ নিয়ে যাপন করে প্রতিটি মুহূর্ত। আল্লাহ তা'আলা আল কুরাআনের একাধিক জায়গায় বলেছেন, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনোই তার শত্রুর প্রতি আস্থা রাখে না। ফেতনার থাবায় নিজেকে কখনো সঁপে দেবে না। ফেতনায় পড়বে না বলে অধিক আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়বে না, জ্ঞানে, দীন ও ইল্‌মে সে যে পর্যায়েই থাক না কেন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি বরং ফেতনা থেকে অবস্থান করে বহু দূরে। ফেতনার কাছাকাছি যাওয়া থেকে সে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে। এসবের পরে যদি সে কখনো নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফেতনায় নিপতিত হয়, তবে তা থেকে নিস্কৃতির জন্য আল্লাহর সাহায্য আসে। আল্লাহর করুণা তার সঙ্গ দেয়। আর যদি সে নিজের ওপর অতিমাত্রায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, নিজের নখর দিয়ে নিজের গোর নির্মাণ করে চলে, তবে তার ওপর থেকে আল্লাহর করুণা সরিয়ে নেওয়া হয়। ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে একা।

ইউসুফ আলাইহিসসালাম নিজ থেকে ফেতনায় নিপতিত হননি, ফেতনাই বরং তার মুখোমুখি হয়েছে, আর তখন তিনি আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন। ফেতনার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য

শান্তির মিনার
www.pathagar.com

আল্লাহর আশ্রয় চেয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে আল্লাহ যদি নারীদের ষড়যন্ত্র থেকে তাকে রক্ষা না করতেন তবে তিনি জাহেলদের দলভুক্ত হয়ে যেতেন। আল্লাহর ওপর তাঁর প্রচণ্ড ভরসার কারণেই আল্লাহর করুণা তার সঙ্গ দিয়েছে, ফলে তিনি ভয়াবহ বিপদ থেকে রেহাই পেতে সক্ষম হয়েছেন।

৩. সময় নির্ধারণ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়

ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিক থেকে বাঁচার একটি উপায়, সময় নির্ধারণ ও সুনির্দিষ্টভাবে কিভাবে কী কাজ করতে যাচ্ছে তা নির্ণয় করে নেওয়া, উদ্দেশ্য স্থির করে নেওয়া। এর বিপরীতে অনির্দিষ্টভাবে যদি একটির পর একটি পেইজ ওপেন করে চলে, এক সাইটের পর অপর সাইট ভিজিট করে চলে, তবে অযথা সময় নষ্ট ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যায় না। যদি কোনো উপকার আহরণে সক্ষম হয় তবে তা হবে খুবই ক্ষীণ।

৪. পরিণাম দর্শন

ইন্টারনেটের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত হবে তার কৃতকর্মের পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখা। নিজেকে দমন করা, নিজের প্রবৃত্তি-খায়েশের ঘাড়ে লাগাম লাগানো। ইবনুল জাউযি রা. বলেন, 'হে তাকওয়ার দ্বারা সম্মানের আসনে সমাসীন ব্যক্তি, তুমি তাকওয়ার সম্মানকে গুনাহের অপদস্থতার বিনিময়ে বিক্রি করো না। যে জিনিসের প্রতি তোমার খায়েশ জন্মেছে তা বর্জন করে তোমার প্রবৃত্তির তৃষ্ণা মেটাও, যদিও তা কষ্টদায়ক হয়, জ্বালা দেয়।'

তিনি আরো বলেছেন, 'প্রবৃত্তিকে দমনের শক্তিতে এমন স্বাদ রয়েছে যা সকল স্বাদকে অতিক্রম করে যায়; তুমি কি দেখো না, যারা প্রবৃত্তিতে আরোপিত তারা কিভাবে অপদস্থ হয়; কেননা তারা পরাজিত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে দমন করে তার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টো; কেননা সে শক্তিমান হওয়ার স্বাক্ষর রাখে, কারণ প্রবৃত্তিকে দমন করায় সে পারঙ্গমতার পরিচয় দেয়।

৫. যৌন আবেদনময় সকল বিষয় থেকে দূরে থাকা আবশ্যক

যৌন আবেদন-সুরসুরি সৃষ্টিকারী সকল বিষয় থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে দূরে থাকতে হবে। খারাপ ও পর্নো সাইটগুলো অবশ্যই বর্জন করতে হবে। যেসব ব্লগ-সাইটে ফাহেশা অশালীন কথাবার্তা বলা হয়, যেসব প্রবন্ধে প্রবৃত্তি উসকিয়ে দেওয়ার মেটার রয়েছে, তা বর্জন করা ঈমান ও আখলাকের দাবি। আবেদনময় চিত্র-ছবি, কামনা-বাসনা উসকিয়ে দেয় এমন ফুটেজ থেকে দূরে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ; মানুষের মন- সৃষ্টিগতভাবে প্রবৃত্তির প্রতি আসক্ত, প্রবৃত্তি যেদিকে টানে সেদিকেই সে চলতে শুরু করে। মানুষের মন বারুদ অথবা পেট্রোলতুল্য, যা জ্বলার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। এসব বস্তু প্রজ্বলনকারী বস্তু থেকে যতক্ষণ দূরে থাকে, শান্ত থাকে, জ্বলার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকে। এর অন্যথা হলেই তা জ্বলে ওঠে, জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক।

মানুষের মনও অভিন্ন প্রকৃতির। মানুষের মন শান্ত-নীরব থাকে। তবে যখন তা উসকিয়ে দেওয়ার মত কোনো কিছুর নিকটবর্তী হয়, দুষ্টপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেওয়ার মত কোনো শ্রব্য, দৃশ্য, পাঠ্য, অথবা শুঁকার বিষয়ের স্পর্শে আসে তখন তার ঘুমন্ত প্রবৃত্তি দানবের মত জেগে

শান্তির মিনার
www.pathagar.com

ওঠে, তার ব্যাধিগুলো আন্দোলিত হয়ে ওঠে, তার খায়েশ-আসক্তি বাঁধভাঙা জোয়ারের মত হয়ে হাজির হয়। তাই এসব প্রবৃত্তি উদ্দীপক বিষয় থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত জরুরি।

৬. দৃষ্টি অবনত রাখা

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনাকাঙ্ক্ষিত চিত্র কখনো কখনো সামনে এসে হাজির হয়। এমতাবস্থায় ব্যক্তি যদি তার দৃষ্টিকে অবনত করে নেয়, তবে সে একদিকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল অন্যদিকে নিজের হৃদয়কেও তৃপ্তি দিতে সক্ষম হল। চোখ হৃদয়ের আয়না। চোখের লাগাম ছেড়ে দেওয়া অনুশোচনার কারণ, পক্ষান্তরে দৃষ্টি অবনতকরণ, হৃদয়কে করে শান্ত-তৃপ্ত। যখন কেউ তার দৃষ্টিকে লাগাম লাগিয়ে রাখে তখন তার হৃদয়ও কামনা-বাসনার মুখে লাগাম লগিয়ে রাখে। চোখ উন্মুক্ত-স্বাধীন করে দিলে, হৃদয়ও উন্মুক্ত, স্বাধীন হয়ে যায়।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

[قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ]. النور:30

"মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র।"

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ র. এ-আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ-আয়াতে আল্লাহ তাআলা, দৃষ্টি অবনত করা ও লজ্জাস্থান হেফাযত করাকে আত্মার পরিশুদ্ধির সমধিক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। আর আত্মার পরিশুদ্ধির অর্থ সকলপ্রকার দুষ্ট, অশালীন, জুলুম, শিরক, মিথ্যা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া।

৭. নিশ্চিত হওয়া

ইন্টারনেটে ব্যবহারকারীর জন্য এটা জরুরি যে, সে যা বলছে বা শুনছে বা পড়ছে অথবা বর্ণনা করছে তার শুদ্ধতা ভালভাবে যাচাই করে নেয়া, কেননা এটা মানুষের বুদ্ধিমত্তা, ভারিক্কি ও ঈমানের পরিচয়। আর এটা জরুরি এ জন্যও যে, ইন্টারনেটে ভালমন্দ সবই লেখা হয়, সক্ষম-অক্ষম সবাই তাতে লেখে। অনেকেই আবার অপরিচিত নাম বা ছদ্মনামে লেখে।

সে কারণেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হবে সতর্কতা অবলম্বন করা। তাই যখন সে কোনো সংবাদ বা অন্য কোনো বিষয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করবে। নিশ্চিত হওয়ার পর এ সংবাদ বা তথ্যটি প্রচারের উপযোগিতা নিয়ে ভাববে। যদি তা কল্যাণকর হয় তবে প্রচার করবে। অন্যথায় তা প্রচার থেকে বিরত থাকবে। এই ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কারণে কত খারাবিই না সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই এমন রয়েছে যারা ইন্টারনেটে যা পায় মহাসত্যের মতো বিশ্বাস করে নেয়। এটা নির্বুদ্ধিতার আলামত; কেননা বুদ্ধিমানের আচরণ হল নিশ্চিত হওয়া, সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নেয়া। এমনকি কোনো সুপরিচিত ব্যক্তির কথা হলেও তা যাচাই করে দেখা উচিত। অপরিচিত মানুষের কথাবার্তার বেলায় কি অবস্থান নিতে হবে তা বলাই বাহুল্য। মানুষ যা শোনে তাই প্রচার করতে শুরু করা থেকে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,' ব্যক্তির মিথ্যা বলার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে. সে যা শুনে তা বর্ণনা করতে লাগে'। (মুসলিম)

www.pathagar.com

ফেতনা-ফাসাদের সময় এ আদবটি অধিক গুরুত্বসহ পালন করা জরুরি। যে ব্যক্তি নিজের উপকার চায় তার উচিত নিরাপদে থাকার খাতিরে, ভর্ৎসনা থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, এই আদবটি কঠিনভাবে ধরে রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً - النساء: 83.

"আর যখন তাদের কাছে শান্তি কিংবা ভীতিজনক কোনো বিষয় আসে, তখন তারা তা প্রচার করে। আর যদি তারা সেটি রাসূলের কাছে এবং তাদের কর্তৃত্বের অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিত, তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা তা উদ্ভাবন করে তারা তা জানত। আর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হত, তবে অবশ্যই অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে।" (সূরা আননিসা: ৮৩)

শায়খ আল্লামা আব্দুর রহমান আসসুদি এ-আয়াতের তাফসিরে বলেন, ' এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদেরকে, তাদের অযাচিত কাজ করার পর একটি দীক্ষা। অর্থাৎ যখন তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মুখোমুখি হবে, সর্বসাধারণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো বিষয় হবে, মুমিনদের আনন্দের বা দুঃখের কোনো সংবাদ থাকবে, তবে এ-বিষয়ে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে, এবং সংবাদটি প্রচারে দ্রুততার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। বরং বিষয়টিকে রাসূল ও উলুল আমরের কাছে রুজু করতে হবে, উলুল আমর হলেন, জ্ঞানী ও সুচিন্তিত মতামত দিতে পারঙ্গম, নসিহতকারী ও সুভদ্র ব্যক্তি যারা বিষয়ের নিগূঢ়তায় প্রবেশ করতে এবং মুমিনের স্বার্থ কোথায় তা বুঝতে সক্ষম। তারা যদি মনে করেন যে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রচার করলে ফায়দা হবে, মুমিনদের উদ্যমতা বেড়ে যাবে, তাদের আনন্দের কারণ হবে, শত্রুপক্ষের অনুশোচনা বর্ধনের কারণ হবে, তাহলে তা প্রচার করবে, এর অন্যথা হলে তা প্রচার থেকে বিরত থাকবে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তাদের মধ্যে যারা তা উদ্ভাবন করে তারা তা জানত।" অর্থাৎ তারা তাদের সুচিন্তা ও জ্ঞানে তা থেকে সঠিক বিষয়টি উদ্ধার করতে পারবে।

এখানে আমরা আরেকটি আদর্শিক বিধান পাচ্ছি, আর তা হল, কোথাও যদি বাহাস শুরু হয় তবে উচিত হবে এ-বিষয়ে যারা দক্ষ তাদের শরণাপন্ন হওয়া। নিজেকে এগিয়ে না দেয়া. কেননা এটাই নির্ভুলতার জন্য সমধিক উপযোগী পদ্ধতি।

কোনো কিছু শোনার সাথে সাথে তা প্রচার করতে লেগে যাওয়া উচিত নয় এ-বিধানটিও আমরা উক্ত আয়াতে খোঁজে পাই। বরং কথা বলার পূর্বে চিন্তাভাবনা করে দেখা, কল্যাণ কোথায় তা ভেবে দেখে প্রচার করবে কী করবে না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারেও বিধান পাচ্ছি উক্ত আয়াতে।

নিশ্চিত হওয়া ও ভেবে-চিন্তে দেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে শায়খ সুদি অন্য একটি আয়াত উল্লেখ করেন, আয়াতটি হল-

وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً -طه: 114

www.pathagar.com

"তোমার প্রতি ওহি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করো না এবং তুমি বল, হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন ।"

তিনি বলেন, এখানে জ্ঞান অন্বেষণকারীর একটি শিক্ষণীয় আদব রয়েছে, আর তা হল ইলমের ব্যাপারে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা । কোনো বিষয়ে রায় দিতে তাড়াহুড়া না করা । গর্ববোধে নিপতিত না হওয়া । উপকারী ইলম অর্জন যাতে সহজ হয় সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ।

তিনি আরেকটি আয়াত উল্লেখ করেন-

لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ - النور: 12

"যখন তোমরা এটা শুনলে তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, 'এটাতো সুস্পষ্ট অপবাদ?"

এ আয়াত উল্লেখপূর্বক তিনি বলেন, এখানে আল্লাহ তাআলা দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন যে, যখন মুমিনরা অন্যান্য মুমিন ভাইদের চরিত্রহননকারী কোনো খারাপ সংবাদ শুনবে তখন তাদের ঈমান ও প্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে যা জানা আছে তার প্রতি নজর দেবে । সমালোচকদের কথায় কান দেবে না । বরং বিরাজমান মূল বিষয়কে ভিত্তি হিসেবে ধরবে, সমালোচকদের কথা বিশ্বাস না করে তা বরং প্রত্যাখ্যান করবে ।

৮. ভেবে -চিন্তে মন্তব্য করা

এ ক্ষেত্রে জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত হবে সকল বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা । জানা থাকলেই সবকিছু বলে দিতে হবে, কথা এমন নয় । বরং ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলা । ছোট বড় সকল বিষয়ে মন্তব্য করা সমীচীন বলে মনে করি না । ঘটে যাওয়া সকল বিষয়েই মন্তব্য করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় । কারণ মন্তব্যকারী হয়ত বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করেনি । এমনও হতে পারে যে অবস্থা নিরূপণে সে ভুল করছে । তাই ধীরস্থিরতা খুবই জরুরি । আরবিতে একটি প্রবাদ আছে, ' তাড়াহুড়াকারীর পাথেয় হল 'ভুল' ।

এর বিপরীতে যে ব্যক্তি ভেবে-চিন্তে মন্তব্য করবে, বিবেকের স্বচ্ছতা তাকে সহায়তা দেবে । বক্ষ্যমাণ অভিমতটি তার মস্তিষ্কে পরিপক্বতা পাবে, ভুল কম হবে । বরং এটা হেকমত ও প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে যে মানুষ তার জানা সববিষয় সম্পর্কেই মন্তব্য করে চলবে । চিন্তা-ভাবনার আশ্রয় নেয়া সত্ত্বেও, অথবা অভিমত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও, সকল বিষয়ে মন্তব্য করা উচিত বলে মনে করি না । মানুষের উচিত কিছু অভিমত সঞ্চয় করে রাখা । তবে যদি হেকমত ও মাসলেহাত দাবি করে, অথবা পরিস্থিতির তাকাযা হয় তবে অভিমত ব্যক্ত করা চলে । যে বিষয়ে মন্তব্য করা হচ্ছে তা যদি বড়দের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তো কেবল পরামর্শের আকারে ব্যক্ত করা বাঞ্ছনীয় । আরবিতে একটি কবিতা আছে যার অর্থ, 'কথা বললে মেপে বল; কারণ কথা, বুদ্ধি অথবা দোষ উন্মুক্ত করে দেয়' ।

وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي العقولَ أو العيوبَ المنطقُ

www.pathagar.com

ইবনে হিব্বান বলেছেন, ধীরস্থিরতা অবলম্বনকারীকে কেউ পেছনে ফেলতে পারে না। আর তাড়াহুড়াকারী অন্যদের নাগাল পায় না। একইরূপে যে চুপ থাকে তাকে খুব কমই লজ্জিত হতে হয়, আর যে বলে, সে কমই নিরাপদে থাকে।

তাড়াহুড়াকারী জানার পূর্বেই বলে ফেলে, বোঝার পূর্বে জবাব দেয়, অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বেই প্রশংসাকীর্তনে মত্ত হয়, প্রশংসা করার পর আবার তিরস্কারও করে, চিন্তা করার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, আর বদ্ধপরিকর হওয়ার পূর্বেই চলতে শুরু করে।

তাড়াহুড়াকারীর সংগী হল লজ্জা। নিরাপদ থাকার বিষয়টি তাথেকে দূরে অবস্থান নেয়। আর আরবরা তাড়াহুড়াকে সকল লজ্জার মা বা উৎস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

উমর ইবনে হাবীব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বলা হত : এমন কোনো তাড়াহুড়াকারী পাওয়া যাবে না যে প্রশংসিত, এমন কোনো রাগী ব্যক্তি পাওয়া যাবে না যে খুশি। এমন কোনো স্বাধীন ব্যক্তি পাওয়া যাবে না যে লোভী। এমন কোনো বদান্য ব্যক্তি পাওয়া যাবে না যে হিংসুটে। এমন কোনো খাদক পাওয়া যবে না যে ধনী। এমন কোনো বিরক্তিপ্রকাশক ব্যক্তি পাওয়া যাবে না যার বন্ধুবান্ধব আছে।

এ কারণেই যারা প্রজ্ঞাবান তারা ধীরস্থিরতা অবলম্বন করার ব্যাপারে বারবার উপদেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে যাওয়া হবে তখন। মুতানব্বি বলেছেন,' অভিমত, তার অবস্থান তো বাহাদুরের বাহাদুরি প্রকাশের পূর্বে, আর বাহাদুরি, সে তো দ্বিতীয় স্থলে। যদি এ দুটি কোনো শক্তিমান ব্যক্তির বেলায় একসাথ হয় তবে তো সে সকল ক্ষেত্রেই চলে যাবে শীর্ষে।' মুতান্নাবি আরো বলেন,' ব্যক্তিতে বিরাজিত প্রতিটি বাহাদুরিই যথেষ্ট, তবে প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তির বাহাদুরিই সর্বোচ্চ।

৯. উপস্থাপনে ভারসাম্য রক্ষা

বুদ্ধিমানের উচিত উপস্থাপনে ভারসাম্য রক্ষা করা, অতিরঞ্জন থেকে বেঁচে থাকা। ছোটকে বড় করে না বলা। কেননা অতিরঞ্জন ও তিলকে তাল করে বলার মাঝে বাস্তবতা হারিয়ে যায়। একটি আরবি প্রবাদে আছে, ' উত্তম ব্যক্তি মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তি।'

১০. আল্লাহ আপনাকে দেখছেন এ বিশ্বাস হৃদয়ে জাগ্রত রাখা

ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে বাঁচার উপায় হল আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই দেখছেন এ বিশ্বাস হৃদয়ে জাগ্রত রাখা। কবি বলেন, ' আমার এ চোখ ঐ যুবকের চাইতে অধিক সুন্দর কাউকে দেখেনি যে নিভৃতে আল্লাহর মাকামকে ভয় করে।' তাই বুদ্ধিমানের উচিত এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বসহ নেয়া। সবসময় এ কথা মনে রাখা যে, সকল গায়েব-অদৃশ্য আল্লাহর কাছে দৃশ্যমান। অবস্থা যদি এই হয় তাহলে ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহকে সমধিক হালকা দ্রষ্টা হিসেবে সাব্যস্ত করা কি করে সম্ভব?! এটা অনুধাবন করা উচিত যে, যে ব্যক্তি কোনো কিছু গোপন করবে আল্লাহ তাকে ঐ বিষয়ের পোশাক পরিয়ে দিবেন, যে ব্যক্তি কোনো কিছু গোপন করল, চাই তা ভাল হোক বা মন্দ, আল্লাহ তা প্রকাশ করবেন। আমল যে ধরনের হবে, প্রতিদানও সে অনুপাতেই হবে। ইরশাদ হয়েছে, "যে মন্দ কাজ করবে তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।" (সূরা আন নিসা : ১২৩)

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে এবার আমি আপনাকে কিছু আলোকিত বাক্য শুনাব, ' আবু হাযেম সালমা ইবনে দিনার র. বলেছেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক দুরস্ত করে নেয়, তখন আল্লাহও তার মাঝে ও মানুষের মাঝে সম্পর্ককে ভালো করে দেন, এর বিপরীতে যখন কোনো ব্যক্তি তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়, আল্লাহও তখন তার মাঝে ও মানুষের মাঝে সম্পর্ককে নষ্ট করে দেন। আর নিশ্চয়ই একজনের চেহারার তুষ্টি অনুসন্ধান সকলের তুষ্টি অনুসন্ধানের তুলনায় সহজ। এর বিপরীতে যদি আপনার ও আল্লাহর মাঝখানকার সম্পর্ক বিগড়ে দেন তবে সবার সাথেই সম্পর্ক বিগড়ে দিলেন। সবাইকেই রাগিয়ে তুললেন।

মু'তামার ইবনে সুলাইমান বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি সংগোপনে কোনো পাপ করে তবে সে তার লাঞ্ছনা মাথায় নিয়েই করে'।

ইবনুল জাওযি র. বলেন,' আল্লাহার ব্যাপারে আপনি দলিল তালাশ করেছেন, অতঃপর পৃথিবীতে যত ধূলিকণা রয়েছে তার থেকেও অধিক পেয়েছেন, আল্লাহর আজব বিষয়ের মধ্যে আপনি দেখেছেন যে, আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট নন মানুষ যদি এমন বিষয় গোপন করে, তাহলে বিলম্বে হলেও আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেন। লোকেরা তা নিয়ে কথা বলে। যদিও মানুষ তা দেখেনি।

হয়ত এই পাপকারীকে এমন বিপদে ফেলা হয় যার দ্বারা তার সকল পাপ মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়। এ যাবৎ সে যত পাপ গোপন করেছে, এ বিষয়টি তার জবাব হয়ে যায়। এটা এ জন্য ঘটে যাতে মানুষ জানতে পারে যে পাপ ও পদস্খলনের প্রতিদান দেয়ার অবশ্যই একজন রয়েছেন। আর তিনি এমন এক সত্তা, কোনো পর্দা বা প্রতিবন্ধকতা, তার ক্ষমতাকে রহিত করতে পারে না, যার নিকট কোনো আমলই হারিয়ে যায় না।

অনুরূপভাবে মানুষ পুণ্যের কাজকেও হয়ত গোপন করে, কিন্তু তা প্রকাশ পেয়ে যায়, মানুষ তা নিয়ে কথা বলে, তারা বরং আরো অতিরিক্ত বলে, এমনকি সে ব্যক্তি তাদের কাছে এমন প্রতীয়মান হয় যে সে যেন আদৌ কোনো পাপ করেনি। মানুষ তার ভাল কাজগুলোই উল্লেখ করে। এ রকম এ জন্য ঘটে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে অবশ্যই একক প্রতিপালক রয়েছেন যিনি আমলকারীর কোনো আমলকেই বিনষ্ট করেন না।

মানুষের হৃদয় ব্যক্তির অবস্থা জানে, তারা তাকে ভালবাসে অথবা বর্জন করে, তাকে তিরস্কার করে অথবা তার প্রশংসা করে, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক যে পর্যায়ের হয় সে অনুযায়ী এগুলো ঘটে। আল্লাহই যথেষ্ট ব্যক্তির সকল উৎকণ্ঠা দূর করার ক্ষেত্রে, সকল অশুভ বিষয় তাথেকে উঠিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে।

আর যদি কোনো ব্যক্তি তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ককে বিগড়ে দেয়, সত্য অনুসরণের বিবেচনা থেকে সরে আসে, তবে তার প্রাপ্য বিষয় উল্টে যাবে। যারা তার প্রশংসা করত তারাই তাকে তিরস্কার করতে শুরু করবে।'

তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয় নিভৃতে আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক চর্চার প্রভাব রয়েছে যা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে চলে আসে। এমন অনেক মুমিন রয়েছেন যারা নিভৃতে আল্লাহকে সম্মান করেন,

www.pathagar.com

অতঃপর সে তার প্রবৃত্তির খায়েশকে ছেড়ে দেয়। কেননা সে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পায়, অথবা তার সাওয়াবের আশা করে। অথবা আল্লাহকে সম্মান করে তা ছেড়ে দেয়। এ কাজ করে সে যেন সুবাসযুক্ত কাঠ ধূপদানির ওপর রেখে দেয়, অতঃপর তা সুগন্ধি ছড়াতে থাকে। মানুষ তা শুঁকে, অবশ্য তাদের জানা থাকে না এ সুগন্ধির উৎস কোথায়।

মানুষ তার প্রবৃত্তির খায়েশ থেকে দূরে যাওয়ার জন্য যতটুকু মুজাহাদ করবে, ততটুকু তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মহব্বত বাড়বে। বর্জনীয় অথচ লোভ্য-প্রিয় বস্তুকে ছেড়ে থাকার জন্য মানুষ যতটুকু শ্রম দেবে তার সুবাসও তত বাড়বে, আর এ সুবাস দাহ্য কাঠের প্রকৃতি হিসেবে বাড়ে অথবা কমে। অতঃপর আপনি মানুষকে দেখবেন যে ঐ লোকটিকে তারা সম্মান-শ্রদ্ধা করছে, তাদের মুখ থেকে তার প্রশংসা রের হচ্ছে, যদিও তারা জানে না কেন এমন হচ্ছে। তারা তাদের অনুভূতিকে ব্যক্ত করতে অপারগ।

এ সুবাস মৃত্যুর পরও সুগন্ধ ছড়িয়ে যেতে পারে। তবে তা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন হতে পারে। তাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যাদেরকে মানুষ দীর্ঘকাল স্মরণ রাখে, অতঃপর ভুলে যায়। আবার এমন লোকও রয়েছে যাদেরকে এক'শ বছর পর্যন্ত লোকেরা স্মরণ রাখে, অতঃপর ভুলে যায়। আবার এমনও ব্যক্তি আছে যাদেরকে অনন্তকাল স্মরণ রাখা হয়।

ঠিক এর উল্টো হল ঐ ব্যক্তি যে সৃষ্টিকুলকে ভয় পায়। যে নিভৃতে আল্লাহকে সম্মান করে না। অতঃপর পাপের সাথে তার সম্পৃক্ততা যতটু থাকে সে অনুপাতেই তাথেকে দুর্গন্ধ বের হয়, মানুষের হৃদয় তাকে ঘৃণা করে।

যদি তার পাপ অল্প হয়, মানুষ তার বদনাম করে না বটে, তবে প্রশংসা করে অল্প, হ্যাঁ তার পুণ্যের কারণে মানুষের হৃদয়ে তার সম্মানটুকু বজায় থাকে। আর যদি পাপের সংখ্যা অধিক হয় তাহলে সর্বোচ্চ যা হয় তা হল মানুষ তার ব্যাপারে, প্রশংসা-তিরস্কার কোনোটাই করে না, শুধুই কেবল চুপ থাকে। নিভৃতে যারা পাপ করে তাদের পাপের ফলে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানেই কষ্ট-যাতনা বরণ করে নিতে হয়। তাকে যেন বলা হচ্ছে, থাকো, নিজের জন্য তুমি যা পছন্দ করেছ, তাতেই তুমি থাক। অতঃপর সে অনন্তকাল কষ্ট-যাতনাতেই থেকে যায়।

প্রিয় পাঠক, দেখুন, পাপকে প্রাধান্য দিলে পাপ কিভাবে মানুষকে দিকভ্রান্ত করে যাতনার গহ্বরে নিক্ষেপ করে। আবুদ্দারদা রা. বলেন, 'নিশ্চয়ই বান্দা যখন নিভৃতে আল্লাহর অবাধ্য হয়, আল্লাহ মানুষের হৃদয়ে তার ব্যাপারে ঘৃণা ঢেলে দেন, যদিও তারা আঁচ করতে পারে না। তাই আমি যা লিখলাম তা নজর দিয়ে দেখুন, যা উল্লেখ করলাম তা জানুন, আপনারা আপনাদের গোপন ও নিভৃতের মুহূর্তগুলো সম্পর্কে উদাসীন হবেন না; কেননা আমলের নির্ভরতা নিয়তের ওপর। আর প্রতিদান দেয়া হয় ইখলাস-ঐকান্তিকতা অনুযায়ী'।

ইমাম ইবনুল জাওযী র. বলেন, 'যতটুকু আপনারা আল্লাহকে সম্মান করবেন, আল্লাহও আপনাদেরকে ততটুকু সম্মান করবেন। যতটুকু আপনারা আল্লাহর কদর-ইহতেরাম করবেন আল্লাহও আপনাদেরকে ততটুকু কদর ইহতেরাম করবেন। আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি এমন ব্যক্তি দেখেছি, যারা ইলমচর্চায় জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। তবে তিনি সীমালঙ্ঘন করেছেন; ফলে মানুষের কাছে হালকা হয়ে গিয়েছেন। তার

www.pathagar.com

বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার ও মুজাহাদা থাকা সত্ত্বেও মানুষ তার প্রতি ফিরেও তাকাত না।

আমি দেখেছি যারা যৌবনে ইবাদত-আরাধনায় লিপ্ত থেকেছে, যদিও ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল, তবু আল্লাহ তার কদর বাড়িয়ে দিয়েছেন। মানুষের হৃদয়ে তার কদর বসে গেছে, অতঃপর তার মধ্যে যতটুকু খায়ের-ভালাই আছে তার থেকেও অধিক তাকে প্রশংসা করেছে।

আমি এমন ব্যক্তিকেও দেখেছি যে তার সবকিছু ঠিকঠাক পেত যখন সে সত্যপথে চলার ক্ষেত্রে দৃঢ়তা দেখাত, আবার যখন সত্য থেকে হেলে পড়ত, আল্লাহর করুণাও তাথেকে দূরে সরে যেত। মানুষের পাপের ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত-করুণা ব্যাপক না হলে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মান-ইজ্জত সব হাওয়ায় উড়ে যেত, তবে যা হয় তার অধিকাংশটাই হয় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, অথবা শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোমলতা গ্রহণপূর্বক।

১১. যা উপকারী তা পেশ করায় অংশ নেয়া

ইন্টারনেটের খারাপ দিকগুলো থেকে বেঁচে থাকা যেমন জরুরি, তদ্রূপভাবে মুসলমানের উচিত, বরং বলা যায় আবশ্যক, ইন্টারনেটের ভালো দিকগুলো হতে উপকৃত হওয়া। বিশেষ করে ব্যক্তি যদি ইন্টারনেট বিষয়ে জ্ঞান রাখে অথবা এই ময়দানে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তির জন্য, উপকারী কন্ট্রিবিউশন, মন্তব্য, বিশ্বস্ত ইসলামী সাইটগুলো মানুষকে দেখিয়ে দেয়া, ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা জরুরি।

লেখক : প্রচার ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ঢাকা মহানগরী পূর্ব

www.pathagar.com

কামাল আতাতুর্কের উত্তরসূরিরা কি এখন বাংলাদেশে?

বাংলাদেশের প্রায় সকল পত্রিকার দৈনন্দিন সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় পড়তে তেমন একটা অবহেলা করি না। মাঝে মধ্যে হাতে সময় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিচার পড়তেও ভুল করি না। গত আগস্ট মাসে প্রথম সারির একটি দৈনিক পত্রিকার দেশ-মহাদেশ পাতায় তিন কলামে আমার প্রিয় একজন লেখকের "এরদোগান মেন্ডারেস ও কামাল আতাতুর্ক" শিরোনামে চমৎকার একটি লেখা পড়েছিলাম। লেখাটি পড়ে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। যুগে যুগে যারা রাষ্ট্রনায়ক বা রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নানা ষড়যন্ত্রের ঝাল বুনেছেন এ ষড়যন্ত্রের পেছনে তারা নিজেরাই যে ভূমিকা রেখেছেন তা নয়, পর্দার অন্তরালে তাদের সাথে ছিল বিভিন্ন মতবাদ, দল বা গোষ্ঠীর লোকেরা। আমার এ লেখার মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক ছোট্ট এ ভূখন্ডটি কোন ষড়যন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ঠ তা তুলে ধরার প্রয়াসমাত্র। জনাব লেখক প্রথম কলামের শেষ দিকে বর্তমান তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রেসেপ তায়েফ এরদোগানের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে সাবেক শহীদ প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্ডারেস এর কথা তুলে ধরেছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অনেক ভাল ভাল কাজ করে যাচ্ছেন, সাথে সাথে তুরস্কের সাধারণ জনগণের বিপুল সমর্থনও পাচ্ছেন। এমন অনেক ভাল কাজ করেছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব আদনান, বিনিময়ে পেয়েছিলেন কথিত দেশদ্রোহিতার অভিযোগে নির্মম ফাঁসির আদেশ। ১৯৬০ সালে একদল তরুণ সেনা কর্মকর্তাকে দিয়ে অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছিল। পর্দার আড়ালে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এর কল কাঠি নেড়েছিলেন। তাদের ইঙ্গিতে এই দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ককে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বিচারের নামে প্রহসন

www.pathagar.com

করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়। প্রশ্ন হলো আদনান মেন্ডারেস এত ভাল কাজ করার পরও কেন তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীর অভিযোগ? ভোটারেরা পরপর তিন মেয়াদে তাকে নির্বাচিত করেন। কিন্তু মেন্ডারেসের এত জনপ্রিয়তার পরও কেন তার শেষ পরিণতি শুভ হয়নি? এর উত্তর হলো মোস্তাফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্রের যে প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে কিছুটা ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন আদনান মেন্ডারেস। সাংবিধানিক আদালতের দৃষ্টিতে সেনাবাহিনীর চাপে ক্যাঙ্গারু কোর্ট সাজিয়ে জঘন্য ইতিহাস রচনা করা হয়, যা ইতিহাসে কালো অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব রেসেফ তায়েব এরদোগানের সংস্কারমূলক অনেক কাজের সাথেই মিলে যায় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী আদনানের সাথে। তার মানে কি তাদের দুয়ের একই পরিণাম? না এটা আমরা বলতে পারবো না। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালাই ভাল জানেন এরদোগানের শেষ পরিণতি কী হবে। তবে তুরস্কের জাতীয় নির্বাচনের আগে আর্ন্তজাতিক জার্নাল "দ্যা ইকোনমিস্ট" পত্রিকা বলেছে মেন্ডারেসের পরিণতি এরদোগানের হবে তা অচিন্তনীয়। যাই হোক আমার আজকের লেখার বিষয় এরদোগান বা মেন্ডারেস নয়। লিখতে চাই কামাল আতাতুর্ককে নিয়ে। একজন মুসলমান হিসেবে কামাল আতাতুর্ক সম্পর্কে আমার ভাল ধারণা পোষণ করাটাই স্বাভাবিক। নামটাও সুন্দর অন্য দিকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ "আধুনিক তুরস্কের স্থপতি।" এক কথায় তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন শাসক ছিলেন। বিশেষ করে যারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা করতে চান তারা তাকে আদর্শের প্রতীক হিসেবে দেখতে পারেন। কারণ তিনি আধুনিক তুরস্ককে ধর্মহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বপ্রথম যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার অংশ হিসাবে ধর্মীয় বিধিবিধান পালন ও আরবি ভাষায় আযান প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এভাবে তিনি মুসলিম ঐতিহ্য মুছে ফেলে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সংযোজন করে তা টিকিয়ে রাখার জন্য সাংবিধানিক আদালত গঠন করেন। তার যুক্তি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাকে আইনের মাধ্যমে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। ইতিহাস সাক্ষী তুরস্কে দীর্ঘদিন যাবৎ যারা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বিভিন্ন সময়ে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা যায় বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সংবিধানে নতুন ভাবে সংযোজন করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কায়েমে তারা উঠে পড়ে লেগেছে। পেছন থেকে উলুধ্বনি বাজিয়ে তাদের সাহস জোগাচ্ছে একদল হুতোম পেঁচা। এর বিরুদ্ধে যারা কথা বলবে অর্থাৎ এই সংবিধানের যারা বিরোধিতা করবে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। সরকারের এহেন আচরণ প্রমাণ করে কামাল আতাতুর্কের চেয়ে তারা কোন অংশে কম নয়। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে ১৯৭২-২০১৩ সাল পর্যন্ত কারো মৃত্যুদণ্ড হয়েছে বলে আমার জানা নাই, তবে সামনের দিনগুলো যে আমাদের জন্য সুখকর নয় তা বলা দুষ্কর। এই সরকারও ভালই জানে দেশের ইসলামপ্রিয় জনগণ পচা-দুর্গন্ধময় ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গ্রহণ করেননি। এ জন্য অতীতে আন্দোলন হয়েছে, বর্তমানেও আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। বাংলার মাটিতে এই আবর্জনাবাদ কখনো কায়েম হবে না। মূল প্রসঙ্গে ফেরা যাক। কামাল আতাতুর্ক এত সব কিছু করার পেছনে একটি বিষয় আড়াল করার চেষ্টা করেছেন, যা বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশই জানতো না। "মোস্তাফা

www.pathagar.com

কামাল আতাতুর্ক" নামে মুসলিম হলেও মূলত তিনি তুরস্কের একটি ক্ষুদ্র ইহুদি গোত্রের সন্তান। দলিল প্রমাণাদিতে দেখা যাচ্ছে, তিনি শুধু অমুসলিমই ছিলেন না। কামাল আতাতুর্ক ছিলেন পরিচয় গোপনকারী ইহুদি ভিন্ন মতাবলম্বী। জানা যায় ইহুদিদের ফ্রি ম্যাশন আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। ১৯৯৪ সালে নিউইয়র্কের একটি ইহুদি সংবাদপত্র ফরওয়ার্ডে ইহুদি হিসেবে কামাল আতাতুর্কের পরিচয় তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়- কামাল নিজেই উল্লেখ করেছেন, তিনি একজন ইহুদি। ইহুদিদের অন্য অনেক দলিলে কামালকে ইহুদি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। মৃত্যুর পর তার উইল অনুযায়ী কামাল আতাতুর্ককে কবর না দিয়ে জাদুঘরে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। দ্বিতীয় যে তথ্যটি আরো ভয়ংকর। কামাল ছিলেন "ডোয়েনমেহ" হিসাবে পরিচিত ইহুদি ভিন্ন মতাবলম্বী। তারা কখনো মুসলিম পরিবারের সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করেন না। ইসলামের নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা তারা দাঁড় করিয়ে চার দেয়ালের মধ্যে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করে। "ডোয়েনমেহ" রা ইসলামী সাম্রাজ্যকে ধবংস করার লক্ষ্য সামনে রেখে মিছে মিছি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে গোপনে তাদের আগের বিশ্বাস ও ধর্ম পালন করতো। কামাল আতাতুর্ক ইহুদিদের নিজস্ব অনুষ্ঠানের মধ্যে সেটি স্বীকার করেন এবং এ জন্য গর্বও অনুভব করেন। তৃতীয় যে তথ্যটি আরো লোমহর্ষক, তা হলো তুরস্কে তুর্কি হরফকে আরবির পরিবর্তে রোমান হরফে লেখা এবং আরবি নাম রাখা ও আরবি চর্চা বন্ধ করেছেন কামাল। সামরিক বাহিনী দিয়ে জোরপূর্বক তুর্কি সমাজ থেকে ইসলামের প্রভাব ও ভিত্তি দূর করার চেষ্টা করেন সফলতার সাথে। সুতরাং এ থেকে উপলব্ধি করা যায় কামাল আতাতুর্ক মুসলমানতো দূরের কথা কোন মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণও করেননি। পরিচয় গোপনকারী এক ভণ্ড প্রতারক শয়তানের প্রেতাত্মা বা ইহুদি। ধিক কামাল আতাতুর্ক, ইতিহাস কথা বলে এমন কামালের বহু দেশে আবির্ভাব ঘটেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের অবস্থা দেখে মনে হয় বাংলাদেশও পড়তে যাচ্ছে কি না এহেন কামালদের ভণ্ডামি আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কবলে তা কে জানে? যেমন ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুরকে দিয়ে কে বা কারা ধর্মহীন সেকুলার রাষ্ট্র বানাতে চেয়েছিল। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রতীক হিসেবে রাতারাতি কাজী নজরুল ইসলাম কলেজের নাম পবিবর্তন করে নজরুল কলেজ রাখে। অপরাধ নামের সাথে কেন ইসলাম? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেয়া হয়। যদিও দীর্ঘ ৩৮ বছর পর আদালতের রায় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম লেখাতে বাধ্য করা হয়। সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ বাদ দেয়া হয়। গুণীজনেরা বলে থাকেন শেখ সাহেবকে দিয়ে যারা এমন কুকাজ করিয়েছিলেন তারা আজো পর্দার আড়ালেই রয়ে গেল, বাংলার মানুষ তাদেরকে চিনতে পারলো না।

বর্তমান সরকারের মধ্যেও একটি কুচক্রী মহল সূক্ষ্মভাবে ভেতরে ঢুকে শেখ হাসিনাকে বিপথে ফেলার জন্য সংবিধান পরিবর্তন করে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস বাদ দেয়া এবং বিসমিল্লাহ মুছে ফেলার পরামর্শ দিয়ে সফল হয়। বর্তমান সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের মুখেও বর্ষার কোলা ব্যাঙের সুর, আগামীতে ক্ষমতায় আসতে পারলে শতভাগ ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাবো। জাতির আর বুঝতে বাকি রইলো না এদেশে কামাল আছে কি-নাই?

www.pathagar.com

জনমনে সন্দেহ কে বা কারা কামালের ধর্ম পালন করছে, ডিজিটালের নামে কামালের সিদ্ধ শপথে বাংলাদেশের মাটিতে পেছন থেকে কল-কাঠি নাড়ছে। কেউ কেউ রসিকতা করে বলে থাকেন যেভাবে ধর্মীয় শিক্ষা সংকোচন আর জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে তাতে এ দেশে ভবিষ্যতে আরবি চর্চা, আরবিতে নাম রাখা, আরবিতে আযান দেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। ইলমে দ্বীন শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলো বন্ধের ষড়যন্ত্র যেভাবে হচ্ছে তা দেখে সত্যিই অবাক লাগে। কারণ কামালের প্রেতাত্মারা চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে ধর্মহীন সেকুলার রাষ্ট্রের আদর্শ নষ্ট হয়ে যাবে যদি উপরোক্ত বিষয়গুলো বন্ধ করে দেয়া না হয়। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এ দেশে কোন মুস্তাফা কামালের জন্ম হোক এটা কোন মুসলমান চায় না। এ দেশ হাক্কানী উলামায়ে কেরামের দেশ। বের করতে হবে কারা পরিচয় গোপনকারী মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক। তাদের এ দেশে থাকার কোন নৈতিক অধিকার নেই। কারণ এদেশ হযরত শাহ জালালের, হযরত শাহ পরাণ, হাজী শরিয়ত উল্লাহ, তিতুমীর, খান জাহান আলী, শাহ মাখদুমের পুণ্যভূমি। এখানে শুধু তাদের উত্তরসূরিরাই থাকবে। অন্য কেউ নয়।

লেখক: সাবেক প্রকাশনী সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ঢাকা মহানগরী পূর্ব

www.pathagar.com

স্বপ্ন ও প্রত্যাশার ঘুড়ি

ভূমিকাঃ সোনালি সমাজ। শব্দটি শোনামাত্রই বুকের ভেতরটা আনন্দে ভরে যায়। ভাবি, আহ! যদি দেখতে পেতাম সে সমাজ। শুধু যে ভাবি তা কিন্তু নয়। ভাবনার পাশাপাশি অনেকে আবার সম্পৃক্তও হয়েছি সে সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়। আর প্রচেষ্টা করতে গিয়ে মুখোমুখি হচ্ছি নানা ধরনের সমস্যার। সমস্যার এত রং দেখেই হতাশ হয়ে পড়ছি। দোষারোপ করছি তাদের, যাদের কারণে আমরা পারছিনা কাঙ্খিত সমাজ গড়তে বা গড়ার কাজ করতে। ভাবি উনি বা উনারা কেন এটা করেন না, সেটা করেন না। ওনার বা ওনাদের এটা করা উচিত ছিল, সেটা করা উচিত ছিল। কেন তিনি এরকম করছেন সে রকম করছেন না কেন? ওনার কারণেই আজ এত সমস্যা। কিন্তু কতকাল আর দোষাদোষি? আসুন, অন্যদের দিকে না তাকিয়ে আমরা আমাদের নিজেদেরকে গড়ে তুলি অনন্য মানুষ করে, যাতে আমার আপনার কারণে ভবিষ্যতে আর কেউ কষ্ট না পায় এবং দোষতে না পারে। নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখি নতুন নতুন স্বপ্নে। আর পাশাপাশি গড়ে তুলি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। মহান মালিক আমাদের সে তৌফিক দিন। আমীন।

মূল আলোচনাঃ ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনরা যখন এই পৃথিবী শাসন করেছেন তখন পৃথিবীর মানুষের মনে ছিল অসম্ভব রকমের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি। কারণ তারা গঠন করেছিলেন আলোকিত ও সোনালি সমাজ। কিন্তু তাদের পর পৃথিবীতে আর সেইরকম আলোকিত ও সোনালি সমাজ গঠিত হয়নি। সমাজ শব্দটির পূর্বে অবস্থান করা আলোকিত ও সোনালি শব্দ দুটি আজ তাদের অবস্থান থেকে অনেক অনেক দূরে। সমাজের সাথে বসতে না পেরে শব্দ দুটি তাদের শেষ আশ্রয়স্থল অভিধানের পাতায় গিয়ে নিঃশব্দে চোখের পানি ফেলছে। আর প্রত্যাশা করছে কেউ তাদেরকে অভিধানের পাতা থেকে উঠিয়ে আনবে। গড়বে ঠিক আগের মত আলোকিত ও সোনালি সমাজ। হ্যাঁ, আমরা মুসলিমরা আলোকিত ও সোনালি শব্দ দুটির নিঃশব্দ কষ্ট দূর

www.pathagar.com

করার স্বপ্ন দেখি। আমরা স্বপ্ন দেখি আবারও এই পৃথিবী পরিণত হবে সোনালি ও আলোকিত পৃথিবীতে। কিন্তু পৃথিবীকে আলোকিত করার কাজটি একেবারেই সহজ কাজ নয়। এই কাজটি এর আগেও যারা করতে গিয়েছে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন এবং নতুন নতুন অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আজও যারা এই কাজ করতে যাচ্ছে ও যাবে তাদেরও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে ও হবে। এই পরিস্থিতি ও পরিণতি দেখে আমরা স্বপ্ন হারিয়ে ফেলি। আমরা হাল ছেড়ে দেই। আমরা ভাবি আর হয়ত সোনালি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়।

প্রকৃত পক্ষে আলোকিত ও সোনালি সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজটি অসম্ভব বা জটিল না হলেও এটি একটি সময়সাপেক্ষ কাজ। আকস্মিক কোন পরিবর্তন বিদ্রোহ সরকারযন্ত্রের বা শাসনযন্ত্রের হঠাৎ পরিবর্তনের মাধ্যমে সত্যিকার আলোকিত সমাজ গড়া সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী কোন কালেই অতিদ্রুত বা আকস্মিকভাবে এ ধরনের সমাজ গঠিত হয়নি। এধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠারে জন্য সমাজের সকল মানুষের মন-মানসিকতা চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্খা, রুচি-দৃষ্টিভঙ্গি পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে কোরআন হাদীসের আলোকে পরিবর্তন আনতে হবে। অন্যভাবে বললে, আলোকিত সমাজ গড়ে তোলার জন্য তৌহিদ, ন্যায়বিচার ও খিলাফতের উপর ভিত্তি করে দুটি যায়গায় পরিবর্তন আনতে হবে। যায়গা দুটির প্রথমটি হচ্ছে চিন্তা ও মনোজগ। দ্বিতীয় স্থানটি হচ্ছে জনজীবন। জনগণের চিন্তা ও মনের জগতে পরিবর্তন সাধিত হবে যদি সেই সমাজের নাগরিকদের মনে খোদার ভয়, খোদা সন্তোষকে জীবনোদ্দেশ্য, তীক্ষ্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, পরকালমুখিতা, দুনিয়ার লাভ ক্ষতি অপেক্ষা নৈতিক লাভ ক্ষতির তীব্রতা উপলব্ধি, বিনা যুক্তিতে ঐশী আইন কানুন মান্য করার মানসিকতা, আমানতদারিতা, ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য ও নেতৃত্ব লাভের লালসাহীনতা প্রাধান্য পেতে পারে। আর এই রকম পরিবর্তন এমনি এমনিই হবে না। এর জন্য দরকার তিনটি কাজ। প্রথমত, আন্দোলন (সংগঠন) সৃষ্টি দ্বিতীয়ত, নেতা ও কর্মী তৈরি, তৃতীয়ত, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি। আজ আমরা এই ক্ষেত্রে আনন্দিত যে, আমাদের সমাজে আলোকিত পৃথিবী গড়ার জন্য আন্দোলন, নেতা-কর্মী, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ কাঙ্খিত পরিমাণে না হলেও একেবারে খারাপ হয়নি। আবার খুব বেশিও হয়নি। যে ধরনের বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ (ফকীহ), কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক নেতৃত্ব দরকার সে ধরনের মানুষ আসলে পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাবে কী করে সে ধরনের মানুষতো মুখের কথায় তৈরি হয় না। সে ধরনের মানুষ আমাদের নিজেদেরকে হতে হবে ও অন্যদেরকে সেভাবে তৈরি করতে হবে।

আমাদের আরো ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে আমাদের সীমাবদ্ধতাকে। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই সীমাবদ্ধতা হারে হারে বুঝতে পারেন এবং তারা এই ব্যাপারে কথাও বলেন। বলেন যে আমাদের এটা নেই, সেটা নেই.... ইত্যাদি। তো অনেকে আবার এই অভাব বোধটিকে বা অভাব উপলব্ধি করাকে আড় চোখে দেখেন। কিন্তু আমি এই উপলব্ধির বিষয়টিকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করি। আমি মনে করি এই অভাব বোধটুকু খুবই জরুরি। কারণ অভাব বোধই যদি না থাকে তাহলে অভাব পূরণ হবে এমনটি চিন্তা করা যায় না। আর অভাব বোধকারীদের কারণেই হয়ত আমরা আলোকিত সমাজের দিকে ধীর গতিতে হলেও অগ্রসর হতে পারছি। এজন্য আমি নিরন্তর ধন্যবাদ দেই তাদের যারা তাদের চেতনার সমস্তটুকু দিয়ে আমাদের অভাবগুলো উপলব্ধি করেন। তবে আমরা যারা অভাববোধ করি তাদের ভাবনায় একটু পরিবর্তন আনা দরকার। বুঝা দরকার সমস্যাতো অনেকেই দেখে কিন্তু

www.pathagar.com

সমাধানের জন্য কতজন এগিয়ে আসে বা আসতে পারে। আজ আমাদের এত অভাববোধ কেন? কেন সীমাবদ্ধতার পাহাড়? কারা এর জন্য দায়ী?

সর্বশেষ খলিফা হযরত আলী (রা) এর পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ী অনেক আন্দোলন কায়েম হয়েছিল। আমরা সেই আন্দোলনগুলির ও তাদের নেতাকর্মীদের জীবন পর্যালোচনা করলে হয়ত আজও সোনালি সমাজ বিনির্মিত না হওয়ার পিছনে এবং বর্তমান দুনিয়াতে আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি তার পিছনে তাদের অনেক ক্রটি খুঁজে পাব। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে অতীতের দিকে না তাকিয়ে একথা বলতে চাই যে অতীতের সমস্যাসমূহ যে যে কারণে ও যেভাবে হয়েছে আগামীর সব সমস্যাও ঠিক সে সে কারণেই ও সেভাবেই হচ্ছে। আর সমস্যা সমাধান করতে ও আলোকিত পৃথিবী গড়তে ব্যর্থ হলে পূর্বতনদের মত আমরা ও আমাদের সমসাময়িক উচ্চ শ্রেণীর (যারা আমাদেরকে নেতৃত্ব দেন, পথ প্রদর্শন করেন, তত্ত্বাবধান করেন) মানুষরাও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ধিকৃত হব। তবে আমি একটু উদার হয়ে বলি, আমাদের চেয়ে যারা উচ্চ শ্রেণী তারা আসলে আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তেমন একটা দায়ী হবেন না। কারণ তাদের সীমাবদ্ধতা ছিল এবং আছে।

আমরা যদি আমাদের নিজেদের দিকে খেয়াল করি তখন আমরা উপলব্ধি করি বা করতে পারি আমাদের জ্ঞানের অযোগ্যতা। যার পিছনে কারণ হিসেবে আমরা আরোপ করি আমাদের পারিবারিক পরিমন্ডল, শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, উপরের মহল থেকে যথাযথ তত্ত্বাবধানের অভাবকে। আমরা সীমাবদ্ধতার দোহাই দিয়ে নিজেরা নিষ্কৃতি পেতে চাই। কিন্তু উপরের মহলকে ন্যূনতম ছাড় দিতে নারাজ। আমরা যেমন অনেক কারণ দেখাই, উর্দ্ধতনরা কি সেরকম কারণ দেখাতে পারবে না? তাদের ক্ষেত্রে কি এই রকম সমস্যাগুলো ছিল না।

তো বলি কি অন্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমরা আর কতকাল নিষ্কৃতি পাব। মনে হয় উপরের মহলকে দোষারোপ করার এই প্রবণতা থেকে অন্তত আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। না হলে আজকে আমরা যেমন উর্দ্ধতনদের দোষারোপ করছি। তেমনি অধস্তনরাও আমাদেরকে আগামীতে দোষারোপ করবে, ইতিহাস রচনা করবে। ঐতিহাসিক ভুল অনুসন্ধান করবে। লাভ কী? আসুন দোষারোপের মানসিকতা পরিহার করে আগামীর পৃথিবীতে যাতে আজকের কারণে সমস্যা তৈরি না হয় তার জন্য সজাগ হই, সচেতন হই। ভাবতে শিখি পৃথিবীর পরিবর্তন এবং সকল সমস্যার সমাধান যে করবে, সেই মানুষটি আমি।

উর্ধ্বতনকে সচেতন করবো না বা উর্ধ্বতনের নিকট প্রত্যাশা আমরা করবই না এমনটি কিন্তু আবার ভাবা ঠিক হবে না। আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা করবো। তবে সেটা হবে আমরা আমাদের নিজেদের নিকট যতটুকু প্রত্যাশা করি তার শত ভাগের একভাগের সমান। আর উর্ধ্বতনরা প্রত্যাশা ছাড়াই যা করেন সেটি আমাদের জন্য বোনাস। অন্যের নিকট প্রত্যাশাকে অনুৎসাহিত করার মত একটি গল্প এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে একবার কোন এক সমাবেশে এক ব্যক্তি একটি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখলেন। বক্তব্য শেষ হওয়ার পর একজন শ্রোতা (ছাত্র) এসে আয়োজককে (শিক্ষক) বলল, স্যার শুনলাম । তো, ভাল লাগল না। তখন আয়োজক শ্রোতাটিকে শান্তভাবে জিজ্ঞাস করলেন আজ যদি তোমাকে এই বিষয়ের উপর বলতে দিতাম তুমি কি পারতে? সে বলল না। তখন আয়োজক আবার জিজ্ঞাস করলেন, তোমাকে যদি একান্ত তোমার পছন্দের বিষয়ে বলতে দেয়া হয় তুমি কি পারবে? শ্রোতাটি

www.pathagar.com

বলল না। তখন আয়োজক নরম স্বরে বললেন তবে এত চাও কেন? কিছু দিতে পারবে না কিন্তু অন্তহীনভাবে চাইবে। এটা কী ? কেন এত ভিক্ষুক আমাদের চারপাশে? কেন অন্যদের কাছে এত প্রত্যাশা? কেন ভিখারির মতন শুধু চাওয়া? আরেকজন এসে সব করে দিয়ে যাবে আর আমি শুধু খেয়ে যাব। কিছুই দেব না। এ কী ? সত্যি বলতে কী, আমরা যার নিকট প্রত্যাশা করছি সে যদি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারতোই আমার মনে হয় আপনার বলার অপেক্ষায় সে বসে থাকতো না। একথা সত্য যে আমরা যখন আমাদের উর্ধ্বতনদের নিকট প্রত্যাশা করি তখন হয়ত লাভের পরিমাণ খুব বেশি হয় না বা আমরা শুধু শুধু কষ্ট পাই (প্রত্যাশা পূরণ না হওয়াতে)। তারপরও কিছু লাভ তো হয়। যেমন তারা সচেতন হন, উপলব্ধি করেন।

এখন আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই সবচেয়ে বেশি শক্তি দিয়ে মনন দিয়ে, যেদিকে আমরা আমাদের প্রত্যাশার তীর ছুড়ে মারতে চাই সেই দিকটি একান্তই আমাদের নিজেদের দিক। আমরা আমাদের নিজেদের মনের মধ্যেই স্বপ্নের, প্রত্যাশার বিশাল আকৃতির ভবন নির্মাণ করতে চাই। স্বপ্ন দেখতে চাই একান্ত নিজেদেরকে নিয়েই।

আমরা স্বপ্ন দেখতে চাই। অনেক অনেক বড় স্বপ্ন। কারণ আজকের এই আশাহীনতার সাম্রাজ্যে নিজেদেরকে আলোকিত মানুষ হিসাবে গড়ার জন্য স্বপ্ন দেখার বিকল্প নাই। আমরা সম্ভবত এই কথার সাথে খুব করে পরিচিত যে মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় অর্থাৎ একজন মানুষ সমসময় চেষ্টা করে তার স্বপ্নের সমান বড় হতে। আর হয়ও তাই এ রকম একটি ঘটনাও আমরা খুঁজে পাবো না যে, মানুষ তার স্বপ্নের চেয়েও বড় হয়েছে। এজন্য আমরা স্বপ্ন দেখতে চাই প্রতিনিয়ত। নির্ধারণ করতে চাই আলোকিত পৃথিবী গড়ার জন্য আমাদের ভূমিকা কি হবে? তবে হ্যাঁ এই স্বপ্ন ঘুমের মধ্যে দেখব না। জাগ্রত অবস্থায়ই দেখব। কারণ আমরা জানি স্বপ্ন হচ্ছে তা যা মানুষ জেগে জেগে দেখে। সেটি স্বপ্ন নয় যেটি মানুষ ঘুমিয়ে দেখে। স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সামনে সমসাময়িক বাস্তবতাকে (বয়স, শারীরিক অবস্থা, সামজিক প্রতিবন্ধকতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা) ভুলেও বিবেচনায় আনব না। আমরা স্বপ্ন দেখতে দ্বিধাগ্রস্ত হবো না। কোন বড় স্বপ্ন মাথায় এসেছে, কোন কিছুর দোহাই দিয়ে সেটিকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলব না। আর যে স্বপ্নই নির্ধারণ করবো তাতে যাওয়ার জন্য স্বপ্নকে দিন দিয়ে ভাগ করে আজ যে অংশটুকু করতে হবে, সেটুকু যেকোন মূল্যে সম্পাদন করব। তবে একটি কথা স্বপ্ন দেখার সময় ভুলব না যে, স্বপ্ন নিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রতিনিয়তই নতুন নতুন স্বপ্ন এসে উঁকি দিবে আমার মনের জানালায়। নতুন স্বপ্নের ভিড়ে অনেক পুরনো স্বপ্ন বাস্তবায়নের পূর্বেই ছিটকে পড়বে। কোন স্বপ্ন যদি বাস্তবায়িত না হয় বা পরবর্তিত হয়ে যায় তাহলে আমরা হতাশ হবো না। হতাশা বলতে যে শব্দটি আছে তাকে আমার মনের বাড়ির আঙিনায় প্রবেশতো দূরে থাক কয়েক মাইলের মধ্যেও প্রবেশ করতে দিব না। এক্ষেত্রে পাহারা বসাব। আসলে আনিশ্চয়তা বা হতাশা বলতে যে শব্দটি আছে তার অর্থ কিন্তু ভয় পাওয়া, আত্মবিশ্বাস হারানো। হতাশা দুর্বলের অভিধানে একটি প্রতাপশালী শব্দ।

যেহেতু আমরা আমাদেরকে স্বপ্নচারী মানুষ হিসেবে দাবি করি তাই আমরা সাম্প্রতিক মানুষ ও গতানুগতিক মানুষ হবো না। যাদের অতীত বা ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই তাদেরকেই মূলত আমি সাম্প্রতিক মানুষ বা গতানুগতিক মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করি। এ ধরনের মানুষেরা তাদের অতীত জীবনে অসাধারণ কোন কর্মতো করেইনি ভবিষ্যতেও তেমন কিছু করার সম্ভাবনা নাই। সমাজে এই ধরনের মানুষের অভাব নেই। এ কারণে আমি তাদের আরেক নাম

www.pathagar.com

দিয়েছি গতানুগতিক মানুষ। এখন আমাদের ঠিক করতে হবে আমরা কি এধরনের মানুষই হব? না, ভিন্ন রকম মানুষ হব?, হ্যাঁ আমরা সাম্প্রতিক বা গতানুগতিক মানুষ হব না। আমরা অবশ্যই ভিন্ন ধরনের মানুষ হবো। আমরা হব স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। যিনি স্বপ্ন দেখেন ও দেখান তাকেই আমরা স্বপ্নের ফেরিওয়ালা বলতে পারি। প্রতিদিন আমাদের বাসার আশে পাশে এসে কত মানুষ কত কিছু ফেরি করে বেড়ায়। কিন্তু স্বপ্নকে ফেরি করতে তেমন কেউ আসে না। এজন্য আমরা স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হব। নিজেরা স্বপ্ন দেখব আমাদের আশেপাশের সকলকে স্বপ্ন দেখাব, স্বপ্ন দেখতে শিখাব। আমরা স্বপ্নের ফেরিওয়ালা আলোর যাত্রী। আমরা আমাদের এই দেশটাকে মনের মত আলো দিয়ে সাজাতে চাই। তার জন্য দরকার আলোকিত মানুষ। তো কারা হবে এই আলোকিত মানুষ? যারা হতে চাবে তারাই। তবে আমরা নিজেদেরকে প্রথমে আলোকিত করে গড়তে চাই। আর সকল স্তরের মানুষের পাশাপাশি এখনও যারা বয়সে ছোট তারাই হবে সবচেয়ে আলোকিত মানুষ। কারণ তাদের হৃদয়ে এখনও মিশমিশে কাল অন্ধকারের মত আলো ঠাঁই নিতে পারেনি। সুতরাং সত্যিকার আলো তাদের হৃদয়ে পৌঁছলে সে আলোতে তারা তো নিজেদেরকে সাজাবেই পাশাপাশি সাজাবে তাদের চারপাশের পৃথিবীকে। আসুন আমরা ছোটদেরকে গড়ে তুলি। তাদের জন্য হই গল্প, গায়ক, কবি, রসিক, খেলার সাথী, জ্ঞানী, ইংলিশ ম্যান ও ভ্রমণসঙ্গী। এখন আসুন একটু করে আলোচনা করি ছোটদের জন্য কিভাবে গল্পকার, গায়ক, কবি, রসিক, খেলার সাথী, জ্ঞানী, ভ্রমণসঙ্গী হওয়া যায় তাই নিয়ে।

যে ভাইয়াটি নিয়মিত পাড়া বা মহল্লার ছোটদের গল্প শোনান তিনিই তার নামের উর্ধ্বে উঠে পরিচিত হন গল্প ভাইয়া নামে। গল্প ভাইয়া মজার মজার গল্প শোনান ছোটদেরকে। আর ছোটরা চিরকালই গল্প শুনে উৎফুল্ল হয়। গল্প তাদের কচি মনে চরম দাগ কাটে। তারা গল্পের নায়কটির মত হতে চায়। এজন্য গল্পে গল্পে যদি তাদেরকে জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে বড় হওয়া শত শত মনীষীর জীবন শুনাতে পারতাম তাহলে হয়ত সুদূর প্রসারিভাবে তাদের মধ্যে হতে তৈরি হত শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, কবি-সাহিত্যক, সাংবাদিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক নেতৃত্ব। যারা হত আলোকিত পৃথিবী গড়ার আসল কারিগর। আসুন সুযোগ করে আমাদের আশপাশের ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে গল্পের আসর গড়ে তুলি। যারা আমাদের নাম ভুলে আমাদেরকে ডাকবে, গল্প ভাইয়া নামে।

ছোটদের নিয়ে আমরা আয়োজন করতে পারি গান এবং কবিতার আসর। নিজেই গায়ক হয়ে যেতে পারি। ছোটদের জন্য খুব বেশি সুন্দর কণ্ঠ দরকার নেই। তবে কণ্ঠ যা আছে তা দিয়েই যদি শুরু করি খুব খারাপ হয় না। মজার মজার ছোটদের উপযোগী কবিতা মুখস্ত না পারলেও অন্তত দেখে দেখেও শোনাতে পারি। কবিতা বা গানের আসর যদি একান্তভাবে করা না-ই যায় তাহলে ভালোভালো ছোটদের উপযোগী গল্প, কবিতার ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি বিলি করতে পারলেও খারাপ হয় না। ছোটরা আমাদের গান ও কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে আমাদের বলবে গায়ক ও কবি ভাই।

ছোটরা হাসতে পছন্দ করে। হাসি শব্দ শুনলেই হাসি চলে আসে ছোটদের। অবশ্য আমরাও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নই। যা হোক ছোটদেরকে হাসাতে হবে। আনন্দ দিতে হবে। এজন্য আমাদের নিজস্ব সংগ্রহে শত শত কৌতুক রাখতে পারলে খারাপ হয় না। কৌতুকেরও আসর করা যেতে পারে। তবে কৌতুককে শুধু হাসির খোরাক না বানিয়ে শিক্ষাপ্রদ করার চেষ্টাও আবশ্যক।

www.pathagar.com

আমরা ছোটদের খেলার সাথী হতে পারি। আমাদের সময় কম? হ্যাঁ, সময় কম থাকাই স্বাভাবিক। তবে চেষ্টাতো করব। ভিন্ন ভিন্ন রকমের মজার মজার সব খেলার নাম পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে অন্তত খোঁজ তো রাখতে পারব। খেলছে কিনা? কেমন খেলল? কেমন লাগল?

সাধারণ জ্ঞানের তুখোড় হয়ে ছোটদের নিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাধারণ জ্ঞানের আসর করলেও তো খারাপ হয় না। নিজেরও হল ছোটদেরও হল আপনার 'সাধারণ জ্ঞান' দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে সবাই আপনাকে বলবে জ্ঞানী ভাই। সাধারণ জ্ঞানী ভাইয়া বলবে না। কারণ জ্ঞানীর পূর্বে সাধারণ বসালে কিন্তু জ্ঞানীর অবস্থানে কমে যায়। ছোটদের কে নিয়ে আয়োজন করা যায় English speaking Club. যে ক্লাবে আসার পর শুদ্ধ উচ্চারণের অনর্গল ইংরেজিতো আমরা বলবই পাশাপাশি বলবে ক্লাবের সকল সদস্য। আমাদের ইংরেজি শুনে মুগ্ধ হয়ে তারা আমাদের বলবে Titanic of English. আপনি আবার এই ভেবে মন খারাপ করবেন না যে আপনাকে টাইটানিকের সাথে তুলনা করেছে। আর টাইটানিকতো তার প্রথম যাত্রাতেই ডুবে গিয়েছিল। ভয় নেই ইংরেজি জানলে আমার বিশ্বাস আপনাকে কেউ ডুবাতে গেলেও কষ্ট হবে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতেও আমরা তাদের ভ্রমণ সঙ্গী হতে পারি। পাশাপাশি তাদেরকে মাঝে মাঝেই নিয়ে যাতে পারি চিত্তালোকায়ন ঘরে। উহ দুঃখিত, পাঠাগারে। আমি আবার পাঠাগারকে চিত্তালোকায়ন ঘর বলে সম্বোধন করতে বেশি পছন্দ করি। কারণ পাঠাগার মানুষের চিত্তকে আলোকিত করে। আসুন সময় করে মাঝে মাঝে তাদেরকে দেখিয়ে আনি কি করে মানুষ মজা করে লাইব্রেরিতে বই পড়ে। যদিও আমাদের দেশে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বা তার কাছাকাছি মানেরও কোন লাইব্রেরি নাই বা আমরা আয়োজন করতে পারি না বিশ্বের সবচেয়ে বড় বইমেলা (পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় জার্মানির ফ্রাঙ্কফুটে) তবুও কিছুটা আনন্দের খবর হল, আমাদের প্রায় প্রতিটি জেলা শহরেই পাঠাগার আছে যেগুলোতে পড়তে কোন টাকা পয়সা লাগে না। আর আমাদের ঢাকাবাসীদের সুবিধা আর একটু বেশি। কারণ আমাদের আশপাশে অনেকগুলো লাইব্রেরি আছে।

হচ্ছে কি ছোটদের এসব কর্মসূচি দিয়ে গড়ে তোলা সহজ। আবার অতটা সহজও নয়। আবার কঠিনও নয়। একথা সত্য যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদ্যোগের মাধ্যমে এত কর্মসূচি হাতে নেয়া কঠিন। তবে যতক্ষণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আলোকিত মানুষ গড়ার জন্য ব্যক্তি পর্যায় থেকেই কাজগুলো করতে হবে। আর শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে হবে প্রদীপ্ত মনে। খুঁজতে হবে পরিবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় কে হচ্ছে শিক্ষক। এ ক্ষেত্রে আমরা ভাবতে পারি যে, আমার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এক দুটি নয় কয়েকটি বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করার পাশাপাশি কিন্ডারগার্ডেন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করব। কারণ এর মাধ্যমে আমরা একঝাঁক কচি মনের মানুষকে নার্সিং করতে পারব।

দরকার পারিবারিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা। যাতে অন্তত ৩ থেকে ৫ হাজার বই থাকবে। দরকার সামাজিক পাঠাগার বা কমিউনিটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা। পাঠাগার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে পাঠক তৈরি ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠাকে আন্দোলন হিসেবে নিতে পারলে সমৃদ্ধ অনুভব ও উপলব্ধিগুণ সম্পন্ন কিছু মানুষ আমরা পেতে পারব। কারণ বইতো যেন তেন কোন বস্তু নয় বই হচ্ছে সেই জিনিস যার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড তরঙ্গ সৃষ্টিকারী ও আবেগ তৈরিকারী জিনিসপত্র শব্দ হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বসে আছে। আমরা জানি অতীতে যারা শক্তিমান আলোকিত ও গভীর মানুষ হয়েছিলেন তাদের ফলবান জীবনই হচ্ছে বই। তাদের কাজ উদ্যম মূল্যবোধ মনন,

www.pathagar.com

স্বপ্ন, কল্পনা ও উপলব্ধির ভান্ডার সব রয়েছে বইয়ের মধ্যে একটি চিনা প্রবাদ আছে যে সে ব্যক্তি তিন দিন গ্রন্থ পাঠ থেকে বিরত থেকেছে, সেই সঙ্গে সে তার কথা বলার সৌন্দর্যও হারিয়ে ফেলেছে। আর আগেই তো বলেছি আমাদেরকে আকাশের সমান বড় স্বপ্ন দেখতে হবে। আর প্রকৃত কথা হচ্ছে আকাশের সমান বিশাল স্বপ্ন দেখতে হলে অবশ্যই আকাশের বিশালতা সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে হবে। একজন মানুষ যে কোন দিন প্লেনের নাম শোনেনি পৃথিবীর চমৎকার সব স্থাপনা দেখেনি বিশ্বের প্রভাব সৃষ্টিকারী অনন্য মানুষদের জীবন শুনেনি সে কি করে স্বপ্ন দেখবে প্লেনে চড়ার, প্লেনের বা বিশাল সৌন্দর্য মন্ডিত ভবনের মালিক হওয়ার ও প্রভাব সৃষ্টিকারী মানুষ হওয়ার? সে যদি কখনও শুনে একটি ড্রামের মত জিনিসের মধ্যে হাজার খানেক মানুষ উঠে বসে তারপর সেটি আকাশে উড়ে একদেশ থেকে আরেক দেশ যায়। সে ভাববে মানুষতো একা এক মিনিটের জন্যই হাওয়ায় ভাসতে পারে না। আবার একসাথে এত মানুষ? সে ভাববে কোন পৌরাণিক গল্প শুনছে। এজন্য বলছি কি? আমরা প্রচুর পড়ব। পড়ার পাশাপাশি লিখবও। লিখা প্রসঙ্গে জা পল সার্ত বলেছিলেন লেখার জন্য কলম ধরা মানেই প্রতিবাদে এগিয়ে যাওয়া। আর আমরাতো সমকালীন অন্যায় ও আঁধারের প্রতিবাদ করতেই চাই। আর আমরা করছিও বটে। আর আরেকটি বিষয়ে আমরা খুবই দক্ষ হব সেটি হচ্ছে ভাষা। এক্ষেত্রে আমরা আরবি ও ইংরেজিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিব। আসুন অসাধারণ দক্ষ হয়ে উঠি ভাষা দুটিতে।

সবশেষে যে কথাটি দিয়ে শেষ করছি সেটি একটু নেতিবাচক। তারপরও তা দিয়েই শেষ করছি কথাটি হল আমাদের চেয়ে অলস ও নোংরা জাতি খুব কম আছে। যা করণীয় সেটাকে অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারলে বা পিছিয়ে দিতে পারলে আমরা যেন বিপুল স্বস্তিবোধ করি। আনন্দ অনুভব করি। এভাবে পিছিয়ে দিতে দিতে আজ সবখানে আবর্জনার পাহাড় জমে আছে। তো প্রত্যয় নিই আজ হতে, এখন এই মুহূর্ত হতে, আমরা আমাদের জীবনে আর কোন কাজই আগামীর জন্য ফেলে রাখব না। কাজ আসা মাত্রই সম্পাদন করব ইনশাআল্লাহ।

প্রবন্ধ পাঠ শেষে আমরা প্রত্যয় নিচ্ছি যে, আমরা আলোকিত ও সোনালি সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করব। আমাদের উর্ধ্বতনদের নিকট সবচেয়ে কম প্রত্যাশা করব আর সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা করব আমাদের নিজেদের নিকট। নিজেরা স্বপ্রচারী মানুষ হব। স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হব। স্বপ্ন দেখব এবং অন্যদেরকে দেখাব। সাম্প্রতিক মানুষ বা গতানুগতিক ধরনের মানুষ হবো না। ছোটদের জন্য আমরা হবো গায়ক, কবি, রসিক, খেলার সাথী, জ্ঞানী ভ্রমণসঙ্গী। আমার একান্ত তত্ত্বাবধানে তাদের মধ্য হতে তৈরি করব বেশ কিছু শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, মিডিয়া, ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক নেতৃত্ব। আমরা ভাষাজ্ঞানে বিশেষত ইংরেজি ও আরবিতে অত্যধিক দক্ষ হবো। আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কাজ করব সুদূরপ্রসারিভাবে। আর প্রচুর বই পড়ার পাশাপাশি পাঠক তৈরি ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিব।

লেখক : শিক্ষা সম্পাদক
ঢাকা মহানগরী পূর্ব

www.pathagar.com

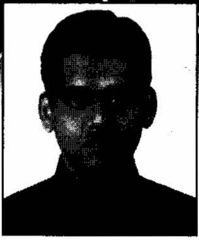

মিয়ানমারে গণহত্যা : জেগে উঠো মুসলিম বিশ্ব

পৃথিবীর মানচিত্রে চোখ রেখে যে প্রান্তেই নজর দেবেন মুসলিম নির্যাতন কোথাও খুব বিরল নয়। বর্তমান দুনিয়ার সবচে স্বল্পমূল্য জিনিসগুলোর তালিকায় চলে এসেছে মুসলিমদের রক্ত। ধরাপৃষ্ঠের অন্য কোনো জাতি বা ধর্ম ইসলাম বা মুসলিমের মতো নির্যাতিত নয়। জগতের সবচে বড় নিগৃহীত জাতির নাম মুসলিম। আধুনিক দুনিয়ায় বসনিয়া-চেচনিয়া-জিংজিয়াং ও মিন্দানাওয়ের পর কাশ্মির-গুজরাট-আসাম, ফিলিস্তিন-আফগান-ইরাক ও মিয়ানমারে চলছে মুসলিম নিধনযজ্ঞ। জাতিসঙ্ঘের ঘোষণা অনুযায়ী পৃথিবীতে সবচে নির্যাতিত সংখ্যালঘু জাতির নাম রোহিঙ্গা মুসলিম।

একটি কুকুর না খেয়ে মারা গেলে যে সভ্য দুনিয়ায় চোখের পানির স্রোত বয়ে যায়, বন্য প্রাণী বাঁচাতে যেখানে কোটি কোটি ডলারের ফান্ড অনায়াসে সংগৃহীত হয়, মিয়ানমারে মাসের পর মাস নির্বিচারে নিরপরাধ নারী-শিশু-বৃদ্ধকে হত্যা করার পরও সেখানে কোনো সাড়া পড়ে না। কোনো কুলাঙ্গার ইসলামের নবী বা ধর্মকে কটাক্ষ করে প্রাণ বাঁচাতে দেশান্তরিত হলে সভ্য দুনিয়ায় তার আশ্রয়ের অভাব হয় না। তার স্বদেশ ত্যাগের বেদনায় সমব্যথী ব্যক্তি বা দেশের অভাব হয় না। অথচ নিজ দেশে পরবাসী রোহিঙ্গা মুসলিমদের জোর করে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হলেও এ নিয়ে তাদের কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মানববন্ধন, টকশো কিংবা জাতিসঙ্ঘের কোনো বিশেষ বৈঠক নেই। এই বিশ্বে বাঘ সংরক্ষণের আহ্বানে পত্রিকার শিরোনাম করা হয়, সম্মেলন হয় কিন্তু সারাবিশ্বে ৫৭টি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের গণহত্যা থেকে রক্ষা করতে কোনো সম্মেলন হয় না।

অন্তহীন নির্যাতনের পরম্পরা

১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয় বার্মা সরকার। কয়েকশ বছরের পিতৃভূমিতেই তাদের বলা হচ্ছে অবৈধ অভিবাসী।

www.pathagar.com

নিজেদের দেশে তাঁরা বর্তমানে প্রবাসী। এদের রোহিঙ্গা বলতে নারাজ বার্মা সরকার এবং বার্মার বৌদ্ধরা। তারা এদের ডাকে বাঙালি বলে। সে থেকেই বার্মায় মুসলিমদের গণহত্যা চলে আসছে। প্রায়ই রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি কখনো সরকার, কখনো স্থানীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধরা আবার কখনো উভয়পক্ষ মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। যখনই নির্যাতনের কিছু চিত্র সামরিক জান্তার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত আলোয় আসে, তখনই এ নিয়ে কিছুটা কথাবার্তা হয়। আবার কদিন পরেই সব আলোচনা থেমে যায়। স্থায়ী সুরাহা হয় না রোহিঙ্গা মুসলিমদের সমস্যার।

সর্বশেষ ব্যাপক গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বছরের জুন মাসে। রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত ২০১২ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মূলত মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলিম ও বৌদ্ধ রাখাইনদের মধ্যে চলমান সংঘর্ষের ঘটনাপ্রবাহ। দাঙ্গাটির সূত্রপাত হয় জাতিগত কোন্দলকে কেন্দ্র করে এবং উভয়পক্ষই এতে জড়িত হয়ে পড়ে। অক্টোবর মাসে এটি সকল নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এতে কমপক্ষে ৮০ জন নিহত হয়, বাস্তুচ্যুত হয় প্রায় ২০,০০০ মানুষ এবং হাজার হাজার ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। ১০ জুন রাখাইনে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং সামরিক বাহিনীকে ওই অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। চলমান দাঙ্গায় অনেকেই নিহত হয়। ২২ আগস্ট সরকারিভাবে ৪৪ জনের নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করা হয়। ৯০,০০০ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। প্রায় ২,৫২৮টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, যার বেশিরভাগই রোহিঙ্গাদের। দাঙ্গায় বার্মিজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পাওয়া যায়। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একতরফাভাবে রোহিঙ্গাদের ব্যাপক গণগ্রেফতার এবং ধরপাকড়ের অভিযোগ ওঠে। ২১ মার্চ আবার দাঙ্গা শুরু হয়েছে। বার্মার মেইকতিলা শহরে বৌদ্ধ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় ধরনের দাঙ্গা শুরু হয়েছে। স্থানীয় একজন সংসদ সদস্য বলেছেন সহিংসতায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কয়েকটি মসজিদের ওপর হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ ১ মে উগ্রবাদী বৌদ্ধদের হামলায় নতুন করে অন্তত দু'টি মসজিদ ও প্রায় দুশ' বসতবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। মুসলিমদের এসব ঘর-বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

অসহায় রোহিঙ্গা

একবার চিন্তা করে দেখুন তো হঠাৎ যদি বলা হয় আপনি এ দেশের নাগরিক নন, অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্বও নেই আপনার কাছে-তাহলে কেমন লাগবে? বার্মার রোহিঙ্গা মুসলিমদের বর্তমান কোনো মাতৃভূমি নেই। এতসব মানবাধিকার আর আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের যুগে তাদের বাসস্থল রিফিউজি ক্যাম্প! কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ক্যাম্পগুলো পাহারা দিচ্ছে চেকপোস্ট বসিয়ে বার্মার মিলিটারি। বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সার্বক্ষণিক অভাব-বঞ্চনায়, দুঃখ-কষ্টে ও দুর্ভোগে অনিশ্চিত জীবন কেটে যাচ্ছে শরণার্থী শিবিরবাসী রোহিঙ্গাদের। পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যের বাসিন্দা ৬৮ বছর বয়সী মোহাম্মদ আলি সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্টকে বলতে লাগলেন, আমার বাবা, দাদা সবার জন্ম এই মাটিতেই। বরুদা ক্যাম্পে আশ্রিত হয়েছেন ১৫ হাজার রোহিঙ্গা। মুসলিম সিতবেতে ছিল এদের নিজস্ব ঘরবাড়ি। ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

www.pathagar.com

৩৮ বছর বয়সী মুসলিম নারী মনিয়ন খাতা জানালেন, তাদের বসতির আশপাশ পুলিশ ও বৌদ্ধরা ঘিরে ফেললে পালিয়ে গিয়ে তারা জান বাঁচান ঝিলের পানিতে লুকিয়ে। বৌদ্ধরা কেন তাদের ওপর হামলা করলো- জানেন না এই ভয়ার্ত নারী। তার ধারণা, তাদের জমি ও সম্পত্তি বৌদ্ধরা কেড়ে নিতে চায়। আমরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই- এটাই চায় বৌদ্ধরা। বৌদ্ধদের সহিংস হামলা থেকে বাঁচার গরজে রাখাইন অঞ্চলের অসংখ্য রোহিঙ্গা মুসলিম ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে শরণার্থী শিবিরগুলোয় দিন কাটিয়ে চলেছেন গত বছরের জুন থেকে। বার্মায় একের পর এক বৈষম্য-যন্ত্রণা সয়ে চলেছে এই মুসলিম সম্প্রদায়। গত ৩ ডিসেম্বর আকিয়াবের একটি মুসলিম শিবিরে হাজির হয়ে বর্মী সৈনিকরা মুসলিমদের একটি ছাপানো ফর্মে সই করতে বলে। ফর্মে নাগরিকত্বের জায়গায় বাংলাদেশী লেখা দেখে শিবিরের লোকজন ফর্মে সই করতে অস্বীকার করলে সৈন্যরা এরপর চার মহিলাসহ আট ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যায়। বার্মার গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী সুচি গত বছর কয়েক দশকের গৃহবন্দিত্ব ঘুচিয়ে মুক্ত দুনিয়ায় পা ফেলেন। তার ত্যাগ আর সংগ্রামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সারাবিশ্বের মিডিয়া। মানবাধিকার ও গণতন্ত্র নিয়ে লড়াইয়ের জন্য একের পর এক তিনি লাভ করছেন নানা আন্তর্জাতিক সম্মাননা। অথচ গত এক বছরে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর দুর্যোগের ঘনঘটা বিরাজ করলেও প্রতিবাদে স্বজাতীয়দের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন নি তিনি। রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে তার নীরবতার সমালোচনা হয়েছে মুসলিম বিশ্বজুড়ে। স্বদেশী রোহিঙ্গারাও অসন্তুষ্ট তার প্রতি। বাস্তুভিটাহারা রোহিঙ্গা নারী মৌং বলেন, তিনি (সুচি) কোনো কথা বলছেন না, সম্ভবত আরও বেশি বৌদ্ধ ভোট তিনি পেতে চান বলে। কিন্তু শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত হয়েও ভবিষ্যৎ প্রশ্নে রোহিঙ্গারা আতঙ্কমুক্ত নন। গত বছরের জুন ও অক্টোবরে বৌদ্ধ সহিংসতার শিকার রোহিঙ্গা মুসলিমদের বাঁচাবার জন্য কোনো অবলম্বনের উপায় খোঁজা সম্ভব হচ্ছে না। কাঁটাতারের বেড়ায় এবং পুলিশ ও সেনা তথা সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর পাহারায় তাদের দিন কাটছে। খাদ্যাভাবে, রোগে, চিকিৎসার অভাবে ও শীতের প্রাদুর্ভাবে অস্থায়ী ক্যাম্পে তাদের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। কোনো আন্তর্জাতিক সাহায্য আজও তাদের কাছে পৌঁছায়নি। অন্যদিকে শিবিরাশ্রিত রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর বর্মী নিরাপত্তা বাহিনীর হামলা ও হয়রানি আজও অব্যাহত রয়েছে।

কারা এই রোহিঙ্গা?

রোহিঙ্গা আদিবাসী জনগোষ্ঠী পশ্চিম মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। এরা ধর্মে মুসলিম। রোহিঙ্গাদের আলাদা ভাষা থাকলেও তা অলিখিত। মিয়ানমারের আকিয়াব, রেথেডাং, বুথিডাং মংডু, কিয়ক্টাও, মাম্ব্রা, পাত্তরকিল্লা এলাকায় এদের বাস। বর্তমান ২০১২ সালে, প্রায় ৮,০০,০০০ রোহিঙ্গা মিয়ানমারে বসবাস করে। মিয়ানমার ছাড়াও ৫ লক্ষের অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এবং প্রায় ৫ লাখ সৌদি আরবে বাস করে বলে ধারণা করা হয়। রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত রয়েছে- সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাওয়া একটি জাহাজ থেকে বেঁচে যাওয়া লোকজন উপকূলে আশ্রয় নিয়ে বলেন, আল্লাহর রহমে বেঁচে গেছি। এই রহম থেকেই এসেছে রোহিঙ্গা।

ইতিহাসের আলোয় রোহিঙ্গা জাতি

বর্তমান মিয়ানমারের রোহিং (আরাকানের পুরনো নাম) এলাকায় এ জনগোষ্ঠীর বসবাস।

www.pathagar.com

ইতিহাস ও ভূগোল বলছে, রাখাইন প্রদেশের উত্তর অংশে বাঙালি, পার্সিয়ান, তুর্কি, মোগল, আরবীয় ও পাঠানরা বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর বসতি স্থাপন করেছে। তাদের কথ্য ভাষায় চট্টগ্রামের স্থানীয় উচ্চারণের প্রভাব রয়েছে। উর্দু, হিন্দি, আরবি শব্দও রয়েছে। রাখাইনে দুটি সম্প্রদায়ের বসবাস 'মগ' ও 'রোহিঙ্গা'। মগরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মগের মুল্লুক কথাটি বাংলাদেশে পরিচিত। দস্যুবৃত্তির কারণেই এমন নাম হয়েছে 'মগ'দের। এক সময় তাদের দৌরাত্ম্য ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। মোগলরা তাদের তাড়া করে জঙ্গলে ফেরত পাঠায়। তবে ওখানকার রাজসভার বাংলা সাহিত্যের লেখকরা ওই রাজ্যকে রোসাং বা রোসাঙ্গ রাজ্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ১৪৩০ থেকে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত ২২ হাজার বর্গমাইল আয়তনের রোহিঙ্গা স্বাধীন রাজ্য ছিল। মিয়ানমারের রাজা বোদাওফায়া এ রাজ্য দখল করার পর বৌদ্ধ আধিপত্য শুরু হয়। এক সময় ব্রিটিশদের দখলে আসে এ ভূখণ্ড। তখন বড় ধরনের ভুল করে তারা এবং এটা ইচ্ছাকৃত কিনা, সে প্রশ্ন জ্বলন্ত। আমাদের 'প্রাক্তন প্রভুরা'! মিয়ানমারের ১৩৯টি জাতিগোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুত করে। কিন্তু তার মধ্যে রোহিঙ্গাদের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ ধরনের কত যে গোলমাল করে গেছে ব্রিটিশরা!

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি মিয়ানমার স্বাধীনতা অর্জন করে। শুরু হয় বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা। সে সময় পার্লামেন্টে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। এ জনগোষ্ঠীর কয়েকজন পদস্থ সরকারি দায়িত্বও পালন করেন। কিন্তু ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে মিয়ানমারের ভিন্নপথে যাত্রা শুরু করে। রোহিঙ্গাদের জন্য শুরু হয় দুর্ভোগের নতুন অধ্যায়। সামরিক জান্তা তাদের বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করে। তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। ধর্মীয়ভাবেও অত্যাচার করা হতে থাকে। নামাজ আদায়ে বাধা দেওয়া হয়। হত্যা-ধর্ষণ হয়ে পড়ে নিয়মিত ঘটনা। সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়। বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োজিত করা হতে থাকে। তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নেই। বিয়ে করার অনুমতি নেই। সন্তান হলে নিবন্ধন নেই। জাতিগত পরিচয় প্রকাশ করতে দেওয়া হয় না। সংখ্যা যাতে না বাড়ে সে জন্য আরোপিত হয় একের পর এক বিধিনিষেধ। মিয়ানমারের মূল ভূখণ্ডের অনেকের কাছেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী 'কালা' নামে পরিচিত। বাঙালিদেরও তারা 'কালা' বলে। ভারতীয়দেরও একই পরিচিতি। এ পরিচয়ে প্রকাশ পায় সীমাহীন ঘৃণা।

বাঙালি-বার্মিজ সম্পর্ক

নিকট প্রতিবেশী এবং ভ্রাতৃপ্রতিম জাতি হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে রোহিঙ্গা মুসলিমদের সম্পর্কের ইতিহাস অনেক পুরনো। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় রোহিঙ্গারা আজ আমাদের আশ্রয়প্রার্থী। অথচ ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় এই আরাকানি মুসলিমরা আমাদের সাহায্য করে আসছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি আলাউল আরাকান রাজসভার সভাকবি ছিলেন। এখানে বসেই তিনি হিন্দি কবি মালিক মোহাম্মদ জায়সীর পদুমাবৎ অবলম্বনে পদ্মাবতী কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষার গবেষকরা সবাই একমত যে, আরাকান রাজসভাতেই বাংলা ভাষার নব উৎকর্ষের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তী ঘটনা সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়কালের। সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে যখন ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ শুরু হলো, মেজো পুত্র শাহ শুজা যিনি এ বাংলার শাসক ছিলেন। কিন্তু তার ভাই আওরঙ্গজেবের

www.pathagar.com

দাপটে তারই সেনাবাহিনীর চাপে বাংলায় টিকতে না পেরে জীবন বাঁচাতে তিনি সপরিবারে আরাকানে চলে গিয়েছিলেন। তৎকালীন মগরাজা রাজপুত্র শাহ শুজার কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য প্রস্তাব দিলে শাহ শুজার সঙ্গে তার বিরোধ শুরু হয়। সে ক্ষেত্রে এই রোহিঙ্গা মুসলিমরাই সেদিন মুসলিম রাজকন্যার সম্ভ্রম বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন। যদিও তারা সফল হননি। কিন্তু তাদের সাহস, সহমর্মিতা ও মুসলিম হিসেবে আত্মমর্যাদা ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা আছে। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে আমাদের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা আরাকানি মগদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। ওই অঞ্চলের জনজীবনে আরাকানি ডাকাতদের অত্যাচারের মূর্তিমান আতঙ্ক এখনো শরীরে কাঁপন ধরায়। বাংলার নবাব তখন শায়েস্তা খান। তিনি বুজুর্গ উমেদ খানকে চট্টগ্রামের শাসক হিসেবে পাঠান মগ জলদস্যুদের দমনে। বুজুর্গ উমেদ খান তখন আরাকানি রোহিঙ্গা মুসলিমদের কূটনৈতিক এবং সামরিক সহযোগিতায় আরাকানি জলদস্যুদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিলেন।

মিয়ানমার সরকারের দ্বিমুখী আচরণ

৩০ এপ্রিল ২০১৩ মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উগ্র বৌদ্ধদের হামলার শিকার হয়ে শরণার্থীতে পরিণত হওয়া হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলিমের জন্য সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে। গত মাসে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যার অভিযোগে মিয়ানমারের আদালতে সাতজন মুসলিমের বিচার চলছে। অথচ উগ্র বৌদ্ধরা যে শত শত মুসলিমকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে সরকার সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। একজন বৌদ্ধকেও এ পর্যন্ত বিচারের সম্মুখীন করা হয়নি। এ থেকেই মুসলিমদের ব্যাপারে মিয়ানমার সরকারের দ্বিমুখী আচরণের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং প্রমাণিত হয়েছে সরকার ন্যায়বিচার করছে না।

শেষ কথা

মিয়ানমার বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় সহযোগিতা সংস্থা আসিয়ানের সদস্য। এ জোটের বাইরে নিজ ইচ্ছামত তারা চলতে পারবে না। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি মিয়ানমার সরকারের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে রোহিঙ্গা মুসলিমদের সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানিয়েছেন। আসিয়ানের অন্যতম প্রভাবশালী এ দেশটির হুমকির পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের আন্তর্জাতিক সব সংগঠন বিশেষত ওআইসিকে এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। সাধারণভাবে সকল মুসলিম দেশ এবং বিশেষভাবে আরববিশ্বকে মিয়ানমানের অসহায় মুসলিমদের পাশে দাঁড়াতে হবে। কেবল যৎসামান্য আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতায় সীমিত না থেকে আন্তর্জাতিক সকল ফোরামে বিশেষত জাতিসঙ্ঘে রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার নিয়ে আওয়াজ তুলতে হবে। মিয়ানমারের বিবেকহীন সরকারকে বাধ্য করতে হবে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে এবং তাদের সকল নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে।

হে আল্লাহ, আপনি তাবৎ বিশ্বের মজলুমদের সাহায্য করুন। আপনার আসমানি সাহায্য আর অদৃশ্য শক্তিকে তাদের সহায়ক বানিয়ে দিন। দিকে দিকে উড্ডীন করে দিন ইসলামের বিজয় পতাকা।

লেখক : কলেজ কার্যক্রম সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ঢাকা মহানগরী পূর্ব

www.pathagar.com

অশ্রুসিক্ত ২৮শে অক্টোবর

২৮শে অক্টোবর ছেলে হারা মা, স্বামী হারা স্ত্রী, ভাই হারা বোন, বাবা হারা সন্তান, সন্তান হারা বাবার এক বুক জ্বালা যন্ত্রণার ইতিহাস। পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে ততদিন বাংলার মুসলিমদের ইতিহাসে প্রতিটি বছর আটাশে অক্টোবর এক বীভৎস্য অবয়বে ধরা দিবে। ২৮শে অক্টোবর যেন হায়েনার একটা বিষাক্ত নখর। ২৮শে অক্টোবর রক্ত ঝরার ইতিহাস। এই দিনে বাংলার ইসলামপ্রিয় মা বোন যারা বেহেশতের সরদারনি হযরত ফাতেমার (রা:) উত্তরসূরি তাদের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান স্বামীরা আল্লাহর প্রদত্ত আল কোরআনের বাণীকে ও ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দিন আল্লাহপাক ঈমানদারকে এক বিরাট পরীক্ষায় ফেলে ছিলেন। মনে পড়ে আল্লাহ পাকের সেই বাণী তোমরা যারা ঈমান এনেছ বলে দাবি করো, তোমাদেরকে কি আমি এমনিতেই ছেড়ে দিব? অথচ পরীক্ষা করা হবে না কে সাচ্চা ঈমানদার আর কে ঝুটা ঈমানদার?

আসলে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে আল্লাহ পাক মুসলমানদের সেই পরীক্ষায়ই ফেলে ছিলেন। সেই পরীক্ষায় আল্লাহ পাক ঈমানদারদের বিজয়ী করেছেন কিছু নিস্পাপ মাছুম বান্দাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে। ২৮শে অক্টোবরের কথা মনে হলেই রাসূল (সা) এর বদর প্রান্তরের কথা মনে পড়ে যায়। সেই বদরের যুদ্ধে ৩১৩ জন সাহাবী নিয়ে রাসুল (সা) কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

শত্রুর দলে ছিল হাজার সৈন্য। এই স্বল্প সংখ্যক সাহাবীকে আল্লাহ পাক ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করে বিজয়ী করেছিলেন। ঠিক তদ্রূপবায়তুল মোকাররম উত্তর গেটেও দু'তিনশ জনের জামায়াত শিবির যারা সেই দিন সমাবেশের কাজে আঞ্জাম দানের কাজে ব্যস্ত ছিল, ছিল না তাদের হাতে কোন অস্ত্র, তারা মারামারিতে যায়নি। তারা গিয়েছে সমাবেশে যোগ

www.pathagar.com

দান করতে ঠিক সেই অপ্রস্তুত মুহূর্তে বিশ পঁচিশ হাজার অস্ত্রসজ্জিত আওয়ামী সন্ত্রাসী আক্রমণ চালালো। শেখ হাসিনার হুকুমে সেদিন সত্যিকার ঈমানদাররা শত্রুর ভয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায় নি। তারা খালি হাতে সেদিন লড়েছিল আওয়ামী গুন্ডা বাহিনীর বিরুদ্ধে, তারা ভয় পেয়ে কাপুরুষের মত পালিয়ে যায়নি। তাই মনে হয় আল্লাহ পাক ফেরেশতা দিয়ে জামায়াত শিবিরকে সাহায্য করেছেন। সেই কারণে বিজয় সম্ভব হয়েছিল। তা না হলে সে ময়দানে রক্তের বন্যা বয়ে যেত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাফ করুন। সেইদিন সাচ্চা ঈমানদাররা ময়দানে টিকে ছিল ঝুটা ঈমানদাররা পালিয়ে ময়দান ছেড়ে পেছনে চলে এসেছিল। আল্লাহ তাদের মাফ করে দিন। আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে এমন সাহসী বীর মুজাহিদ মাসুমের মা বানিছেন আমাকে। আজ সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর গত হতে চলল আল্লাহর এই দীনের কাফেলায় শরিক হয়েছি। প্রত্যেক মাহফিলে সবাই মিলে আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে প্রাণ ভরে দোয়া করতাম। হে আল্লাহ আমাদেরকে শহীদের, গাজীর মা, ওমর ও আবু বকরের মা বানাও। তবুও খারাপ ছেলের মা বানাইও না। দোয়া করতাম, রব্বানা হাবলানা মিন আঝওয়া জিনা ওয়া জুররিইয়াতিনা কুরবতা আইউনিও ওয়াজায়ালন লিন মুত্তাক্বিনা ইমামা। এই দোয়া চাওযা থেকে বাদ পড়তো না। সব সময় মনে মনে আশা পোষণ করতাম আমার ছেলেরা যেমন তেমন হলে চলবে না। আল্লাহ তাদেরকে সম্মানী ইজ্জত ওয়ালা নেককার বানান। ছেলে মেয়ে দিয়ে যেন দুনিয়া আখিরাতে আল্লাহ বেইজ্জতি না করেন। আল্লাহ যেন ওদের বীর মুজাহিদ বানান ইসলাম কায়েমের জন্য। তার জন্য শিশুকাল থেকেই পরিবারে ইসলামী পরিবেশ তৈরি করেছিলাম। সাত বছরের জামাতে নামাজ আদায়। ভোরে কী শীত কী গরম টেনে বিছানা থেকে নামিয়ে ওজু করিয়ে মসজিদে এগিয়ে দিয়ে আসতাম অভ্যাসে পরিণত হওয়ার জন্য। যেহেতু সংঘবদ্ধ হওয়া ফরজ সেই জন্য ছাত্রশিবিরের আব্বুদের ডেকে ঘরে বৈঠকের ব্যবস্থা করি। এবং আমার দুই ছেলেকে তাদের হাতে তুলে দেই আল্লাহর নামে।

ছাত্রশিবিরের ছেলেদের মত এমন চরিত্রবান ছেলে অন্য কোন সংগঠনেই পাওয়া যাবে না। ওরা স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছেলেদের সব সময় নামাজ ও কুরআন অর্থসহ পড়া এবং আমল করার দাওয়াত দেয়। এদের সংস্পর্শে যারাই আসবে তারাই হয় সোনার মানুষ। এই নিস্পাপ ছেলেরা আল্লাহর কাজ করে বলে আল্লাহর ইসলামের দুশমনেরা ওদেরকে সহ্য করতে পারে না। এই বাংলাদেশের ইতিহাসে যুগে যুগে যত যুবকেরা এ কাজ করেছে তারাই মার খেয়েছে, রক্ত ঝরিয়েছে। শহীদ আবদুল মালেক থেকে শুরু করে মতিউর রহমান নিযামী (বর্তমান আমীরে জামায়াত), ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরসহ আরও অনেক ঈমানদারদেরকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। কাউকে ইটের উপরে মাথা রেখে পিটিয়ে মাথা চূর্ণ করেই ক্ষান্ত হয়নি হায়েনারা উপরন্তু তাকে জবাই করে শান্ত হয়েছে। তারাই বর্তমানে বিভিন্ন বড় বড় নেতা এম.পি. মন্ত্রী হয়ে বড় গলায় বক্তৃতা মারে আর মধুর সুখে দিনাতিপাত করছে। শহীদ মালেকের খুনিরা এখনও বেঁচে আছে এবং মন্ত্রীগিরি করে বেড়াচ্ছে। একদিন তাদেরকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। বিচারের ময়দানে সেই বিচারের দিনের অপেক্ষায় আছি। এই সরকার এত কিছু করল, বড় চোর ডাকাতের সরদারদের ধরল কিন্তু সবচেয়ে বড় অপরাধী শেখ হাসিনা যার হুকুমে আমার সন্তনসহ এতগুলা মানুষ খুন হল তার বিচার করল না। ফয়সালা আল্লাহর নিকট দিয়ে রেখেছি।

www.pathagar.com

জামায়াত শিবিরকে মারার কারণ হল তারা ইসলাম সহ্য করতে পারে না। এইভাবে জামায়াত শিবিরকে মেরে সাধারণ মানুষকে তারা ভয় দেখায় কেউ যেন জামায়াত শিবিরে যোগ না দেয়। এটাই তাদের দৃষ্টিতে সফলতা। এ্ই সফলতার মাধ্যমে জনগণের সামনে তাদের আসল চেহারা ধরা পড়ে যায়। আমি সব সময় মাহফিল শেষে আহবান করতাম সব মা বোনদের কে তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে সৎ মানুষ গড়ার লক্ষ্যে ইসলামী ছাত্রশিবিরে পাঠায়। আমি আমার সন্তানদেরকে শিক্ষা দিয়েছি আল্লাহর পথে চললে এ রকম বাধা আসবেই। এমনকি এই পথে মৃত্যুও আসতে পারে। ভয়ের কোন কারণ নেই। মৃত্যু হলে শহীদি মৃত্যু এর চেয়ে সৌভাগ্যের মৃত্যু আর কিছুতেই হতে পারে না। আমি জেনে শুনে এই পথে আমার ছেলেদেরকে দিয়ে দিয়েছি। হায়াতের মালিক আল্লাহ। যার মৃত্যু যেভোবে আল্লাহ স্থির করে রেখেছেন সেভাবে হবেই। তবে সবসময় দোয়া করতে হয়। আল্লাহর কাছে চাইতে হয়। না চাইলে আল্লাহ কখনো কাউকে দিবেন না। কেন জানি শুধু শাহাদাত সম্পর্কিত বইগুলো বেশি পড়তাম। আমার সন্তানদের সাথে সেই সম্পর্কে আলোচনা করতাম। মাসুমের আগে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের ঘটনাগুলো পড়তাম আর চোখের পানি ফেলতাম। তাদের মাদের কথা ভাবতাম ছেলে হারা মায়ের বুকে কত কষ্ট। সন্তানদের জন্য দোয়া করতাম। কিন্তু এভাবে কবুল হয়ে যাবে ভাবতেও পারিনি। আমার আকাঙ্খা ছিল সন্তানদেরকে ইসলামিক বানাবো। এই লক্ষ্যে এখনও কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু হোদয়েত আল্লাহর হাতে। শহীদ মাসুমের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছি না। প্রতিদিন ক্ষণে মাসুমকে মনে পড়ে যাবে, না দেখলে আমি পেরেশান হয়ে যেতাম সেই প্রিয় সন্তানটি ছাড়া আমার ৭টি বছর পার হতে চলল। সব সময় ওর স্মৃতিগুলো মনের কোণে এসে ভিড় করে আর চোখের পানিতে গাল ভেসে যায়। কষ্টে বুকের ভেতর কেমন যেন করে, প্রকাশ করতে পারি না শুধু আল্লাহকে ডাকি ও রাসূলের কথা স্মরণ করি।

"গোলাপ তুলতে গিয়ে কাঁটার আঘাত সয়ে
তোমাকে শুধু আমি স্মরেছি
ওগো নবীজী তোমার সুরভি নিতে
এসেছিল যারা ছুটে তাদের মত কি মোরা হয়েছি
তাদের মত কি মোরা হয়েছি
আঘাতে আঘাতে যারা দিয়েছিল জান প্রাণ
ব্যথা ভরা বুকে যারা গেয়েছে তোমার গান
সেই সাহসী মরণজয়ী আমরা কি আজো হতে পেরেছি
আমরা কি আজো হতে পেরেছি।"

সত্যি ব্যথা ভরা বুকে শুধু আল্লাহ ও রাসূলের গান গাওয়ারই চেষ্টা করছি। যখন ভাবি আমার সন্তানের জন্য আমার মায়া মহব্বত ১ গুণ আর আল্লাহর মহব্বত নিরানব্বই গুণ। যে পথে মাসুম জীবন দিয়েছিল এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির একমাত্র পথ। এ কাজের জন্যই আল্লাহ পাক আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যুগে যুগে নরী রাসূলরা এ কাজের জন্য মার খেয়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও এই কাজের জন্য রক্ত ঝরিয়েছেন এবং শাহাদাত কামনা করেছেন।

www.pathagar.com

আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান এটাই মানব জাতির প্রথম ও প্রধান কাজ বা দায়িত্ব। এই কাজ করতে গিয়েই মাসুম তার জীবন দিয়েছিল। এই চিন্তায় চোখের পানি মুছে ফেলি আর ভাবতে থাকি আল্লাহ পাক আমার কাছে আমানত হিসাবে সন্তানকে দিয়েছেন। আমি আল্লাহর আমানতের খেয়ানত না করে আল্লাহর পথে চলতে শিক্ষা দিয়েছি। শহীদ মাসুম শিশুকাল থেকে শুরু করে তরুণ বয়স পর্যন্ত কখনো খোদা বিরোধী কাজ করে নাই। যেটুকু জীবন বেঁচে ছিল তা মায়ের কড়া শাসনের মধ্য দিয়ে ও শিবিরের সংগঠনের পাহারায় বড় হয়েছে যার কারণে বিভ্রান্ত হওয়ার কোন সুযোগ পায় নাই। শহীদ মাসুম ছিল নির্মল চরিত্রের অধিকারী, মানুষের সাহায্য সহযোগিতায় সে ছিল অগ্রগামী। গরিব ছাত্রদেরকে বিলিয়ে দিত। তাদের দুই ভাইয়েরই এ অভ্যাস ছিল। নতুন বই কিনে পড়াতাম আর পড়া শেষে সেগুলো বিলিয়ে দেয়া এটাই ছিল কাজ। কখনো বই বিক্রয় করেনি। কিন্তু কখনো কারো থেকে চেয়ে এনে পড়া এই অভ্যাস ছিল না। আল্লাহর দীনের পথে ভিড়ানোর জন্য বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্র পড়াতো নিজের প্রিয় জিনিসগুলো পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করত না। পাড়ার দুষ্ট ছেলেদেরকে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে প্রোগ্রামে নিয়ে যেত। এলাকার ছোট বড় সবাই মাসুমকে খুব ভালবাসতো। এলাকার মায়েরা ঘরে ঘরে এখনো কাঁদেন মাসুমের জন্য। তারা বলে তাদের ছেলেদের নামাজের জন্য মসজিদে কে ডেকে নিয়ে যাবে? শহীদ মাসুম দাওয়াতের কাজে ছিল সদা তৎপর এক তরুণ। তার বিএএফ শাহীন কাজে সে শিবির সম্পর্কে ভাল ধারণা দিয়েছিল তার সহপাঠীদেরকে। শহীদ মাসুম ভাল একজন ক্রিকেটার ছিল। ক্রিকেট খেলার মাধ্যমেও মাসুম সুন্দর গান গাইতে পারত। সুন্দর কবিতা লিখতো। মাসুম খুব সুন্দরভাবে কুরআন তেলাওয়াত করত। কখনো তাড়াহুড়া করে কোরআন পড়ত না সে তাজবিদের সাথে তারতিলের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করত। মাসুম ছিল একজন সমাজ দরদি তরুণ। কারো অসুখের কথা শুনলে ছুটে যেত সেবার উদ্দেশ্যে। হাসপাতালে রাত কাটাতো রোগীর পাশে। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি এমন সন্তানের মা আল্লাহ পাক আমাকে বানিয়েছেন। কুরআনের এই আয়াত সব সময় স্মরণ করি। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বল না, তারা জীবিত। তাদেরকে আমার (আল্লাহর) পক্ষ থেকে রিজিক দেওয়া হয়। তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। আল কোরআন এদেরকে বলা হয় শহীদ। এরা একজনে ৭০ জনকে বেহেশতের জন্য সুপারিশ দিয়ে দিবেন। সোবহানাল্লাহ্‌ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির এমন আল্লাহর প্রিয় যোগ্য লোক তৈরির একটি কারখানা। এই ছাত্রশিবিরে যোগদানের কারণে তাদের যত্নে আল্লাহর রহমতে সম্ভব হয়েছে এই সফলতা। আমি দোয়া করি সারা বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে আল্লাহ পাক যেন ছাত্রশিবিরে যোগদান করিয়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আল্লাহর অগ্নিপরীক্ষা চলছে ঈমানদারদের ওপর। যারাই কোরআনের কথা বলবে, কোরআনের দাওয়াত দিবে তাদেরকে টার্গেট করে বর্তমান ফ্যাসিবাদী আওয়ামী কমিউনিস্ট সরকার তাদের পুলিশ নামক সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে ঈমানদারদেরকে নির্যাতন করছে। তাদের ধরে নিয়ে আইনের আওতায় না এনে তাদেরকে মেরে ফেলছে, গুম করছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় আলেম ও নেতাদেরকে ধরে মিথ্যা বানোয়াট মামলা দিয়ে রিমান্ডের নামে

www.pathagar.com

নির্যাতন চালাচ্ছে। তাদের টার্গেট হল আমাদের দলকে নেতৃত্বশূন্য করে দেয়া। আমাদের নেতা কর্মীদের ধ্বংস করে দিয়ে আমাদের আল্লাহর কাজ থেকে বিরত রাখা।

আসলে তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ আজ প্রায় ৪ বছর ধরে আমাদের নেতাদেরকে বন্দী করে প্রহসনের নাটক করছে কিন্তু আমাদের দ্বীনের কাফেলার কাজ বন্ধ করতে পারছে না পারবেও না। যতই ফাঁসির রায় দিক না কেন? কার্যকর করার মালিক আল্লাহ। আল্লাহ সৎলোকদের সাথেই থাকেন, থাকবেন চিরকাল। আল্লাহ আমাদের হায়াতের মালিক। যদি আল্লাহ শাহাদাত নসিব করেন তাহলে হযতো বা হায়েনাদের হাতে আমাদের নেতারা জীবন দিবেন। এতে দুঃখ নেই আফসোস নেই লজ্জারও কোন কারণ নাই। কারণ যুগে যুগে যত নবী রাসূল দুনিয়ায় সত্যের দাওয়াত দিতে গেছেন অমনি তাদের ওপর চড়াও হয়েছে কায়েমি শাসকগোষ্ঠী তাদের হাতে ক্ষমতা থাকার কারণে তারা যা ইচ্ছা তাই করছে। তাদেরও একটুও ভাবা উচিত যে মহাপ্রতাপশালী ফেরাউন, সাদ্দাদ, নমরুদ, হিটলার ইরানের রেজা শাহ পাহলবী আজ কোথায়? তাদের দুর্দান্ত প্রতাপে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হত। কত মানুষ তারা মেরেছে তথাকথিত প্রভু হয়ে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাকে বলতে চাই, বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হল রাজনীতি করা। প্রত্যেক দল তার আদর্শ দিয়ে জন সাধারণের মন জয় করবে। জনগণ চাইলে তাদেরকে ভোটযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী করবে এটাইতো একটা দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার। আর তা না করে বিরোধী দলের লোকজনকে গুলি করে মেরে সে ক্ষমতায় থাকতে চায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি একবারের জন্য তার বাবার দাদার কথা ভেবেছেন, তারা আজ কোথায়? সবাই চলে গেছেন পরপারে। প্রত্যেকের কৃতকর্মের জবাব তারা দিচ্ছেন কবরে। আওয়ামী লীগ নেত্রীকেও সেই পথ ধরে যেতে হবে। তার হুকুমে আমার ছেলেদের খুন করা হল এই বিচার আল্লাহ পাক দুনিয়াতেও করবেন ইনশাআল্লাহ। আওয়ামী দুঃশাসনে গোটা দেশ আজ বিপর্যস্ত। দেশবাসী তাদের অপশাসন থেকে মুক্তি চায়। দেশবাসীর ঈমান রক্ষার্থে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে জামায়াত শিবির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আজ জামায়াত-শিবির নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রবর্তীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। তাই দেশবাসীদের কাছে আমার আহবান আসুন সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে জামায়াত-শিবিরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশরক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি। দেশকে ভালবাসা ঈমানের অংগ। আমাদের প্রিয় নবী জন্মভূমিকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তাই তিনি জীবন দিয়ে দেশে সুশাসন কায়েম করে গেছেন। সেই সুন্নাত পালন ছাড়া নবীর শাফায়াত ও আল্লাহর রহমত পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। সবাই মিলে শিপন মাসুম, জসিম, ফয়সাল রফিক, মুকাদ্দাস, মাসুদ ওয়ালি উল্লাহ, রমজানদের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করার জন্য এগিয়ে আসি। তাহলেই মাসুম শিপন মুজাহিদদের আত্মদান হবে সার্থক এবং বাংলার এই আকাশের ইসলামের পতাকা উড্ডীন ত্বরান্বিত হবে। আওয়ামী হায়েনাদের কালো থাবাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সত্যিকার সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যাশায় তরুণরা এগিয়ে যাবে দৃঢ় পদক্ষেপে। এই প্রত্যাশায় তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে বাংলার নির্যাতিত মানুষ। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কবুল করুন।

লেখক: শহীদ মাসুমের আম্মা

www.pathagar.com

ঢাকা মহানগরীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা ঢাকা মহানগরী পূর্ব উপলক্ষে স্মারক প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে খুশি হলাম। ইসলামী আন্দোলনের চিরাচরিত জরাজীর্ণ ও বন্ধুর পথ অতিক্রমের পাশাপাশি গঠনমূলক কাজগুলোর ধারাবাহিকতা আমাদেরকে যেমন আশান্বিত করে তেমনি অনাগত প্রজন্মের জন্য রেখে যায় একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা, আমাদের দেখা এই শহীদি কাফেলার বর্তমান সময়টা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং যদিও এই আন্দোলন আরো কঠিন পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছে। যে আন্দোলনের প্রতিটি কর্মী এই রক্তপিচ্ছিল পথকে অতিক্রম করার সাহস রাখে এক হাজার পূর্ণ লোনা দরিয়া সাঁতরিয়ে ইসলামের বিজয় বেতন উঠানোর প্রত্যয় নিয়ে হারিয়ে যায়। শহীদি মৃত্যু যাদের তৃষ্ণার্ত আত্মার পানি পান করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় জাগতিক ভোগ বিলাস ও স্বার্থকে পদদলিত করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দৃঢ় পদে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। দুনিয়ার কোন শক্তি তাদেরকে পরাভূত করতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ, বাতিলের আঘাত নির্যাতন গ্রেফতার, শাহাদাতের মাধ্যমে কেবল বহু আন্দোলনের বিজয়ের পথকে দীর্ঘায়িত করতে পারে কিন্তু চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। আমি সাধুবাদ জানাই তাদের স্মারক প্রকাশের উদ্দেশ্যকে রাজধানীর রাজধানী হিসাবে পরিচিত এই গুরুত্বপূর্ণ শাখা ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৯ সালের জুলাই পর্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই শাখার প্রত্যেকটি থানা এবং ওয়ার্ডে রয়েছে যথেষ্ট সম্ভাবনা। এই শাখার মাটিতে শুয়ে আছেন ইতিহাসের কালো অধ্যায় ২৮ অক্টোবর ২০০৬ সালের পল্টন ট্রাজেডির শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন এবং সাইফুল্লাহ মো: মাসুম, এই শাখার পিচ ঢালা কালো পথগুলো বিভিন্ন সময়ে আমাদের ভাইদের রক্তে সব চাইতে বেশি রঞ্জিত হয়েছে। এখানে সব চাইতে বেশি পদচারণা আন্দোলনের দায়ীত্বশীলদের। তাই আমি আশা করবো ঢাকা মহানগরীর পূর্ব শাখার প্রত্যেকটি জনশক্তি এই উপলব্ধিটুকু মাথায় রেখে আন্দোলনের কাজকে আরো বেশি পোষণ করবেন। সময় যত অতিবাহিত হচ্ছে, দীর্ঘ হচ্ছে আমাদের শাহাদাতের সিঁড়ি, আমরা জানি না দ্বীন কায়েমের জন্য এই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে আর কত শহীদি খুনের প্রয়োজন। গত ১২ ডিসেম্বর' ১৩ আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রিয় নেতা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ভাইকে, আল্লাহ উনাকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ভাইয়ের শাহাদাতের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করুক আগামী দিনের ইসলামী বিপ্লবের প্রত্যেকটি কর্মীর রক্তকণিকা, সেই আলোয় আলোকিত হবে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সোবহানাহু তা'য়ালা আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন আমিন।

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

www.pathagar.com

স্মৃতিতে আরিফ মঈনুদ্দীন

যখন একজন মানুষ মৃত্যুকে বরণ করে তখন বই এর একটি অধ্যায় ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হয় না বরং সে অধ্যায়টি তুলনামূলকভাবে উত্তম ভাষায় অনুবাদ করা হয়।
-ইংরেজ কবি Jhon Donne

মৃত্যু কোন শুরুর শেষ নয় বরং তা হচ্ছে এক অন্তিম যাত্রার সূচনা মাত্র
-সাইয়েদ কুতুব আরিফ মঈনুদ্দিন!

২০০০ ইং সালের শেষ দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাহাড়ী ক্যাম্পাসের কোন এক চায়ের স্টলে প্রথম পরিচয়। যতটুকু মনে পড়ে আরিফ ভাইয়ের সাথে আব্বাস ভাইয়ের মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল। আব্বাস ভাই অর্থনীতি বিভাগে আর আরিফ ভাই ব্যবস্থাপনা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। শহিদী কাফেলার একই পথের সহযাত্রী হওয়ায় অল্পসময়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটি আন্তরিক সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল যা তার চিরবিদায়ের আগ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। কখনও ভাবিনি তার অনুপস্থিতিতে তারই স্মৃতিচারণ করতে হবে আমাকে। আহমদ শিহাব উল্যাহ ভাই ফোন দিয়ে অনুরোধ করলেন ঢাকা মহানগরী পূর্ব এর একটি প্রকাশনার জন্য আরিফ ভাইকে নিয়ে কিছু লিখতে হবে, মহানগরী থেকেও ফোন করলেন কিছু লিখার জন্য। অগত্যা কাগজ কলম নিয়ে বসা। সদা হাস্যোজ্জল, প্রাণবন্ত ও সকলের সাথে মেশার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী আরিফ মঈনুদ্দিন ভাইয়ের সবাইকে ছেড়ে চলে যাওয়া এখনও তার চেনা জগতের কাছে শুধুই আশ্চর্যের! আর এই বলে মেনে নেয়া, পবিত্র কুরআনের ভাষায়-"প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে" অথবা "আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেহ মৃত্যু বরণ করতে পারেনা, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে।"

শহিদী কাফেলার এক কঠিন সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরিফ মঈনুদ্দিন ভাই ভর্তি হয়েছিলেন। প্রথম বর্ষ থেকেই প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তার সরব উপস্থিতি ছিল। অল্প

www.pathagar.com

সময়ে সকলের কাছে আরিফ ভাই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সব সময় নিজের মান উন্নয়ন ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। ২০০০ইং থেকে ২০০৫ইং পর্যন্ত এই পাঁচটি বছর চবি ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সুবাদে একসাথে অনেক স্মৃতি জড়ো হয়েছিল। তারপর আমি মহানগরীতে আসার পর প্রায়ই যোগাযোগ হতো। কখনও ছদ্মনামে ফোন করতেন আর আমিও না বুঝার ভান করে কথা বলতাম, তখন তিনি খুব মজা পেতেন। অকৃত্রিম ভালবাসার বন্ধনে অনেককেই জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তা কি সংগঠনের অথবা বাইরের। অন্য সংগঠনের ছাত্ররা ও তার প্রশংসা করতো। আমি অনেক সাধারণ ছাত্রকে বলতে শুনেছি আরিফ ভাই নেই! এটা মেনে নেয়া কঠিন।

মহেশখালী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৮ইং সালে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি পাশ করেন। ২০০০ ইং সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এইচ.এস. সি পাশ করেন। এরপর ২০০০-২০০১ ইং সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগে ভর্তি হন এবং বি.বি.এ ও এম.বি.এ কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। এরপর আই.আই.ইউ.সি থেকে এল.এল.বি পাশ করেন এবং একই ইউনিভার্সিটিতে এল.এল.এম অধ্যয়ন করছিলেন।

সাংগঠনিক জীবনে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ ইং সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারী মনোনীত হন। ২০০৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ বিভাগে সহকারী প্রশিক্ষণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২০০৯ সালের শেষ ছয় মাসের জন্য ঢাকা মহানগরী পূর্বের সভাপতি ও কার্যকরী পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১০ ইং সালের শুরুতে ছাত্রজীবন শেষ করেন। ২০১০ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একটি শিপিং কনসালটেন্সি ফার্মে চাকুরী করছিলেন।

শুনেছি যিনি মৃত্যু বরণ করেন মৃত্যুর পূর্বে তিনি কোন না কোন ভাবে অবগত হয়ে যান অথবা তার আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। হয়তোবা আরিফ মঈনুদ্দিন ভাই নিম্নের লিখাতে তাই বুঝাতে চেয়েছিলেন। ফেইস বুকের সাহায্যে এই লিখাটি পেয়েছিলাম-

ফয়সলের ডায়রীতে লিখা আরিফ ভাইয়ের কথাগুলো সত্যি হয়ে যাবে ভাবতেই অবাক লাগছে। বিদায় বলার কোন সুযোগ না দিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে, পৃথিবীর মায়ামমতার উর্দ্ধে ।

নিজে হাসি খুশি থাকতেন আর আনন্দ গুলো সবার সাথে ভাগাভাগি করে নিতেন। আর নিজের কষ্টগুলো শুধু নিজের মধ্যে চেপে রাখতেন, অভিমানও করতেন কিন্তু কখনও বুঝা যেতনা। অথচ পরিবারের বড় সন্তান, ভাই বোনদের দায়িত্ব আর তার উপর বাবার নির্ভরতা। ০৪ জুলাই' ২০১৩ইং চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেইন যোগে রওয়ানা হয়েছিলাম, ব্রাক্ষনবাড়ীয়া অতিক্রম করছি এমন সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি ইমরুল হাসান এর একটি মেসেজ পেলাম যে, আরিফ মাঈনুদ্দিন ভাই আর নেই। ভাবতেই গা শিউরে উঠল, নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারলামনা! তাই নিশ্চিত হওয়ার জন্য ফোন করলাম জাকির ভাইকে। তিনিও একই সংবাদের কথা জানালেন। তারপর একে একে ফোন আসতে লাগল কিভাবে, কখন, কি হয়েছিল এ জাতীয় প্রশ্ন আবার অনেকের কান্নাজড়িত কন্ঠ। ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমাচ্ছিলেন, সে ঘুম আর ভাঙ্গেনি মহান আল্লাহর মেহমান হয়ে তারই দরবারে চলে গেলেন জান্নাতের পরম সুখের উদ্দেশ্যে। অফিসে যাবার জন্য আরিফ ভাইয়ের আম্মা আরিফ ভাইকে ঘুম থেকে ডাকতে গিয়েছিলেন কিন্তু দেখলেন তার বড় নির্ভরতা ও প্রিয় সন্তান আরিফ চির

www.pathagar.com

নিদ্রায় শায়িত। মায়ের হাতে তৈরী নাস্তা আর অফিসে খাবার জন্য দুপুরের খাবার খাওয়া হলো না।

মানুষ মাত্রেই ভুল ত্রুটির উর্দ্ধে কেউ নন। আরিফ ভাইও ভুল ত্রুটির উর্দ্ধে কেউ ছিলেন না। ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় হয়ে যাওয়া ভুল ত্রুটির জন্য সকল বন্ধু ও শুভাকাংখী ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এই প্রত্যাশা করছি।

কারো মতে মৃত্যু কোন বইয়ের উত্তম ভাষায় অনুবাদ হোক আর কারো মতে মৃত্যু অন্তিম যাত্রার সূচনা হোক; মৃত্যু এক অনিবার্য এবং নির্ধারিত বিষয়। অনেক প্রিয়জনের মৃত্যু আর শাহাদাতের লম্বা মিছিলের মাঝে আরিফ ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পার্থিব ও পরকালীন কঠিন বাস্তবতার জানান দিয়ে গেল। ভালবাসার বন্ধন ছিড়ে পৃথিবীর মায়ামমতা ত্যাগ করে আরিফ ভাইয়ের চলে যাওয়া আমাদের মাঝে পরকালীন পাথেয় সংগ্রহ করার তীব্র আকাংখা তৈরী করবে। আরিফ মাঈনুদ্দীন! নৈশব্দের ভাঙ্গন অথবা প্রচুর আওয়াজের মধ্যে চুপ হয়ে যাওয়া নীরবতা; যে শুধু বেঁচে থাকবে তার কর্মে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরিফ মঈনুদ্দীন ভাইকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন!

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক

www.pathagar.com

শহীদ স্মরণে

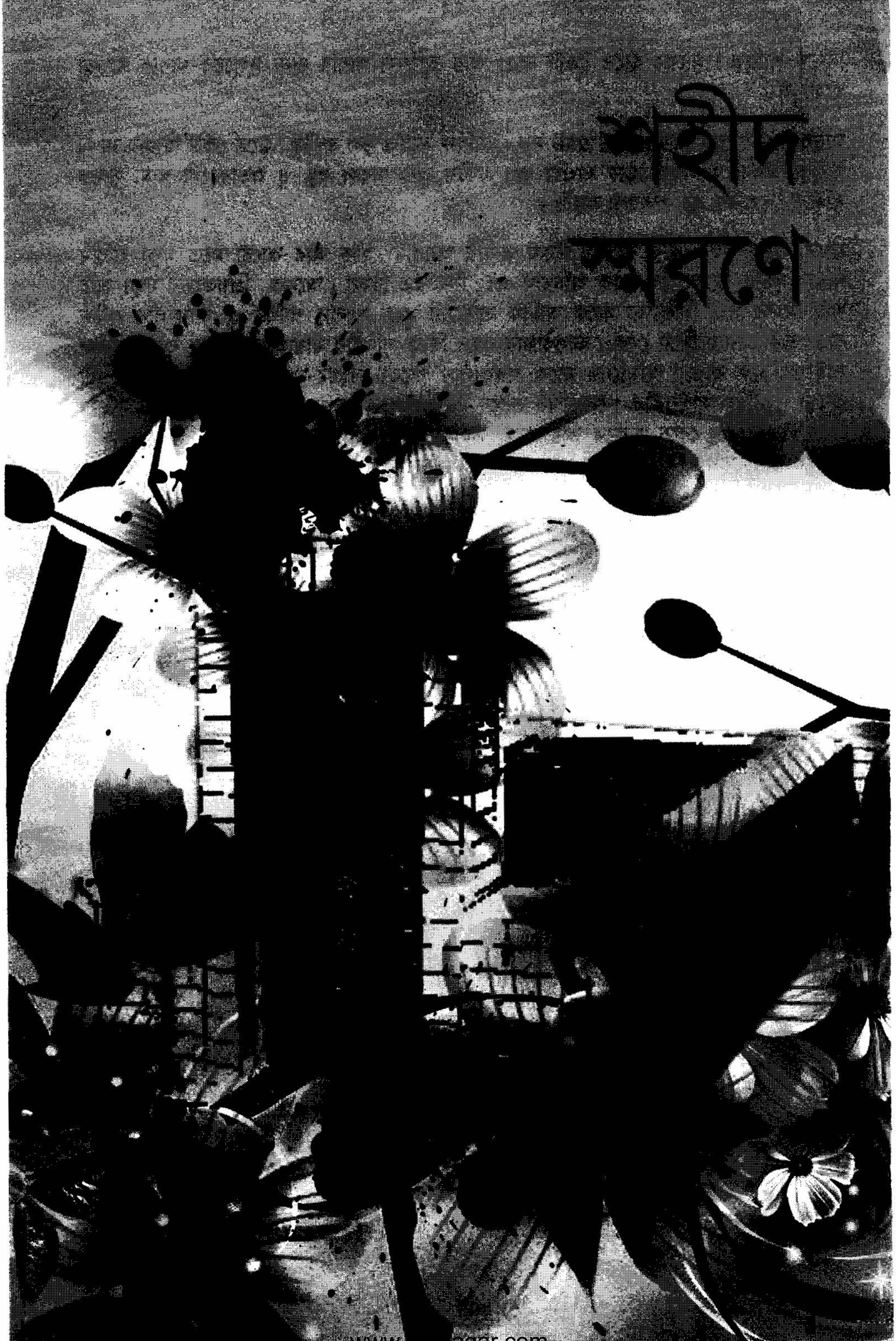

www.   agar.com

প্রিয় ভাই মরহুম আমজাদ হোসাইন

এনামুল হক নাঈম

মরহুম আমজাদ হোসাইন আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাওয়া একটি নাম। একটি প্রতিভা। সৌরভ ছড়ানোর সূচনাতে ঝরে পড়া একটি গোলাপ। মৃত্যু প্রত্যেকটি জীবনেরই অনিবার্য বাস্তবতা। কিছু মৃত্যু প্রত্যাশিত না হলেও স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া যায়, যাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে। কিন্তু হঠাৎ করে কোন রোগে বা এক্সিডেন্টের শিকার হয়ে চলে যাওয়াটাকে কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। আর তা যদি হয় একজন উদীয়মান যুবক, নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন একজন দায়িত্বশীল, বৃদ্ধ পিতা-মাতার আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থল, ছোট ভাই-বোনদের ভরসার কেন্দ্র। তাহলে সেই মৃত্যু যে কত বেশি বেদনাদায়ক, হৃদয়বিদারক এবং তার সাথে সংশ্লিষ্টদের যে কিভাবে বিস্ময়বিমূঢ় করে তোলে তার বিবরণ কোন শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র, আলিয়া মাদরাসার সাবেক সভাপতি, রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র সদ্যগঠিত পল্টন থানার সভাপতি ও মহানগরী পরামর্শসভার একজন সদস্য যদি এভাবে এক্সিডেন্টের কবলে পড়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে যান তা যে কতবড় ক্ষতি তা সহজেই অনুমেয়। এ রকম বিষয়গুলোতে ভুক্তভোগী আত্মীয় স্বজনেরাই বেশি সাফার করেন। যার ক্ষয়ক্ষতি কোন জরিমানার অর্থ, কেস মামলার শাস্তি দিয়ে পোষানো যায় না।

একজন মানুষ যে কোনভাবে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তার চূড়ান্ত জীবনের সূচনা হয়। নিজের ব্যক্তিগত আমল বন্ধ হয়ে যায়। বিগত কর্মের ফল পাওয়া শুরু হয়। শুধুমাত্র সদকায়ে জারিয়ার মারফত ব্যক্তির তহবিলে নেকি জমা হতে পারে। সদকায়ে জারিয়ার অনেক খাতের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন করা অনেক বড় একটি সদকায়ে জারিয়ার কাজ। তাই ইসলামী আন্দোলনের পরিবারভুক্ত প্রত্যেকটি সদস্যই সৌভাগ্যবান। আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়ে দ্বীনি সম্পর্ক অনেক বেশি মজবুত এবং উপকারী। পরপারে চলে যাওয়া একজন মানুষের জন্য বেঁচে থাকা মানুষগুলোর যা করার আছে তার মধ্যে মরহুমের জন্য সবচেয়ে দরকারি বিষয় হলো দোয়া। কারো জন্য দোয়া তখনই আসে যখন তাঁর সম্পর্কে জানা থাকে। আমাদের শহীদদের ডাটা সংরক্ষণের একটি সুন্দর পদ্ধতি থাকার কারণে শহীদদের জন্য দোয়া, শহীদ পরিবারের খোঁজখবর নেয়ার একটি কাঠামোগত সিস্টেমে দাঁড়িয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমাদের কিছু সাংগঠনিক ভাবে স্বীকৃতি দিতে না পারা শহীদ ভাইদের খোঁজখবর বাস্তব কারণেই সেভাবে নেয়া যায় না। আমজাদ ভাইয়ের চলে যাওয়ার পর অনেকবারই চেয়েছিলাম আমার এই প্রিয় ভাইটির সাথের স্মৃতিগুলো লিখবো। কিন্তু সে রকম কোন উপলক্ষ না পাওয়ার কারণে তা হয়ে ওঠেনি। সংগঠনে থাকতে ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার ভাইদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলাম মরহুম আমজাদ ভাইসহ শহীদ আব্দুল খালেক, শহীদ আব্দুল খালেক হামীদ, ২৮ অক্টোবরের শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন ও সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম ভাইদের নিয়ে স্মারক করার জন্য। এবার সে রকম একটি স্মারক হচ্ছে বলে জানালেন ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার সম্মানিত সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা ভাই। অবিভক্ত ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ শাখা শহীদ আব্দুল খালেক ভাই, শহীদ আব্দুল খালেক হামীদ, শহীদ সাইজুদ্দিন,

www.pathagar.com

শহীদ আতিকুল ইসলাম দুলাল ভাইদের নিয়ে রক্তে ধুয়ে আসে মুক্তি নামে এবং ২৮ অক্টোবরের শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন ও সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম ভাইকে নিয়ে একটি বুকলেট করলেও মরহুম আমজাদ ভাই, শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন ও সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম ভাইকে নিয়ে বিস্তারিত স্মারকের ব্যাপক চাহিদা ছিল। এবার সে চাহিদা পূরণ হতে চলেছে তাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ।

আমজাদ ভাইয়ের সাথে যেভাবে পরিচয় : যতদূর মনে পড়ে ২০০৩ সালে আমি আলিয়া মাদরাসার সেক্রেটারি থাকা অবস্থায় আমজাদ ভাইয়ের সাথে মাদরাসা ক্যাম্পাসে প্রথম দেখা হয়। তিনি তখন ফাজিলের ছাত্র এবং সংগঠনের সদস্য, সেনানিবাস থানার জনশক্তি। এর পর থেকেই নিয়মিত ক্যাম্পাসে আসা যাওয়ার সময় প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হতো। ২০০৪ সালে আমার ওপর ঢাকা আলিয়া মাদরাসা শাখার সভাপতির দায়িত্ব আসে। সেক্রেটারি মনোনীত হন হাবিব বিন আনওয়ার ভাই। হাবিব ভাই আমার এক ব্যাচ সিনিয়র হওয়ার কারণে মাদরাসা সেক্রেটরির জন্য আমার পরের ব্যাচের দায়িত্বশীল এ শাখায় না পাওয়ায় অধ্যয়নরতদের মধ্য থেকে খোঁজা হলো। অবশেষে ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেনানিবাস থানার তৎকালীন সেক্রেটারি আমজাদ ভাইকে স্থানান্তর করে আনার প্রস্তাবে দেই। প্রস্তাব শুনে মহানগরী সভাপতি হাফেজ মিজানুর রহমান ভাই বললেন আমজাদের বাড়িতো ভোলা জেলায়, সভাপতি সেক্রেটারি দু'জন এক জেলার হলে সমস্যা হবে নাতো?। মিজান ভাইকে প্রস্তাব দেয়ার আগে এই বিষয়টি আমার মাথায়ই ছিল না। পরে অবশ্য মহানগরী সভাপতিই বললেন যেহেতু আর কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না তো আর কী করা। মহানগরী উত্তরের সভাপতি আব্দুর রহমান ভাইয়ের সাথে কথা বলে একজন দায়িত্বশীল দেয়ার শর্তে আমজাদ ভাইকে আলিয়া মাদরাসার জনশক্তি হিসেবে পাওয়া গেল। এভাবেই সংগঠনের সিদ্ধান্তে আমজাদ ভাইয়ের সাথে একই ময়দানে কাজের সুযোগ হয়।

ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় দায়িত্বশীল হিসেবে : অন্য একটি ময়দান তথা আবাসিক এলাকা থেকে নিয়ে এসে একটি ক্যাম্পাস সংগঠনে সেক্রেটারি মনোনীত করতে হওয়ায় কিছুটা টেনশন কাজ করছিল। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ঢাকা আলিয়া মাদরাসার ময়দানকে স্বীয় মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে আয়ত্তে নিয়ে আসেন। মনে পড়ে সেক্রেটারি হিসেবে সেটআপ সাথী সমাবেশে তাঁর উপস্থিত হওয়ার পর সবার মধ্যে উৎসুক ভাব লক্ষ্য করা গেল। সেক্রেটারি হিসেবে নাম ঘোষণার পর কিছুটা কানা-ঘুষা হলেও পরবর্তী প্রোগ্রাম পরিচালনা ও সুন্দর বক্তৃতার ফলে সবাই খুব খুশি হলেন। সহজ সরল জীবন যাপন, অমায়িক ব্যবহার এবং সর্বাবস্থায় হাসিমাখা মুখখানি সবার হৃদয়ে স্থান করে নেয়। বক্তৃতা দেয়ার ক্ষেত্রে আমীরে জামায়াতের (মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী) স্টাইল ফলো করার চেষ্টা করতেন, বিশেষ করে আমীরে জামায়াত বক্তৃতার শুরু এবং শেষে যে কথা ও দোয়াগুলো বলতেন সেগুলো প্রায়ই বলতে পারতেন। আমার সাংগঠনিক জীবনে আমজাদ ভাইয়ের আগে ও পরে অনেক ভাইদেরকে সেক্রেটারি হিসেবে পেয়েছিলাম। এ সব ভাইয়ের মধ্যে আমজাদ ভাইয়ের সাথের সময়টি ছিল সবচেয়ে কম (তিনি আমার সাথে ছয় মাস সেক্রেটারি ছিলেন) কিন্তু খুব বেশি সহযোগিতামূলক এবং প্রেরণাদায়ক। সাধারণত সভাপতি সেক্রেটারির মধ্যে যে রকম সম্পর্ক থাকে আমজাদ ভাইকে দেখেছি তার ব্যতিক্রম। তিনি সবাইকে এত বেশি আপন মনে

www.pathagar.com

করতেন এবং সবার সাথে সরল মনে মিশতে পারতেন, তা ছিল রীতিমত অকল্পনীয়। আমি আর আমজাদ ভাই যখন কখনো একত্রে হাঁটতাম তিনি আমার হাত ধরতেন আঙুল ফুটাতেন, অন্যরা দেখে বুঝতেই পারতেন না যে আমরা দু'জন সভাপতি সেক্রেটারি। কৌশলগত কারণে মাদরাসার সভাপতির থাকার রুম ছিল ২৪৪ নম্বর রুম, সেক্রেটারির থাকার রুম ছিল ২৩৩ নম্বর রুম। আমজাদ ভাই একা কখনো বাইর থেকে রুমে আসার সময় আমার রুমে এসে দেখা করে নিজের রুমে যেতেন, আমার সাথে একত্রে কখোনো হলে এলে তিনি সরাসরি নিজের রুমে যেতেন না বরং আমাকে রুমে এগিয়ে দিয়ে তিনি রুমে যেতেন। ডাইনিংয়ে খেতে যাওয়ার সময় আমাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। ডাইনিংয়ে খাওয়ার ক্ষেত্রে নিজেই প্লেট-বাটি এনে খেতেন। নামাজের শুরু বা শেষে মসজিদের গেটে দাঁড়িয়ে সালাম বিনিময় করতে দেখা যেত। সংগঠনের বিভিন্ন বৈঠকগুলোতে সবসময় মৌলিক কথা বলতেন, নিজের মতামতের ক্ষেত্রে খুব কম কথায় গুছিয়ে বলতে পারতেন।

৪ এপ্রিল ২০০৫ এ বেঁচে গেলেও চলে গেলেন ১৩ মার্চ ২০০৬

৪ এপ্রিল ২০০৫ এ ছাত্রদলের নির্মমতা : দেশের দ্বীনি শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখানে ইসলামী আন্দোলনের মজবুত পদচারণা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানের সুযোগে সকল সরকারের কিছু সুযোগ সন্ধানীর হালুয়া রুটির লালসায় বার বার রক্তাক্ত হয়েছে সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া ঢাকা। ১৯৮৯ সালের ৭ ডিসেম্বর মধ্যযুগীয় বর্বরতায় মাদরাসা ক্যাম্পাসে আব্দুল খালেক ভাইকে নির্মমভাবে শহীদ করার পর সবচেয়ে পৈশাচিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ২০০৫ সালের ৪ এপ্রিল মধ্যরাতে। তখনকার ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের অন্যতম একটি শরিক জামায়াত এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মূল রূপকার ছাত্রশিবির হওয়া সত্ত্বেও সব লাজলজ্জার মাথা খেয়ে তৎকালীন আলিয়া মাদরাসার মিসকিন সংগঠন ছাত্রদলের ভুঁইফোঁড় নেতাদের ইন্ধনে পার্শ্ববর্তী থানা ও মহানগরী ছাত্রদল এবং তৎকালীন স্থানীয় এমপির প্রত্যক্ষ নির্দেশে রাতের অন্ধকারে মাদরাসার সাধারণ ছাত্র ও শিবিরের নিরপরাধ নেতাকর্মীদের ওপর লোমহর্ষক বর্বরতা চালানো হয়। রাত এগারটার দিকে মহানগরী সভাপতি ফোন করে নির্দেশ দিলেন দ্রুত আলিয়া মাদরাসার দিকে যাওয়ার জন্য। ঢাকা মেডিক্যালের গেট পর্যন্ত গিয়ে বুঝতে পারলাম কী পরিস্থিতি চলছে। ডা: ফজলে রাব্বি হলের গেট থেকে আলিয়া মাদরাসার গেট পর্যন্ত পুরো এলাকাজুড়ে রণ সাজে দাঙ্গা পুলিশ, নিয়মিত পুলিশ এবং সাথে অস্ত্রধারী সন্ত্রসীদের মহড়া চলছিল।

এ এলাকা দিয়ে যাওয়ার পথ না পেয়ে পলাশীর মোড় দিয়ে বোর্ড এলাকা হয়ে মাদরাসার ক্যাম্পাস এলাকায় গিয়ে দেখি আহত ভাইদেরকে বিভিন্নভাবে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে। আর একটু অগ্রসর হয়ে শুনতে পেলাম আমজাদ ভাই শহীদ হয়েছেন এবং ইয়াছিন আরাফাত, রায়হানসহ আরো অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনা ঘটিয়ে সন্ত্রাসীরা চলে গেলে মাদরাসা প্রশাসন আল্লামা কাশগরী হল বন্ধ ঘোষণা করে সিলগালা করে দেয়। ঐদিকে খবর আসলো আমজাদ ভাইসহ অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হলেও সবাই আশঙ্কামুক্ত। সেইসময় শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়লেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন প্রিয় আমজাদ ভাইকে, কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে আবার আন্দোলনের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দ্বীনের কাজে। কিন্তু একটি বছর না পেরুতেই ১৩ মার্চ ২০০৬ তারিখে চলে

www.pathagar.com

গেলেন আমাদেরকে ছেড়ে। আলিয়ার ঘটনার সময় আমজাদ ভাইয়ের গুম বা শহীদ হওয়ার খবরটি সঠিক না হলেও আবু সাঈদ খান ভাইয়ের সেই অবিশ্বাস্য সেই ফোনের খবরটি সত্যই হয়ে গেল!

আলিয়া মাদরাসার পর : আলিয়া মাদরাসা থেকে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয় রমনা থানায়। একই মহানগরীতে থাকায় সকল বৈঠকাদিতে দেখা সাক্ষাৎ ছিল স্বাভাবিক। ২০০৫ সালের মে মাসে আমাকে স্থানান্তর করা হয় মহানগরী দক্ষিণের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। জগন্নাথের ছাত্র হওয়ায় তখনকার অন্যান্য সকল অধ্যয়নরত সদস্য সাথীদের মত আমজাদ ভাইও নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যেতেন এবং অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা রাখতেন। সংগঠনের সিদ্ধান্তের কারণে একাধিকবার ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সন্ত্রাসের মুখে পড়েছেন। আলিয়ায় এক বছর দায়িত্ব পালন শেষে নবগঠিত পল্টন থানায় সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয় আমজাদ ভাইকে। নতুন থানায় কম সময়ের মধ্যে কাজগুলো গুছিয়ে আনেন। থানার জন্য একটি মোটরসাইকেলও ক্রয় করেন। ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক আনন্দের কথাগুলো প্রায়ই আমার সাথে শেয়ার করতেন। দুর্ঘটনার তিন-চার দিন আগে অনেক পীড়াপীড়ি করে আমাকে তাঁর পল্টন থানা মেসে দাওয়াত দিয়েছিলেন, দুপুরে খাওয়ার সময় থানার অবস্থা বর্ণনা করে বললেন থানার জন্য একটা মোটরসাইকেল কেনার চেষ্টা চলছে। দুর্ঘটনার আগের দিনই সম্ভবত গাড়িটি কিনেছিলেন। কিন্তু আমার সাথে দেখা করতে আসার কথা যখন জানালেন তখনও বলেননি তিনি নতুন মোটরসাইকেল কিনেছেন এবং সেই গাড়িটি নিয়েই আসছেন। পরে যতদূর জানতে পেরেছি মোটরসাইকেল ড্রাইভ করে জিপিও মোড় ক্রস করে গুলিস্তানের দিকে আসার সময় ডানদিক থেকে সচিবালয় রোড দিয়ে আবাবিল পরিবহনের একটি গাড়ি রাস্তার মাঝখানে আমজাদ ভাইকে চাপা দেয়। গাড়ির সামনে মোটরসাইকেলের উপরে থাকা অবস্থায় তিনি গাড়ির গ্লাস পরিষ্কারের ব্রাশের গোড়া ধরে বাঁচার চেষ্টা করলেও বেপরোয়া ড্রাইভার গাড়ি ব্রেক করেনি বরং মোটরসাইকেলসহ বাসটি আমজাদ ভাইকে হেঁচড়িয়ে জুয়েলার্স রোডের মাথা পর্যন্ত নিয়ে যায়। রাস্তায় পড়ে থাকা আমজাদ ভাইয়ের নিথর দেহটি পুলিশ ঢাকা মেডিক্যালে পাঠায়।

দুর্ঘটনার দিন: ১৩ মার্চ ২০০৬ তারিখ সোমবার সকাল ৯টা সাড়ে ৯টার দিকে আমজাদ ভাই ফোন করলেন ভাই বাসায় আছেন কি না? বললাম হ্যাঁ আছি। তিনি বললেন আমি আসছি, বললাম আসেন। ফোনের পর থেকে ১১ প্যারিদাস রোডের বাসায় (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন থানা মেস ও বাসা) অপেক্ষা করছি আমজাদ ভাইয়ের জন্য। ঘণ্টা পেরিয়ে যেতে যেতে বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি এবং ফোন করবো করবো ভাবছি, কেননা পল্টন থেকে বাংলাবাজার যেতে সর্বোচ্চ আধঘণ্টা লাগার কথা কিন্তু ততক্ষণে সোয়া এক থেকে দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এমন সময় ফোন করলেন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের তৎকালীন সেক্রেটারি আবু সাঈদ খান ভাই, বললেন, আমজাদ ভাই মারা গেছেন শুনছেন? কী বলেন? আমিতো ওনার জন্য অপেক্ষা করছি! ওনি ফোন করে বললেন আমার সাথে দেখা করতে আসছেন!! কিন্তু কোথায় কিভাবে মারা গেলেন!!! সাঈদ খান ভাই বললেন, শুনছি মোটরসাইকেল এক্সিডেন্ট। বিস্তারিত জানি না, লাশ ঢাকা মেডিক্যালে আছে সে দিকে আসেন। সাঈদ খান ভাইয়ের ফোন শেষে বুঝতে পারছিলাম না যে কী শুনলাম! এটাই কি সত্য? খবরটা কি

www.pathagar.com

সঠিক? কয়েক মিনিট ধরে নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না, বুঝতে পারছিলাম না কী হয়ে গেল! আমিই বা এখন কী করবো। যে ভাইটি আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসছিলেন, আমি এখন তাঁর নিথর দেহখানি দেখার জন্য রওনা হলাম ঢাকা মেডিক্যালের মর্গের দিকে।

ঢাকা মেডিক্যালে গিয়ে দেখি আলিয়া মাদরাসা, পল্টন থানা, মহানগরী পূর্ব, মহানগরী দক্ষিণসহ ঢাকার অসংখ্য জনশক্তি-দায়িত্বশীল উপস্থিত। আমি সেখানে উপস্থিত হলে যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় তা আর ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমজাদ ভাইকে দেখার জন্য চেষ্টা করছি কিন্তু মেডিক্যালে পোস্টমর্টেমের প্রক্রিয়া প্রায় শুরু হয়ে গেছে বিধায় আর দেখতে দিচ্ছিল না। কিন্তু কোন ভাবে মনকে মানাতে পারছিলাম না যে ভাইটাকে কী অবস্থায় পাওয়া গেল তা দেখতে পারবো না? অবশেষে ঢাকা মেডিক্যালের দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় মেডিক্যালের ছাত্রদের জন্য লাশকাটার দৃশ্য দেখার যে ব্যবস্থা রয়েছে সে স্থান দিয়ে গাড়ির নিচে পিষ্ট হয়ে থেঁতলে যাওয়া প্রিয় আমজাদ ভাইয়ের লাশটি দেখে যেন কলিজার মধ্যে হু হু করে আগুন জ্বলে উঠেছিল।

জানাজা দাফন কাফন : মরহুম আমজাদ ভাইয়ের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় তাঁর প্রিয় ক্যাম্পাস সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়ার ক্যাম্পাসের ফটকে। ইমামতি করেন শহীদি কাফেলার কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ ভাই। জানাজার পূর্বে সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতির সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সবার মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী হুজুরের ইমামতিতে। ঢাকার সেনানিবাস এলাকায় তৃতীয় জানাজা শেষে দাফন করা হয় প্রিয় আমজাদ হোসাইন ভাইকে। এভাবেই নিভে গেল একটি উদীয়মান সম্ভাবনাময় জীবনের প্রদীপ। একজন দ্বীনি ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য রওনা হয়ে মালিকের সাথে সাক্ষাতে চলে গেলেন!। এভাবে আমাদের প্রত্যেককেই যেতে হবো সেই পথে, কিন্তু সে যাওয়া কার কী রকম হবে তা কেউই বলতে পারি না। সেই চলে যাওয়ার স্থানটি কোথায় বা সময়টিই বা কখন তা জানারও সাধ্য নেই কারো। পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের সেই আকুতি মনে পড়ে "মসজিদ হতে আজান আসিতেছে বড় সুকরুণ সুর, মোর জীবনের রোজ কিয়ামত ভাবিতেছি কত দূর।"

পরিশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে করজোড়ে প্রার্থনা করি তিনি যেন প্রিয় আমজাদ ভাইকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন। তার পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দেন এবং সবাইকে ইসলামী আন্দোলনের সঠিক বুঝ দান করেন। আমরা যারা জীবিত আছি তারা যেন আল্লাহর খাঁটি বান্দা হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারি, আর শামিল হতে পারি মহান মালিকের সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত বান্দাদের সারিতে। আমিন

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

শহীদ ঈদগাহ সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া ঢাকা

মাদরাসা জগতের সূতিকাগার সরকারি মাদরাসা ই আলিয়া ঢাকা। ১৭৮০ সালের এর প্রতিষ্ঠা। কলকাতা শহরের বৈঠকখানা রোডে এক ভাড়া বাড়িতে এই মাদরাসার যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসন থেকে পাকিস্তান ও ভারত পৃথক পৃথক ভাবে স্বাধীনতা অর্জন করে। উভয় দেশের মধ্যে অখণ্ড ভারতের সম্পদ। অর্ধার্ধি ভাগাভাগি হয়। অর্থ সম্পদ-এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুনাম ঐতিহ্য ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে উভয় দেশের সরকারই সচেষ্ট থাকে। পাকিস্তান সরকারের একান্ত আন্তরিকতায় কলকাতা মাদরাসার বইপুস্তক আসবাবপত্র অর্ধেক ভাগে পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে আসা হয়। প্রথমে সদরঘাটের লক্ষ্মীবাজার কবি নজরুল কলেজের ডাফরিন হোস্টেলে মাদরাসার কার্যক্রম শুরু হয়। অতএব ১৯৫৬ সালে বকশী বাজারের বর্তমান ভবনটি স্থাপন করা হয়।

শুরু থেকেই এই মাদরাসার ঐতিহ্য ছিল সোনালি আভায় পরিপূর্ণ। মেধাবী ছাত্রদের আনা গোনা ও মিলনমেলা ছিল এই মাদরাসার প্রাণ। মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা ছিল খুবই উজ্জ্বল। তার ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। যদিও রাজনৈতিক ডামাডোল এই মাদরাসা অগ্রযাত্রাকে বিভিন্ন সময় ব্যাহত করেছে বটে। কিন্তু তা ছিল সাময়িক। তবে এর গর্ভে লালিত সন্তানের মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে যাত্রী সচিবপদস্থ কর্মকর্তা রাজনীতিবিদ সাহিত্যিক হয়ে জাতিকে দিয়েছে অভাবনীয় উপহার। সত্যিই সরকারি মাদরাসা ই আলিয়ার তুলনা একমাত্র সে নিজেই। প্রসঙ্গ শহীদি ঈদগাহ সরকারি মাদরাসা আলিয়া ঢাকা। শহীদ আব্দুল খালেক এই মাদরাসার মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

www.pathagar.com

কামিল হাদীস গ্রুপের ২য় বর্ষের ছাত্র। শহীদ আব্দুল খালেক (২২ বছর) ১৯৮৯ সালের ৭ ইং ডিসেম্বর শাহদাত বরণ করেন। শহীদ আব্দুল খালেক ভাইয়ের শাহাদাতের প্রেক্ষাপট ছিল এক আলোড়িত ঘটনার ধারাবাহিকতার অংশ। ১৯৮৯ সালে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন ছাত্র সংসদ নির্বাচনের। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সাইদ ছবুর পরিষদের প্যানেল ঘোষণা করে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। শিবিরের নিশ্চিত বিজয় জেনে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ছাত্রদল ক্যাম্পাসকে অশান্ত করে তোলে। স্থগিত ঘোষণা করা হয় নির্বাচন। ছাত্রদলের এই সফলতা ওদেরকে আরো বেপরোয়া করে তোলে। পথেঘাটে এখানে সেখানে শিবির নেতা-কর্মীদের অপমান অপদস্থ এমনকি গায়ে হাত ওঠাতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। আলিয়া মাদরাসা ছাত্ররাজনীতি বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘেঁষা থাকার কারণে এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। মাদরাসা ইসলামী ছাত্রশিবির একক সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও নীরবে সহ্য করতে হয়। ওদের এই মানসিক নির্যাতন বিভিন্ন সময় ঘটনা এতটা হতো যে তা বর্ণনা করা ছিল কঠিন। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সন্ত্রাসী সানাউল হক নীরু, গোলাম ফারুক অভি একাধিকবার আলিয়া মাদরাসায় হামলা করে। কিন্তু সংগঠনের নির্দেশ ধৈর্য ধরতে হবে।

একদিন ১৯৮৯ সালের ১৩ আগস্ট রাতে শেষ পর্যন্ত বেধে গেল সংঘাত। শিবিরের নারায়ে তাকবিরের শ্লোগান দঃসাহসী ভূমিকায় ছাত্রদল দিশাহারা হয়ে পড়ে। মুহুমুর্হ শ্লোগান দরজা-জানালা গজারি ও হকিস্টিকের বেপরোয়া আঘাতের শব্দ একটি ভীতকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। এব পর্যায়ে ছাত্রদলের নেতা কর্মীদের অনেকেই মসজিদের ও ডাইনিং হলের দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যায়। যারা পালাতে পারেনি তারা প্রচণ্ড লাঠি পেটার কবলে পড়ে। রাতেই মাদরাসা কর্তৃপক্ষে পুলিশের সহায়তা আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। হলের সকল গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। এভাবে রাত গেল দিন গেল। নোটিশ দেয়া হল ত্যাগের। অনেক চেষ্টা করেও সম্ভব হয় নাই হল খোলা রাখার। বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রাতেই হল ছাড়তে হবে। কিন্তু চতুর্দিকে পুলিশ। পুলিশের প্রতি নির্দেশ ছিল হলের সকল ছাত্রকেই গ্রেফতার করতে হবে। ভোর রাত ৪ টায় হলের পেছনের গেট ৯ (মাঠসংলগ্ন) দিয়ে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত হল। অবশ্য দিনের বেলা বিভিন্ন ভাবে সাধারণ ছাত্ররা বের হয়ে যায়। প্রায় ২০০ জন ছাত্রসহ আমরা রাত ৪টায় বের হলাম। মাঠের পূর্বে দক্ষিণ কর্নার দিয়ে বের হলে উর্দু বোডের দিকে যেতেই বকশীবাজার বোর্ডের কর্নার মসজিদের রাস্তার দুই দিক থেকে পুলিশ আমদের ঘেরাও করে ফেলে। পুলিশ স্কোয়াড করে লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পথে পথে দৌড়াদৌড়ি করে অনেকেই পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু দায়িত্বশীলগণ দায়িত্বের কারণেই পালাতে পারেনি। ফলে ৮৫ জন গ্রেফতার করা হয়। শেষ পর্যন্ত ৪২ জনের নামে মামলা দেয়া হয়। ১১ জনকে শেষ পর্যন্ত ৪ দিনের রিমান্ডে দেয়া হয়। শহীদ আব্দুল খালেক ভাইসহ ২ জন রিমান্ডের আসামি না হওয়ায় ১৪ ইং আগস্ট তাদেরকে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ১৫/১৭ দিন পরে আমরা ৫ জন ছাড়া সবাই জামিন লাভ করে। আমরা ৫ জন সাড়ে পাঁচ মাস জেলে ছিলাম। সস্প্রতি আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল ফাত্তাহ সেক্রেটারি হিসাবে আমি নিজে এছাড়া সাক্ষী সানাউল্লাহ ভাই মোশারফ ভাই ও মাহমুদ ভাই ডিটেনশনের (বিশেষ আটকাদেশ) আসামি হিসেবে ৩ মাস পর ১৭ নভেম্বর জামিনে ছাড়া পাই।

www.pathagar.com

দীর্ঘ দেড় মাস পরে নভেম্বর মাসের ২ তারিখ মাদরাসা খোলা হয়েছে। ছাত্রশিবিরের নেতা কর্মী ক্যাম্পাসে আসতে পারছে না। ইতোমধ্যে হলে সিট বরাদ্দের নোটিশ দেয়া হয়েছে। শিবিরের সিদ্ধান্ত হল সিট বরাদ্দের পরীক্ষায় ব্যাপক অংশগ্রহণ করতে হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন শাখায় ছাত্রদের নামে সিট বরাদ্দ নেয়া হল। শহীদ আবদুল খালেক ভাই নতুন সিট বরাদ্দের একজন ছাত্র হিসেবে সিট বরাদ্দ পেয়েছেন ৭ ই ডিসেম্বর পুরানা পল্টন অফিস থেকে সবার সাথে তিনিও ক্যাম্পাসে আসেন।

সকাল ১০টা সময় শহীদ আব্দুল খালেক ভাই হলের টাকা জমা দিলেন। গেট দিয়ে বের হওয়ার সময় গেস্ট রুমে বসা থাকা ছাত্রদলের মতিন আসলাম খোকনরা তাকে দেখে ফেলে। ওরা তাকে ডাক দেয় কিন্তু আব্দুল খালেক ভাই না এসে দ্রুত বের হয়ে যায়। ওরাও পিছু নেয় এবং পিছন থেকে ডাকতে থাকে। অবস্থা ভাল নয় ভেবে শহীদ খালেক তার এক বোনের বাসার দিকে দৌড়াতে থাকে। হত্যাকারীরা তাকে ধাওয়া করে। মাদরাসার দক্ষিণ পাশে তার গ্রামের বোনের বাসা। মফিজ ভাই তার ভগ্নিপতির বাসার সিঁড়িতে উঠে যায়। যখন আব্দুল খালেক ভাই বুঝতে পারে সে অন্য বাসার সিঁড়িতে উঠেছে। পিছু হটে নিচে নেমে আসতে থাকে, ৩৩ জনে ওরা (হত্যাককারীরা) সিঁড়িতে উঠে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছুরির আঘাত তার ফুসফুসকে বিদীর্ণ করে দেয়। ১ বার কি ২ বার চিৎকারে শব্দ হয়। অতঃপর সিঁড়িতেই তার নিসাড় দেহ পড়ে থাকে। পরবর্তীতে লালবাগ থানার পুলিশ এসে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যায়। জরুরি বিভাগের ডাক্তার তাকে মৃতা ঘোষণা করেন।

শহীদ আব্দুল খালেক ভাইয়ের মরদেহ আলিয়া মাদরাসা ক্যাম্পাসে আর যায়নি। সোজা বায়তুল মোকাররম মসজিদের পূর্ব চত্বরে নিয়ে যাওয়া হয়। জানাযা পড়ান মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী । সেখান থেকে সোজা গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর হেলাজিন হাইমচর ইউনিয়নের আলিয়া গ্রামে পরবর্তী বছর ৭ ডিসেম্বর আমি গিয়েছিলাম আর এক শহীদ শহীদ আব্দুল খালেক হামিদ ভাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম যিনি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যায়ে ১৯৯৩ সালে শাহাদাত বরণ করেন।

যেখানে শহীদের রক্ত ঝরে সেখানের মাটি ইসলামী আন্দেলনের কথা বলে এই সূত্রে আমরা জীবন বাজি রেখে আলিয়া হলে এসে উঠে পড়ি। ওরা সবাই পালিয়ে যায়। তারপর কতদিন কত মাস চলে গেল। Time and Tibe wait for none অর্থাৎ সময় স্রোতের তোড়ে আমাদের অত্যন্ত কাছের এবং প্রেরণার উৎস শহীদ আব্দুল খালেক ভাইকে কখনো স্মরণ রেখেছি । আবার কখনো ভুলে গিয়েছি। তাই ফরিয়াদ হে আল্লাহ তুমি আমাদের মাফ করে দাও আব্দুল খালেক ভাইকে শাহাদাতের মর্যাদায় কবুল কর। শহীদের সাথী ভাই এবং সহপাঠী হিসেবে আমার সাথেই তার সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক ছিল। তার সাথে উঠা-বসা আজ একথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যারা শহীদ হয় তাদের মৃত্যু পূর্ব আসল সত্যিই শহীদের মর্যাদায় নিয়ে যায়। তার আখলাক আন্তরিকতায় সত্যিই আমরা অভিভূত ছিলাম বিশেষ করে দায়িত্বশীলদের আনুগত্য ও ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম ও সিক্ত। একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমরা গ্রেফতার হলাম ১৩ আগস্ট রাত ৪টায়। ঐদিনই কোর্টে উঠানো হয়। আমাদের ৫ জনকে ৪ দিনের রিমান্ডে দেয়া হয় এবং বাকিদের জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়। ৪ দিন পর রাত ৮টায় আমাদেরকে

শান্তি মিনার

www.pathagar.com

জেলে পাঠানো হয় গেটের ভেতরে ঢুকে যখন সামনে এগুচ্ছি তখনই ডান দিক থেকে ডাক আসে সাইদ ভাই ভাই আমরা এখানে প্রথমে একটি ডাক অতঃপর অনেক ডাক। আজও যেন কানে ভাসে প্রথম ডাকটিই ছিল শহীদ আব্দুল খালেক ভাইয়ের ডাক। আমাদেরকে রাতে আমদানিতে রাখা হল। পরদিন সকালেই সবার সাথে দেখা হল। কী আশ্চর্য কারো মুখে দুঃখ বেদনা নেই, সবার মুখে হাসি আর হাসি, আলহামদুলিল্লাহ তবে সবার মুখেই একটি শংকার প্রশ্ন ছিল রিমান্ডে আমাদের টর্চার করেছে কি না। শহীদ আব্দুল খালেক ভাইসহ অন্যান্যদের ৪ দিনের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে যেমন করেছে চিন্তামুক্ত তেমন করেছে আশান্বিত।

শহীদ আব্দুল খালেক ভাই আল্লাহ তায়লার কাছে। মাদরাসা আছে আমরা আছি। এটাই সত্য। কিন্তু আজ ভাবছি শহীদ আব্দুল খালেকের সফলতা আমাদের বর্তমান অবস্থা আল্লাহ তায়ালা কিভাবে মূল্যায়ন করবেন। এই ভাবনা মাঝে মাঝে আমাকে অস্থির করে তুলে। কুরআন হাদীসে বর্ণনামতে শহীদদের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে।

আল্লাহ তায়ালা সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া এই ঈদগাহ এর আমানত রক্ষার তৌফিক দিন। আমিন।

লেখক : প্রফেসর (বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

শান্তির মিনার

www.pathagar.com

আমার কুরআনে হাফেজ ছেলেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার দাঁত পর্যন্ত শহীদ করেছে

শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন চাঁদপুর জেলার মতলব থানায় ১৪ আগস্ট রোববার জন্মগ্রহণ করে। ছোটবেলা থেকে খুব বেশি চঞ্চল কিংবা খুব বেশি চুপচাপ- এ দুয়ের মাঝামাঝি সে ছিল। সে কোন বিষয়ে আমাদেরকে ঝামেলা কিংবা পাওয়ার জন্য জোরাজুরি করতো না।

পড়াশোনার প্রতি ছিল তার যথেষ্ট আগ্রহ। তার এই আগ্রহ দেখে আমি এবং তার বাবা সিদ্ধান্ত নিই তাকে হাফেজ বানাবো। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত গোড়ান নাজমুল হক সিনিয়র মাদরাসা থেকে পড়ার পর হেফজখানায় আমরা তাকে ভর্তি করিয়ে দিই। হেফজ শেষ করে তামিরুল মিল্লাত মাদরাসায় সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। এখান থেকে দাখিল পরীক্ষায় ১১তম স্থান অধিকার করে। মানুষের সাথে সে খুব সহজেই মিশে যেত। হাসি এবং গল্পের মাধ্যমে যে কোন আসরকে প্রাণবন্ত করতে শিপনের জুড়ি ছিল না। মানুষের যে কোন বিপদ কিংবা সমস্যা সমাধানে সে দ্রুত সাড়া দিত। যেমন এক ছেলে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা উঠলে তাকে ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তির পর দেখা গেল তার ওষুধের টাকা নেই। সে তার নিজের পকেটের টাকা দিয়ে ঐ ছেলের ওষুধ কিনে দেয় এবং সারারাত তার বিছানার পাশে থেকে শুশ্রূষা প্রদান করে ভোরে পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরে। এলাকার এক বৃদ্ধ লোকের কাছ থেকে ছিনতাইকারীরা টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিলে ঐ লোকটিকে ৩০ টাকা রিকশা ভাড়া প্রদান করে তার নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। এলাকায় সে এতই ভাল হিসেবে পরিচিত ছিল যে, ৪ বছর ধরে মহিলাদের মাঝে সে তারাবির ইমামতি করেছিল এবং মসজিদে তারাবি পড়িয়েছে এক বছর। সরকারি বিজ্ঞান কলেজে অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে তার আচরণে মুগ্ধ হয়ে হিন্দু ছেলেরা পর্যন্ত বায়তুলমালে অর্থ প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করত। শহীদ হওয়ার আগের বছর ২০০৫ সালে গোড়ানের এক বাড়িতে তারাবির ইমামতি করে।

শিপন এলাকার অনেক ছেলেকে কুরআন শরিফ পড়তে শিখিয়েছে। এলাকার এক ছেলের মা একদিন আফসোস করে বলছিলেন, শিপন বলেছিল আমার ছেলেকে কুরআন শেখাবে। সেও রাজি হয়েছিল কিন্তু তাকে এখনও কুরআন শেখাতে পারিনি।

যে গরিব ছেলেদের বাবা টাকা দিতে পারত না তাদেরকে সে টাকা ছাড়াই পড়াতো। এলাকার ছেলেরা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ভাল করতে হবে এই চিন্তায় সে সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিল। সে সবাইকে মসজিদে নামাজ এবং কুরআনের আলোকে জীবন গড়ার তাগিদ দিতে ব্যতিক্রম আয়োজনের মাধ্যমে তাদেরকে দাওয়াত পৌঁছাতো। যেমন ব্যায়াম, ফুটবল, ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন। ফজরের নামাজের সময় ছেলেদেরকে নামাজের জন্য ডাকতো ভোরে যেন কেউ না ঘুমায় সে জন্য শহীদ মাসুম তাদেরকে সাথে নিয়ে মাঠে খেলতে যেতো।

বাসায় ওর কারণে কেউই মুখ ভার করে রাখতে পারত না। সে থাকা অবস্থায় তাকে অবশ্যই

www.pathagar.com

কথা বলতে হবে বা হাসতে হবে। কারণ তার একটি অভ্যাস ছিল কৌতুকের মাধ্যমে সবাইকে আনন্দ দেয়া। এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভাল লাগতো। সে আমাকে কাছে ডেকে বসে বলতো, আমার কথা এখন শুনেন না, এমনও দিন আসবে কেউ আপনাকে ডাকবে না।

এলাকায় ছাত্রদের মাঝে দাওয়াতি কাজের কারণে এলাকার প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করে এবং তাকে হুমকি প্রদান করলেও সে তাদেরকে ইফতারের দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করেছে। তারা দাওয়াতে সাড়া না দেয়ায় খোঁজ নিয়েছে কেন তারা এল না। এভাবে আল্লাহ তাকে সবার মাঝে একটি সুন্দর মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে নিষ্পাপ হিসেবে তার দরবারে নিয়েছেন।

শহীদ হওয়ার কয়েকদিন আগে এক গরিব ছেলেকে ঈদের পাঞ্জাবি এবং তার বাড়িতে সেমাই চিনি পাঠায় সে। এক অসুস্থ রোগীকে রক্ত দিয়ে সে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে, তার পরও আমি বললাম, তুমি রক্ত দিলে কিন্তু তোমার শরীর তো দুর্বল। সে বলল, আপনি যেমন আমার মা, আমার জন্য আপনার যেমন কষ্ট লাগে, তারও তো এরকম কষ্ট লাগে।

রক্তের কারণে যদি সে বেঁচে যায় তবুও তো ভালো। নিজে রক্ত দেয়ার পাশাপাশি অন্যকেও উৎসাহী করত রক্ত দেয়ার ক্ষেত্রে। আজ আমার একটাই প্রত্যাশা শিপন যে রকম কৌশলে দ্বীনের দাওয়াত দিত, সবাই যেন সে রকম কৌশলে এবং মানুষের উপকারের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত সকলের কাছে পৌঁছায়। আর আমার শিপনকে যেরকম নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে শহীদ করা হয়েছে আমার ছেলে কুরআনে হাফেজকে তারা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার দাঁত পর্যন্ত শহীদ করেছে তাই আমি এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই এবং ভবিষ্যতে আর কোনো মায়ের বুক যেন এভাবে খালি না হয় এবং কোনো সন্তানকে যেন এভাবে না মারা হয়।

সরকার ৪০ বছর আগে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের নামে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিদের বিনা বিচারে জেলখানায় আটকে রেখেছে অথচ মাত্র ৫ বছর আগে প্রকাশ্য দিবালোকে লগি-বৈঠার মাধ্যমে নির্মমভাবে হত্যাকারীদের যাদের ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে চেনা যায় তাদেরকে বিচার করা দূরের কথা বরং ২৮ শে অক্টোবরের সেই মামলাটাকে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলার অজুহাতে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে, এর চেয়ে নিষ্ঠুর নির্মম মানবতাবিরোধী অপরাধ আর কী হতে পারে।

লেখিকা : শহীদ শিপনের মা

www.pathagar.com

রক্তে রঞ্জিত সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া

উপমহাদেশে মাদরাসা জগতের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সরকারি মাদরাসা-ই- আলিয়া, ঢাকা- যার ইতিহাস ঐতিহ্য অনেক বেশি। ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রতিষ্ঠানে অনেক গুণী ব্যক্তিবর্গ অধ্যয়ন করেছেন। বর্তমান আলিয়া মাদরাসার বয়স ২৩৪ বছর। সকল যুগেই ইসলামের দাওয়াত, ইসলাম প্রসার করার জন্য একদল পাগল মুজাহিদ তাদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন। আমরা যখন নবী, রাসূল, সাহাবায়ে আজমাইনদের ইতিহাস পড়ি, তখন মনে হয়, আমরা এখন সে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি, এটা খুবই স্বাভাবিক। হযরত ইব্রাহীম (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত নূহ (আ) এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে হযরত বেলাল, খাব্বাব, তালহা, আমর ইবনে আস (রা) সহ অনেক সাহাবী (রা) তাদের জীবনের বিনিময়ে দাওয়াতে তাবলিগ করেছেন।

আমরা যদি এই যুগের কথা বলি, তাহলে দেখব যে দেশে, যে রাজ্যে বা যে ময়দানে রক্ত ঝরেছে সেখানেই ইসলামের বিজয় নিশ্চিত হয়েছে। সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া সে রকম একটি ময়দান। এই ময়দানকে বেহেশতের বাগানে পরিণত করার জন্য আমাদের ৪ জন ভাই তাদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন। অসংখ্য ভাই আহত, পঙ্গুত্ব, অন্ধ, হাত হারানো অবস্থায় এখনো বেঁচে আছেন। আহত পঙ্গুত্ব ও শহীদ ভাইদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে এই ময়দান। আজকে যেই ভাইটির স্মৃতিচারণে এই লেখাটি লিখছি, তিনি এই জমিনের অসংখ্য সুন্দর গোলাপের মধ্যে একটি সুন্দর গোলাপ, আল্লাহর পছন্দের একটি গোলাপ শহীদ

www.pathagar.com

আতিকুল ইসলাম দুলাল। খুব অল্প বয়সেই খোদার নিকটে তার ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের মাঝ থেকে চলে গেলেন। তিনি আমাদেরকে শিখিয়ে গেলেন শহীদ হওয়ার মর্ম।

আমি হয়তো তাকে খুব কাছ থেকে দেখিনি, কিন্তু সেই সময়ের দায়িত্বশীলদের কাছ থেকে যতটুকু জেনেছি শহীদ আতিকুল ইসলাম দুলাল ভাই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, তার বিচক্ষণতা, বুদ্ধি, মেধা দেখে মনে হচ্ছিল যে, তিনি হবেন অনেক বড় দায়িত্বশীল। আমরা ঠিকই এটা ভেবেছি কিন্তু মহান আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের এই ভাবেই দুনিয়া থেকে নিয়ে যান। ১৮ ই জুলাই ১৯৯২ সালে ঢাকায় বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতা ভাষাসৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির দাবিতে বিশাল জনসভায় আমাদের এই ছোট্ট ভাইটি যোগদান করেন। জনসভা থেকে ফেরার পথে মতিঝিলে আসলে সেখানে নির্মম হামলা চালায় তথাকথিত কমিটির সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা। ঘাতকের ব্রাশ ফায়ারে তার বুক ও মাথা ঝাঁঝরা হয়ে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন, শহীদ আতিকুল ইসলাম দুলাল।

আজ আমরা যারা শহীদ আতিকুল ইসলাম দুলাল ভাইয়ের উত্তরসূরি বেঁচে আছি, আমাদের কাজ হচ্ছে শহীদদের রেখে যাওয়া কাজকে আনজাম দেওয়া। যতদিন পর্যন্ত এই বাংলার ভূখণ্ডে ইসলামের পতাকা উড়বে না, ততদিন পর্যন্ত আমাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের পথে থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের তার দ্বীনের পথে টিকে থাকার তাওফিক দিন।

লেখক: সভাপতি, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

www.pathagar.com

জান্নাতের সবুজ পাখি

শহীদ মাসুম শহীদ হওয়ার আগে আমাদেরকে কখনো বুঝতে দেয়নি যে সে ভেতরে ভেতরে এতটা তৎপর। ও শুধু ওর বই-খাতায় আরবিতে আল্লাহু আকবর, মুষ্টিবদ্ধ হাতসহ ছাত্রশিবিরের মনোগ্রাম আঁকত। এই মনোগ্রামকে সে খুব ভালবাসতো এটা অন্তত বুঝতে পেরেছিলাম শহীদ হওয়ার আগে ওর ব্যবহার করা জিনিসপত্রের কোনই গুরুত্ব দিতাম না। ও শহীদ হওয়ার পর ওর ব্যবহার করা প্রতিটি ক্ষুদ্র জিনিসও আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান মনে করে কুড়িয়ে কুড়িয়ে জমা করে রাখি। ওর পড়ার টেবিলের ড্রয়ার খুলে দেখি ওর নিজ হাতের লেখা দাওয়াতি কার্ডের উপর ছাত্রদের নাম। ওর লেখা সম্বলিত কার্ডগুলো যত্ন করে রেখেছি কারণ আর কোন দিন ওর হাতের লেখা চাইলেও পাওয়া যাবে না। কারণ ওতো দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে চিরদিনের জন্য। সেদিন তার খাতা ঘেঁটে চেয়ে দেখি খাতার সব চেয়ে উপরে এক জায়গায় একটি পাখি এঁকে পাশে তার নাম লিখেছিল জান্নাতের পাখি। আজ তা ভাবি সত্যিই সে দুনিয়ায় বেঁচে থাকা অবস্থায় কল্পনা করতো জান্নাতের পাখি হওয়ার। সত্যিই আল্লাহ পাক তার সেই আকাঙ্খা পূরণ করে জান্নাতের পাখি বানিয়ে দিয়েছেন শহীদ মাসুম এখন জান্নাতের পাখি হয়ে জান্নাতের বাগানে বিচরণ করছে। জান্নাতের বাগান সবুজ তাই জান্নাতি পোশাক সবুজ পাঞ্জাবি রক্তিম বর্ণের লাল টুপি পরে শাহাদাতের দুদিন আগেও দুনিয়ার প্রিয় মানুষদের সাথে তৃপ্তির সাথে ঘুরে ঘুরে সবার সাথে শেষ দেখা করে গেছে। শহীদ মাসুম ছিল সদ্য ফুটন্ত গোলাপের মতই। অন্তরে ছিল না কোন অপবিত্রতা। তার অন্তর পবিত্রতা আর শুভ্রতা দিয়ে ঘেরা ছিল। সে ছিল বড়ই দয়ালু। আমার একান্ত প্রিয়

www.pathagar.com

ছোট ভাই বয়সেও বেশ কাছাকাছি ছিলাম। তার নামটি ছিল তার মতই পবিত্র। যাকে কোন পাপ স্পর্শ করতে পারেনি মাসুম মানে নিষ্পাপ। বাগানের সব চাইতে সুন্দর গোলাপ ফুলটি যেমন সবার দৃষ্টি কাড়ে তেমনি সেও নজর কাড়তো সবার।

শিশুকাল থেকেই সে ছিল ব্যতিক্রম। কখনো দুষ্টুমি করত না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো। তার কাপড় চোপড় কখনো পুরাতন হত না ছিঁড়তো না। সে ছিল অল্পে তুষ্ট নির্লোভি বালক। খুব মিশুক ছিল সে। গরিবের প্রতি তার ভালবাসা ছিল গভীর। তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করতে সদাতৎপর ছিল। তার কথাবার্তা চাল চলনে স্মার্টনেস ছিল দেখার মত।

সংগঠনের প্রতি তার গভীর ভালবাসা। সংগঠনকে নিয়ে খুব ভাবতো সে। কিভাবে কত সুন্দর করে মানুষের মাঝে তুলে ধরা যায় ইসলামকে। আবার আম্মু বেশির ভাগ সময়ই সংগঠনের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এ কারণে ছোট বেলা থেকেই আমার সাথে তার সম্পর্ক ছিল গভীর। কোচিং এর যাতায়াত খরচও একটু বেশি টাকা পয়সা আমার কাছে দিয়ে যেতেন আম্মু। সব কিছু চাওয়ার ব্যাপারে আমার কাছে চাইতো। সব সময় মুক্তা আপু বলে ডাকতো। আজো আমার কানে মুক্তা আপু ডাক শুনতে পাই। মনে হয় এখনও আমাকে ডাকছে এবং বলছে মুক্তা আপু এটা দাও ওটা দাও। আত্মীয়রা ঈদ উপলক্ষে টাকা গিফট করলে আমি না খরচ করে জমাতাম, একটুও খরচ করতে চাইতাম না। আর যখনই মাসুম কোন কাজে আমার কাছে টাকা চাইতে আসতো তখনই জমানো টাকাটা তাকে দিয়ে দিতাম। ওর প্রতি এত আন্তরিকতা ছিল আমার। বড়র কাছে ছোটর এমন আবদারই থাকে। আমার প্রিয় ভাইটির কথা এখনো মনে হলে আমি স্বাভাবিক থাকতে পারি না। অন্তরে এত ব্যাথা হয় যে সহ্য করা কষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। শুধু আল্লাহর পুরস্কারের আশায় সবর করার চেষ্টা করি।

শহীদ মাসুমের অনেক বুদ্ধিমত্তা ছিল। যে কোন বিষয়ে আমি সমস্যার সমাধান ওর কাছ থেকে পেতাম। কোথাও দাওয়াতি কাজে গেলে সেখান থেকে শুধু শিবিরের কাজ করে ফিরে আসতো না বরং সেই বাসাগুলোতে ছাত্রী কয়জন তার খবর আমার কাছে পৌঁছে দিত। যাতে করে আমাদের ছাত্রী সংস্থার সহযোগী বাড়াতে সুবিধা হয়। ওর ভাল কাজগুলো প্রকাশ পেত না সহজে। শহীদ মাসুম সব সময় সারপ্রাইজ দিতে খুব পছন্দ করতো। শহীদ মাসুম জীবনের শেষ মুহূর্তেও সারপ্রাইজ দিয়ে যাবে তা কখনো ভাবিনি।

২৮শে অক্টোবর থেকে নভেম্বরের ২ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম মাসুম সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে আসবে। ওর রক্তমাখা প্যান্ট ধুয়ে রেখেছিলাম ও তো ফিরে আসবে এই ভেবে। শহীদ মাসুমের ঈদের পাঞ্জাবি যেটা পরে শেষ ঈদ করেছিল। ওর সেন্টমাখা টুপিতে এখনো জীবিত মাসুমের গন্ধ পাই। ওর ছবিগুলো প্রতিদিন দেখি আর মনে হয় ও মরেনি। ও বেড়াতে গিয়েছে ও ফিরে আসবে। ছোট বেলা থেকেই দুজন পাশাপাশি ছিলাম। এর সাথে খেলা করতাম ও ভালো ক্রিকেট খেলতে পারতো। বাসায় এসে আম্মুকে পেতো না। শুধু আমাকেই বেশি সময় পেত যার জন্য আমার সাথে তার এত গভীরতা। মিছিলে গিয়ে কি হত কোথাও ঘুরতে গিয়ে কী হত, সব মজার মজার ঘটনা আমার কাছে বলতো। বিদ্যুৎ চলে গেলে প্রাণ খুলে ছোট বোন নাদিয়া সাদিয়াকে নিয়ে গান করতো। আর কোন দিন মাসুমের কণ্ঠে সেই গানগুলো শুনবো না। মাসুম এখন বহুদূর চলে গিয়েছে। মাসুমের পিপাসা এই পৃথিবীতে

www.pathagar.com

কোন কিছু দিয়ে মিটবে না। পিপাসার্ত হৃদয় নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। কোনা উপায় নাই। ছোট বেলার প্রতিটি স্মৃতিতে মাসুম ভেসে উঠে চোখের সামনে আর বুকটা ভেঙে যায় মাসুমহারা কষ্টে। আমাদের পরিবারে কত সুখ ছিল এখন সব সুখ আওয়ামী হায়েনারা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ভাই হারানো ব্যথা নিয়ে বেঁচে আছি।

আমার যে ভাইটি কখনো অন্যায় করেনি, সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতা। কখনো কোন দিন একটি নালিশ নিয়ে কেউ আসেনি। সেই ভাইটিকে কিভাবে মারলো নরপশুরা, তাদের কি একটু দয়া হল না? ওরা কি ভেবেছে একজনকে মেরে আমাদের সংগঠনের কাজ বন্ধ করে দিবে? এ কাজ ঠিকই চলবে।

"আঘাতে আঘাতে যারা দিয়েছিল জান প্রাণ। ব্যথা ভরা বুকে যারা গেয়েছে তোমার গান" অন্তরে মাসুম হারানো ব্যথা নিয়ে আল্লাহর পথে চলবো কখনো এই পথ হতে বিচ্যুত হবো না। এই পথে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে চলবো এই শপথ নিচ্ছি ২০১৩ এর ২৮ অক্টোবরে। আল্লাহ পাক কবুল করুন আমিন।

লেখিকা: শহীদ মাসুমের বোন

শান্তি মিনার

www.pathagar.com

শহীদ মাসুম আমার প্রেরণা

প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সকল মানুষের মৃত্যুকে সকলে স্মরণ করে না। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধানকে কায়েম করতে যারা জীবন বিলিয়ে দেন অকাতরে, তারা মানবজাতির স্মৃতিতে হয়ে থাকে অম্লান, অনুপ্রেরণার হীরক খণ্ড। শহীদ মাসুম তেমনই একজন। শহীদ মাসুমের সাথে ছোট বেলা হতেই গভীর সম্পর্ক ছিল। সদা হাসিমুখ স্মার্ট, নম্রতা যেন সর্বদা আমাকে আকৃষ্ট করতো। অস্পর্শীয় মায়ার টানে। জীবনে বহু প্রোগ্রাম করেছি একই সাথে। সর্বদা লক্ষ্য করতাম তিনি যেন অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম, বহুঅগ্রবর্তী। অতি আগ্রহী, সংগঠনকে তিনি যেন নিজের চেয়ে বেশি ভালবাসেন। মিছিলে উনার শ্লোগান আমার হৃদেয় সর্বদা ঝলকানি দিয়ে উঠতো। কোন দিন দেখিনি একটু অবহেলা, বিরক্তি সাংগঠনিক কাজে। শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে আমরা একসাথে মিছিল করে ফিরছিলাম। শহীদ মাসুম বাড়িতে গেলেন। আমিও শহীদ মাসুমের বাড়িতে গেলাম। তখন রাত ১০টা শহীদের মা (সম্পর্কে আমার দাদী) বাড়িতে ছিলেন না। শহীদ মাসুমের সাথে এক সাথে মুড়ি খেলাম তখন মাসুমের প্রচণ্ড মাথা ব্যথা। উনি মাথা ব্যথা নিয়ে আমার সাথে ঘর থেকে বের হলেন দাওয়াতী কাজে পরের দিনের প্রোগ্রামের জন্য। আমার সাথে দেখা হলে মান উন্নয়নের তাগিদ দিতেন। সর্বদা কর্মীদের মানোন্নয়নের ব্যাপারে তিনি ছিলেন তৎপর। খেলার মাঠের কর্মীদের নিয়ে যেতেন নামাজে। সবাইকে ডাকতেন কুরআনের দিকে। তার সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, তাকওয়া আমাকে যে এই দিঘল সুতার টানে আরো আকৃষ্ট করেছে। শাহাদাতের দিন তিনি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে অপর শহীদ ভাই শিপনকে ডেকে দাওয়াতি কাজে বের হন। ডেকে আনেন আল্লাহর পথের তৌহিদী সেনাদের। তিনি যেন সেদিন এক নতুন ঈদের সাজে সজ্জিত হয়েছিলেন। আগে আগে তিনি যথারীতি থানা অফিসে আসেন। আমাকে দেখে কুশল বিনিময় করেন। আমরা যথাযথ ভাবে দৈনিক বাংলার মোড়ে উপস্থিত হলাম। শহীদ মাসুম আমার সাথে ফুচকা খেলেন আর হাসিমুখে নানা কথা বললেন। আমরা মিছিল নিয়ে সমাবেশে যোগ দিলাম। শহীদ মাসুমের কণ্ঠ থেকে গর্জে উঠেছিল রক্ত দেবে ছাত্রশিবির জান দেবে ছাত্রশিবির। শ্লোগান আমাদের হৃদয়কে জাগিযে তুলেছিল নতুন উদ্যেমে। কিছুক্ষণ পরই তিনি পান করলেন শাহাদাতের অমিয় সুধা। বরণ করলেন শাহাদাত। সে দিন ময়দানে তিনি ছিলেন এগিয়ে, আমরা ছিলাম পেছনে। শাহাদাতের অপূর্ব তৃপ্তি যেন উনাকে টেনে সবার সামনে নিয়ে গিয়েছে।

লেখক : ভাতিজা, বন্ধু ও সাথী

www.pathagar.com

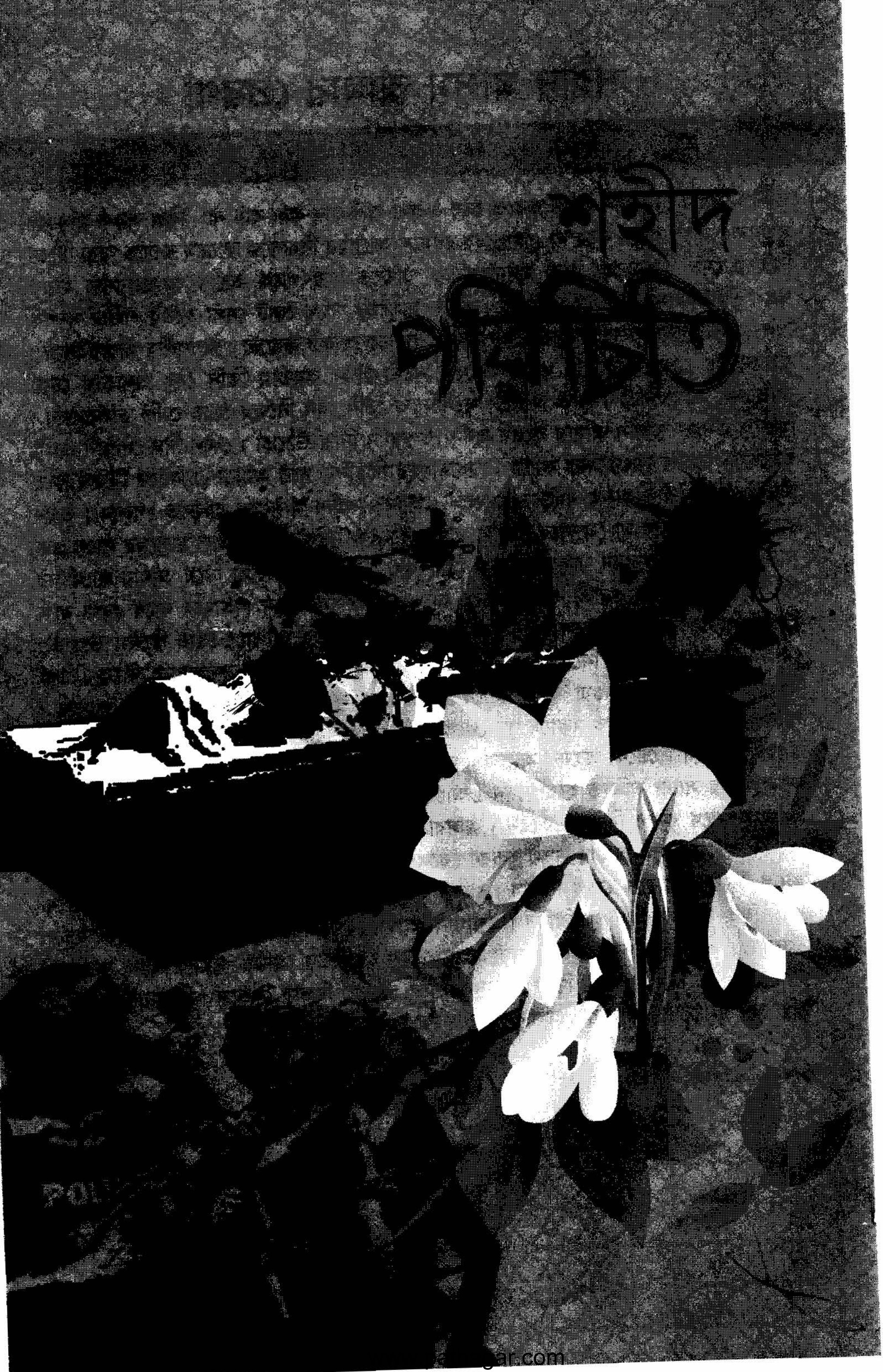

gar.com

নাম ঃ **শহীদ আব্দুল মালেক** (১৯৪৭-১৯৬৯)

পিতা ঃ মরহুম মৌলভী মুন্সী মোহাম্মদ আলী

মাতা ঃ মরহুমা মোসাঃ ছাবিরুন নেছা

ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ খোকসাবাড়ী, থানা ঃ ধুনট, জেলা ঃ বগুড়া

জন্ম তারিখ ঃ মে ১৯৪৭ ইং

ভাই বোন ঃ ৫/১

পারিবারিক পরিচিতি ঃ ভাইদের মধ্যে ৫ম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ ঃ ১ম থেকে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত গ্রামের পাঠশালা, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত গোসাইবাড়ী হাইস্কুল (বাড়ী থেকে ৪মাইল দূরে) এস.এস.সি-বগুড়া জেলা গভঃ হাই স্কুল, এইচ.এস.সি -রাজশাহী কলেজ, সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগের ছাত্র।

ঘটনার স্থান ঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

শহীদ হওয়ার স্থান ঃ ঢাকা মেডিকেল

শাহাদাতের তারিখ ঃ ১৫ আগস্ট ১৯৬৯

সাংগঠনিক মান ও দায়িত্ব সমূহ ঃ ১৯৬৬-৬৭ সেশনে ঢাকা শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক,

১৯৬৭ সেশনের জুলাই মাসে ঢাকা শহর শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৮ সালে নিখিল পাকিস্তান ছাত্র সংঘের কার্যকরী পরিষদ সদস্য হন।

www.pathagar.com

শহীদ মোহাম্মদ সাইজুদ্দিন

পিতা : মো: আব্দুল মান্নান বেপারী

ঠিকানা : মীরেরশ্বরাই, সদর, মুন্সীগঞ্জ

ভাই-বোন : ৬ ভাই ২ বোনের মাঝে তিনি ৩য়

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণী

কততম শহীদ : ৪৭তম

ঘটনা ও ঘটনার স্থান : জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির দাবিতে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটের বিশাল জনসভা থেকে ফেরার পথে মতিঝিলের শিল্প ব্যাংকের সামনে বাসে ওঠার সময় ব্রাশফায়ারে বুক ও মাথা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। বর্বর এ নগ্ন হামলা চালায় ঘাদানিক কমিটির সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা।

শহীদ হওয়ার স্থান : শিল্প ব্যাংক ভবনের সামনে, মতিঝিল।

আঘাতের ধরন : ব্রাশফায়ারে বুক ও মাথা ঝাঁঝরা হয়ে যায়।

যাদের হাতে : ঘাদানিক কমিটির স-শস্ত্র সন্ত্রাসীদের।

শাহাদাতের তারিখ : ১৮ জুলাই ১৯৮২ ইং।

সাংগঠনিক মান : কর্মী

যে শাখার শহীদ : ঢাকা মহানগরী পূর্ব

শহীদ আতিকুল ইসলাম দুলাল

পিতা : মরহুম আলী মিয়া

ঠিকানা : দক্ষিণ ইসলামপুর, সদর, মুন্সীগঞ্জ।

ভাই বোন : ৬ ভাই ৬ বোনের মাঝে তিনি ২য়

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ১০ম শ্রেণী

কততম শহীদ : ৪৮তম

ঘটনা ও ঘটনার স্থান : জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির দাবিতে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটের বিশাল জনসভা থেকে ফেরার পথে মতিঝিলের শিল্প ব্যাংকের সামনে বাসে ওঠার সময় ব্রাশফায়ারে বুক ও মাথা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। বর্বর এ নগ্ন হামলা চালায় ঘাদানিক কমিটির স-শস্ত্র সন্ত্রাসীরা।

শহীদ হওয়ার স্থান : শিল্প ব্যাংক ভবনের সামনে, মতিঝিল।

আঘাতের ধরন : ব্রাশফায়ারে বুক ও মাথা ঝাঁঝরা হয়ে যায়।

যাদের হাতে : ঘাদানিক কমিটির স-শস্ত্র সন্ত্রাসীদের।

শাহাদাতের তারিখ : ১৮ জুলাই ১৯৮২ ইং।

সাংগঠনিক মান : কর্মী

যে শাখার শহীদ : ঢাকা মহানগরী পূর্ব

www.pathagar.com

শহীদ শামসুজ্জামান খান রেজা

পিতা : আলহাজ্ব মোশারফ আলী খান
মাতা : মিসেস শামসুন্নাহার খানম
বর্তমান ঠিকানা : দত্তপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর।
স্থায়ী ঠিকানা : শ্রীরামপুর, থানা+জেলা : সাতক্ষীরা।
জন্ম তারিখ : ১৫ জুন ১৯৭০ ইং।
ভাই বোন : ৩ ভাই ৩ বোন
সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : হিসাববিজ্ঞান অনার্স ৩য় বর্ষ, ঢাকা কলেজ।
কততম শহীদ : ৬২তম
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩, দত্তপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর।
শহীদ হওয়ার তারিখ ও স্থান : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।
শহীদের কবরস্থান : পারিবারিক কবরস্থান, সাতক্ষীরা।
শাহাদাতের তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৩
সাংগঠনিক মান: সদস্য প্রার্থী
শহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ঘটনা : শহীদের বড় বোন বলেন, আহত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে রেজা আমাকে বলেছিল আপা বিপদ আসলে ধৈর্য ধারণ করবেন।
যে শাখার শহীদ: ঢাকা মহানগীর উত্তর

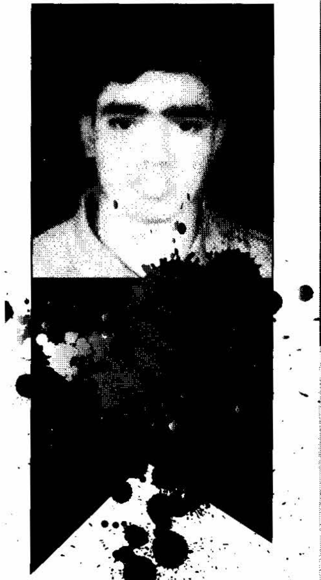

শহীদ কামরুজ্জামান আলম

পিতা: মো: জুলফিকার আলী
মাতা: মিসেস মমতাজ বেগম
বর্তমান ঠিকানা : ২১৭ কলোনি, সেকশন-১৩, মিরপুর ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কর্পুকাটি পো: কালিয়া থানা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী।
জন্ম তারিখ : ৯ অক্টোবর ১৯৭৩ইং
ভাই-বোন : ৩ ভাই ১. কামরুজ্জামান আলম ২. শামসুজ্জমান ৩. নূরআমান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
কততম শহীদ : ৬৩তম
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান : ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ই, দত্তপাড়া, টংগী, গাজীপুর
শহীদ হওয়ার তারিখ ও স্থান : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩ইং ঢাকা মেডিকেল কলেজ
কবরস্থান : সরকারি কবরস্থান, মিরপুর-১১, ঢাকা
শাহাদাতের তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইং
সাংগঠনিক মান : কর্মী
যে শাখার শহীদ : ঢাকা মহানগরী উত্তর

www.pathagar.com

শহীদ মোজ্জাম্মেল হক মনজু

পিতাঃ মরহুম ডাঃ শেখ জামাল উদ্দিন

মাতাঃ জাহানারা বেগম

ঠিকানা : ৮/১১ সি ব্লক মিরপুর-১৩ ঢাকা।

ভাই বোন : ৩ ভাই ৪ বোন

সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: জার্মান টেকনিক্যাল কলেজ মিরপুর

আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইং। দত্তপাড়া, টংগী, গাজীপুর।

শহীদ হওয়ার তারিখ ও স্থান : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইং, ঢাকা। মেডিকেল কলেজ।

কবরস্থান : সরকারি কবরস্থান মিরপুর-১১ ঢাকা।

সাংগঠনিক মান : কর্মী

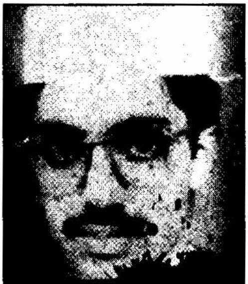

শহীদ আব্দুল খালেক হামীদ

পিতা : নায়েক আব্দুর রশীদ

ঠিকানা : গ্রাম: পূর্ব শুল্যকিয়া বাজার, সদর উপজেলা, নোয়াখালী।

ভাই বোন : ৪ ভাই ২ বোন, সবার মাঝে ৩য়

সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : কামিল অধ্যয়নরত সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা।

কততম শহীদ : ৮৫তম

শহীদ হওয়ার স্থান : মোনেনশাহী

শাহাদাতের তারিখ : ৪ মার্চ ১৯৯৬ইং

সাংগঠনিক মান : সদস্য প্রার্থী

যে শাখার শহীদ : ঢাকা মহানগরী পূর্ব

www.pathagar.com

শহীদ আব্দুল ওয়াহিদ

পিতা : শরীফুল ইসলাম

মাতা : মরহুমা আলেয়া বেগম

বর্তমান ঠিকানা : বাসা-৭, লেন-১, ব্লক সি, মিরপুর-১১, ঢাকা।

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রামঃ পুটিমারী, থানাঃ শৈলকুপা

জেলা : ঝিনাইদহ।

জন্ম তারিখ : ০১/০১/১৯৮০ইং

ভাই বোন : ২ ভাই-জাহিদুল ইসলাম, ১ বোন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : ১ম-৫মে শ্রেণী প্রিপারেটরি গ্রামার স্কুল, মিরপুর। ৬ষ্ঠ-১০ম মিরপুর বাংলা উচ্চবিদ্যালয়।

সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : তেজগাঁও কলেজ।

কততম শহীদ : ৮৬তম

আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান : ০৪/০৩/১৯৯৬ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোমেনশাহী।

শহীদ হওয়ার তারিখ ও স্থান : ০৪/০৩/১৯৯৬ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের মেসের পাশে।

সাংগঠনিক মান : সাথী

সর্বশেষ দায়িত্ব : ওয়ার্ড সেক্রেটারি।

যে শাখার শহীদ : ঢাকা মহানগরী উত্তর

শহীদ হোসাইন মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম

পিতা : মো : দেলোয়ার হোসেন

মাতাঃ মাহমুদা দেলোয়ার মুন্নি

বর্তমান ঠিকানা : ডি-২৩, ৩য় কলোনি, লালকুটি, মিরপুর ঢাকা-১২১৬।

ঠিকানা : গ্রামঃ কুলশ্রী পোঃ দরগা বাজার, থানাঃ চাটখিল

জেলাঃ নোয়াখালী

ভাই বোন : ২ ভাই ১ বোন

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.বি.এ ষষ্ঠ সেমিস্টার

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি

শহীদ হওয়ার তারিখ ও স্থানঃ ২৮ অক্টোবর ২০০৬, বায়তুল মোকাররম উত্তর গেট, পল্টন

মহিলা কলেজের গলি রোডের লাইটিং-এর দোকানসমূহের সামনে।

সাংগঠনিক মান : সদস্য

সর্বশেষ দায়িত্বঃ ওয়ার্ড সভাপতি (মিরপুর ১০ নং ওয়ার্ড)

যে শাখার শহীদ : ঢাকা মহানগরী পশ্চিম

www.pathagar.com

শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন

পিতাঃ মোঃ তাজুল ইসলাম
মাতাঃ মোসাম্মত মাহফুজা বেগম
ঠিকানাঃ ১১৯/১/খ, পূর্ব বাসাবো, ঢাকা- ১২১৪ ।
ভাই বোন : ৩ ভাই ১ বোন
শিক্ষাগত যোগ্যতা : অনার্স ২য় বর্ষ, পদার্থবিদ্যা, ঢাকা কলেজ ।
কততম শহীদ : ১৪৭তম
শহীদ হওয়ার তারিখ ও স্থান : ঐতিহাসিক ২৮ অক্টোবর ২০০৬, বায়তুল মোকাররম উত্তর গেট ।
যাদের হাতে : তথাকথিত নামসর্বস্ব ১৪ দলীয় জোট ধারী ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে
সাংগঠনিক মান : সাথী
দায়িত্ব : ওয়ার্ড অর্থসম্পাদক (২৭ নং পূর্ব)
যে শাখার শহীদ : ঢাকা মহানগরী পূর্ব ।

শহীদ আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল

পিতাঃ মরহুম মোঃ আহসানুল হাই
মাতাঃ সাইয়েদা হাসনা বানু
ঠিকানাঃ পাইনাদি, মোস্তফা নগর, সানারপাড়, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ।
ভাই বোন : ৫ ভাই ২ বোন
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ২য় বর্ষ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান : ঐতিহাসিক ২৮ অক্টোবরে নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জের চিটাগাং রোডে ইসলামী ছাত্র শিবিরের মিছিলে আওয়ামী লীগ হায়েনাদের সশস্ত্র হামলায় আহত হন
শহীদ হওয়ার তারিখ ও স্থান : ২৯/১০/২০০৬ ইবনে সিনা হাসপাতালের আই সিইউতে সকাল ৮.৩০ টায়
আঘাতের ধরনঃ মাথা সহ সারা শরীর লগি বৈঠার আঘাতে থেঁতলে যায় ।
যাদের হাতেঃ আওয়ামী লীগ হায়েনাদের হাতে ।
সাংগঠনিক মান : কর্মী
দায়িত্ব ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক ।
যে শাখার শহীদ : নারায়ণগঞ্জ শহর শাখা ।

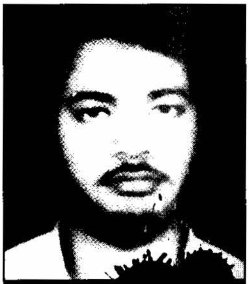

www.pathagar.com

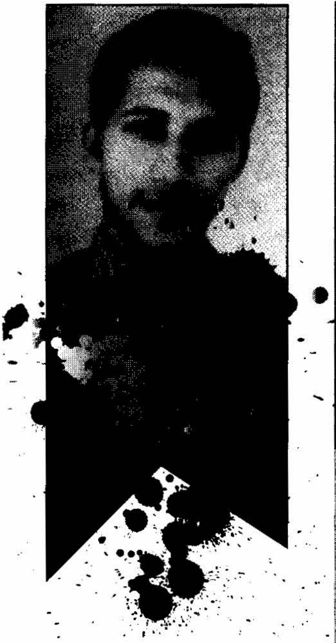

শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুদ

পিতা : মুহাম্মদ মাহতাব উদ্দিন আহমদ
মাতা : শামছুন নাহার রুবি
ঠিকানা : ১৩০/১৬ বাগানবাড়ী, মাদারটেক, বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা।
ভাই বোন : ২ ভাই ৩ বোন
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইংরেজি সাহিত্য, অনার্স ১ম বর্ষ।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : সরকারি তিতুমীর কলেজ
কততম শহীদ : ১৩১ তম
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান : ইতিহাসের কালো অধ্যায় ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এ চারদলীয় জোট সরকারের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে আয়োজিত শান্তিপূর্ণ সমাবেশে তথাকথিত নামসর্বস্ব ১৪ দলীয় জোটধারী আওয়ামীলীগের হাজি সেলিম ও ডা. ইকবালের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা লগি, বৈঠা, ছুরি, চাপাতি, আগ্নেয়াস্ত্র, হাত বোমার আক্রমণে আহত হন।
শহীদ হওয়ার তারিখ ও স্থান : ২ নভেম্বর ২০০৬ ইং, বায়তুল মোকারমের উত্তর গেট।
যাদের হাতে : তথাকথিত ১৪ দলীয় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে।
সাংগঠনিক মান : সাথী
দায়িত্ব : ওয়ার্ড সেক্রেটারি (২৭ নং দক্ষিণ), সবুজবাগ থানা।
যে শাখার শহীদ : ঢাকা মহানগরী পূর্ব।

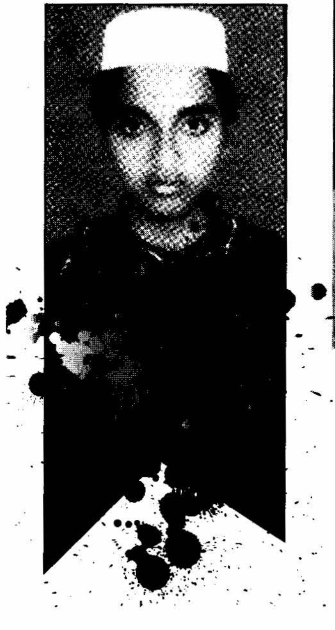

শহীদ এ কে এম শাসছুদ্দিন শরীফ

পিতা : মাওলানা জহুরুল ইসলাম
বর্তমান ঠিকানা : কাঠের পুল যাত্রাবাড়ী ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পোস্ট: হানারচর, থানা ও জেলা : চাঁদপুর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: এলএলবি (১ম সেমিস্টার) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
সাংগঠনিক মান: সাথী
দায়িত্ব : ওয়ার্ড সেক্রেটারি, মাতুয়াইল পশ্চিম
মৃত্যুর তারিখ ও কারণ : ৬ জুলাই ২০০৯ দাওয়াতি কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে, যাত্রাবাড়ী-ডেমরা সড়ক, সড়ক দুর্ঘটনায়।

www.pathagar.com

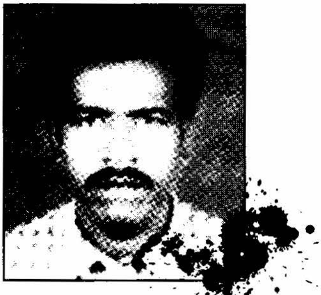

শহীদ মো : হাবিবুর রহমান

২৮ অক্টোবর, ২০০৬

পল্টন ময়দান, ঢাকা

শহীদ মো : জসিম উদ্দিন

২৮ অক্টোবর, ২০০৬

পল্টন ময়দান, ঢাকা

শহীদ মাওঃ আবদুল মতিন

১৪ অক্টোবর, ১৯৯২ ইং

মালিবাগ, ঢাকা ।

শহীদ মোঃ জয়নাল আবদিন

১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫

ফার্মগেট, ঢা

শহীদ মোঃ হোসেন মামুন

১৩ মার্চ, ১৯৯৬

তালতলা, ঢাকা ।

www.pathagar.com

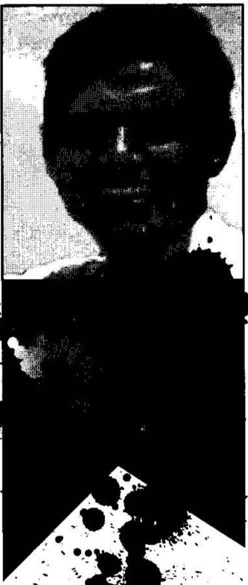

শহীদ খলিলুর রহমান মল্লিক

নাম : মোঃ খলিলুর রহমান মল্লিক
পিতা : মোঃ আব্দুল বাতেন মল্লিক
মাতা : জমেলা বেগম
জন্ম : ১লা জানুয়ারী ১৯৯৬, পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলায় করমজা মল্লিকপাড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত মল্লিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন।
ভাই-বোন : ৪ ভাই, ১ বোন (খলিল দ্বিতীয়)
শিক্ষা জীবন : ২০০৮ সালে তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসায় ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ২০১০ সালে A গ্রেড পেয়ে দাখিল পাস করেন। সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের কারণে পুনরায় মুরাদপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ২০১২ সালে A গ্রেড পেয়ে অত্র মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস করেন। সর্বশেষ তিনি একই সাথে তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসায় ফাযিল এবং বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে (অনার্সে) অধ্যয়নরত ছিলেন।

সাংগঠনিক জীবন : ২০০5 সালে সমর্থক ও পরে কর্মী হন। ২০০7 সালে ৮ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় সাথী শপথ গ্রহণ করেন এবং ২০১০ সালে দাখিল পরীক্ষার পর সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। সর্বশেষ দায়িত্ব ঢাকা মহানগরী দক্ষিন, শ্যামপুর থানা ওয়ার্ড সভাপতি এবং একই সাথে থানার অফিস সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।
শাহাদাতের তারিখ : ১৪ই আগস্ট ২০১৩,সকাল ৭.০০টা।

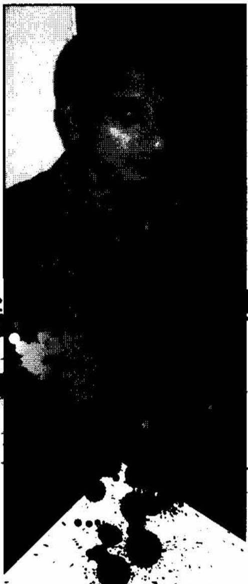

শহীদ মনসুর আহমেদ

নাম : হাফেজ মনসুর আহমেদ
পিতা : মৃত আব্দুল রাজ্জাক
গ্রাম : নূরুল্লাহপুর, ইউনিয়নঃ মুন্সির হাট, থানাঃ মতলব দক্ষিণ
জেলা : চাঁদপুর
পড়ালেখা : এল এল বি ১ম বর্ষ সিটি ইউনিভার্সিটি
হামলাকারী : পুলিশ
হামলার ধরন : গুলি শাহাদাতের
স্থান : মালিবাগ, ঢাকা
সাংগঠনিক মান : সাথী
দায়িত্ব : ঢাকা মহানগরী উত্তর শাখার বিমানবন্দর থানার ৩নং ওয়ার্ড সভাপতি
শাহাদাতের তারিখঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৩

www.pathagar.com

স্মৃতি চারণ

www.pathagar.com

কষ্টের মুহূর্ত

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার এশটি স্মারক বের হবে এই সিদ্ধান্ত হওয়ার পর থেকেই মনের মধ্যে খুবই উচ্ছ্বাস এবং আনন্দ অনুভব করেছি। কারণ হল ২০০১ সালের মে মাসে তৎকালীন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ শাখা থাকা অবস্থায় কাজ শুরু করে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১৩ বছরে আলাদাভাবে কোন স্মারক বের হয়নি। আনন্দের মাত্রা তাই বেশি।

কিন্তু বিষয় হল তার পরের...
আমাকেও নাকি এই স্মারকের জন্য লিখতে হবে। মহানগরী সভাপতি রানাভাই, সেক্রেটারি রিয়াজভাই বেশ কয়েক বার তাগাদা দিয়েছেন লেখার জন্য কিন্তু এই ব্যাপারে আমি আমার দায়িত্বশীল ভাইদের যথাযথ আনুগত্য করতে পারিনি। আবার চিন্তাও করেছি, দায়িত্ব অনুভব করেছি যে, যে মহানগরীতে দীর্ঘ ১৩ বছর কাজ করলাম সেই মহানগরীর একটি স্মারক বের হচ্ছে সেখানে একটা কিছু লেখা দরকার। কিন্তু কী লিখবো এখন পড়ে গেলাম সেই চিন্তায়। কারণ এর আগে কোথায় কোন বিষয়ে লিখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। অবশেষে মহানগরীর প্রচার ও আইটি সম্পাদক আব্দুল কাদের ভাই ফোন করে বললেন ভাই আপনি আপাতত কোন বিষয়ের ওপর স্মৃতিচারণ করে লিখেন।

কিন্তু কোন বিষয়ে লিখবো। একটু চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম জেলজীবনের স্মৃতিচারণ করে লিখি।

২০১৩ সালের ৮ এপ্রিল। সেদিন ছিল হেফাজতে ইসলাম ঘোষিত হরতাল কর্মসূচি। আর তার পরের দিন অর্থাৎ ৯ই এপ্রিল ছিল ইসলামী ছাত্রশিবিরের সংগ্রামী কেন্দ্রীয় সভাপতি মেধাবী ছাত্র নেতা মো: দেলাওয়ার হোসেন ভাইকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্রশিবির ঘোষিত হরতাল কর্মসূচি। সেই কর্মসূচি সফল করার জন্য ৮ এপ্রিল

www.pathagar.com

বেলা ৩:০০ টায় মহানগরীর সভাপতির নেতৃত্বে মিছিলের প্রস্তুতি কালে আমি গ্রেফতার হয়ে যাই। ৮-৯ এপ্রিল মতিঝিল থানা, ডিবি কার্যালয়ে এবং ১১ এপ্রিল রাত থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত যে নির্যাতন, হয়রানি ও পেরেশানির মুখোমুখি হয়েছিলাম তা এখানে বর্ণনা করলাম না। যদি কখনো নির্যাতন, হয়রানি ও পেরেশানির বিষয়ে স্মৃতি চারণ করি তখন সে সব কথা আসতে পারে। মাঝখানে বলে রাখি ডিবি কার্যালয়ে একই সাথে ছিলাম আমাদের সংগ্রামী কেন্দ্রীয় সভাপতি মো; দেলাওয়ার হোসেন ভাই, এই সময়ের সাহসী কলম দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব মাহমুদুর রহমান। যাই হোক সব কিছু ঝামেলা পেরিয়ে ১৬ই এপ্রিল ২০১৩ আদালতের আদেশের মাধ্যমে আমাদের পাঠিয়ে দেয়া হল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। দুর্ভাগ্যবশত আমার এই পথের সহযাত্রী হয়েছিলেন রামপুরা থানা সভাপতি তানজীন ভাই, রামপুরা থানার তৎকালীন সেক্রেটারি বর্তমান সবুজবাগ থানা আব্দুর রহমান ভাই, বনশ্রী ওয়ার্ড সভাপতি তারেক ভাই, খিলগাঁও থানার সাবেক সদস্য আব্দুর রাজ্জাক ভাই, মতিঝিল থানার সাথী এ. কে আজাদ এবং আমাদের কর্মী শাহীন আলম।

কারাগারে প্রবেশের পূর্বেই সকল আনুষ্ঠানিকতা এবং কারাগেটের ঐতিহাসিক চেকিং পয়েন্ট পার হয়ে কারাগারের ফাইলের পর ফাইল দিয়ে পৌছালাম আমদানিতে। পরের দিন আসর নামাজের পর আমাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হল মেঘনা-৫ ওয়ার্ডে। যেটা জামায়াত-শিবিরের ওয়ার্ড হিসেবে পরিচিত। ২ দিন পর অর্থাৎ ১৯ শে এপ্রিল আমাদের সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কাশিমপুর কারাগারে। ভেবেছিলাম এবং আমাদের চিন্তাও ছিল আমরা ৬ জন একই সাথে থাকবো। কিন্তু আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই কারাবিধি মোতাবেক তানজীন ভাই আর তারেক ভাই কাশিমপুর-১, আব্দুর রহমান ভাই ও এ কে আজাদ কাশিমপুর-৪ এবং আ: রাজ্জাক, শাহীন আলম এবং আমি কাশিমপুর-১ এ ভাগাভাগি হয়ে যায়। তাই মনটা একটু খারাপ হয়ে যায়। কাশিমপুর যাওয়ার ঐ যাত্রায় আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের সাবেক সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতি মো: সেলিম উদ্দিন ভাই। সেলিম উদ্দিন ভাই খুবই আন্তরিকতার সাথে আমাদের সবার খোঁজ খবর নিলেন। সেলিম উদ্দিন ভাইকে কাছে পেয়ে আমরাও বেশ আনন্দিত হলাম যে, একটি বিরাট বটবৃক্ষের ছায়ার সাথে আমরা কাশিমপুরের দিকে চলতে লাগলাম।

সেলিম উদ্দিন ভাইয়ের খুব কাছাকাছি থেকে মেশার সুযোগ হয়েছে সেই ২০০৬ সাল থেকে। আমি তখন রমনা থানার ৫৪ নং পূর্ব ওয়ার্ডের সভাপতি। সেলিম উদ্দিন ভাই ছাত্রজীবন শেষ করে রমনা থানায় এসে উঠলেন। আর বাসা আমাদের ওয়ার্ডের মধ্যে সোনালীবাগে। তখন থেকেই সেলিম উদ্দিন ভাইয়ের সাথে মেলামেশার সুযোগ। সত্যিই এক অতুলনীয় প্রেরণার উৎস আমাদের সেলিম উদ্দিন ভাই। অবশেষে সবাইকে বিদায় দিয়ে কাশিমপুর-২ এ নামলাম। এখানেও সেই চেকিং আর ফাইলের পর ফাইল দিয়ে আমদানি হয়ে আমাদের স্থান হল ৬ নম্বর বিল্ডিং এ ১১ নম্বর ওয়ার্ডে। সত্যিই এক অতুলনীয় পরিবেশ পেলাম কাশিমপুর-২ এ যেয়ে। আমাদের ঐ বিল্ডিং-এ গোলাম মাওলা ভাইয়ার দায়িত্বে ছিল কাশিমপুর কারাগার-২। যার যে সমস্যা সকল সমস্যা মেটানোর জন্য হাসিমুখে দাঁড়িয়ে যেতেন আমাদের গোলাম মাওলা ভাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের **IBA Department**-এর মেধাবী ছাত্র আবার কুরআনে হাফেজ গোলাম মাওলা ভাই ডিবি পুলিশ কর্তৃক যে ভয়াবহ, নির্মম ও লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তা ছিল অবর্ণনীয়।

www.pathagar.com

কাশিমপুর-২ এ পেলাম সাংগঠনিক পরিবেশ, ছাত্রশিবিরের পরিচালিত মেসের মত খাওয়া দাওয়া পদ্ধতি। সেখানে নিয়মিত যোহর নামাজের পর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, সকালে সহীহ কুরআন শিক্ষা ক্লাস ও আয়াত হাদীস মুখস্থকরণ এবং কর্মীদের সাথী বানানোর জন্য ওয়ার্কশপ। পরবর্তীতে সাথী শপথ contact। সেখানেই আমাদের মহানগরী পূর্ব শাখার ৫ জন কর্মী ভাইকে সাথী শপথ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মো: আতিকুর রহমান ভাই। আমাদের পাশে আরো ছিলেন কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আতিকুর রহমান ভাই, প্রচার সম্পাদক আ.স.ম ইয়াহইয়া ভাই, ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন ভাই, বিতর্ক সম্পাদক সাজ্জাদ ভাই, শাহজাহানপুর থানা আমীর শামছুর রহমান ভাই, পল্লবী থানা আমীর আব্দুস সালাম ভাইসহ আরো অনেক বড় বড় দায়িত্বশীল ভাইয়েরা। আমাদের মহানগরীর ১৬-১৮ জন ভাই ছিলাম শুধু ৬ নম্বর বিল্ডিং এ। এদের মধ্যে মহানগরীর সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক তোজাম্মেল হক ভাই। লালবাগ থানা সভাপতি জাকির হোসেন ভাই, স্কুল সবুজবাগের সভাপতি হাফিজুর রহমান, মুগদা থানা সভাপতি এহসানুল হক মাহবুব, মুগদা থানা সেক্রেটারি এ.এইচ.এম. সাইফুল্লাহ ভাইসহ অনেকে। ১১ নং ওয়ার্ডে আমাদের সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় সমাজ সেবা সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান আশু ভাই, মিরপুরের সানাউল্লাহ চাচা, রাজশাহীর মেহেদী ভাই, ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান অনুষদ সেক্রেটারি মেহেদী হাসান সানি ভাই, তামিরুল মিল্লাত টঙ্গী শাখার আতাউল্লাহ বুখারী, চকবাজারের খালেদ সাইফুল্লাহ, গার্মেন্টসকর্মী সুমন শেখ। সম্মানিত পাঠক দ্বীনি ভাই ও বোনেরা যে স্মৃতি ও প্রেরণার কথা বলার জন্য আমার এই প্রয়াস তাহল উপরে যে সব ভাইয়ের নাম লিখছি আর যাদের নাম লিখিনি আমাদের সবার ঐক্যবদ্ধ এবং সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় আমাদের দাওয়াতি কাজ এবং অন্যান্য সাংগঠনিক তৎপরতা মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সংগঠনের যে পরিচিতি কায়েদি এবং হাজিতদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম তার মধ্য দিয়ে অনেকেই আমাদের সংগঠনকে ভালবাসতে শুরু করেছে আলহামদুলিল্লাহ। কয়েদি এবং অন্যান্য হাজতিদের অনেকে মনোভাব প্রকাশ করেছে যে, যদি জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের চরিত্র ও কাজ আমরা যা দেখছি তাই হয় তাহলে তাদের আদর্শ গ্রহণ করতে আমাদের কোন বাধা নেই। অনেকেই জেলজীবন থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের সংগঠনের সাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ সেই ভাইদের কবুল করুন তার দ্বীনের পথে (আমিন)

বর্তমান স্বৈরাচারী, জুলুমবাজ আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত ৫ বছরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির এবং ইসলামী ছাত্রীসংস্থার হাজার হাজার ভাই ও বোনেরা যে জুলুম, নির্যাতন এবং কারাবরণের শিকার হয়েছেন তা অনেকেই অন্য চোখে দেখলেও আমি ইসলামী আন্দোলনের একজন নগণ্য কর্মী হিসেবে এটাকে ইতিবাচক দেখতে চাই। কারণ যেখানেই ইসলামী আন্দোলন জুলুমের শিকার হয়েছে সেখানেই আন্দোলন বিজয়ী হয়েছে। আমাদের এই জুলুম নির্যাতনের পরই বিজয় সুচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

লেখক : অফিস সম্পাদক
ঢাকা মহানগরী পূর্ব।

www.pathagar.com

স্মৃতিময় F10

২০১২ সালের শুরুর কথা তখন থাকতাম, শান্তিবাগে ৪২ নম্বর বাসায়। সভাপতির চিন্তা ছিল সকল দায়িত্বশীল ভাই একই বাসায় থাকলে কাজের জন্য ভাল হবে তাই একটা বড় বাসার দরকার। আমি আর এনাম ভাই বের হলাম বড় বাসা খুঁজতে সেই সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাসা খুঁজলাম। অবশেষে একটা বড় বাসা পাইলাম শান্তিগর স্কাই ভিউ পার্ক সিটি F10, যেখানে মহানগরীর প্রায় সকল দায়িত্ববান ভাইয়েরা থাকতাম।

সেদিন ছিল ২৪/১২/২০১২ ইং রবিবার, দিনটি শুরু হয়ে তৎকালীন মহানগরী আমার শ্রদ্ধেয় দায়িত্বশীল শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির ভাই-এর সাথে। রাত্রে বাসায় না থেকে দুই ভাই বাহিরে ছিলাম। সকালে বাসায় আসলাম সেদিন ছিল আমার ১১ সিমিষ্টারের ফাইনাল পরীক্ষা এনাম ভাই ওনার ইউনিকম হোন্ডাটা আমাকে দিয়ে বললেন ১০টায় বিক্ষোভ মিছিল আছে মহাখালিতে মিছিল শেষ করে মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম বুলবুল ভাইকে নিতে হবে। বুলবুল ভাইকে যথাস্থানে পৌছানোর পর আপনি পরীক্ষা দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। আর আমরা সবাই (রানাভাই, নুরু উদ্দিন ভাইকে আ: মুমিন ভাই, রওশন ভাই, মিঠু ভাইসহ) তৎকালীন মহানগরী সাহিত্য সম্পাদক মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম ভাই-এর ছোট বোনের বিয়েতে ফেনী যাবো। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাই হলে। আমি গেলাম আমার কাজে বাকি ভাইরা তাদের কাজে। বিকাল ৪.৩০ মি: পরীক্ষা শেষ দুপুরে খাইনি, গোসল হয়নি তাই আর দেরি নয় হোন্ডা নিয়ে একটানে বাসায়। এসে দেখি বাকি সবাই যথাস্থানে চলে গেছেন। ডাইনিং টেবিলে আছে দুই পিস মাছ দেরি না করে এক পিস খাইলাম আর এক পিস রাখলাম রাতের জন্য। শীতের দিন গোসল করতে কষ্ট হলে পানি গরম করতে দিলাম গোসল করব। পানি গরম হচ্ছে আমি একটু ফেজবুক খুলি, কম্পিউটার খুলতেই কলিং বেল বেজে ওঠে কিরিং কিরিং। ভাবলাম কাজের ছেলেটা আসছে দ্রুত দরজা খুললাম। খুলতেই দেখি পল্টন থানার ওসি গোলাম সারোয়ার সহ তারা আরো ১০-১২ জন। সারোয়ার আমাকে দেখেই চিনে ফেলল, বলল পাইছি এত বড় নেতা, কিরে চল ভেতরে আর কে আছে বল। এই সেই সারোয়ার যে প্রথমবার খানবাশমতি থেকে আমাদের গ্রেফতার করেছিল। বাসায় ঢুকলেন তিনি এবং তার টিম তারপর যা হবার তাই...(প্রায় দুই বস্তা ডকুমেন্ট ১০/১২ মোবইল সেট, একটা লেপটপ, শরিফ ভাই-এর ড্রয়ারে থাকা প্রায় ১,২০,০০০ টাকা। ওসির ধারণা এখানে

www.pathagar.com

কোন মিটিং চলছিল আমাদের টের পেয়ে তাড়াহুড়া করে সবাই নেমে গেছে। ধারণার কারণ ছিল, এনাম ভাইরা ফেনীতে যাওয়ার সময় তাদের স্যান্ডেল জুতাগুলো এলোমেলোভাবে রেখে তাড়াতড়ি চলে গেছেন এটা দেখে ওসির ধারণা সবাই তাড়াহুড়া করে পালিয়েছে জুতা মোবাইল নেয়ার সময় পায়নি। শুরু হলো আমার উপর অমানুষিক নির্যাতন। দাবি একটায় মিটিং-এ কে কে ছিল তাদের ধরিয়ে দিতে হবে। বাসায় কিছুক্ষণ নির্যাতনের পর আমাকে নিলেন থানায় ওসির রুমে। শীতের দিন ওসি আমাকে মাটিতে শোয়াতে বললেন কথামত শোয়ানো হল তারপর শুরু...

এক পর্যায়ে ওসি সাহেব ঘেমে গেলেন। শরীর থেকে সকল জামা খুলে ফেললেন এবং ফ্যান চালিয়ে দিলেন। বুঝতেই পারছেন কনকনে শীতের মধ্যে জামাকাপড় খুলে ফ্যান ছাড়তে হলো। এবার নির্দেশ এই একে পরিত্যক্ত মহিলা কারাগারে রাখ, কেউ যাতে ওর সাথে সাক্ষাৎ করতে না পারে ওকে নিয়ে রাত্রে অভিযানে যাব। তাই করা হল। রাত তখন ৩.০০ টা আমাকে ডাকা হলো আবার ওসি সাহেবের রুমে । এই বেটা চল তোকে নিয়ে অভিযানে যাব, কোথায় কোথায় নিবি বল কাকে কাকে ধরিয়ে দিবি বল, তারপর আবার খানিক নাস্তা। আমাকে কোথায় না নেওয়ায় বলল বেটাকে লক আপে দে সকালে এডিসি স্যার কে দিব, ২৫ তারিখ সকাল ১০.০০টার একটু পর এডিসি আসাদুজ্জামান স্যারের রুমে নেওয়া হল, স্যার আমার সকল পরিচয় শুনলেন তারপর শুরু তৃতীয় দফা নির্যাতন। তিনিই একই বিষয়ে জানতে চাইলেন আমি কাকে কাকে ধরিয়ে দিব। তার কথা বার্তাতে চাইলে ধরিয়ে দিতে হবে না হলে এই একে নিয়ে যাব আর তুই শোন তোকে নিয়ে রাত্রে অভিযানে যাব কাকে কাকে ধরিয়ে দিবি ঠিক কর যা, চলে গেল ২৫ তারিখ, রাত্রে আর চালান না করে ২৬ তারিখ সকালে শরিফ আসলেন লক আপে। এই তোজাম্মেলকে বললাম আমি ফিরে দুই দিন হলো তোর বাড়ি থেকে কেউ আমার সাথে যোগাযোগ করল না। শোন আমি তোর মামলার আইও তোর ফ্যামিলির কে আছে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বল। কিছুক্ষণ পর এক কনষ্টেবল এসে নাম ডাকলেন এবং আমাকে নিয়ে আইওর কাছে গেলেন। আইও সাহেব টাকা চান তাই তার মোবাইল দিয়ে আমার বাবার সাথে কথা বলিয়ে দিলেন এবং টাকা নিয়ে যোগাযোগ করতে বললেন। তার পর শুরু হলো ৪র্থ বারের মত নির্যাতন। আমার অবস্থা এত বেশি খারাপ ছিল যে জজ সাহেব রিমান্ড না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। রিমান্ডে যেন নিতেই হবে একটা একটা করে মামলা দেয় আর রিমান্ড চায় এই ভাবে চারটা মামলা দেওয়া হলো কোন মামলায় আর রিমান্ড মঞ্জুর হল না। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের আমদানিতে প্রায় ১৭ দিন তারপর কাশিমপুর কারাগারে ২ এর ৬/১২ তে প্রায় ৬ মাস কেটে যায় এরই মধ্যে আমার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ বাকি সকল বন্ধুরা মাস্টারে আমি জেলখানায় ৬ মাস ভালই কাটল, কষ্ট হলেও দুনিয়ার ভেতরের আর একটি দুনিয়াকে খুঁজে পেলাম। সপ্তাহে প্রায় ২/৩ দিন কোর্টে আসতাম পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি হাতে হ্যান্ডকাফ কাশিমপুর হতে সিএমএম কোর্টে প্রিজন ভ্যান, গারদখানায় বসে এক প্যাকেট বিরিয়ানি এ এক অন্য রকম জীবন।

নিয়মিত কুরআন, হাসিদ ইসলামী সাহিত্য আর ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে ভালই কাটে ৬টি মাস। তারপর একদিন সকালে ডাক আসল আপনার জামিন হয়েছে। তারপর আবার আপনাদের মাঝে।

লেখক : সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
ঢাকা মহানগরী পূর্ব।

www.pathagar.com

মিডিয়া ও তথ্যসন্ত্রাসের শিকার ছাত্রশিবির

মহানগরী পূর্ব আমাদের হৃদয়ের একটি স্পন্দনের নাম। আর এই মহানগরীর জনশক্তি হতে পেরে আরও বেশি গর্বিত। অনেকদিন পর মহানগরী পূর্বের একটি স্মারক বের করা হবে। সিদ্ধান্ত হওয়ার পর থকেই মনে এক ধরনের আনন্দের খেলা চলছিল। আর সেটা যদি হয় যুগ পূর্তি তাহলে তো কথাই নেই। মহানগরী সভাপতির কথা সকল সেক্রেটারি ভাইকে অবশ্যই ১টা লেখা যা স্মৃতিচারণ করতে হবে। তাই হয়তো লিখতে বসা, লেখালেখির অভ্যাস আমার নেই। আর স্মৃতিচারণের অর্থই হয়তো জানি না। তারপরও সাহস করে লিখতে বসা।

তুমি যাবে ভাই, যাবে মোর সাথে আমাদের সে গাঁয়
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের যায়।

আমি গ্রামের ছেলে, গ্রামই আমার ভাল লাগে। তাই আমার গ্রাম থেকে শুরু করছি। ২০০৪ সাল এইচএসসি পরীক্ষা শেষ। মাথায় নেই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার চিন্তা। সারাদিন শুধু খেলাধুলা আর সাংগঠনিক কাজ ছাড়া তেমন কোন কাজ নেই। যদিও সমাজের অনেক সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলাম বিশেষ করে মসজিদ ও ঈদগাহ হৈ-হুল্লোড় আর আনন্দের মধ্যে দিন ভালই কাটছিলো। আমার ইচ্ছা ছিল থানা সদরের ডিগ্রি কলেজে পড়ালেখা করবো। আর শুধু সংগঠন করবো। কারণ আমি জানি আমার বাইরে গিয়ে পড়ালেখার খরচ আমার বাবা দিতে পারবেন না।

এমনিতেই বড় পরিবার, আর পানি বাদে সবই কিনে খেতে হয় তাই বাবার এই ছোট চাকরি দিয়ে আমাকে বাইরে পড়াতে পারবেন না। আর আমার পরিবার, পরেই আমার দায়িত্ব আবার থানা সেক্রেটারি তাই সাংগঠনিক চিন্তায়ও বাইরে যাওয়ার সাহস করতে পারি নাই।

www.pathagar.com

কিন্তু বাবার চিন্তা আলাদা, কারণ আমি সংগঠন করি এটা বাবা পছন্দ করেন না। আর আমাদের বংশের মধ্যে কেউ কখনও সংগঠন বা ইসলামী আন্দোলন করেনি। বাবার চিন্তা আমি বাড়ি থাকলে সংগঠন করবোই আমাকে পড়ালেখার জন্য বাইরে পাঠাতে হবে বাবার ইচ্ছাই পুনর্বহল, কোন প্রকার প্রস্তুতি ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা কলেজে ভর্তিযুদ্ধে শামিল হলাম। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কোন মতে টিকলেও বাদ সাধলো বাবার আপত্তি, কারণ ইবিতে ছাত্রশিবিরের ঘাঁটি তাই ভর্তি হওয়া যাবে না। অবশেষে ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। কিছুদিন (১৫) দিন মিরপুর, এরপর আবাসিক ঠিকানা হল লালবাগের ৬২ নং ওয়ার্ড সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে ঢাকায় দায়িত্ব পালন শুরু হল।

পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যের সাথে মিশে নতুন অভিজ্ঞতা যেন মাত্র শুরু হলো। বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালন করে। থানা অর্থসম্পাদক, সেক্রেটারি এবং সভাপতি হিসেবে লালবাগ থানার খেদমত করার সুযোগ আল্লাহ আমাকে করে দিয়েছেন। ২০০৫ সাল থেকে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত লালবাগের আলো বাতাস হয়তো আমার জন্য নির্ধারিত ছিল। এর পর ২০১১ সালের জুলাই মাসে আসে আমার ওপর রমনা থানার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত রমনা থানার খেদমতে থেকে মহান আল্লাহ আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিলেন। কারণ এখানে সবসময় দেখা হতো জামায়াত ও শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে। আর বাসা বাড়ির কথা বললে প্রায়ই কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলের বাসায় যাওয়া এবং দোয়া নেয়ার সুযোগ হতো। ২০১২ সালের জুলাই থেকে মহানগরী ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক হিসেবে সেক্রেটারিয়েট বিভাগে দায়িত্ব শুরু। ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার কারণেই খুবই কাছ থেকে দেখার সুযোগ হলো। এই সংগঠনের উপর জুলুম নির্যাতন এবং অপপ্রচার চালানো হয়।

যে কোন যায়গা থেকে একজন ভাইকে ধরে এনে মিথ্যা মামলা দিয়ে রিমান্ডের নামে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। এমনকি হাত পা ভেঙ্গে, আঙ্গুলের নখ পর্যন্ত তুলে ফেলা হয়েছে শুধু মারধর করেই ক্ষান্ত হয়নি, রিমান্ডে এনে বিভিন্ন সময়ে মোটা অংকের টাকা দাবি করে না দিলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি, ক্রসফায়ার এবং একটার পর একটা মামলা দিবে বলে হুমকি দেয়। টাকা দিলেও অনেক সময় একের পর এক মামলা দিয়েই যায়। তারা যেন সরকার থেকে জুলুম নির্যাতন এবং রিমান্ড লিজ নিয়েছে। যে কোন কারণে ধরেই কোর্টে পাঠায় এবং ৭-১০ দিনের রিমান্ড চায়। আর আদালত আসামির উপর অন্যায়ভাবে (১-৫) দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

এমনও হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে যখন রিমান্ড শেষে কোন ভাইকে কোর্টে তুলেছে তার শারীরিক অবস্থা এমন হয়েছে তারদিকে তাকালেই চোখ দিয়ে এমনিতেই পানি চলে আসে। অনেক কষ্টে পানি ঠেকিয়ে ওই ভাইকে সান্তনা দিতে হত। কোর্টে দায়িত্ব পালনের কারণে এমনও হয়েছে কোর্টে কোন কাজ নেই। তারপরও মনে হতো আমার কোন ভাইকে হয়তো কোর্টে নিয়ে আসলো কিনা। কোন কাজ না থাকলেও আইনজীবীদের ফোন দিয়ে খোঁজ নিতাম কোর্টের অবস্থা কী?

সবচেয়ে খারাপ লাগতো একজন ভাইকে ধরে কোর্টে আনার আগে বেধড়কভাবে পিটিয়ে এমন ভাবে আহত করেছে যে, সে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তারপরও তাকে টেনে হিঁচড়ে কোর্টে তুলছে এবং রিমান্ড মঞ্জুর হচ্ছে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে একজন ভাইকে ধরে মেরে, বিভিন্ন যায়গায় অভিযান চালিয়ে বাসা বাড়ির মূল্যবান সম্পদ, টাকা পয়সা কম্পিউটার

www.pathagar.com

নিয়ে গিয়ে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জব্দ তালিকা ছাড়াই দুই তিন দিন পর কোর্টে তুলছে এমন ঘটনাও ঘটেছে ধরার পরে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করেছে।

আর জামিনের পর জেলগেট থেকে ধরে এনে আবার নতুন মামলা দেওয়া যেন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, কোন কোন ভাই বলেছে জামিন হওয়ার পরে জেলগেট থেকে রিএরেষ্ট হয়ে মামলা বাড়ানোর চেয়ে জামিন না করালেই ভাল। আবার জামিন হলেও জেলগেট ম্যানেজ করার কথা বলতো। আর কারাগারএ যেন টাকার খনি। একটা ইটও যেন টাকা ছাড়া কথা বলে না। একবার নিজে গ্রেফতার হওয়ার কারণে স্ব চোখে দেখে এসেছি কিভাবে দুর্নীতি হয়।

ছাত্রকল্যাণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার কারণে সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকতাম এই ভেবে যে, আমি কি আমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছি। তাই মনে মনে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতাম আল্লাহ আমাকে এই কঠিন দায়িত্ব থেকে মুক্তি দাও, আমি এই দায়িত্ব পালনের যোগ্য নই। আল্লাহ হয়তো শুনেছেন, তাই ২০১৩ সালের জুলাই মাসে আমার নতুন দায়িত্ব মহানগরী স্কুল ও বিতর্ক সম্পাদক। এখনো মনে হয় মহানগরীতে অনেক গুরুত্বপুর্ণ স্কুল, হাজার হাজার ছাত্র আমি কি পারবো স্কুল দায়িত্বশীলদের সাথে নিয়ে সকল ছাত্রের কাছে ইসলামের আহবান পৌছে দিতে। মনে অনেক ভয় কাজ করে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার চিন্তায়। সবাই আমার এবং স্কুলের ভাইদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ আমাদের যোগ্যতাকে আরও যেন বাড়িয়ে দেয় এবং আমার ভুল ক্রটিকে মাফ করে দেন। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির এক বিপ্লবী চেতনার নাম। এই নামটি মানুষের মনে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখাতে এবং চেতনা জাগাতে সক্ষম হয়েছে বলে আমি মনে করি। অপর পক্ষে এই নামটি স্পন্দন ধরাতে সক্ষম হয়েছে ইসলামবিদ্বেষী এবং নাস্তিকদের হৃদয় যন্ত্রে। তাই তারা ষড়যন্ত্রে মেতেছে এই সংগঠনটির বিরুদ্ধে। শুধু তাদের কথা বললে ভুল হবে। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারও উঠে পড়ে লেগেছে কিভাবে এই সংগঠনটাকে মানুষের কাছে খারাপ হিসেবে প্রকাশ করা যায়। তাই তারা খুবই নির্লজ্জ ভাবে ব্যবহার করছে প্রশাসনকে। বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে নিরীহ সকল ছাত্রকে ধরে এনে, তাদের বাসা বাড়ি থেকে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী বই এনে এগুলোকে জিহাদী বই হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছে। আর বাসা, মেস, হোটেল থেকে ধরে এনে বলছে এরা দেশবিরোধী, সরকার বিরোধী, যুদ্ধঅপরাধ বিরোধী গোপন বৈঠক করছে। সবচেয়ে উদ্বেগ এবং আশ্চর্যের বিষয় হল তারা তাদের সঙ্গে করে ককটেল, টেপ ও তার সদৃশ্য বস্তু নিয়ে বলছে বোমা তৈরীর সরাঞ্জামসহ গ্রেফতার করা হয়েছে। অনেককাংশে অন্য বিপথগামী সংগঠনের লোককে ধরে জামায়াত শিবির হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছে। আর কিছু সরকারের চাটুকার মিডিয়া বার বার জামায়াত শিবিরের কাজ বলে প্রচার করছে। শুধু একটা করে তারা ক্ষান্ত হয়নি। অন্য লোককে টাকা দিয়ে শিবিরের নামে মিথ্যা সাক্ষাৎকার হিসেবে প্রচার করছে।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের দলীয় কোন্দলে আহত নিহতদের শিবিরের কর্মকাণ্ড হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি বহু আলোচিত তত্বী হত্যাকান্ডও শিবির ঘটিয়েছে বলে দাবি করে মিথ্যা সংবাদ ছেপেছে এবং প্রকাশ করেছে। বিশ্বজিৎ হয়তো হিন্দু বলে জামায়াত শিবির এর দায় থেকে বেঁচে গেছে। নয়তো এই দায়টাও জামায়াত শিবিরের উপরে চালাত। সবচেয়ে হাসির নাটক মখা আলমগীর যে রানা প্লাজার জন্য জামায়াত শিবির পিলার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে আরও অনেক এমন ঘটনা জামায়াত শিবির নামে চালিয়েছে।

www.pathagar.com

সর্বশেষ তথাকথিত প্রহসনের নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় দেশের যে কয়েকটি জেলায় হামলা হয়েছে তাও তারা নির্লজ্জ ভাবে জামায়াত শিবিরের উপর চাপিয়েছে। আওয়ামী লীগ তাদের দলীয় লোকদেরকে দিয়ে করিয়ে বিরোধী দলের উপর চাপিয়েছে। সবচেয়ে আলোচিত যশোর এর মালো পাড়ার ঘটনাও তারা ঘটিয়েছে। এটার প্রমাণ স্থানীয় আক্রান্ত ব্যক্তিরা এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলো ফলাও করে প্রচার করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলনকারী আ স ম আব্দুর রব এর কথা শুনলেই বুঝা যায় কারা এটা ঘটিয়েছে। তিনি বলেন- আওয়ামী লীগ মনে করে থাকলে ভোট পাব। আর চলে গেলে জমি পাব।

হিন্দুরা সবসময় বেশির ভাগই আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় তাই তারা জানে শত নির্যাতনে এলাকা ছেড়ে চলে গেলে সেই জমি আওয়ামী লীগের কর্মীরা ভাগ করে নিয়ে যাবে। তাই তারা নির্যাতন করে দোষ জামায়াত শিবিরের উপর চাপায়।

তাই নিজেদের অস্তিত্বের সংকটে এবং মিডিয়াগুলো সরকারের পক্ষ নিয়ে জামায়াত শিবিরের উপর নির্লজ্জ মিথ্যাচার করছে। নিজেরা নিজেদের দলীয় কোন্দলের শিকারে পরিণত হয়ে শিবিরের উপর সেটার দায় চাপাচ্ছে। আরও অনেক এ রকম ঘটনা ঘটছে।

তবে এটুকু বলতে চাই ছাত্রশিবির তাদের আদর্শ দিয়ে সারা দেশের মানুষের কাছে যে নমুনা পেশ করেছে। তাতে মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রচারণা চালিয়ে ছাত্রশিবিরকে দুর্বল করা যাবে না এবং বর্তমানে দেশের সচেতন নাগরিক সমাজ বাংলাদেশে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে গ্রহণ করে তাদের আরও শক্তিশালী করবে ইনশাল্লাহ। আমাদেরকে আরও কুরআনের আলোতে বলীয়ান হয়ে কাজ করতে হবে এই কামনায় দোয়া চেয়ে শেষ করছি, আল্লাহ হাফেজ।

লেখক : স্কুল কার্যক্রম সম্পাদক
ঢাকা মহানগরী পূর্ব

www.pathagar.com

ঝরা পাতা

২০১৪ সাল। ২০০২ থেকে শুরু। প্রায় এক যুগ পার হয়ে গেল এই মহানগরীতে। এই তো সেদিনের কথা ২০০২ সালে দাখিল পাস করার পর উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়ায় আলিম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। ঢাকা আসার আগেই অবশ্য বাংলাদেশের হাজারো তরুণের প্রিয় কাফেলা 'শহীদি কাফেলা' তথা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী ছিলাম। আজ লিখতে গিয়ে হাজারো স্মৃতি মনে পড়ে, তার মধ্যে থেকে দু-একটি ঘটনা বলেই ইতি টানবো ইনশাআল্লাহ।

ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা, ঢাকা মহানগর ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের খুবই গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এখানে যেমন রয়েছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠসমূহ, তেমনি ইসলামী আন্দোলনের স্পন্দন শহীদ ভাইয়েরা শুয়ে আছেন। এক কথায় বলা চলে ঢাকার ভেতরে আরেক ঢাকা হলো ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা। এই শাখার মধ্যে দু'টি ময়দান রয়েছে, যেখানে শহীদ ভাইয়েরা সদাজাগ্রত। তার প্রথমটি হলো সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া ঢাকা আর দ্বিতীয়টি হলো সবুজবাগ থানা। দুই ময়দানেই কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলেন আল্লাহ আমাকে। আসলে সবার ভাগ্যে এ রকম ময়দানে কাজ করার সুযোগ হয় না। আল্লাহ যাদেরকে চান তাদেরকে এমন ময়দানে কাজ করার সুযোগ দেন। আল্লাহর শুকরিয়া। আলহামদুলিল্লাহ।

মহান রবের আরো শুকরিয়া যে, আমার মতো এত অধম গুনাহগার বান্দা এই রকম শহীদি ময়দানে প্রথমে কর্মী পরে দায়িত্বশীল হিসেবে কাজ করতে পারার জন্য। কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, যারা এত মেধাবী ছিল না, সংগঠনও বেশি বুঝত না এবং এই ঢাকা শহরের

www.pathagar.com

মোহে আকৃষ্ট ছিল না কিন্তু সংগঠন ও দায়িত্বশীলদের আনুগত্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেছে তারাই টিকে ছিল ও আছে। আর যে বা যারা অধিক মেধাবী, সংগঠনকে ভালো বুঝতো কিন্তু সংগঠনের আনুগত্য ও শৃঙ্খলা মানতো না তারা আজ বিপথগামী হয়ে গেছে। তারা এমন কোন হীন কাজ নেই যা এখন করতে দ্বিধা করে না। আমরা আলিয়া মাদরাসায় দেখেছি, অনেক মেধাবী, অনেক সম্ভাবনাময়ী দায়িত্বশীল, যারা কেবল দুনিয়ার মোহে এবং সংগঠন ও দায়িত্বশীলদের আনুগত্যহীনতায় অকালে ঝরে গেছেন। আমরা কয়েকজন ভাই একই দিনে সাথী হিসেবে শপথ নিই। কিন্তু তারা আজ কোথায় হারিয়ে গেছেন তার কোন হিসেব নেই। কিছু দিন পর থেকে কিছুসংখ্যকক ছাড়া বাকিরা সংগঠনের আনুগত্যহীনতার জন্য বিচ্যুত হয়ে গেছে। আর একটি ঘটনা বলি, যখন নতুন বছর শুরু হয়, সংগঠনের ইতিহাস-ঐতিহ্য অনুযায়ী নতুন দায়িত্বশীল নির্বাচিত বা মনোনীত করা হয়। এমন সময় অনেক সাথী, সদস্য ভাইদের ছাত্রাবাসের বাইরে আবাসিক থানায় ও ওয়ার্ডে নাম ঘোষণা হলে অনেকেই মন খারাপ করতো। এই ধরনের সিদ্ধান্ত অমান্য করতো। তাদেরকে আনুগত্যের মধ্যে আনতে দায়িত্বশীল ভাইদের কতো যে কষ্ট করতে হতো, যা খুবই দুঃখজনক। কিন্তু এমন কিছু জনশক্তি ছিল, যাদের সিদ্ধান্ত দেয়ার পর না করেছে বলে আমার মনে পড়ে না।

হ্যাঁ একবার না করেছিলাম কিন্তু তার ফলাফলও আমি সাথে সাথে পেয়ে ছিলাম। সেই সময়টা ২০০৪ সালের ঘটনা। ছাত্রাবাসের ডাইনিং-এর দায়িত্ব সাধারণত আমাদের ছাত্রভাইয়েরা পালন করে থাকে। কোনদিন আমি এই দায়িত্ব পালন করিনি। কিন্তু অনেক ছাত্রভাইকে দেখেছি, এই দায়িত্ব নেয়ার জন্য বার বার দায়িত্বশীল ভাইদের অনুরোধ করত। একবার শহীদ আমজাদ হোসাইন ভাই আলিয়ার তৎকালীন সভাপতি হিসেবে আমাকে ডাইনিংয়ের দায়িত্ব পালন করার জন্য সিদ্ধান্ত দেন। কিন্তু আমি এতে অপারগতা প্রকাশ করার সাথে সাথেই একটা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হই। আমজাদ ভাই আমার দেখা আলিয়া মাদরাসার ব্যতিক্রম এক থানা সভাপতি ছিলেন। কোন ছাত্রও আমাদের কোন জনশক্তির কোন অসুবিধা কিংবা সমস্যা জানতে পারলে সাথে সাথে তা সমাধানের চেষ্টা করতেন। সংগঠন ও দায়িত্বশীল যখন যে সিদ্ধান্ত দিবে তা অকপটে মেনে নেয়াই হলো একজন নিবেদিত কর্মীর অন্যতম দায়িত্ব। তা রক্ষা করার চেষ্টা এখন পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা দেখেছি এতেই কল্যাণ যদিও সাময়িকভাবে প্রথমে খারাপ লাগে কিন্তু স্থায়ীভাবে এটাই মঙ্গলজনক। আমার সংগঠন বলতে সবই ঢাকা আলিয়ায়। সংগঠনের কর্মী, সাথী, সদস্য ও দায়িত্বশীল সবই ঢাকা আলিয়া শুরু হয়।

সদস্য শপথ গ্রহণ করার তিন মাসের মাথায় আমাকে শহীদের আরেক ময়দান সবুজবাগ থানায় কাজ করার সিদ্ধান্ত দেয়। যদিও আমার ছাত্রাবাস ছেড়ে চলে যাওয়াটা কষ্ট হয়েছিল। সেই সময় ঢাকা আলিয়ায় আমার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ, মেধাবী ও দক্ষ দায়িত্বশীল ভাই যেমন- আসাদুল্লাহিল গালিব, আব্দুল মুনিম খান, আবু তালহা বশিরসহ আরো ৫-৬ জন সদস্য ছিলেন। কিন্তু আমাকে এমন একটা ময়দানের দায়িত্বশীল হিসাবে ঘোষণা করা হয়, সেখানে দায়িত্বশীল হিসাবে যাবার পূর্বে কখনও কাউকে চিনতাম না, জানতাম না। অজানা, অচেনা একটি ময়দানে মহানগরীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক চলে গেলাম সবুজবাগ থানায়। যে সময় আলিয়ার ছাত্রাবাসে থাকতে, খেতে যৎসামান্য টাকা ব্যয় করতে হতো। কিন্তু নতুন এলাকায়

www.pathagar.com

থাকা খাওয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতে খরচ অনেক বেড়ে গেল। তা কষ্টসাধ্য ব্যাপারও বটে। সকল কিছু মেনে নিয়েই চলে গেলাম নতুন ময়দানে। কিন্তু আমরা দেখেছি শুধুমাত্র আলিয়ার আশপাশ থানায় দায়িত্ব দেয়ার পর অনেক ভাই যাননি। এমনকি অনেক ভাইয়ের সাথী, সদস্য পদ পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে। আমার সবুজবাগ থানায় যাওয়ার এক মাস আগে আওয়ামী গুন্ডাবাহিনীর হাতে শাহাদাৎ বরণ করেন দুই অকুতোভয় বীর সৈনিক শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন ও শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুম অর্থাৎ ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারম উত্তর গেটসংলগ্ন স্থানে। তারা দু'জন ছিলেন ২৭ নম্বর ওয়ার্ড দক্ষিণের অর্থ সম্পাদক ও সেক্রেটারি। এই দুই ভাই এলাকায় এত জনপ্রিয় ছিলেন যে তাদের শাহাদাতের পর বোঝা গেল কোন ছাত্র, দোকানদার, প্রতিবেশী, শিক্ষক, সহপাঠী ছিল না যারা তাদের ব্যাপারে একটি খারাপ শব্দ উচ্চারণ করেন। সবাই তাদের এত ভালো বলেছেন যা খুবই অভাবনীয়। শহীদ শিপন ও মাসুম ভাইয়ের দু'টি ঘটনার কথা আপনাদের বলেই আমার লেখা শেষ করব।

শহীদ শিপন ছিলেন আল-কুরআনে হাফেজ এবং তিনি খুবই মেধাবী। তিনি সকলের সাথে এত মিশতেন এবং সবাইকে হাসি খুশিতে মাতিয়ে রাখতেন। তার শাহাদাতের পর এলাকাবাসী তার সাক্ষ্য দেন। কুরআনে হাফেজ হওয়ার কারণে তিনি অনেক ছাত্রভাইকে বিনা পয়সায় কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং অনেক ছাত্রের পড়াশোনার জন্য বই ও খরচের ব্যবস্থা করতেন, যা তার শাহাদাতের পর অনেক পরিবারের সদস্য এসে শহীদ শিপন ভাইয়ের পিতা-মাতাকে বলতো যে, আমার ছেলেকে সে বিনামূল্যে কুরআন শেখাতো। কেহ এসে বলত আমার ছেলের বইয়ের ব্যবস্থা করেছে শিপন। কেহ বলত আমার ছেলেকে বিনা মূল্যে অঙ্ক ও ইংরেজি পড়াতো শহীদ শিপন। তার সম্পর্কে শহীদের মা বলেন, শিপন মাঝে মাঝে এসে বলত, মা আমার কয়েকজন ছাত্র আছে তাদেরকে আজকে খাওয়াতে হবে। আমি রাজি হলে দেখতাম, সে তার টার্গেটকৃত মেধাবী ছাত্র, সংগঠনের সমর্থক, কর্মী ও সাথীদের দাওয়াত দিতো এবং সে সবাইকে নিজ হাতে খাওয়াতো। এভাবে সে অনেক ছাত্রকে কুরআন শেখাত, পড়াশোনার জন্য সহযোগিতা করত এবং এলাকার মেধাবী ছাত্র ও জনশক্তিদের সংগঠনে সম্পৃক্ত করত। আর শহীদ মাসুম ছিলেন খুবই চঞ্চল ও ডানপিটে স্বভাবের ছেলে। ছোটবেলা থেকেই তিনি খেলাধুলা পছন্দ করতেন। তার খেলাধুলা সম্পর্কে শাহাদাতের পর সাবেক জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক আশরাফুল বলতেন যে, মাসুম আজ বেঁচে থাকলে আমার চেয়েও ভাল ক্রিকেটার হতেন।

মাসুম ভাইকে খুব চোখে চোখে রাখতেন খালাম্মা। কিন্তু যে দ্বীনের জন্য পাগল তাকে কি আর আটকিয়ে রাখা যায়। শহীদের মা বলেন, একবার বিকালবেলা মাসুমকে বাসায় আসতে দেরি হতে দেখে আমি খেলার মাঠে চলে গেলাম। মাঠের একপাশ থেকে দেখি ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা শেষে সকলকে সাথে নিয়ে মাগরিবের নাজাজ আদায় করছে। আমি কিছু না বলে বাসায় এসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। কখন মাসুম ফিরবে? বাসায় ফিরলো অনেক রাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে? মাসুম বলে, আম্মু আমার এক বন্ধু অসুস্থ ছিল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং তার জন্য কয়েক ব্যাগ রক্ত জোগাড় করতে করতে রাত হয়ে গেল। শহীদ মাসুমের আম্মু বলেন, আমি তাকে কিছু না বলে শুধু

www.pathagar.com

বললাম, আমাকে জানালে তো পারতে। এই রকম স্বভাবের ছিল শহীদ মাসুম। শহীদ মাসুম সম্পর্কে তৎকালীন থানা সভাপতি সাইফুল্লাহ ভাই বলেন, আমি তাকে পড়ালেখার জন্য বিভিন্ন মিটিং মিছিল থেকে ছুটি দিতাম কিন্তু সে ঠিক সময়েই মিছিলে হাজির। মাসুম ভাই এত সুন্দর শ্লোগান দিতেন যাতে সবাই মজা করে শ্লোগান ধরত। অনেক সময় দেখতাম, মাসুম ভাই কাঁধে কলেজ ব্যাগসহ মিছিলে। কী ব্যাপার আপনি কোচিং কিংবা কলেজ বাদ দিয়ে চলে এসেছেন? তখন মাসুম ভাই মিষ্টি হেসে দিয়ে বলতেন, এই মিটিং মিছিল আমার ভালো লাগে।

উপসংহারে এই কথা বলতে চাই, আমরা যে ময়দানে কাজ করছি যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করে সকল জনশক্তিকে নিয়ে কাজ করা। এই ময়দানে অনেক শহীদের রক্ত রয়েছে। শহীদের কথা মনে রেখে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো। ঢাকা শহর খুবই মোহনীয় ও আকর্ষণীয় কিন্তু কোন অবস্থায় এই মোহে বা আকর্ষণে দ্বীনের কাজ ফেলে রেখে অন্য কাজে আবদ্ধ না হওয়া। সকল অবস্থায় সকল সময় সংগঠনের আনুগত্যের ভেতরে থাকা। সংগঠনের ও দায়িত্বশীলদের সিদ্ধান্ত অকপটে মেনে নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া। সকল সময় আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করা ও বেশি বেশি আল্লাহর রহমত ও সাহায্য চাওয়া।

সকল কাজের পেছনে যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা-ই মূল কাম্য হয় এবং শহীদদের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়নে সর্বশেষ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া– সর্বোপরি আল্লাহ যেন আমাদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন অথবা শহীদের সাথী হিসেবে আমৃত্যু তার দ্বীনের ওপর অটল রাখেন এবং দ্বীনের জন্য কবুল করেন। আমিন।

লেখক : সাবেক সাহিত্য ও প্রকাশনী সম্পাদক
ঢাকা মহানগরী পূর্ব

www.pathagar.com

সেই আমি এই আমি এবং ইসলামী ছাত্রশিবির

তখনো ডানপিটে ভাবটা যায়নি। কারো কথায় কর্ণপাত করতাম না। কাউকে মানতে চাইতাম না। নিজের একটা জগৎ আলাদা করে নিয়েছিলাম। বাবা-মা রীতিমতো দুশ্চিন্তায় থাকতেন এই ভেবে হয়তো এখনি তাদের সোনার টুকরো ছেলেটির নালিশ নিয়ে কোন সৌভাগ্যবান প্রতিবেশী আসবে। কারো ছেলেকে পিটুনি দিয়েছে অথবা কারো খেজুর গাছের রসের হাঁড়ির সব রস পাকস্থলীতে ভরে শূন্য হাঁড়ি ঝুলিয়েছে ইত্যাদি নানা রকম বাঁদরামির হরহামেশা নালিশ পেতে পেতে এমন অবস্থা হয়েছে যে যেদিন কেউ নালিশ নিয়ে আসতো না সেদিন আল্লাহর কাছে সোনার টুকরো ছেলের হঠাৎ ভাল হওয়া নিয়ে মা জননী দু'হাত তুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। এদিকে সিনেমা হলে গিয়ে বাংলা ছবি দেখার নেশাটাও এমনভাবে ভর করেছিল যে কোন নতুন সিনেমা আসলে না দেখা পর্যন্ত নিজেকে খুব ছোট ও অসহায় মনে হতো। এ অসহায়ত্ব সিনেমা দেখার টাকা জোগাড় না হওয়ার। বাবা মায়ের কাছে আমি আবির্ভূত হয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের ফটিকের মতো। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, পৃথিবীতে তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলের মতো এমন বালাই আর নেই। আমি আমার পরিবারে তেমনি একটা বালাই হিসেবে বিবেচিত ছিলাম। লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগী ছিলাম না। সারাদিন শুধু সীমাহীন দুষ্টুমি আর দুষ্টুমি। আমার বাবা খুব রাগী ছিলেন। সব সময় তার ভয়ে তটস্থ থাকতে হতো। আম্মু আমার জন্য কতো যে আব্বুর বকা খেয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। শত হলেও মায়ের মন তো। আমাকে যেমন রাগ করতো তেমনি আশ্রয়ও দিতো। আর আল্লাহর কাছে প্রচুর দোয়া করতো। তাহাজ্জুদ নামাজে প্রায়ই কান্না করতো তার ছেলেটা যেন মানুষের মতো মানুষ হয়। সে যেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারে।

www.pathagar.com

আমি এখনো আমার মূল লেখাটা শুরু করিনি। প্রেক্ষাপট বলতে আরেকটু সময় নেয়া জরুরি মনে করছি। আমি যেভাবে আজকের আমি হয়েছি তার পেছনে রয়েছে অনেক না বলা কথা। তার কিছুটা স্মৃতি রোমন্থন না করলে আমাকে যারা মানুষ বানিয়েছে তাদের ওপর অবিচার করা হবে। নিজের অতীত হয়তো অনেকে পুরোপুরি লিখেন না বা বলেন না। আমিও হয়তো পুরোটা বলতে পারবো না বা বলবো না। তবে যেটুকু না বললেই নয় তা থেকে কাউকে বঞ্চিত করব না। ঘুটঘুটে অন্ধকার পথ থেকে আলোর দিশা পাওয়া সবার ভাগ্যে জোটে না। যেমনটি জোটে নি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা মানিকের। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েছে ঠিকই কিন্তু ধর্ষণের সেঞ্চুরি পালন করে আমাদের জাতির মুখে কলঙ্ক লেপন করেছে। গোলাম ফারুর অভির কথা অনেকের হয়তো মনে থাকার কথা। স্ট্যান্ড করা ছাত্র গোলাম ফারুক অভিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিল। কিন্তু আদর্শহীন রাজনীতির ধারক বাহক অভি মডেল তারকা তিন্নিকে হত্যা করে। লিখতে গেলে এমন অসংখ্য নাম উঠে আসবে যারা অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথের সন্ধান না পেয়ে শুধু নষ্টই হয়নি অনেককে নষ্টও করেছেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমি সেই অন্ধকার পথ থেকে আলোর সন্ধান পেয়েছিলাম। যার পুরো কৃতিত্ব বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সৎ জাতিগঠনের কারিগর লক্ষ কোটি ছাত্রের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের।

২০০০ সালের কথা। এসএসসি পরীক্ষা দিয়েই পালিয়ে ঢাকায় চলে আসি। কেন পালিয়েছি? আগেই বলেছি প্রচন্ড রকম ডানপিটে ছিলাম। সিনেমা হলের কোন সিনেমা বাদ দিতাম না। এমনকি তখন প্রতি শুক্রবার বিটিভিতে বাংলা ছবি দেখার জন্য আব্বুর পকেট থেকে দুই টাকা পাঁচ টাকা মেরে দিতাম। একবার সিনেমা দেখার টাকা নেই। কী করি ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ বুদ্ধি আসলো নানা বাড়িতে সুপারি আছে। অমনি সাত আট কি.মি. পথ পায়ে হেঁটে রওয়ানা দিলাম। আমার সাথে যোগ দিল আমার আরেক যোগ্য সহযোগী সিনেমা পোকা খালাত ভাই। দুজনের ভাব এমন ছিল যে আমাদেরকে সবাই বলতো সমজভাই। যেখানেই যাই দুজন একসাথে। নানা বাড়িতে গিয়ে দেখি সুপারি গাছে সুপারি পেকে আছে। চুপচাপ দু জনে দুই গাছে উঠে পড়লাম। তড়িঘড়ি করে উঠতে গিয়ে বুকের চামড়ার কিছু অংশ ছিলে গিয়েছিল। দাঁত দিয়ে অনেক কষ্ট করে যখন সুপারি ছিঁড়ে নিচে নেমেছি তখন মনে হয় পৃথিবীর সকল লজ্জা ও ভয় আমাকে ঘিরে ধরেছিল। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্য অবলোকন করেছেন আমার ছোট খালা। তার চোখে চোখ পড়তেই দেখি তিনি মিটিমিটি হাসছেন। সে হাসি আমার কাছে টগবগে গরম পানি মাথায় ঢেলে দেয়ার মতো মনে হলো। যাক সে দিনের মতো পার পাওয়া গেল। আমার এমন এলোমেলো নিয়ন্ত্রণহীন জীবনের কারণেই পরীক্ষা ভাল হয়নি তাই পরীক্ষার পর পরই আব্বুর ভয়ে ঢাকায় পালিয়ে আসি।

এরপর শুরু হয় আরেক নতুন অভিজ্ঞতা। আসলে ঐ সময়ের বয়সটাই যেন কেমন? ভাল সংশ্রব না পেলে নির্ঘাত জীবন নষ্ট হবে। আমার এলাকার আরেকটা ছেলের সাথে শাহাজাহানপুর রেলওয়ে কলোনি মসজিদে একটি রুমে ভাড়া থাকি। ঠিক মনে নেই তবে কারো একজনের সহযোগিতায় খিলগাঁও একটি গার্মেন্টসে কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর হিসেবে চাকরি নেই। শুরু হয় মানবেতর জীবন যাপনের আরেক অধ্যায়। আমার এই অধ্যায়ের কথা অনেকেই জানেন না। কিন্তু এই লেখাটি যেহেতু ইসলামী ছাত্রশিবিরের জন্য বলা জরুরি মনে

www.pathagar.com

করছি। কারো জীবনের জন্য উপকারেও আসতে পারে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে রান্না করা। তারপর কাজে যাওয়া। রাত দশটা বা বারোটায় রুমে ফেরা। এভাবে চলছিল সে সময়ের দিনগুলো। সূর্যের আলোর দেখা মিলতো না। রান্না করে যা খেতাম তা আলু ভাজি আর ভাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে আমি। আদর আহ্লাদের কমতি ছিল না। নিজের কাপড়ও কখনো নিজে ধুতে পারতাম না। আমার হাত পায়ের নখগুলোও সবসময় আম্মু কেটে দিত। সেই আমি ঢাকায় আসা, রান্না করা তারচেয়ে বড় কথা গার্মেন্টেসে চাকরি করা ভাবা যায়? আমার মামা তখন শিবিরের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগে সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। কেন্দ্রীয় অফিসের সপ্তম তলায় থাকতেন। তিনিও জানতেন না আমি এমন একটা জায়গায় আছি। আব্বুর এক খালু আমি যেখানে থাকতাম তার পাশেই থাকতো। রেলওয়ের কর্মকর্তা ছিলেন। আমি সবার কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। হঠাৎ একদিন তার সাথে আমার দেখা হয়ে যায়। ব্যাস, বাড়ি পর্যন্ত খবর পৌঁছে যায়। আব্বু ঢাকায় চলে আসেন। ইতি ঘটে কয়েক মাসের গার্মেন্টস জীবনের।

আমার সেই খালাত ভাই যার সাথে আমার গলায় গলায় পিরিত ছিল। সে আমার আগেই ঢাকায় এসেছিল। কামরাঙ্গীরচরে এক বাসায় লজিং থাকতো। ছোট মামা আমাকে তার কাছ পাঠিয়ে দেয়। তখন কামরাঙ্গীরচর থানা শিবিরের সভাপতি ছিলেন সেলিম হোসাইন ভাই। থানা অফিস যে বাসায় সে বাসার মালিকের বাসায়ই লজিংয়ের ব্যবস্থা হয়। তবে থাকতে হয় নিচতলায় শিবিরের মেসে আর খেতে হয় লজিং বাসায়। যেহেতু শিবিরের মেসে থাকি সেহেতু তাদের সাথে নামাজ পড়তে হতো। কি একটা বিষয় নিয়ে একদিন থানা সভাপতির সাথে আমার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে একটা চড় মারেন। আমি কিন্তু তখনো সংগঠন করি না। যথারীতি মামার কাছে নালিশ করলাম। মামা তখন কেন্দ্রীয় অফিসের সাত তলায় মহানগরী দক্ষিণের দায়িত্বশীলদের সাথে থাকতেন। হাফেজ আব্দুল্লাহ আল আরিফ ভাই তখন মহানগরী সভাপতি। তখন যারা মহানগরী সেক্রেটারিয়েটে ছিলেন সবাই পরবর্তীতে বড় দায়িত্ব পালন করেছেন। আবু সাঈদ মু. ফারুক, আজিজুর রহমান, মুস্তাফিজুর রহমান, শাহদাতুল্লাহ টুটুল প্রমুখ তাদের মধ্যে অন্যতম। উনাদের ব্যবহার আমাকে খুবই মুগ্ধ করতো। আমি প্রায়ই সপ্তম তলায় এসে মামার কাছে থাকতাম শুধু এই লোকগুলোর সাহচর্য পাওয়ার জন্য। মনে হতো একটা জান্নাতি পরিবেশ। যেমন অমায়িক ব্যবহার তেমনি তাদের মিষ্টি কথা। ইসলামি আন্দোলন করলে মানুষের চেহারায়ও এক ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। আমি প্রায়ই সেই পবিত্র চেহারাগুলো দেখতে আসতাম। একটা লোভ আমাকে সব সময় আকর্ষণ করতো। তা হলো জান্নাতি পরিবেশ। সব ভুলে যেতাম। ওখানে আসলে আর যেতে ইচ্ছে করতো না। যাহোক মামা নালিশ শুনে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন আমি এখনো পরিবেশের সাথে মানিয়ে উঠতে পারিনি।

আমার সভাপতি হাল ছাড়েননি। তিনি আমাকে তার সাথে করে বিভিন্ন যায়গায় নিয়ে যেতেন। আমি কিছুটা অবাকই হতাম এই ভেবে একজন থানা সভাপতি আমার মতো নগণ্য একজন মানুষকে কেন এভাবে সাথে সাথে রাখতেন। তিনি আসলে একজন বিচক্ষণ দায়িত্বশীল ছিলেন। সাথে সাথে রেখে ইসলামী আন্দোলন বুঝানোর কাজটি অনেক নিখুঁতভাবে করেছে। একজন সত্যিকার দায়ীর মূল কাজ মনে হয় এটিই। কাউকে বক্তৃতা

www.pathagar.com

দিয়ে যতটানা আকৃষ্ট করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি করা যায় বাস্তব ময়দান থেকে তিলে তিলে গড়ে তোলে। সেখানে কৃত্রিমতার কোন সুযোগ থাকে না, অভিনয়ের যায়গাও থাকে না। সে অর্থে তিনি সফল একজন দায়িত্বশীল ছিলেন। উনার অক্লান্ত পরিশ্রম আর লেগে থাকার ফলে সর্বোপরি আল্লাহর অপার মেহেরবানিতে রমজান মাসের বিকেল বেলা আমার সাথী শপথ হয়। সেদিনের সেই অনুভূতির কথা আমি জীবনে কখনো ভুলবো না। তখন মহানগরী পূর্বের সভাপতি ছিলেন প্রিয় আজিজুর রহমান ভাই। তিনিই মহানগরী পূর্বের প্রথম সভাপতি। সে শপথ নিছক কোন শপথ ছিল না। জাহেলিয়াতের সকল চিন্তা চেতনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, সমাজের প্রচলিত নোংরা বাস্তবতাকে দুপায়ে দলিত মথিত করে মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম। আমার জীবনে প্রথম সেদিনই এতো বেশি কেঁদেছিলাম। মনে হয়েছে আমার প্রতিটি অশ্রু কণা আমার সমস্ত পাপগুলোকে মুছে দিয়ে গেছে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন সেদিনের সেই শপথের পর আমার কাছে মনে হয়েছে আমি গুনাহের মহাসমুদ্র থেকে মুক্তি পেয়ে নিষ্পাপ একজন মানুষ হিসেবে নতুন করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছি। আমার মনে আছে শপথ অনুষ্ঠান শেষে আমার সভাপতি যখন মামাকে বললো আপনার ভাগিনা সাথী হয়েছে তখন আমার মামা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তার সেই আন্তরিকতা দেখে আমি অবাক হয়েছি। তিনি হয়তো কখনো তার আপন ভাইকেও এভাবে জড়িয়ে ধরেননি যেভাবে আমাকে ধরেছিলেন। ইসলামী আন্দোলন যে কী এক নেয়ামত এটি হয়তো তারা বুঝবে না যারা এর স্বাদ পায়নি। সাথী হওয়ার পর আমার আব্বু একবার ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে আম্মুকে বললেন, আমাদের সুমন কেমন যেন হয়ে গেছে। ও কখনোতো এতো ভালো ব্যবহার করেনি। এতো ভদ্রতা ও নম্রতা আগে কখনো ওর মাঝে দেখিনি। ও অনেক ভালো হয়ে গেছে। আমার বাবা বাম রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। তাই শিবির সম্পর্কে তার ধারণাটা একটু খারাপ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন নিজের ঘরেই একটা শিবির হয়ে গেলো তখন তার আসল শিবিরকে দেখার সুযোগ হলো। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে শেষ পর্যন্ত আমার বাবা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং সাধ্যমতো ইসলামী আন্দোলনকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ আমার মা এবং ছোট বোনগুলো এখন ইসলামী আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। আসলে যে পরিবার ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী সে পরিবারে একজনকেও যদি ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় তাহলে তার একটি পজিটিভ রেজাল্ট অবশ্যই পাওয়া যাবে।

সদস্যপ্রার্থী থাকাকালীন আমি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হই। দীর্ঘদিন রোগ ধরা পড়ছিল না। নিরুপায় হয়ে ঢাকা থেকে বাড়ি পাঠানো হলো। সেখানে একজন অভিজ্ঞ এমবিবিএস ডাক্তার আমার রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। এরপর শুরু হয় সঠিক চিকিৎসা। কিন্তু এরই মাঝে আমার জীবন থেকে চলে যায় প্রায় একটি বছর। আমি সদস্যপ্রার্থী থাকার সময়টা দীর্ঘ হয়ে যায়। মনটা কোনভাবেই ঠিক রাখতে পারছিলাম না। বার বার শুধু ঢাকায় আসতে চাচ্ছিলাম। বাড়ি থেকে আসতে দিচ্ছিল না। না দেয়ারই কথা। আমার শারীরিক অবস্থা তখন ভয়াবহ। শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গিয়েছিলাম। কয়েকজন কোলে করে আমায় সাত তলায় দায়িত্বশীলদের থাকার রুমে নিয়ে যায়। মহানগর পূর্বের সভাপতি তখন হাফেজ মিজানুর রহমান ভাই। তিনি

www.pathagar.com

আমায় দেখে অনেকটা কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। কোনমতে নিজেকে সম্বরণ করলেন। আমি বার বার জানতে চাইলাম আমি সদস্য হতে পারব কি না। উনি আমাকে সাহস দিয়ে বললেন, অবশ্যই পারবেন আগে সুস্থ হন। যাহোক দীর্ঘ সময় কেটে গেল। কিন্তু একটি জিনিস আমি ঠিক রাখতে পেরেছিলাম। আমি এক দিনের জন্যও ডায়েরি লেখা বন্ধ করিনি। পুরো অসুস্থতার সময় মাত্র এক ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারিনি। তাও সে সময়টা আমার অজান্তে। শুয়ে শুয়ে নামাজ পড়েছি দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস। আমি এ কথাগুলো লিখছি নিজেকে প্রচার করার উদ্দেশ্যে নয়, ইসলামী ছাত্রশিবির আমাকে কতটা দ্বীন শিখিয়েছে শুধু তা বুঝানোর জন্য।

সদস্য শপথ নেই ২০০৫ সালে। মুহতারাম সেলিম উদ্দিন ভাই কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে শপথ পড়ান। এরপর ২০০৬ সালে কামরাঙ্গীরচর থানার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। ঐ বছরটা বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ বছর। সেই ভয়াল ২৮ অক্টোবরের নীরব সাক্ষী এ বছরটি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন মানবতাবিরোধী অপরাধ অতীতে সম্ভবত কেউ দেখেনি। সেদিনের সেই রণাঙ্গনে নিজে সশরীরে উপস্থিত ছিলাম ঠিকই কিন্তু নাস্তিক্যবাদীদের হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম না আমাদের প্রিয় ভাই শহিদ মাসুম, শিপন, মুজাহিদের মতো নিষ্পাপ প্রাণগুলোকে। ওরা আমাদের যে ঋণের বোঝা দিয়ে গেছে তা আমরা শোধ করতে পারবো কি না জানি না। এ লেখায় সেই স্মৃতিচারণ করতে চাই না। কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত "রক্তাক্ত ২৮ অক্টোবর: একটি কালো অধ্যায়" গ্রন্থটিতে আমার একটি লেখা এ বিষয়ের উপর প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আমার স্মৃতিচারণ কিছুটা পাওয়া যাবে।

কামরাঙ্গীরচর থানা সভাপতি থাকা অবস্থায় কিছু ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছি। চারদলীয় জোট সরকার তখন ক্ষমতায়। আমরা থানার উদ্যোগে একটি কর্মী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিলে আয়োজন করেছিলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তখনকার ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু, প্রধান বক্তা ছিলেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম বুলবুল। প্রধান অতিথিকে দাওয়াত দিতে আমরা কয়েকজন তার বাসায় গেলাম। তিনি আমাদের দাওয়াতপত্রটি দেখে আমার কাছে জানতে চাইলেন কতজন উপস্থিত হবে। আমি বললাম পাঁচশ জন। তিনি রুম ভর্তি মানুষের সামনে দাওয়াত পত্রটি ছুড়ে মারলেন এবং উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন কামরাঙ্গীরচরে পাঁচশ শিবির থাকলে তিনি নিজের হাত কেটে ফেলবেন। আমি প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করলাম। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে উল্টো এমপি সাহেবকে একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছিলাম আপনি আসবেন এবং দেখে যাবেন কতজন শিবির আছে। বুলবুল ভাই ও থানা আমিরকে বিষয়টি অবহিত করা হলো। নির্ঘুম কয়েকটি রাত কাটালাম টেনশনে। সকল সাথী ও সদস্য ভাইয়েরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল ঐ প্রোগ্রামের জন্য। যদিও সদস্য ভাইয়েরা এই প্রোগ্রামটি করার ঘোর বিরোধী ছিল। তাদের প্রশ্ন ছিল এ প্রোগ্রামে সংগঠনের লাভ কী? আমি কোন বাদানুবাদ না করেই প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে লাগলাম। এরই মাঝে বিকেল তিনটা বাজতেই এমপি মহোদয় ফোন দিয়ে আমাকে জানালেন তার আরেকটি প্রোগ্রাম আছে আসরের আগেই বক্তব্য দিয়ে চলে যাবেন। ইফতার মাহফিলে লোকজন আসে সাধারণত আসরের নামাজের পর। কিন্তু উনি আগেই আসবেন আর উপস্থিতি কম দেখে আমাদেরকে

www.pathagar.com

আরেকটু অপদস্থ করতে পারবেন হয়তবা এমনটাই চেয়েছিলেন। রাখে আল্লাহ মারে কে? বিকেল সাড়ে তিনটার সময়ই আমাদের পুরো হলরুম কানায় কানায় পূর্ণ। নুরুল ইসলাম বুলবুল ভাই আগেই চলে এসেছিলেন। যেহেতু এটি আমাদের সংগঠনের ইমেজের বিষয় তাই তিনি খুব গুরুত্বের সাথেই প্রোগ্রামটিকে নিয়েছিলেন। যাহোক আসরের নামাজের ঠিক আগ মুহূর্তে নাসির উদ্দিন পিন্টু ভাই এসে উপস্থিত। তিনি হলরুমে ঢুকামাত্র দুপাশ থেকে আমাদের কর্মী ভাইয়েরা দাঁড়িয়ে সম্মান করলেন। মৃদু হেসে মঞ্চে উঠলেন এবং যথারীতি বক্তৃতা শুরু করলেন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেকি ভূয়সী প্রশংসা! মনে হয়েছিল তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি! আলহামদুলিল্লাহ সেদিনের পর থেকে নাসির উদ্দিন পিন্টু কামরাঙ্গীরচর ছাত্রশিবিরকে একবারের জন্যও অবহেলা করেননি। শুধু তাই নয়, কামরাঙ্গীরচরে তারপর থেকে যতগুলো জোটের প্রোগ্রাম হতো তিনি আগে নিজে থানা সভাপতিকে ফোন করে জানাতেন। থানার যত জনপ্রতিনিধি ও বিএনপি নেতৃবৃন্দ ছিলেন সবার সাথে ইসলামী ছাত্রশিবিরের একটি ভাল সখ্যতা গড়ে উঠেছিল।

২০০৮ সালে আমাকে নিয়ে আসা হয় লালবাগ থানায়। পুরান ঢাকায় কাজ করা কিছুটা কঠিন ছিল। কামরাঙ্গীরচর থেকে এখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে চাইলেই কারো বাসায় হুটহাট ঢুকা যেতো না। ফলে জনশক্তি বৃদ্ধিতে খুব পিছিয়ে ছিল এ থানাটি। পর্যাপ্ত সুধী না থাকায় অর্থনৈতিক সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছিল। প্রথম দিকে নিজেকে মানিয়ে নিতে কিছুটা কষ্ট হলেও থানার সদস্য ভাইদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এবং একটি টিম স্পিরিট খুব অল্প সময়ের মাঝে লালবাগ থানার সংগঠনের চেহারা পাল্টে দেয়। মহানগরী পূর্বের থানাগুলোর মাঝে কাজের বিচারে বছর শেষে সেরা থানার পুরস্কার পায় লালবাগ থানা। একটি প্রবাদ আছে "দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ"। সকলকে সাথে নিয়ে কাজ করতে পারলে তার ফলাফলটা নিঃসন্দেহে ভাল হবে। আমার সময়ের সদস্য ভাইদের কাছে আমি তাই কৃতজ্ঞ যে তারা আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তবে আমাদের মাঝে ভাল একটি প্রাকটিস ছিল। থানার সদস্য বৈঠক শেষ করে আমরা সবাই একত্রে তাজ বিরিয়ানিতে খাওয়া দাওয়া করতাম। সোহেল রানা মিঠু ভাই তখন ৫৮ নং ওয়ার্ড সভাপতি। তার সাথে ঐ দোকানের ভালো খাতির থাকায় যতো গভীর রাতই হোক আমরা খেতে পারতাম।

২০০৯ থেকে ২০১১ সাল মহানগরী পূর্বের স্কুল ও শিক্ষা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং সর্বশেষ শিক্ষাকার্যক্রম সম্পাদক হিসেবে কাজ করার সুযোগ হয়। শুরুর সময়টা ভাল থাকলেও শেষের দিকের পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বিশেষ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফারুক হত্যা মামলাকে কেন্দ্র করে সারাদেশে ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর যে চিরুনি অভিযান চালানো হয় তার আঁচড় আমাদের ঢাকা মহানগরীতেও লেগেছিল। দীর্ঘ সময় আমাদের সুধী শুভাকাঙ্খীদের বাসায় রাত যাপন করতে হতো। কেন্দ্রীয় অফিসের সাত তলায় মহানগরী পূর্বের দায়িত্বশীলরা থাকতো। প্রতিদিন সন্ধ্যার আগেই আমরা যার যার পালানোর বাসায় চলে যেতাম। একদিন মহানগর সভাপতি মনির উদ্দিন মনি, সেক্রেটারি ইয়াসিন আরাফাত ও আমি আমরা তিনজন বের হতে দেরি হয়েছিল। তখন রাত দশটা কি সাড়ে দশটা। প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম বের হবো। হঠাৎ নিচে দেখি একটি সাদা মাইক্রোবাস। কি করি ভেবে পাচ্ছিলাম না। ভয়ে আমাদের বুক দুরুদুরু করছিল। মনির ভাই একতলা নিচে নামতেই ছয়তলার ভাবী

www.pathagar.com

হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে উঠে জানালেন পুলিশ পাঁচতলায় চলে এসেছে। এক দৌড়ে আবার তিনি সাত তলায় উঠে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ভেতরে আমরা তিনজন। সব লাইট বন্ধ করে দিলাম। সাত তলা থেকে নামার কোন পথ নেই। ভেবেই নিয়েছিলাম আজ নিশ্চিত গ্রেফতার হতে হবে। মনির ভাইকে বাথরুমের উপর বক্সে ঢুকানো হলো। বক্সের মুখ বাঁধাই করা ক্যালেন্ডারের ফ্রেম দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম। ততক্ষণে ডিবি পুলিশ আমাদের দরজায় লাথি মারা শুরু করেছে। আমাদের কারো কলিজায় এতটুকুও পানি নেই। ভেতরে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিলাম। কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। এমন সময় অন্ধকারের মাঝে বিল্ডিংয়ের পেছন দিকটায় একটি রশি সদৃশ কিছু দেখতে পেয়ে ইয়াছিন ভাই তার ওপর জাম্প করলেন। আমিও তার পেছন পেছন জাম্প করলাম। আমরা সাত তলার উপর। রশিটি পুরনো না নতুন কিছুই জানি না। এটি ছিঁড়ে গেলে যে নির্ঘাত মৃত্যু এ বিষয়টি ভুলেও তখন মাথায় আসেনি। ঢাকা মহানগরী জামায়াতের বিল্ডিং আর শিবিরের বিল্ডিংয়ের মাঝে ঝুলানো রশিটি। সম্ভবত রং করার জন্য এটি রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমরা এর আগে কখনো এটি দেখিনি। দুই বিল্ডিংয়ের মাঝে আমরা দুজন রশিতে ঝুলছি আর নামার চেষ্টা করছি। একবার এই বিল্ডিং আরেকবার অন্য বিল্ডিংয়ের সাথে আঘাত খাচ্ছি। ভেতরে ভয় হচ্ছিল পুলিশ দরজা ভেঙ্গে ঢুকলেই আমাদেরকে ঝুলন্ত দেখতে পাবে। তখন পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে রশি বেয়ে সাত তলা থেকে দুই বিল্ডিংয়ের ময়লা আবর্জনার মাঝে নামলাম। লাফিয়ে অন্য বিল্ডিংয়ের সীমানা প্রাচীরের মাঝে গিয়ে পড়লাম। এখানে আরেক ভয়। ঐ বিল্ডিংয়ের পার্কিং থেকে আমাদের দেখতে পেলে চোর ভেবে উত্তম মধ্যম দিবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হামাগুড়ি দিয়ে বিল্ডিংয়ের সীমানা প্রাচীরের শেষ প্রান্তে গিয়েছিলাম বের হতে পারবো ভেবে। কিন্তু না, সেটি বিল্ডিংয়ের মূল ভবনের সাথে লাগানো থাকায় বের হওয়া গেল না। এবার দেয়াল টপকাতে হবে। ওয়ালে হাত দিতেই দেখি সব কাচ ভাঙ্গা। কী বিপদ! এক স্থান একটু মসণ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওপাশে পড়লাম। দুই বিল্ডিংয়ের সীমানা প্রাচীরের মাঝে আটকা পড়লাম। এবার আরেকটি দেয়াল টপকিয়ে ওপাশে পড়তেই দেখি ছাদ ঢালাইয়ের পর যে কাঠগুলো থাকে সেগুলো রাখা। প্রত্যেকটি কাঠে তারকাটা ঢুকানো। অন্ধকারে ঠিক বুঝা যাচ্ছিল না। অনুমান করে পা ফেলে চলতে লাগলাম। বিল্ডিংয়ের শেষ প্রান্তে আনসার ক্যাম্প। আমাদের দেখেই বললো আপনারা কারা? আমরা অনেক বিনয়ের সাথে সব খুলে বললাম। তারা আমাদের চলে যেতে সাহায্য করলো। সারা গায়ে ময়লা আর শরীরের কিছু অংশ কেটে গিয়েছিল। একটা রিক্সা নিয়ে লালবাগে এক সুধীর বাসায় আশ্রয় নিলাম। এভাবে আওয়ামী পুলিশ থেকে রক্ষা পেলাম। তবে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো তা কখনো ভোলার নয়। সাত তলা থেকে রশি দিয়ে নামা! এখনো ভাবলে গা শিয়রে ওঠে।

লিখতে গেলে লেখা শেষ হতে চায় না। কারণ এই লেখাটা ইসলামী ছাত্রশিবিরের জন্য। যে সংগঠনের দাওয়াত না পেলে হয়তোবা ইসলামের সঠিক শিক্ষাটা পেতাম না। হয়তোবা কুরআন পড়তাম ঠিকই কিন্তু বুঝতামনা এর মাঝে আমার জন্য কি দিকনির্দেশনা রয়েছে। অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো ইসলামকে নিছক একটা ধর্ম হিসেবেই মেনে নিতাম। আমার অন্যান্য বন্ধুদের মতো আমিও আধুনিকতার নামে নোংরামিতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতাম। নিজের অজান্তেই অস্ত্র ও সিগারেটের সুখ টানে নিজেকে খুব ক্ষমতাবান মনে করতাম। রাসূল

www.pathagar.com

(স.) কে রেখে কোন চরিত্রহীন আদর্শহীন দলের স্লোগানে উচ্চকিত করতাম অমুক আমার আদর্শ তমুক আমার প্রেরণা ইত্যাদি নানা রকম ভ্রান্ত মত বা পথের অনুসারী হতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহ তার এই নগণ্য গোলামকে যে মহা নেয়ামতের জন্য কবুল করেছিলেন তার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির শুধু একটি ছাত্রসংগঠনই নয়, একটি আদর্শেরও নাম। একটি সুশীতল ছায়ার নাম ইসলামী ছাত্রশিবির। এটি একটি জান্নাতি বাগান। যে কাজটি বাবা মা করতে পারেন না, স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যা দিতে পারে না ইসলামী ছাত্রশিবির সে কাজটি করে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। আমি মনে করি যদি কোন বাবা মা তার সন্তানকে একজন সত্যিকার অর্থে আদর্শবান মানুষ বানাতে চান, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কাছে তার সন্তানকে তুলে দেয়া উচিত। অভিভাবকরা স্কুল-কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা খরচ করে সন্তানকে ভর্তি করান ভাল মানুষ বানানোর আশায়। কিন্তু সেখানে কতটা আদর্শ শিখতে পারে একবারও কি কেউ ভেবে দেখেছেন? ঐশীর মতো আদরের দুলালীকে যারা অঢেল টাকা ব্যয় করে বিলাসিতা করার সুযোগ করে দিচ্ছেন তারা কি পাচ্ছেন আপনার সন্তান থেকে? নিজ সন্তানের হাতে খুন হওয়ার সাধ আপনাদের মনে জাগে কি? নিশ্চয়ই কেউ এমনটি প্রত্যাশা করেন না। আপনার অজান্তেই আপনার সন্তান যাদের সাথে মিশছে তারা কতটা আদর্শবান তা একবার ভাবুন। আদর্শবান বন্ধু ছাড়া অন্যদের সাথে মিশতে দিলে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন। ইসলামী ছাত্রশিবির সেজন্য তার প্রতিটি কর্মীকে আদর্শবান করে গড়ে তোলে। নামাজ শেখায়, কুরআন-হাদিস ও ইসলামের সঠিক শিক্ষা দেয়। তাই প্রতিটি বাবা-মার উচিত সন্তানকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের হাতে তুলে দেয়া। ছাত্রশিবির আপনার সন্তানকে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি করে দেবে। এজন্য কোন টাকা পয়সা দিতে হবে না। শুধু ইসলামী ছাত্রশিবিরকে আপনার দোয়া ও সমর্থন দিলেই তারা খুশি থাকবে। এর চেয়ে বেশি চাওয়া তাদের নেই।

পরিশেষে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে দু একটি লাইন লিখতে চাই। প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা আপনারা যেখানেই লেখাপড়া করেন না কেন একটি জিনিস সব সময় মাথায় রাখার বিনীত অনুরোধ করছি। একটু ভাবুন এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে চাইলেই আপনি বেশিদিন থাকতে পারবেন না। আমাদের সকলের আসল ঠিকানা একটাই সেটা পরকাল। সেখানে দুনিয়ার প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। আপনি যদি মুসলিম ও মুমিন হয়ে থাকেন আমার এ কথায় দ্বিমত করতে পারবেন না। কিন্তু একবারও কি ভেবেছেন এই পৃথিবীতে আমাদের আসার উদ্দেশ্য কি? দুনিয়া ভোগ করার জন্য নয়। এটা একটা পরীক্ষা ক্ষেত্র মাত্র। তাই মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন আপনার বিবেকের কাছে রাখতে চাই।

- আপনি আজ যে নেতার মিছিলে গিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন তিনি কি কিয়ামতের কঠিন সময়ে আপনার পাশে দাঁড়াতে পারবেন?
- আপনি মিছিলে গিয়ে যে স্লোগান দিচ্ছেন তা কি নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবারের চেয়ে বেশি ভালো?
- আপনার দলের স্লোগান দেয়া অবস্থায় আপনার মৃত্যু হলে আল্লাহর ফয়সালা আপনার ব্যাপারে কী হতে পারে?

www.pathagar.com

- আপনি যে সব নেতা বা দলের সমর্থক ঐ দল বা নেতারা কি আপনাকে চরিত্রবান হতে বলে? না কি টাকা ও পেশিশক্তির কারণে আপনাকে ব্যবহার করে?
- আপনি কি মনে করেন তারা যে আদর্শ ধারণ করে তা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ইসলামের আদর্শ?

বিচারের ভার আপনার উপরেই রাখলাম। যদি মনে করেন ঐ দল করলে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন বা আপনার চরিত্র সুন্দর হবে তাহলে করেন আপত্তি নেই। আর যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে ভাবুন আপনার কী করা উচিত। আমি আপনাকে শিবির করতে বলছি না। আপনাকে যারা নামাজ শেখাবে, কুরআন শেখাবে, পিতামাতাকে সম্মান করতে বলবে আপনি তাদের সাথে থাকবেন কিনা নিজেই সিদ্ধান্ত নিন।

আমরা যারা ইসলামী আন্দোলন করি তারা বিশ্বাস করি আদর্শের লড়াইয়ে যারা পরাজিত অস্ত্র তাদেরই হাতিয়ার। আজ বাতিলপন্থীরা আমাদের উপর যে অন্যায় করছে তা ইসলামী আন্দোলনের ত্যাগ ও কোরবানির ধারাবাহিকতা মাত্র। সুতরাং আমরা হতাশ নই। মানুষের প্রচেষ্টা যেখানে শেষ আল্লাহর সহযোগিতা সেখান থেকে শুরু। নিশ্চয়ই কুয়াশার চাদর খুলে গেলেই চকচকে সূর্য উদিত হবে। সেই রোদেলা মুহূর্তের জন্য গভীর রাতে পরম করুণাময়ের কাছে সিজদাবনত থাকব আমরা সবাই। আর জিহাদের ময়দানে ওমর ও হামজা (রা.) এর মতো অবিচল থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনবো। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত ইনশাআল্লাহ।

লেখক : সাবেক শিক্ষা সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ঢাকা মহানগরী পূর্ব

শান্তি মিনার
www.pathagar.com

সাবেক সভাপতিদের সাক্ষাৎকার

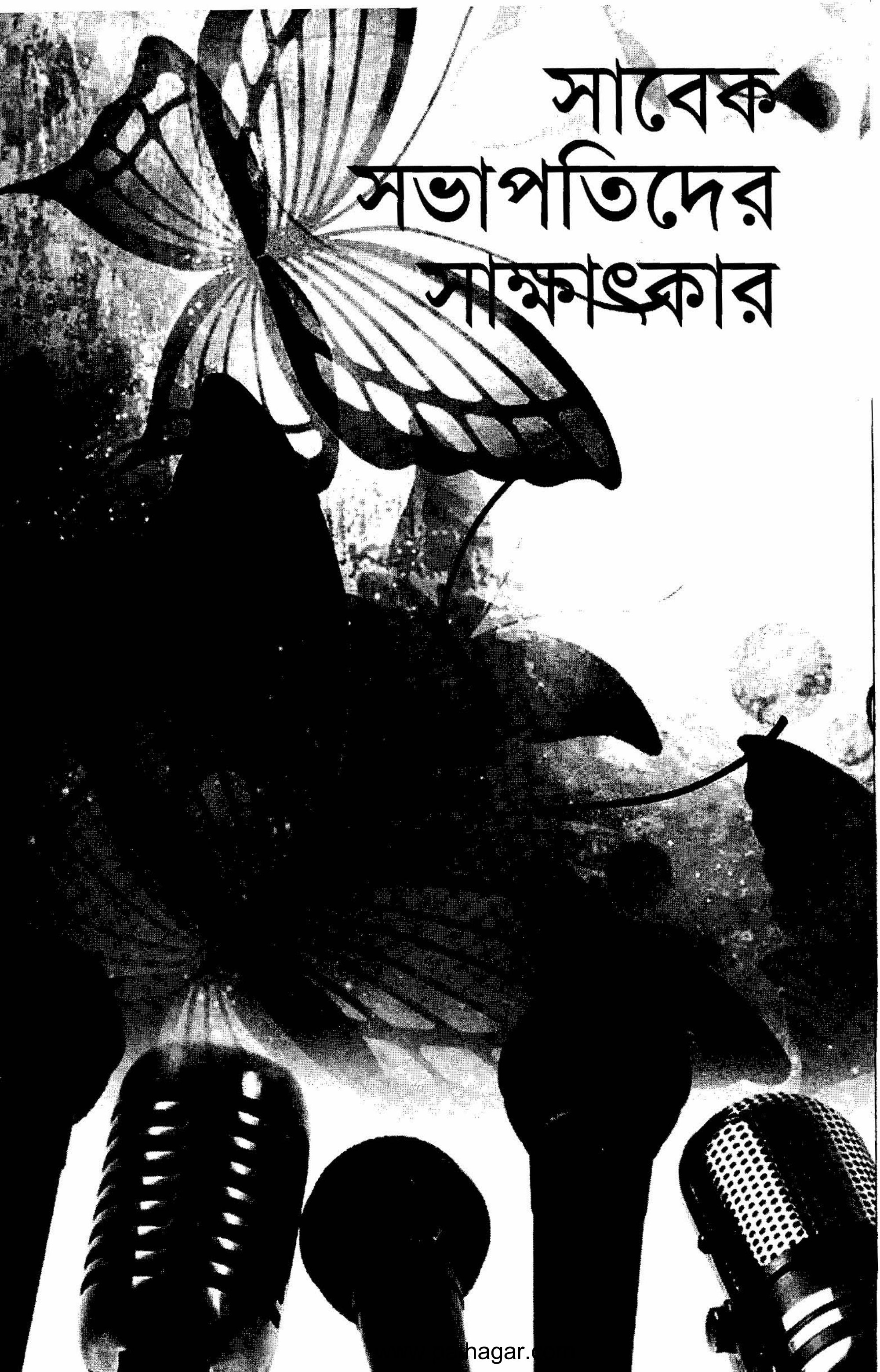

hagar.c

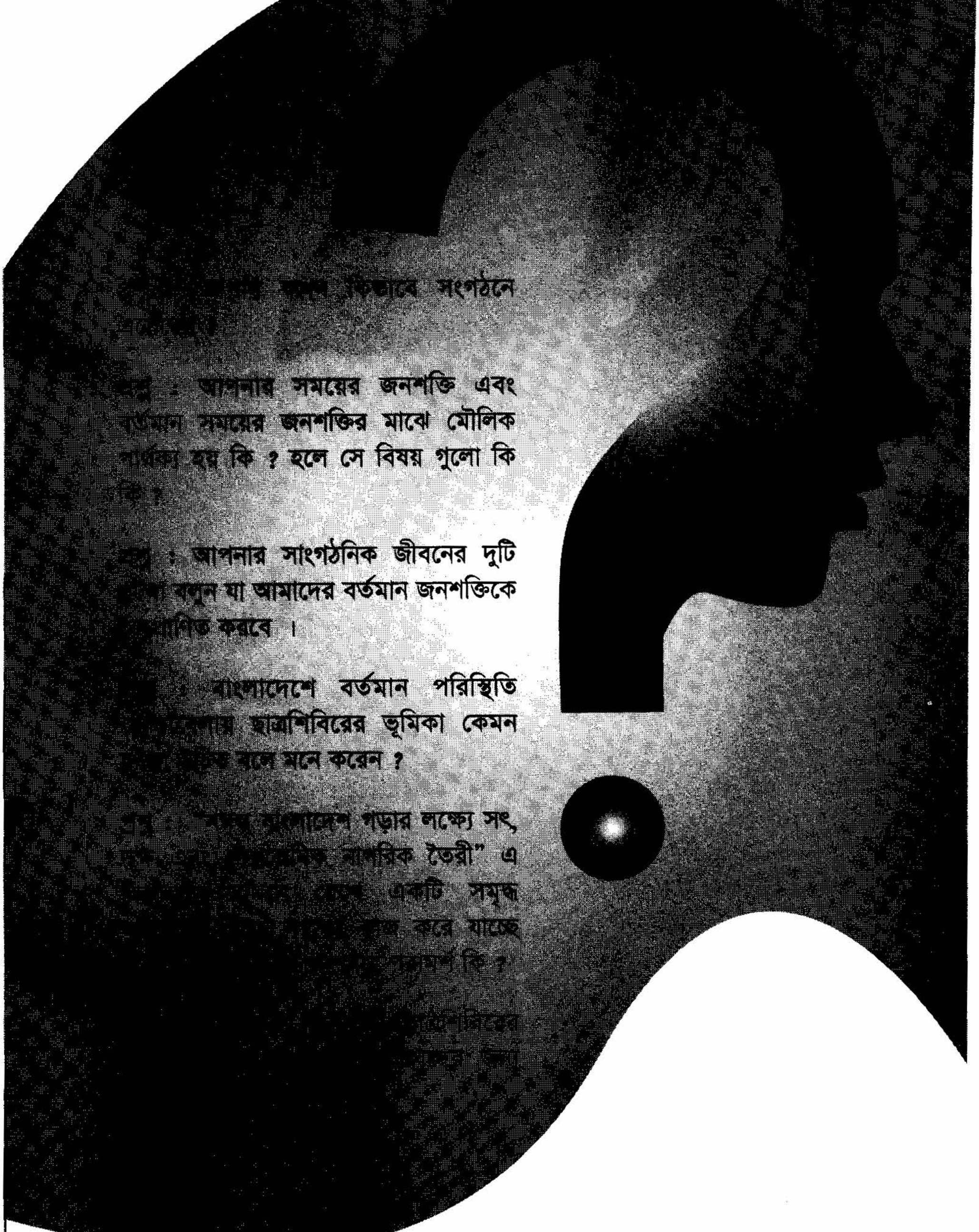

... কিভাবে সংগঠনে ...

প্রশ্ন : আপনার সময়ের জনশক্তি এবং বর্তমান সময়ের জনশক্তির মাঝে মৌলিক পার্থক্য হয় কি ? হলে সে বিষয় গুলো কি কি ?

প্রশ্ন : আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে ।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন ?

প্রশ্ন : "সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরী" এ ... একটি সমৃদ্ধ ... কাজ করে যাচ্ছে ... পরামর্শ কি ?

... শিবিরের ...

www.pathagar.com

[illegible]

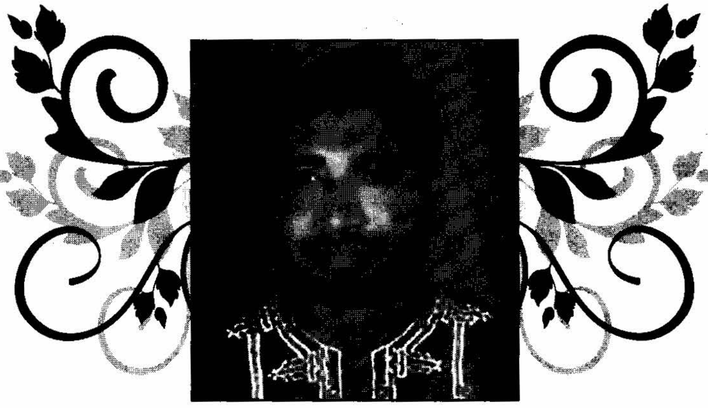

প্রশ্ন : আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন?

উত্তর: যতটুকু মনে পড়ে ১৯৮৬ সালে নলতা-ঘোনা দারুস সুন্নাত দাখিল মাদ্রাসায় ৯ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় তৎকালীন দায়িত্বশীল আমার শ্রদ্ধেয় রফিকুল ইসলাম বাচ্চু ভাইয়ের নিকট থেকে দাওয়াত প্রাপ্ত হই এবং সমর্থক ফরম পূরণ করি। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে ২৫ ডিসেম্বর কর্মী হই।

প্রশ্ন : আপনার সময়ের জনশক্তি এবং বর্তমান সময়ের জনশক্তির মাঝে মৌলিক পার্থক্য হয় কি? হলে সে বিষয়গুলো কী কী?

উত্তর: আদর্শিক জ্ঞান অর্জন, তাকওয়াভিত্তিক জীবন যাপনের চেয়ে প্রচলিত ধারায় মিশে চলতে একটু আগ্রহী বেশি বলে মনে হয়।

প্রশ্ন : আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে?

উত্তর: অনেকগুলি ঘটনা, তার মধ্যে একটি বিষয় বারবার ভেসে আসে, আমি সদস্য হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম। সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী আমাকে কর্মী, সাথী বানাতে হবে, আবার এলাকাভিত্তিক দায়িত্বও পালন করতে হবে। তাই আমাকে ১৯৯৩ সলের সেপ্টেম্বর মাসে জুরাইন এলাকার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হলো। এ এলাকাটি এখন বর্তমান ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের ৮৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। সাংগঠনিকভাবে এই প্রথম রাজধানীতে দায়িত্ব পেলাম। ইতঃপূর্বে মাত্র এক সপ্তাহ দনিয়া নামক এলাকায় দায়িত্ব পালন করি। এ সময় আমাকে বলা হলো ২ জন সাথী তৈরি করতে না পারলে সদস্য হওয়া যাবে না। কী মুশকিল, খুবই চিন্তায় পড়লাম, কিন্তু হতাশ হলাম না, সিদ্ধান্ত নিলাম এ কাজে আমাকে সফল হতেই হবে। টার্গেট নিলাম ৩ জন ভাইকে। দ্রুত একজন ভাই সাথী প্রার্থী হলেন, তার নাম শাহাদাত হোসেন। আরেক জন সাথী হতে খুবই আগ্রহী হলেন কিন্তু বলতে চান না। পরে কন্টাক্ট করে জানতে

www.pathagar.com

পারলাম, গ্রামের বাড়িতে পিতা প্যারালাইজড, মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে পিতার চিকিৎসা এবং সংসার পরিচালনা করেন। এ অবস্থা সহ্য করতে না পেরে তিনি ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ নিয়ে একটি মিশুক কিনেন, রাতে মিশুক চালান, দিনে লজিং এবং বিকালে রীতিমত টিউশনি করেন। এভাবে মাকে সহযোগিতা করেন এবং নিজের লেখাপড়ার কাজ চালিয়ে যান। এ জন্যেই তিনি সাথী হতে ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু, সাথী হওয়া তার ঐকান্তিক ইচ্ছা। বাইয়াতের মাধ্যমে তিনি মহান আল্লাহর জান্নাতের প্রত্যাশী। কথা শুনে আমার চোখে পানি এসে গেল। ভাবনার জগতে উদয় হলো, আমরাতো দু'জনেই একই পথের পথিক। দু'জনেই চূড়ান্ত বাইয়াতের প্রত্যাশী। দুজনেরই একই টার্গেট। উপায় বের করলাম এবং প্রস্তাব দিলাম, আমি আপনাকে বিষয়ভিত্তিক কুরআন, হাদিস, ইসলামী সাহিত্য নোট করে চিরকুট করে দেব। আর আপনি লোজিংয়ে আসা-যাওয়ার পথে এবং পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে ঐ চিরকুটের নোটগুলো মুখস্থ করে প্রতিদিন শুনাবেন। পরামর্শ অনুযায়ী ভাইটি এক মাসের মধ্যে প্রস্তুত হলেন এবং তৎকালীন মহানগরী সভাপতি বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাবেক এম.পি হামিদুর রহমান আযাদ ভাইয়ের নিকট সাথী শপথ নিলেন। পরিবেশগত কারণে ভাইটির নাম উল্লেখ করলাম না। ১৯৯৩ সালের ১২ ডিসেম্বর ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আযাদ ভাইয়ের মাধ্যমে আমার সদস্য শপথ মহান আল্লাহ কবুল করলেন। সত্যিই আমি যে কত খুশি হয়েছিলাম তা বর্ণনাতীত।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

উত্তর : ২০০১ সালে তখন আওয়ামীলীগ সরকারের সে সময়ও গ্রেফতার জেল জুলুম চলছে। ৩ মার্চ রাতে গ্রেফতার হলেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুজাহিদ ভাই। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম বুলবুল ভাই রাত আনুমানিক ৩টায় আমাকে মোবাইলে জানালেন। তখন আমি সবুজবাগের বাসাবোতে রিয়াদ নামে এক সাথীর বাসায় ৩য় তলাতে অবস্থান করছি।

সকাল ৯টায় কেন্দ্রীয় সভাপতি বললেন, ১০টায় বাইতুল মোকাররম উত্তর গেটে প্রতিবাদ মিছিল। ১ ঘন্টার ব্যবধানে প্রায় ৭/৮ হাজার প্রতিবাদী ভাই হাজির হলেন, কিন্তু পুলিশি বাধা! সে দিন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল ভাইয়েরা না আসতে পারলেও তৎকালীন মহানগরী জামায়াতের সম্ভবত সহকারী সেক্রেটারি বর্তমানে আমীর জনাব রফিকুল ইসলাম খান, শিবিরের কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক লুৎফুর রহমান, সেলিম উদ্দীন ও এমাজ উদ্দীন মন্ডল ভাইসহ নেতৃবৃন্দ নানা কৌশলে মিছিল দৈনিক বাংলা মোড় হয়ে হোটেল লিজার কাছে আসতেই পুলিশি এ্যাকশন, গুলি এবং গ্রেফতার।

সেদিন তৎকালীন ঢাকা মহানগরী জামায়াতের মমিনুল ইসলাম পাটোয়ারী, মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, এ্যাড. জসিম উদ্দীন সরকার, এ্যাড. মসিউল আলম ভাই এবং শিবিরের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক জনাব সেলিম উদ্দীন, ঢা.বি সভাপতি মু. শাহ্জাহান ভাই ও আমি সহ গ্রেফতার হয়ে গেলাম ৭০-৮০ জন। পরপর ৫ ও ৬ মার্চেও গ্রেফতার প্রায় ৩/৪শ নেতা কর্মী সহ সাধারণ পথচারী। ঐ দিন রাত দশটার দিকে আমাদেরকে মতিঝিল থানা থেকে কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো। আমদানিতে যেয়ে কঠিন এক দৃশ্য, যাই হোক সারা রাত মশার কামড়ে কেটে গেল। মাওলানা আব্দুল খালেক মজুমদার ভাই পেলেন অনেক পুরনো সাথীকে। যে কারণে বেশ ক'জন মুরব্বি ভালোভাবে রাত কাটালেন। সকালে শুরু হলো চার চার ফাইল। এভাবে নিয়ম অনুযায়ী দিন কেটে যাচ্ছে। বিকাল-সন্ধ্যা হলো আমদানি থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ করে দেওয়া হয় ভাইদের। একে একে সবাইকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি দুশ্চিন্তায়! অপেক্ষার পালা শেষ, আমাকে নিয়ে গেল সন্ধ্যায় ১৩ খাদা নামক এক বিল্ডিংয়ের ২য় তলায় সোহেল নামে এক যুবক। বাড়ি তার মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ জেলা।

দোতলায় প্রবেশ করেই দেখি ইসমাইল হোসেন পাভেল (যিনি একটি বেসরকারি ব্যাংকের সিনিয়র পদে কর্মরত আছেন) ভাইসহ ১২/১৩ জন তারা সবাই আমাকে পেয়ে খুশি। আমাকে সালাম দিতেই শুরু হলো নির্যাতনের পালা, আমার নিকট কাউকে আসতে দেওয়া হলোনা। এশার নামাজ আদায় করেই সবার শোয়ার পালা। রাতের খাওয়া দাওয়া হলো কিনা তা দেখার সুযোগ হলো না। শুরু হলো ইলিশ ফাইল, কেচকি ফাইল। একজন আমাদের, অন্যজন হিরোইন ফেন্সি খোর। ব্যাড়া লাগা, ঘা, পাঁচড়া ইত্যাদি ব্যক্তির সাথে এভাবে ফাইল সাজানো হলো। দু দিক হতে শিকল দিয়ে হাত, পা টেনে পাছায় আঘাত করে ফাইলিং। নেই ফ্যান, অসহ্য যন্ত্রণা-দাঁড়ানো যাবে না আবার বসাও যাবে না। এভাবে কেটে গেল একটি সপ্তাহ।

আমাদের আচার আচরণে, কথা বার্তায়, আলোচনায় এক পর্যায়ে অবসান হলো যাতনার। যারা এত দিন নির্যাতন করল, খারাপ ব্যবহার করলো এবং অমানুষিক অত্যাচার করল। পরে তারাই হলো বন্ধু-আপন জন। এ যেন, সূরা হামীম সেজদার ঐ আয়াতের প্রতিফলন যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "খারাপ আচরণের জবাব ভালো দিয়ে দাও- তাহলে তোমার চির শত্রুটিও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে"। সেখানে ভাইদের যে অকৃত্রিম ভালোবাসা পেয়েছি, দেখেছি তেজোদৃপ্ত ঈমান, তা ভুলবার নয়। এভাবেই অবসান হলো একটি মাসের। পরে জেল থেকে মুক্ত হলাম। কয়েকদিন পর আবারো শুরু হলো মুক্তাঙ্গন হতে মিছিল, কেন্দ্রীয় সভাপতি বুলবুল ভাইকে গ্রেফতারের ব্যর্থ চেষ্টা। একে একে সকল দায়িত্বশীলগণ কুমিল্লা, বরিশাল ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও সংবর্ধনা দেওয়া তো দুরের কথা কোন রকমে অফিসে যেয়ে ছবি নিয়েই শেষ। এভাবেই সে দিন অবসান হয়েছিল আওয়ামী জুলুমের। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল জনতা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জনতার মতামত- ১ অক্টোবরের বিজয়ের মাধ্যমে। এবারও ভয়াবহ জুলুমের অবসান ঘটবে, বিজয় হবে ইসলামী জনতার। মনে রাখতে হবে, নির্যাতন যত বেশি, পুরস্কারও ততো বেশি। ইসলামী ছাত্র-জনতার রক্ত কখনো বিফলে যাবে না।

www.pathagar.com

[redacted]

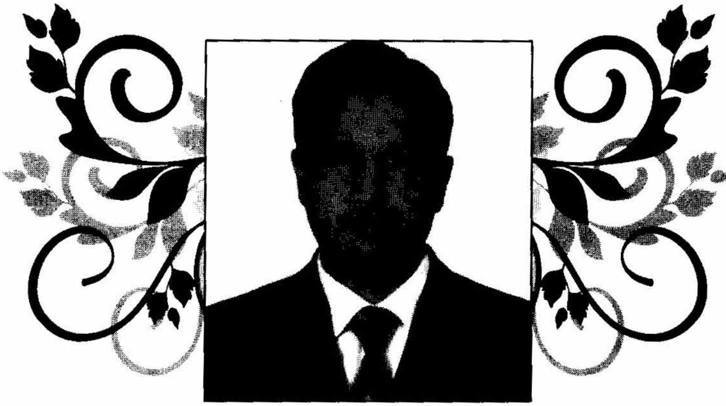

প্রশ্ন : আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন?

উত্তর : ১৯৯৩ সালে দাখিল পরীক্ষার পর জনাব আমিনুর রহমান ভাইয়ের মাধ্যমে প্রথম দাওয়াত পাই। এবং উনার তত্ত্বাবধানে দাখিল ও এস এস সি ফল প্রার্থীদের শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণ করি। এবং অক্টোবর মাসে সংগঠনের সাথী হই।

প্রশ্ন : আপনার সময়ের জনশক্তি এবং বর্তমান সময়ের জনশক্তির মাঝে মৌলিক পার্থক্য হয় কি? হলে সে বিষয়গুলো কী কী?

উত্তর : তেমন কোন পার্থক্য নেই, তবে এখনকার জনশক্তি আগের জনশক্তি থেকে অনেক সাহসী ও আধুনিক।

প্রশ্ন : আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে।

উত্তর : ২০০৫ সালে ইউনিট সভাপতি সেক্রেটারি সম্মেলন করা, যা সারা বাংলাদেশের অনেক শাখাই অনুসরণ করে ছিল।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

উত্তর : বর্তমান জনশক্তির কেরিয়ার গঠনের পাশাপাশি নৈতিক দিকগুলো গঠনে আরো যত্নবান হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : "সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি" এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রশিবির এ ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী?

উত্তর : জনশক্তিকে যোগ্যতা অনুযায়ী ভাগ করে বিভিন্ন বিভাগে সেটাপ করা এবং জনশক্তির ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে গঠন করা।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের জন্য আপনার পরামর্শ ?

উত্তর : সকল কাজে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করা। তাহলে শয়তানের সব ধোঁকা থেকে মুক্ত থাকা যাবে। এবং সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর উপরে ভরসা করা।

www.pathagar.com

[illegible] হোসাইন

প্রশ্ন : আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন?

উত্তর : আমি ১৯৯০ সালে সংগঠনে এসেছি। তখন শাহ্‌রাস্তি থানার সূচীপাড়া হাইস্কুলে ৯ম শ্রেণীতে পড়ি। স্কুলের গেইটে শিবিরের দায়িত্বশীলদের সালাম পেতাম নিয়মিত। যদিও আমি ছোট বেলায় জানতাম বড়দের সালাম দেয় ছোটরা। ছোটদেরও বড়রা সালাম দিতে পারে তা দেখলাম শিবিরে। তাছাড়া তাদের ব্যবহার ও দাওয়াতি কাজের তৎপরতা আমাকে আলোড়িত করে, সাধারণ সভায় অসাধারণ বক্তৃতায় এবং আকষর্ণীয় চরিত্র দেখে শিবিরে যোগদান করলাম।

প্রশ্ন : আপনার সময়ের জনশক্তি এবং বর্তমান সময়ের জনশক্তির মাঝে মৌলিক পার্থক্য হয় কি? হলে সে বিষয়গুলো কী কী?

উত্তর : ১. সংগঠনের সিনিয়র নেতারা জেলে থাকায় ইতিহাস ঐতিহ্যের মৌলিক প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না বর্তমান জনশক্তিরা। পরিবেশগত কারণে টিসি টিএস, শব্বেদারি ব্যাপক ভাবে না থাকার ফলে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২. খুশির বিষয় পূর্বের তুলনায় বর্তমান জনশক্তি অনেকবেশী ত্যাগী কৌশলী ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার জানে যাহা প্রয়োজনও। তবে এটাকে ইতিবাচকভাবে তথা ইসলাম প্রচার প্রসার প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সর্বভৌমত্বের পক্ষে কাজে লাগাতে হবে।

৩. ইসলামী আন্দোলনে পরীক্ষা আসাটাই স্বাভাবিক। পরিবেশ ও বাস্তবতার কারণে তখন দীর্ঘ সময় ধরে এমন ত্যাগ কুরবানী, শহীদ,পঙ্গুত্ব, জেল জুলুম ছিল না। এত বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর জেলে যেতে হয়নি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইসলামবিরোধী শক্তির মোকাবেলায় বর্তমানে শিবিরের নেতাকর্মীরা যেভাবে গুম, শহীদ হচ্ছে পঙ্গুত্ব বরণ করছেন, জেলে যাচ্ছেন, আহত হচ্ছেন তা সত্যিই আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার কারণ। আর এটাই ইসলাম ও দেশবিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তির এদেশীয় নাস্তিক ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তির মাথাব্যথার কারণ।

www.pathagar.com

৪. “শিবির আজন্ম আপোসহীন সংগ্রামী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহী, বিপ্লবী, বিনয়ী, সৎ চরিত্রের বাস্তব নমুনা, তাকওয়া ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠনের অনুপম ঠিকানা” তাই পার্থক্য পাওয়াটা খুবই কঠিন।

প্রশ্ন : আপনার সাংগঠনিক জীবনের দুটি ঘটনা বলুন যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে।

উত্তর : “২৮ অক্টোবর ২০০৬। পল্টন হত্যাকাণ্ড দিবস। জাতীয় কালোদিবস। প্রকাশ্যে দিবালোকে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যার পর লাশের উপর পৈশাচিক নৃত্য! জাতি হতবাক! বিশ্ব বিবেক স্তম্ভিত! এ কোন বর্বরতা? হ্যাঁ এটাই আওয়ামীগণতন্ত্রের ? স্টাইল। তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী ১৪ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশ থেকে ১৪ দলীয় নেতাকর্মীদের লগি-বৈঠা নিয়ে ঢাকায় আসার জন্য নির্দেশ দেন, নেতাকর্মীরা লগি বৈঠা, দেশীয় অস্ত্রসহ বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইটে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় নেতৃবৃন্দকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। বিকাল ৩টায় জনসভা। আমীরে জামায়াতসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করবেন। সকাল ৬টা থেকে স্টেজের কাজ চলছে। সকাল ৭টায় স্বেচ্ছাসেবকরা আসছেন। আমি যথারীতি ফজরের নামাজের পর উত্তর গেইটে হাজির হই। সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি বর্তমানে জামায়াতের নির্বাহী পরিষদ সদস্য ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারি জননেতা নুরুল ইসলাম বুলবুল ভাই স্টেজের কাজ পরিদর্শন করছেন। এক পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে বুলবুল ভাই এর সাথে পল্টন মোড়ে গেলাম। তখন সকাল ৮টা বা ৮.৩০ বাজে। আমরা কেবলমাত্র পল্টন মোড়ে দাঁড়ালাম আর কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই আওয়ামী বাকশালী সন্ত্রাসীরা প্রথমেই আমার ও বুলবুল ভাইর সামনে লগি বৈঠা নিয়ে আমাদের কর্মীদের উপর হামলা করে এবং একজনকে ধরে নিয়ে যায়। পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করি কিন্তু তারা নীরব দর্শকের ভূমিকায়। মুহূর্তেই প্রেসক্লাব বিজয়নগর থেকে আওয়ামী নেতা সাহারা খতুন, মায়া, নাসিমসহ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে পল্টন মোড়ের দিকে মিছিল নিয়ে আসে অস্ত্র উঁচিয়ে। আর আমরা খালি হাতে। এক টানা হামলা আমাদের উপর, এ যেন বর্বরতার আদিম যুগের খণ্ড চিত্র। আমাদের সামনে কর্মীদের প্রচন্ড মারধর করছে লগিবৈঠা দিয়ে পিটিয়ে আহত করছে। অথচ পুলিশের নীরবতায় সন্ত্রাসীরা আরো বেপরোয়া। যাহা টি.ভি চ্যানেলের লাইভ কাভারেজের কারণে জাতি সরাসরি দেখলো।

এক দিকে কেন্দ্রীয় ১৪ দলীয় জোট অন্যদিকে জামায়াত শিবির শুধু ঢাকা মহানগরী। তাও ঈদের পর হওয়ায় সবাই ময়দানে ছিল না। কিন্তু হাজার হাজার অস্ত্রধারী বাকশালী নাস্তিক সন্ত্রসীদের সামনে আমরা ৩/৪ শত (শুরুতে) কর্মী মাথানত করিনি। তারা আমাদের সামনে আশেপাশে লগি বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে গুলি করে শুধু ঢাকাতেই ঢাকা মহানগরী পূর্ব এর সবুজবাগ থানার ২৮নং ওয়ার্ড বায়তুলমাল সম্পাদক ও সাথী হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন, একই ওয়ার্ড সেক্রেটারি সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম ঢাকা মহানগরী পশ্চিমের সদস্য মুজাহিদ সহ ৬ জনকে শহীদ এবং শত শত ভাইকে পঙ্গু ও আহত করে দিল। এই হত্যাকান্ডে শুধু বাংলাদেশ নয় জাতিসংঘ সহ বিশ্বে নেতৃবৃন্দের নিন্দা এবং বিশ্বগণমাধ্যমে ব্যাপক তোলপাড় হয়। আমি সকাল থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ময়দানে ছিলাম। পরে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হই। পরবর্তীতে শুনেছি এত কিছুর পরও বিকাল ৩টায় যথাসময়ে জামায়াতের জনসভা শুরু হয় এবং আমীরে জামায়াত শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী যখন বক্তৃতা করেন তখনও গুলি ও বোমা হামলা চলতে থাকে। আমীরে জামায়াত ধৈর্য্য ধরে সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবে বক্তৃতা করেন। আওয়ামী নেতাদের মুক্তাঙ্গন থেকে মাইকে ঘোষণা দিয়ে হামলার নির্দেশ সত্ত্বেও আমীরে জামায়াত বক্তৃতায় কোন পাল্টা হামলা তো দূরের কথা উসকানি মূলক কোন শব্দও উচ্চারণ করেননি যাহা বিশ্বইতিহাসে বিরল। আর এই নেতাকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে, তাকে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে বিচারের নামে প্রহসন করে হত্যার আয়োজন করছে বর্তমানে নাস্তিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকার"।

"১৯৯৬ সালে রামপুরা এলাকায় উপশাখা সভাপতি হিসেবে নতুন দায়িত্ব দেয়া হয়। কর্মী বৈঠকে যথাসময়ে আমি ছাড়া কেউ উপস্থিত হয়নি। কি করি। যথাসময়ে কর্মী বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করাই ঐতিহ্য। কিন্তু কাকে ঘোষণা দিবো কোরআন তেলাওয়াত করতে? অথচ ঘড়ির কাঁটা বিকাল ৫টা ছুঁই ছুঁই করছে। সময় হয়েছে কিন্তু কেউ তখনও আসেনি। নিজের মাথায় হঠাৎ ধারণা আসলো আমার সাথেতো ২ জন ফেরেশতা আছে এবং আল্লাহ আছেন। তাই নিজেই ঘোষণা দিয়ে নিজেই কোরআন তেলাওয়াত করলাম। বিরতি দিয়ে পুনরায় দাওয়াতী কাজে বের হলাম কর্মী ভাইদেরকে বৈঠকে আনার জন্য। ১জন কে পেলাম তাকে নিয়ে নিদিষ্ট কর্মসূছি শেষ করলাম এবং পুনরায় বৈঠকের পরিকল্পনা করলাম। ইতিমধ্যে সবাইকে জানানো হলো বৈঠক যথাসময়ে শুরু হয়েছে এবং সভাপতি নিজেই কুরআন তেলাওয়াত করেছে। পরবর্তীতে সবাই বৈঠকের পূর্বেই উপস্থিত হতেন এবং সবাই সক্রিয়ভাবে সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন। আমার জীবনে এই ঘটনা শিক্ষা হলো দায়িত্বশীলরা যদি সংগঠনের ঐতিহ্য সংরক্ষণে যথাযথ ভূমিকা রাখেন তাহলে কর্মীরা সব সময় অনুসরণ করেন।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

উত্তর : বাংলাদেশের বর্তমানে পরিস্থিতিতে শিবিরকে রাসূল (সা:) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে যথা -

১. সর্বাবস্থায় হেকমত কৌশলী হতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার।

২. বাসূল (সা:) এর যুদ্ধনীতি বা জিহাদ সম্পর্কে যথাযথ ভাবে জানতে হবে।

৩. ছাত্রশিবিরকে আবেগবর্জিত ধীরস্থির সিদ্ধান্তের আলোকে ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।

৪. মনে রাখতে হবে বর্তমান যুগ জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ, ইসলামী সংগঠন হিসেবে আল-কুরআন এবং রাসূল (সা:) এর আদর্শই আমাদের প্রেরণার উৎস। সাথে সাথে সমসাময়িক নাস্তিক্যবাদীও ধর্মনিরপেক্ষ জড়বাদী জাহেলিয়াতের হামলা মেধা প্রজ্ঞা ও তাকওয়াভিত্তিক জীবন গঠনের মাধ্যমেই মোকাবেলা করতে হবে।

৫. বর্তমান তৎপরতায় ইসলামী ছাত্রশিবির ১৬ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছে। শিবির সকল রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্র ও বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে শিবির তার প্রতিষ্ঠা থেকে আপসহীন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান আধিপত্যবাদ বিরোধী, ইসলাম, গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইয়ে শিবির যে ভাবে রক্ত দিচ্ছে, জীবন দিচ্ছে, জেল জুলুমের শিকার হচ্ছে তা বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই ইসলাম, গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইয়ে কোন আপস নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের পক্ষে এই কাফেলার পথ চলা যত কঠিনই হোক শত শত শহীদের সাথীরা সাহসিকতার সাথে জীবন বাজি রেখে দুনিয়ার সকল লোভ লালসার উর্ধ্বে উঠে তার মূল লক্ষ্য দুনিয়ার শান্তি আখেরাতের মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেই। ইন্‌শাআল্লাহ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : "সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি" এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রশিবির এ ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী?

উত্তর : পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট্ট একটি দেশ বাংলাদেশ। অপার সম্ভবনার দেশটির উপর আজ শকুনের হিংস্র নখর, হায়েনাদের বিষাক্ত দৃষ্টি। স্বাধীনতার পর থেকে পরিকল্পিতভাবে দেশটি যাতে ঐক্যবদ্ধ ও স্থিতিশীল না থাকে তার জন্য স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের ধুয়া তুলে ভাগ করে রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের এদেশের এজেন্টেরা ৪২ বছরে বাংলাদেশকে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। চতুর্দিকে দুর্নীতি, লুটপাট, অসৎ চরিত্র, সৎ চরিত্রের মহা দুর্ভিক্ষ, শুধু সরকারি টাকা লুটপাটের প্রতিযোগিতা, সকল ক্ষেত্রে অনিয়মই যেন নিয়ম। অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি-সভ্যতা আজ এক মহাসংকটে। সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা, অবাধ আকাশ সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির ছোবল, অবাধ মেলামেশা, সমাজকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে। স্কুল- কলেজে এমন ঐশী মার্কা জেনারেশন তৈরি করা হচ্ছে যাদের নিশ্চিত পরিণতি অন্ধকার নেশার জগৎ অথবা মা বাবার অবাধ্য সন্তান অথবা আখেরাত বিমুখ এক উদ্ভ্রান্ত গন্তব্যহীন জীবন যাহা কখনও নৈতিকতা, মানবতা মনুষৎত্বের সংজ্ঞায় পড়ে না । ক্লাসে পড়াব আগডুম বাকডুম আর তার নিকট প্রত্যাশা করব নৈতিকতা, সালাম, ভদ্রতা, মহানুবতা তা হতে পারে না। এই অন্ধকার থেকে ছাত্রসমাজকে উদ্ধার করতে ছাত্রশিবির যে ভিশনকে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে তা সাধারণত প্রকৃত ছাত্রসমাজেরই আকাঙখা। নেশামুক্ত জীবন, সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস, গ্রুপিংমুক্ত ছাত্ররাজনীতির প্রবক্তা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। আজকের ছাত্ররাই আগামীদিনের নেতা, তাই শিবিরের ভিশন যে সৎ, যোগ্য দক্ষ ও দেশপ্রেমিক জেনারেশন তৈরির অঙ্গীকার করা হয়েছে তা অবশ্যই সফল হবে। ছাত্রশিবির তার লক্ষ্যে স্থির থেকে এবং এই দাওয়াতকে সাধারণ ছাত্রদের নিকট পৌছিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে সৎ,দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিকের দেশ হিসেবে উপস্থাপন করবে এবং আগামীর বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিবে ইসলামী ছাত্রশিবির। "সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য আজ সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নেতার বড় প্রয়োজন, তাই হাজারো ষড়যন্ত্র, বাধা মাড়িয়ে ছাত্রশিবিরের সব আয়োজন।"

আজ সৎ, দক্ষ, দেশপ্রেমিক নেতাদের যেভাবে জাতীয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে হত্যা করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ সহ গোটা জাতিকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের জন্য আপনার পরামর্শ ?

উত্তর : ১. সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে নিজেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে Expert করে গড়ে তোলা।
২. কুরআন হাদিসের গভীর জ্ঞানার্জন ও নিয়মিত চর্চাকে অগ্রধিকার।
৩. সময়ের যথাযথ ব্যবহার ও সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা।
৪. সর্বাবস্থায় হেকমত কৌশলে দাওয়াতি কাজ, সংগঠন সম্প্রসারণ, তাকওয়া অর্জন ও আখেরাতমুখী জীবন গঠন।
৫. সর্বস্তরে ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ, যথাযথ আনুগত্য, সাহসী ও যোগ্য উত্তরসুরী তৈরি।
৬. সবসময় আল্লাহর উপর ভরসা করা।

www.pathagar.com

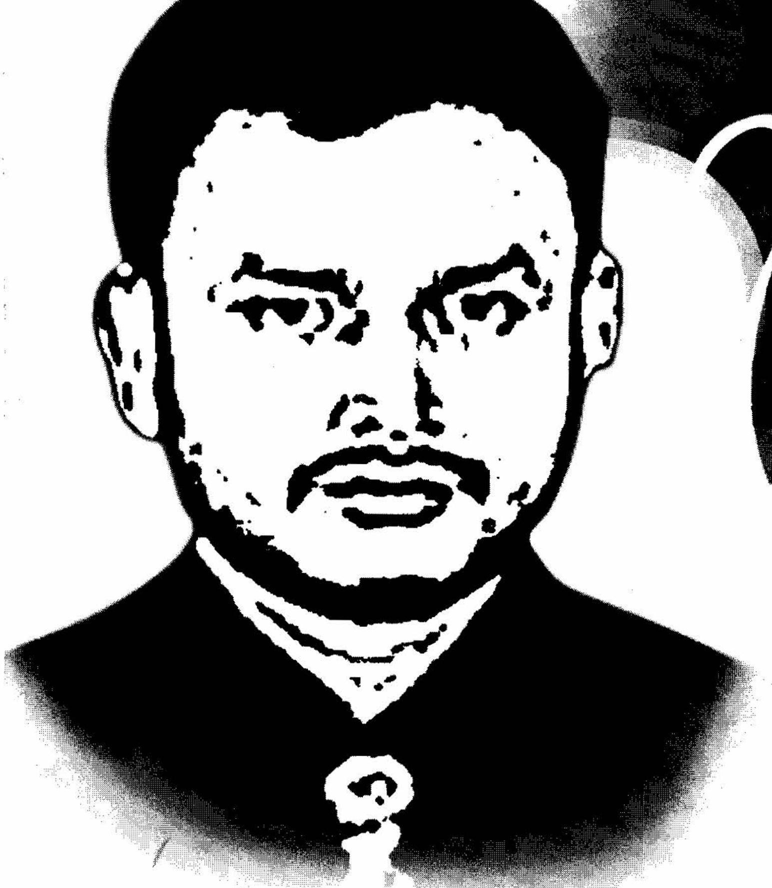

ডা: ফখরুদ্দিন মানিক

আওয়ামী জালিম
সরকারের কারাগারে
আবদ্ধ থাকায়
সাক্ষাৎকার
গ্রহণ করা
সম্ভব হয়নি

www.pathagar.com

মনির উদ্দিন মণি

অনিবার্য কারণবশত
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা
সম্ভব হয়নি

pathagar.com

মু. ইয়াছিন আরাফাত

আওয়ামী জালিম
সরকারের কারাগারে
আবদ্ধ থাকায়
সাক্ষাৎকার
গ্রহণ করা
সম্ভব হয়নি

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি কখন কিভাবে সংগঠনে এসেছেন ?

শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির : আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তায়ালার অপার শুকরিয়া যে তিনি আমাকে এ হেদায়েতের পথে চলার তাওফিক ও সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তবে আমার এ আন্দোলনে আসাটা অতটা সহজ ছিল না কারণ আমাদের গ্রামটির তিন ভাগের এক ভাগ হিন্দু আর বাকিরা সব মুসলিম। তারা মুসলিম হলেও সবাই ছিল আওয়ামী লীগের সমর্থক এমনকি আমার বাবা চাচারাও তাই। শুধু আমার এক চাচা জামায়াতের কর্মী ছিলেন, বিএনপির তো কোন অস্তিত্ব ছিল না। এমন পরিবেশ থাকার কারণে মন মস্তিষ্কে গেঁথে যায় শুধু আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগ। কিন্তু আমার মেঝ মামা শিবির করতেন। আমি ছোট থাকায় শিবির বুঝতাম না তবে মামার প্রশংসা মা বাবাসহ নানা বাড়ির সকলেই করতেন। আমি স্বপ্ন দেখতাম মামার মতো একজন ভাল মানুষ হবার মতো । যদিও আমার মামা আমাকে কখনও শিবির এর দাওয়াত দেননি। যে ঘটনা আমার কিশোর মনে তোলপাড় করেছিল এবং শিবির-এর নাম আমার হৃদয়ের গহিনে গেঁথেছিল সেটি হল ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে তারিখ মনে নেই একদিন সকালে আমি আমার স্কুলে যেয়ে দেখি স্কুলে ঢোকার গেটে ওয়ালে দুটি লাল টকটকে পোস্টার তাতে দুজন মানুষের রক্তাক্ত ছবি পাশে একজনের নাম লেখা মুন্সি আবদুল হালিম (জি এস খুলনা বিএল কলেজ) আর একজন আমান উল্লাহ আমান (খুলনা আলিয়া) নিচে সাদা হরফে নীল বক্সের মধ্যে বড় করে লেখা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমার সাথে সাথে আরো অনেক ছাত্রছাত্রী সহপাঠীদেরকেও দেখেছি ঐ পোস্টারটির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে। সে দিন আমার ছোট হৃদয়ে যে ঝড় তৈরি হয়েছিল তার কম্পন আমি হৃদয়ের মাঝে এখনও অনুভব করি। প্রশ্ন জেগেছিল কী অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হল। কোন উত্তর না পেয়ে বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছে ঘটনা বললাম। মা বললেন খুলনা বিএল কলেজে ও আলিয়া মাদ্রাসায় ছাত্রদল গুলি চালিয়ে ছাত্রশিবিরের ২ জন নেতাকে মেরে

www.pathagar.com

ফেলেছে। মাকে প্রশ্ন করলাম কেন? মা যা বললেন তাতে আমার শিবিরের প্রতি আকর্ষণ আরো বাড়ল। আমার মা মাত্র ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন আর ইসলামের অত গভীর জ্ঞানও তার নেই । সে বলল যারা ভালো পথে চলে তাদেরকে শয়তান বজ্জাতেরা দেখতে পারে না। আমি কেন প্রশ্ন করলে বলল সমাজে খারাপ লোকের সংখ্যা অনেক বেশি ওরা ভাল মানুষদের দেখতে পারে না। আমি আর প্রশ্ন করিনি। চুপ চাপ শুনলাম। সামনে বৃত্তি পরীক্ষা থাকার কারণে পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম ঠিক কিন্তু স্কুলের ওয়ালে দেখা পোস্টার দুটি এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির নামটি আমার হৃদয়ে যেন স্থায়ী আসন গাড়লো। কোন মতে তা হৃদয় থেকে সরাতে পারলাম না। পরীক্ষার পর যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই পাশের ইউনিয়নে গোপালপুর শহীদ আসাদ স্মৃতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এই স্কুলে ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় আবু সাঈদ ভাই (বর্তমানে বাগেরহাটের ডিটিভির প্রতিনিধি) এক সাধারণ সভায় শিবির কী এর আদর্শ এবং ইসলামের বিভিন্ন দিকের চমৎকার উত্তর দিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সব শুনলাম আর যখন তিনি আমাকে সমর্থক ফরম পূরণ করার আহবান জানান আমি সাথে তার আহবানে সাড়া দিয়ে সমর্থক ফরম পূরণ করি। সেই তখন থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম মুন্সি আবদুল হালিম এবং আমান ভাইয়ের এ পথ ধরে আমাকেও বন্ধুর এ পথে চলতে হবে। তাদের দুজনের শাহাদাৎ গোটা খুলনা বিভাগের সকল শ্রেণী পেশার মানুষদের নাড়া দিয়েছিল। আজও চলছি তাদের সে দেখানো পথ ধরে। আমার জানামতে আমি কখনো কোন প্রোগ্রামে সজ্ঞানে অনুপস্থিত থাকিনি। ভাবতে চোখের দু কোণে পানি এসে যাচ্ছে যে আমি দীর্ঘ ২০টি বছর ধরে এই শহীদি কাফেলার ছায়াতলে থাকতে পেরেছি মহান আল্লাহ পাক আমাকে সে সুযোগ করে দিয়েছেন। সত্যি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না। আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন : আপনার সময়ের জনশক্তি এবং বর্তমান সময়ের জনশক্তির মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য আছে কি ? হলে সে বিষয়গুলো কী কী ?

শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির : ইসলামী আন্দোলনে কোনটি আমার সময়ের জনশক্তি বা অমুক ভাই এর সময়ের জনশক্তি বলে কোন কথা নেই, সবাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মী । প্রত্যেকে এ আন্দোলনে আসে আল্লাহর দ্বীনকে ভালোবেসে আল্লাহর সন্তুষ্ট লাভের আশায়। সবাইতো একই আন্দোলনের কর্মী লক্ষ্য উদ্দেশ্য সবার এক। আমার কাছে এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে যখন কোন দায়ীত্বশীল পর্যায়ের ভাইকে বলতে শুনি আমার আমলে আমি এই এই সফলতা পেয়েছি, অমুক ভাই তার সময়ে এই এই দিকে ব্যর্থ হয়েছেন এগুলো সুস্পষ্ট জাহিলিয়াত। কোন ভাইয়ের যোগ্যতা আর এক ভাই থেকে কম থাকতেই পারে। নিজের প্রশংসা নিজে করে শুধু নিজের নেক আমলকে নষ্ট করা ছাড়া কিছুই হয় না। এ ধরনের মানসিকতা আমাদের এ আদর্শিক আন্দোলনের জন্য মারাত্মক ধরনের ব্যাধি । আমি তো দীর্ঘ ১০ টি বছর এই মহানগরীতে ছিলাম যার মধ্যে সভাপতি হিসেবে এক বছর এই দীর্ঘ সময়ে আমি মৌলিক তেমন কোন গুণগত পরিবর্তন দেখিনি। তবে সভাপতি হিসেবে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের তার জনশক্তিকে গড়ার জন্য এবং তাদেরকে একটা পর্যায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আলাদা প্রত্যাশা এবং পরিকল্পনা থাকে আমারও ছিল কিন্তু আমার প্রত্যাশা বা পরিকল্পনার ধারে কাছেও আমি যেতে পারিনি। এর পেছনে অনেক বাস্তবতা থাকলেও আমার নিজের

www.pathagar.com

অযোগ্যতা ও অদক্ষতাই এর পেছনের বড় কারণ। আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের এই আমলের উত্তপ্ত সময়ে দায়িত্ব পালন করা কত যে কঠিন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পরিস্থিতিতে জনশক্তির মৌলিক অনেক বিষয়ে ঠিক রেখে ছোট খাটো কিছু বিষয়ে ওভার লুক করতে হয়েছে। যেখানে অনেক জনশক্তি পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়া এবং দুর্বল মানসিকতার হওয়ার কারণে সংগঠন থেকে দূরে থাকাকে নিরাপদ মনে করেছে সেখানে যে জনশক্তিগুলো নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও দায়িত্বশীলদের আনুগত্যের জন্য গুলির মুখে বুক পেতে দিয়েছে, যখন ডেকেছি তখনই এসেছে তখন মনের অজান্তে দু চোখের কোনা বেয়ে আনন্দাশ্রু বেয়ে নেমেছে হৃদয় থেকে স্বতঃস্ফূর্ত তাদের জন্য থেকে মন দোয়া বেরিয়ে এসেছে। এটাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া এবং আমার সাহস। তার পরও কিছু কিছু বিষয়ে আমাদের আরো নজর দিতে হবে। যেমন পারস্পারিক ভালোবাসা এবং একে অপরের মতকে শ্রদ্ধা করতে শেখা। অপরের কল্যাণকামিতা। সংগঠনের মূল দায়িত্বশীলদেরকে একেবারে উপশাখা পর্যন্ত সাথী কর্মীদের খোঁজ খবর এবং মনিটরিং আরো বাড়াতে হবে। তাছাড়া এখন তথ্য প্রযুক্তি উন্নতির কারণে অনেকের মাঝে প্রদর্শনেচ্ছা বেশি চলে আসছে। কোন প্রোগ্রাম করে তা সাথে সাথে অনলাইনে প্রচার হয়ে যাচ্ছে যেন দায়িত্বশীল কে বা ঊর্ধ্বতন সংগঠনকে দেখানোই যেন এখন মুখ্য, আল্লাহর সন্তোষের কথা অনেক সময় গৌণ হয়ে যায়। আমার মনে হয় এ বিষয়টি একটি নিয়মনীতির মধ্যে আনতে পারলে অর্থাৎ সব গড়ে সমানভাবে না দিয়ে কোন লেভেলের প্রোগামের ছবি প্রচার করা যাবে কোনটা যাবে না তা নিশ্চিত করতে পারলে তার মধ্যে ভালো ছাড়া খারাপ কোন কিছু আমি দেখি না। আমাদের এই জায়গাটাতে আরো নজর দিতে হবে। ব্যক্তিগত দাওয়াতি কাজ আমাদের এই আদর্শিক আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাই এ ক্ষেত্রে প্রত্যেককে আরো যত্নবান হতে হবে। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সকল দায়িত্বশীল যেন অধীনস্থ জনশক্তিদের তত্ত্বাবধান ও নিবিড় সাহচর্য দান করে তাদের ব্যক্তিগত খোঁজ খবর কুরআন হাদিসের চর্চা আমল আখলাকের পরিচর্যা ও একাডেমিক পড়ালেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কোন অবস্থায় এহতেসাবের দরজা বন্ধ করা যাবে না। সকল পর্যায়ে এই এহতেসাবের চর্চা চালু রাখা প্রয়োজন। সর্বোপরি নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে নিজেদের কাজের জন্য জবাবদিহি করা লাগবে এই অনুভূতিকে আরো শাণিত করতে হবে।

প্রশ্ন : আপনার সাংগঠনিক জীবনের দু'টি ঘটনা বলুন যা আমাদের বর্তমান জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে।

শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির : ১৯৯৪ থেকে ২০১৪ টানা ২০ বছর এ সংগঠনের সাথে আছি। আমার সাংগঠনিক ক্যারিয়ারের এ বছর ২১ বছরে পড়ল। এ দীর্ঘ সময়ে কত ঘটনাইতো ঘটলো। কোনটা রেখে কোনটা বলি। ২৮ অক্টোবরের লগি-বৈঠার তান্ডব, জগন্নাথের ক্যাম্পাসের উত্তপ্ত সে দিনগুলোর কথা, না ৩১ জুলাই ২০১১ নিজের আহত হওয়ার কথা, না ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ এর তৌহিদী জনতার প্রতিরোধের কথা, না ৫ ও ৬ নভেম্বর ২০১২ এর কথা নাহ কোনটা বলবো না কারণ এ ধরনের ঘটনা এখন বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক জায়গায় ঘটছে সবার কম বেশি এ ধরনের অভিজ্ঞতা আছে। অন্য বিষয়ে বলছি। দু'টি ঘটনা বলতে বলা হয়েছে চেষ্টা করছি- ঘটনা না বলে ঘটনাসমষ্টি বললে বিষয়টি পরিষ্কার হবে যা আমার হৃদয়ের গভীরে এখনো দাগ কাটে এখনো মাঝে মাঝে আমাকে আনমনা করে

www.pathagar.com

তোলে আমার কাজে প্রেরণা জোগায়। ২০০৫ সালে আমি তখন সবুজবাগ দক্ষিণ বর্তমান মুগদা থানার ২৮ পশ্চিম ওয়ার্ডের সভাপতি। থানা সভাপতি আবদুল হক ভাই আর সবুজবাগ উত্তরের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ভাই। আজাদ ভাই এর কাছ থেকে অনেক বিষয় আমি শিখেছি তাই তাকে একদিক থেকে আমার সাংগঠনিক ওস্তাদ বলেও আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। আজাদ ভাই ও ২৮ পশ্চিমের সভাপতি ছিলেন ২০০৩ সালে আর সেক্রেটারি ছিলেন মোজাম্মেল হক ভাই, তার দুজনে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। আমি তখন কদমতলা উপশাখার সভাপতি। একটি বিষয় জানা খুবই জরুরি ২০০৪ এ ২৮ পশ্চিম ওয়ার্ডের সভাপতি হলেন বায়তুলমাল সম্পাদক শফিউদ্দিন সেন্টু ভাই সেক্রেটারি বানানো হল আমাকে। আর আজাদ ভাইকে ২৭ পূর্ব ওয়ার্ডের (শহীদ মাসুম ও শিপন ভাইদের ওয়ার্ড) সভাপতি বানানো হল। আর সেক্রেটারি মোজাম্মেল ভাইকে তার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার কারণে থানার জনশক্তি হিসেবে রাখা হল যাতে তিনি ভালো রেজাল্ট করতে পারেন। অবশ্য তিনি থানা দায়িত্বশীলদের সে প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামেস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে ফার্স্টক্লাস সেকেন্ড হয়েছিলেন। আমি কিন্তু মূল ঘটনায় এখনো আসতে পারেনি এগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড বলছি। আমার কাছে চরম শিক্ষণীয় বিষয় ছিল যে ২০০৫ সালে যখন ২৮ পশ্চিম সেট আপ হলো তখন। সভাপতি বানানো হলো আমাকে আর সেক্রেটারি বানানো হলো যিনি একটি বছর থানার জনশক্তি হিসেবে কাজ করেছেন এই ওয়ার্ডেরই সাবেক সেক্রেটারি আমার দায়িত্বশীল শ্রদ্ধাভাজন মোজাম্মেল হক ভাইকে। আমার কাছে বিস্ময়ের এখানে শেষ ছিল না এ ওয়ার্ডের সভাপতি ছিলাম আমি আটমাস। এই আট মাসের মধ্যে একদিনের জন্যও মোজাম্মেল ভাই আমাকে বুঝতে দেননি যে তিনি এক সময়ে আমার দায়িত্বশীল ছিলেন বা আমি তার জনশক্তি ছিলাম বরং তিনি আমাকে তার সভাপতি হিসেবে যে সম্মান করা দরকার যে আনুগত্য দরকার তার চেয়েও বেশি করেছেন। অনেক সময় আমি অনেক বিষয়ে তাকে কাজে বলতে ইতস্ততা বোধ করলে তিনি আমাকে উদার মানসিকতা নিয়ে বলতেন ভাই আপনি আমার দায়িত্বশীল নিঃসংকোচে নির্দ্বিধায় সংগঠনের কাজের কথা আমাকে বলবেন কোন জড়তা রাখবেন না। সত্যি আমি তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আর তাকে কোন বিয়য়ে আমাকে নির্দেশ দেয়া লাগতো না নিজে থেকে সব কাজ করতেন। আমার সাংগঠনিক জীবনে এ পর্যন্ত তিনবার এ রকম ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একটি তো বললাম দ্বিতীয়টি হল আগস্ট মাসে আমাকে নটরডেম কলেজের সেক্রেটারি বানানো হলে মোজাম্মেল ভাই ২৮ পশ্চিমের সভাপতি হন। নটরডেমের সেক্রেটারি থাকা অবস্থায় বছর শেষে থানা সেট আপ সভাপতি হলেন আমার অধীনস্থ বায়তুলমাল সম্পাদক ইকবাল ভাই। আর তৃতীয়টি হল নটরডেম সভাপতি থাকা অবস্থায় সেখান থেকে নিয়ে রমনা থানার সেক্রেটারি বানানো হল। আমার সভাপতি ছিলেন এস. এম শামসুল বারী ভাই, আমরা একসাথে থানা সভাপতি ছিলাম উনি ছিলেন লালবাগ থানার সভাপতি, আমি রমনায় যাওয়ার কয়েক মাস আগে তাকে রমনা থানায় সভাপতি হিসেবে আনা হয়। আসলে বারী ভাই এক অমায়িক লোক, তিনি আমার চেয়ে দু এক বছরের বড় হবেন। আমাকে তিনি স্নেহ করতেন ছোট ভাইয়ের মতো। আজকে আমি দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলছি আমার কাছে যদি মোজাম্মেল ভাই এর জীবন্ত দৃষ্টান্ত না থাকতো তাহলে মানবিক দুর্বলতার কারণে ইসলামী আন্দোলনের এ কঠিন পথে এ দু'ই পরিস্থিতিতে আমি দায়িত্ব পালন করতে পারতাম না, টিকে থাকতে পারতাম না। আমি এ পরিস্থিতিতে দুটি

www.pathagar.com

জায়গায় আমার দায়িত্বশীলদের সঠিক ভাবে এবং যে ভাবে তারা চেয়েছিলেন সেভাবে হয়তো আনুগত্য করতে পারিনি আর কতটুকু পেরেছি তার মূল্যায়ন করার দায়িত্ব আমার ঐ দায়িত্বশীলগণের তবে মোজাম্মেল ভাই এর উদাহরণ আমার দায়িত্বপালনকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছিল। আল্লাহ তাকে হায়াতে তাইয়্যেবা এবং সকল নেক আমলের উত্তম যাযাহ দান করুন।

২০০5 সালেই সবুজবাগ ভেঙ্গে সবুজবাগ উত্তর সবুজবাগ দক্ষিণ হয় এবং দুই থানা যৌথ ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে বাসাবো মাঠে মে মাসের ৪ তারিখ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের মাহফিল করা হবে। আমরা সকলে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মাহফিল বাস্তবায়নের জন্য কালেকশন শুরু করলাম। লিফলেট নিয়ে বাসায় বাসায় দাওয়াতী কাজ করতাম। রাত জেগে জেগে পোস্টার লাগানো। একদিন তো মনে আছে আমরা সারা রাত পোস্টার লাগালাম। মাহফিলকে কেন্দ্র করে থানা পুরাতন কিশোরকণ্ঠ কম মূল্যে আমরা এই সুযোগে সেগুলো নিয়ে প্রত্যেক বাসায় বাসায় ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে গিয়েছি সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। অনেকে এমনকি মহিলা আন্টিরা বলেছে এত সুন্দর পত্রিকা প্রত্যেক মাসে যেন তাদেরকে পৌঁছানো হয়। আবার অনেকে মুখের উপর ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে তবে তা সংখ্যায় কম। ২৮ পশ্চিমের এমন কোন বাসা ছিল না, এমন কোন ফ্ল্যাট ছিল না যে সেখানে আমরা যাইনি। এগুলো ভাবতে এখন অনেক সময় চোখের পানি চলে আসে আর কি সে দিন ফিরে আসবে যে দিন আমাদের ভাইয়েরা এরকম পরিবেশে স্বাভাবিক দাওয়াতী কাজ করতে পারবে?

তো আমাদের মাহফিলের প্রচার কাজ শেষ প্রান্তে। আগের দিন আমরা মাহফিলের মাঠে সকালে গেলাম স্টেজ করার জন্য । কিন্তু আমাদের জন্য এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত এসে পড়ল প্রচুর বৃষ্টি শুরু হল। এমন বৃষ্টি যে স্টেজ করাতো দুরের কথা এখন মাহফিল নিয়ে প্রচন্ড আশংকা দেখা দিল। সারা দিন থেমে থেমে বৃষ্টি হল। এর পরও সবাই সিদ্ধান্ত নিল আবহাওয়া যাই হোক স্টেজ বানানোর কাজ চলবে। সন্ধ্যার দিকে মুষল ধারে বৃষ্টি একটু কমে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃতি রূপ নিলেও আকাশে মেঘের তর্জন গর্জন হাঁক ডাক চলছিল রীতি মতো। তো এর মধ্যে সিদ্ধান্ত হলো আমাদের কয়েকজনকে রাতে মাঠ পাহারা এবং মাঠ সংস্কারের কাজ করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৮ পশ্চিম ২৭ উত্তর ২৭ দক্ষিণ এবং স্কুল ওয়ার্ডের উপর দায়িত্ব পড়ে সারা রাত মাঠের পাহারা এবং মাঠের সংস্কারের কাজ করবে। আমিসহ আমরা প্রায় ১০/১২ জন এদের মধ্যে ছিলেন সাইফুল্লাহ ভাই (তখন তিনি সবুজবাগ উত্তরের সেক্রেটারি পরে তিনি মহানগরীর আইটি সম্পাদক ও প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন) তখনকার ২৭ দক্ষিণ সেক্রেটারি কুতুব ভাই, আমাদের প্রাণপ্রিয় **শহীদ সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম ভাই,** নাসের মাহদির নাম আমার মনে আছে বাকিদের নাম আমার এ মুহূর্তে স্মরণ নেই। সবাই পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এশার নামাজ পড়ে রাতের খাবার খেয়ে মাঠে হাজির হলাম। এদিকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি কখনো ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি চলছে। স্টেজের সামনে যেখানে শামিয়ানা টানানো তার নিচে যেখানে শ্রোতারা বসবেন সেখানে কোন কোন জায়গায় গর্ত থাকার কারণে পানি জমে ছিল। এ পানি কিভাবে সরানো যায় তা নিয়ে চিন্তা করছি। হঠাৎ কে যেন বলে উঠলো আচ্ছা মাঠের কোনায় যে বালুর স্তুপ রয়েছে সেগুলো এনে এখানে

www.pathagar.com

দিলেতো গর্ত ভরাট হয়ে যাবে এবং মাঠের পানিও দূর হবে মাঠও সমান হবে। সবার কথাটা পছন্দ হলো। দেরি না করে সবাই কাজে লেগে গেলাম। কাজ করছি সবাই একসাথে আবার হাসি ঠাট্টা তো আছেই। এর আগে শহীদ মাসুম ভাই এবং কুতুব ভাই বাসা থেকে ব্যাট আর বল নিয়ে এসেছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু বিনোদন তাই আমরা দু ভাগ হয়ে পালা করে কাজ করছি আর শামিয়ানার নিচে লাইটের আলোতে ক্রিকেট খেলে নিজেদের চাঙ্গা রাখছি যাতে ঘুম আমাদের এ্যাটাক করতে না পারে। একদিকে মনের আনন্দে কাজ অন্যদিকে আকাশে তখনও চলছে তর্জন গর্জন সাথে হালকা বৃষ্টিতো আছে। সকলের মনের ভেতর এক অজানা আতঙ্ক আশংকা যে শেষ পর্যন্ত আমাদের এই কষ্ট এই পরিশ্রম কি বৃথা যাবে? দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া দিয়ে কি আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা করছেন? আরো কতো ধরনের দুশ্চিন্তা শঙ্কা, কত মানসিক ধকল যে গেছে ঐটুকু সময়ে তা সব লিখে শেষ করা যাবে না। আমাদের কাজ করতে করতে রাত প্রায় চারটা বেজে গেল। সবাই ক্লান্ত প্রয়োজন গভীর ঘুমের। আবার রাতও বাকি আছে কম। এসময় ঘুমিয়ে পড়লে ফজরের নামাজ কাজা হবার সম্ভাবনা। সব কিছু বিবেচনা করে শহীদ মাসুম ভাইয়ের প্রস্তাব মতে সিদ্ধান্ত নিলাম আর ঘুম টুম দরকার নেই বাকি রাত স্টেজে বসেই আমরা তাহাজ্জুদ পড়বো আর নামাজ শেষে আল্লাহর কাছে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া তুলে নেওয়ার আহবান জানাবো। আমরা সকলে অজু করে দাঁড়িয়ে গেলাম রাব্বুল আলামীনের দরবারে। নামাজ শেষে ফজরের আজানের আগে মোনাজাত শুরু হলো। মোনাজাত একটু ভিন্নভাবে করলাম অর্থাৎ দুজনে মোনাজাত পরিচালনা করলেন প্রথমে সাইফুল্লাহ ভাই পরে শেষ অংশ আমি পরিচালনা করলাম। একদম কাছে ডান পাশে গায়ের সাথে লেগে বসে ছিলেন শহীদ মাসুম ভাই। প্রত্যেক দোয়ার শেষে এত জোড়ে জোরে আমিন বলছিলেন যে ঐ শব্দটি এখনও মনে হয় আমার কানে বাজছে। সকলে প্রান খুলে আল্লাহর কাছে চাইল সেখানে ব্যক্তিগত কোন অভাবের কথা বলা হয়নি শুধু বলা হয়েছে "হে আল্লাহ আমরা তোমার গোনাহগার বান্দা আগামীকালকে যে কোরআনের তাফসীর আমরা আয়োজন করছি তা পেশ করবেন বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এবং তা শুনবে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। এর মাধ্যমে অনেকে তোমার দ্বীনের পথে আসতে পারে। তাই আল্লাহ তুমি আমাদের এ আয়োজনকে সুন্দর এবং অনুকূল আবহাওয়ার মাধ্যমে শেষ করার সুযোগ করে দাও।"আরো অনেক কথা এটুকু বোঝার স্বার্থে বললাম। আমাদের সবার কান্নার আওয়াজে বাসাবোর আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। পরে আমরা শুনেছি যে কান্নার শব্দে মাঠের আশপাশের বিল্ডিংয়ের লোকজনের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারা খোঁজ নিয়েছে রাতে এখানে এত কান্না কাটি কেন হয়েছে তা জানার জন্য। মোনাজাত শেষে আমরা পাশের মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ে শৃঙ্খলার আমাদের পরের গ্রুপ মাঠে আসলে আমরা যার যার বাসায় গেলাম। বাসায় যাওয়ার পথে লক্ষ করলাম আকাশ ফরসা আর পূর্ব দিক থেকেও একটি লাল টকটকে সূর্য উঠেছে। মনে প্রশান্তি নিয়ে বাসায় যেয়ে গোসল করে একটু ঘুমালাম, ক্লান্ত শোয়ার সাথে সাথে গভীর ঘুম। টানা ১২ টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে তৈরি হয়ে আবার মাঠে গেলাম। এখন পর্যন্ত কোন বৃষ্টি হয়নি সূর্যের প্রখরতাও ছিল প্রচণ্ড তাই ভ্যাপসা গরমও পড়ছিল। আর রাতে আমাদের ইবাদতের কথা আমরা ছাড়া আর কেউ ঐসময় পর্যন্ত কেউ জানেনি। এরই মধ্যে মাহফিল শুরুর আগ মুহূর্তে অর্থাৎ ২.৩০ টা দিকে হঠাৎ কালো মেঘে আকাশ ভরে

www.pathagar.com

গেল। কিছুক্ষণ পরে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি শুরু হল। সবার চোখে মুখে কালো মেঘের অন্ধকার শেষ পর্যন্ত আমাদের সব আয়োজন বৃথা হয়ে যাবে? আল্লাহ আমাদের সহযোগিতা করবেন না? আমরা যারা রাত্রে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেছি তারাও কিছুটা হতাশ । তবে আমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেছিল যে আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করবেন। এ কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বৃষ্টির ফোঁটা বন্ধ হল। আকাশও ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে শুরু করলো। এবং মাহফিল সুন্দর পরিবেশে শেষ হল। মাহফিল শেষে পর্যালোচনা বৈঠকে পাশে শহীদ মাসুম ভাই বসা আমার দিকে তাকিয়ে যা বললেন তার ভাবার্থ হলো ভাই আমি জীবনে এই প্রথম দেখলাম যে আল্লাহর কাছে কোন জিনিস সৎ ও খালেস নিয়তে চাইলে আল্লাহ তা না দিয়ে পারেন না, এটি আমার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি তার কথায় শায় দিলাম তার কাঁধে হাত রেখে বললাম ভাই এটি আমার জীবনেও স্মরণীয় এবং অনুকরনীয় হয়ে থাকবে। আজ আমার কাছে আরো দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে আমাদের ঐ রাতের দোয়া আল্লাহ কবুল করেছিলেন আর সেটি হয়েছিল শহীদ মাসুম ভাইয়ের মতো মানুষ সেদিন আমাদের দোয়ায় শামিল ছিলেন বিধায়। আল্লাহ তাকে আগে থেকে পছন্দ করে রেখেছিলেন। আর তার এ প্রিয় বান্দাকে ২৮ অক্টোবরের ঐ লগি বৈঠার নারকীয় তান্ডবের মাধ্যমে দুনিয়া থেকে তুলে নিলেন। শহীদ হওয়ার পর তার কফিনে তাকিয়ে আমার হৃদয়টা ভরে গিয়েছিল যেন একটি হাস্যেউজ্বল সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ । তার জানাযা শেষে আল্লামা সাঈদী সাহেব বলেছিলেন এ যেন ফুটন্ত গোলাপের পাপড়ি। তিনি অনোক্ষণ ধরে দোয়া করলেন। ২৮ অক্টোবর গোলাম কিবরিয়া শিপন আমার আর এক সাথী ভাই যাকে হারিয়েছি ঐ নারকীয় তাণ্ডবে। শিপন ভাই ছিলেন এক সদা তৎপর এবং বাকপটু প্রাণচঞ্চল এক তরুণ। যেখানেই যেতেন সুন্দর সুন্দর চুটকি বলে আমাদেরকে চাঙ্গা রাখতেন। শিপন ভাইয়ের সাথে আমার সর্বশেষ দেখা হয় ২০০৬ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে মালিবাগ রেলক্রসিং এর আগে অর্থাৎ মগবাজার থেকে আসছিলেন সাথে সাবেক এক সাথী সুজন ভাই ছিলেন আর আমি মালিবাগ রেলক্রসিং থেবে মগবাজারের দিকে যাচ্ছি। দেখা হওয়ার সাথে সাথে দূর থেকে সালাম দিলেন। আমাকে এখানে আশার কারণ জানতে চাইলেন তখনও উনি জানতেন না যে আমাকে রমনা থানার সেক্রেটারি করা হয়েছে। যখন বললাম আমিতো এখন রমনা থানার সেক্রেটারি উনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন ভাই আপনাকে সংগঠন এবার পাইছে আর কত জায়গায় আপনাকে ঘোরায় আল্লাহই ভালো জানে। বললেন সবুজবাগ থেকে আসার পর আপনি আমাদের ভুলে গেছেন আরতো যান না আমাদের ওখানে। সর্বশেষ যাওয়ার দাওয়াতও সালাম দিয়ে বিদায় নিলেন। আমি তার যাওয়া পথের দিকে কেন যেন কয়েকবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। এভাবে তারা রেলক্রসিং পার হলে আমি মগবাজারের দিকে রওয়ানা দিলাম। আজ আমার কাছে পরিষ্কার কেন আমি ঐদিন বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলাম কিছুদিনের মধ্যে তিনিও যে আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দিয়ে শহীদ হবেন এজন্যই হয়তো। আল্লাহ যেন সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম এবং গোলাম কিবরিয়া শিপন ভাইকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন। আর আমার প্রত্যাশা সবুজবাগের ময়দানে যে ভাবে মাসুম ও শিপন ভাইদের পাশে থেকে কাজ করার সুযোগ হয়েছে জান্নাতেও যেন এক সাথে থাকতে পারি। আমিন। আর আল্লামা সাঈদীকেও যেন আমাদের মাঝে আবার ফিরিয়ে আনেন।

www.pathagar.com

আমার সাংগঠনিক জীবনের দ্বিতীয় যে ঘটনা আমাকে আজও নাড়া দেয় সেটি ঘটেছিল ১৯৯৯ সালের এপ্রিল বা মে মাসের দিকে সঠিক দিন তারিখ মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে যে আমার এস এস সি পরীক্ষা শেষ প্রাকটিকাল বাকি আছে। আর আমি সে সময়ে সাথী প্রার্থী রেজাল্ট দেয়ার (১৭জুন) ৪ দিন পর (২২জুন) সাথী হয়েছিলাম। ঐ সময়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বর্তমানে যে রকম যুলুম নির্যাতন এতটা না করলেও দেশের বারোটা বাজাচ্ছিলেন এ ঘষেটি বেগম ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। এর বিরুদ্ধে সকল বিরোধী দল আন্দোলন করছে। তখনও চারদলীয় জোট গঠিত হয়নি । তবে সরকার বিরোধী যুগপৎ আন্দোলন চলছিল। এরকম সময়ে বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী সরকারের বিভিন্ন অনৈতিক ও দেশের ও জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী কাজের বিরুদ্ধে রোড মার্চ এবং লঞ্চ মার্চ ঘোষণা হলো। বি এন পি রোর্ড মার্চ করলো চিটাগাং অথবা রাজশাহী অভিমুখী সঠিক মনে নেই ,জামায়াত খুলনা অভিমুখী এবং এরশাদ বরিশাল অভিমুখী লঞ্চ মার্চ করলেন। জামায়াতে ইসলামীর রোর্ড মার্চ কর্মসূচি খুলনা যেয়ে শেষ হয় বাবরি চত্বরে সমাবেশের মাধ্যমে। রোর্ড মার্চে নেতৃত্ব দেন মজলুম জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম। খুলনা বিভাগের সব জেলা থেকে এ সমাপনী সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য হাজার মানুষ খুলনা শহরে আসে। রোর্ড মার্চ যখন শুরু হয় তখন সারা দেশে তীব্র খরা চলছিল। কয়েক মাস কোন বৃষ্টির দেখা নেই। বৃষ্টির জন্য সারা দেশে হা হা কার অবস্থা । বৃষ্টির অভাবে মাঠকে মাঠ ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল । ঘরে ঘরে ক্ষুধার্থ মানুষের হা হা কার অবস্থা। অবস্থা এমন হয়ে ছিল যে আমাদের যে পরিমাণ ফসল হতো তা দিয়ে আমাদের ভালো ভাবে চলে যেত কিন্তু ঐ বছর আমাদের সকল ফসল বৃষ্টির অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। শুরু হয় আমাদের টানাটানি অবস্থা এমনকি আমার বাবাকে লাইনে দাঁড়িয়ে রেশমের চাল তুলতে হয়েছিল ঐ সময়। শুধু আমাদের নয়, গ্রামের আরো অনেক প্রভাবশালী পরিবারকে ঐ সময় এ কাজটি করতে হয়েছে। সারা বাংলাদেশের প্রায় সকল এলাকায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এত তীব্র খরা এবং অনাবৃষ্টি আমার জীবনে ঐ প্রথম দেখেছি। বৃষ্টির জন্য সারা বাংলাদেশের মসজিদে মসজিদে দোয়া, এস্তেখারার নামাজ চলছিল। কিন্তু বৃষ্টি আর হচ্ছিলনা। রোদের প্রখরতা ও উষ্ণতায় চারিদিকে শুধু খাঁ খাঁ অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে খুলনার রোর্ড মার্চ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলাম। তীব্য গরমে ও সূর্যের প্রচণ্ড তাপে পিচঢালা রাস্তা যেন উত্তপ্ত কড়াই। এর মধ্যেও হাজার হাজার মানুষ এসেছে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের মুখ থেকে আগামী দিনের দিকনির্দেশনা শোনার জন্য। মঞ্চে সে দিন কেন্দ্রীয় সকল নেতা উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রোর্ড মার্চ শুবুর আগে আল্লাহর দরবারে রহমতের বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন। আমরা তা পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি। জনসভার শেষ পর্যায়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন মুহতারাম আমীরে জামায়াত অধ্যাপাক গোলাম আযম। নেতাকর্মী দর্শনার্থীরা সবাই প্রখর রোদের কারণে স্টেজের সামনে বসতে না পেরে আশে পাশেএকটু ছায়া যেখানে আছে সেখানে কেউ ফুটপাথে কেউ কোন বিল্ডিংয়ের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নেতার বক্তব্য শোনার চেষ্টা করছিলেন। এই বিষয়টি আমীরে জামায়াতের দৃষ্টি এড়ালো না তিনি বললেন আপনারা এই প্রচণ্ড রোদ ও গরমের মাঝে আল্লাহর দ্বীনের পথে এসেছেন আল্লাহ চাহেতো তিনি তার বান্দাদের মেঘ দিয়ে এবং বৃষ্টি দিয়ে শীতল করে দিতে পারেন। হ্যাঁ আল্লাহ তা পারেন অবশ্যই তিনি তার বান্দাদের এত কষ্ট দিতে চান না। বিশ্বাস করুন তীব্র তাপদাহ এবং রোদে

www.pathagar.com

আগত সকলের অবস্থা যখন নাজুক গোলাম আযম স্যারের এই বক্তব্য চলাকালীন আকাশ আস্তে আস্তে মেঘাচ্ছন্ন হতে শুরু করল এবং সমাবেশ শেষ করে আমরা যখন বাগেরহাট যাওয়ার জন্য রূপসার পথ ধরছি কিছুদূর যাওয়ার পর এত তীব্র বেগে বৃষ্টি আসল যে টানা দেড় ঘন্টা বৃষ্টি খুলনা শহরে কোন কোন জায়গায় হাঁটু সমান পানি জমে গেল। যেখানে কয়েক মাস ধরে কোন বৃষ্টি নেই, ভরদুপুর পর্যন্ত বৃষ্টির কোন লক্ষণই দেখা গেল না সেখাণে বৃষ্টির কারনে শহরের ভিতর পর্যন্ত পানি জমে গেল। এই ঘটনার পর থেকে আমার ভেতর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা ছিল ও কিছুটা পিছুটান ছিল সে দিন থেকে আর এক বিন্দু পরিমাণ সেগুলো থাকেনি। আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের (বিশেষ করে দ্বীনি আন্দোলনের) মনের আকাঙ্খাকেও কবুল করে থাকেন এটি ঐদিন ই হাতে নাতে আমার কাছে প্রমাণ হয়েছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম স্যার এই বৃদ্ধ বয়সে অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে দিন কাটাচ্ছেন। এর চেয়ে আমাদের জন্য বেদনার কি হতে পারে। আল্লাহর কাছে কামনা আমাদের সকল নেতাদের যেন মুক্ত হয়ে দ্বীনের কথা বলা ও এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ করে দেন আমিন। এজন্য আমাদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হওয়ার জন্য যা যা করা প্রয়োজন যে ইবাদত এবং আমলে সালেহ করা প্রয়োজন তা সাধ্য মতে করে মহান মাবুদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির বিকল্প নেই। আর এটি ইসলামী আন্দোলনের প্রাণশক্তি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায়ে ছাত্রশিবিরের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন ?

শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির : বাংলাদেশ আমাদের প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি। আমরা এদেশকে ভালবাসি এবং দেশের প্রয়োজনে আমরা যেন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আজ আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার দ্বীনি কাফেলার নেতৃবৃন্দকে আজ এ দেশকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং সত্যের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার কারণে তথাকথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের নামে জঘন্য মিথ্যা মামলায় আটক করে রাখা হয়েছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা আবদুল কাদের মোল্লাকে অন্যায় ভাবে জুডিশিয়াল কিলিং-এর মাধ্যমে হত্যা করে শহীদ করেছে। ফাঁসির রশি ঝুলছে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মু. কামারুজ্জামান ভাই এর সামনে। বর্ষীয়ান জননেতা ভাষা সৈনিক শ্রদ্ধাভাজন গোলাম আযম স্যারকে প্রদান করা হয়েছে ৯০ বছরের কারাদন্ড। মামলার রায়ের অপেক্ষায় আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী হুজুরের জন্য। এছাড়া নায়েবে আমীর উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন বর্ষীয়ান নেতা শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা আব্দুস সোবহান সহকারী, সেক্রেটারি এটি এম আজহারুল ইসলাম, নির্বাহী পরিষদ সদস্য মীর কাসেম আলীর বিরুদ্ধে চলছে তথাকথিত মানবতা বিরোধী অপরাধের মিথ্যা সাজানো নাটক। আমরা দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলছি আমাদের সকল নেতৃবৃন্দ নির্দোষ। তাদের অপরাধ একটাই তারা সবাই এদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছেন, সত্যের পথে থেকে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর এটাই তাদের জন্য কাল হয়েছে । ইসলামী ছাত্রশিবির এ সমস্ত নেতৃবৃন্দের প্রতি যে অন্যায় আচরণ ও তাদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যাচার করা হয়েছে এবং যুলুম করা হয়েছে সে সমস্ত

www.pathagar.com

যুলুমের বিরুদ্ধে যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে ভবিষ্যতেও তারা যে কোন ধরনের অন্যায় যুলুমের বিপক্ষে আরো বলিষ্ঠভাবে ভূমিকা রাখবে। কারণ রাসূলে কারিম সা: বলেছেন স্বৈরাচারী অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিবাদ করা । আমার দৃষ্টিতে যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রখে দাঁড়ানোই হবে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কাজ । দেশের সাধারণ মানুষদের কাছে আমাদের দাওয়াত ও কাজ ব্যাপকভাবে প্রচার এবং তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি আবেগকে নিয়ন্ত্রিত রেখে মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এদেশের রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন চায় আর সেটা সম্ভব ইসলামী ছাত্রশিবিরের দ্বারা। তাই জণগণের প্রত্যাশার আলোকে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে সর্বোত্তম উন্নত নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন করে আর দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষায় আপসহীন সংগ্রামে অবতীর্ন হয়ে বাতিলের সকল রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে ছাত্রশিবির তার কাঙ্খিত মনজ্বিলে মাকসুদে পৌছবে ইনশাআল্লাহ ।

প্রশ্ন : "সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি" এ ভিশনকে সামনে রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রশিবির এ ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী ?

শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির : ইসলামী ছাত্রশিবির সৎ যোগ্য দক্ষ ও দেশপ্রেমিক লোক তৈরি করছে এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিশাল জনসমর্থন এটি আল্লাহর খাস রহমত। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমাদেরকে এ বিশাল জনশক্তিকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি কাজে লাগাতে হবে। আমাদের মধ্যে যারা যে সেক্টরে কাজ করতে চায় তাকে সে সেক্টরে দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সঠিক জায়গায় পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আবার যারা বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছেন সেখানে গিয়ে যেন দলের আদর্শ মূলনীতিগুলো যাতে ভুলে না যায় এবং নৈতিক মূল্যবোধ যাতে হারিয়ে না ফেলে সে জন্য যথাযথ মটিভেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের জন্য আপনার পরামর্শ ।

শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির : বর্তমান সময়টা আমাদের কাছে একটু নতুন পরিস্থিতি হলেও ইসলামী আন্দোলনের জন্য এটি নতুন কোন পরিস্থিতি নয়। তাই এ সময়টা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর রাসূল (সা:) এবং সাহাবা কেরামদের দেখানো পথ অবলম্বন করবে এটাই স্বাভাবিক। কখনো কোন হটকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ইসলামী আন্দোলন ও এই আন্দোলনের কর্মীদের বিপদে ফেলা যাবে না। এই আন্দোলনের প্রাণ চালিকাশক্তি হচ্ছে কুরআন হাদিসের জ্ঞান । সে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সময় নিয়ে কুরআন হাদিস ইসলামী সাহিত্য চর্চা করে নিজেদের নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করে সর্বসাধারনের মাঝে ইসলামের সুমহান আদর্শকে তুলে ধরা। ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর উচিত দায়িত্বশীলদের যথাযথ আনুগত্য করা এখন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার এবং সবার হাতের কাছে থাকার কারণে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে যোগাযোগ যেমন সহজ হয়েছে তেমনি দাওয়াতী কাজেরও এক অবারিত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এ কথা যেমন সত্য

www.pathagar.com

তেমনি তথ্যপ্রযুক্তির এই অগ্রগতি আমাদের ঈমান আকিদা এবং নৈতিক চরিত্রকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে তাই তথ্যপ্রযুক্তি অর্থাৎ মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে।

আর দায়িত্বশীল ভাইদেরকে বলবো আন্দোলনের সকল জনশক্তি আপনাদের কাছে এক বিশাল আমানত। তাদেরকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো এবং তাদেরকে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে দায়িত্বশীল ভাইগণই শিক্ষকের ভূমিকায় থাকবেন। নিজেদের মধ্যে ঘুণাক্ষরে এ চিন্তা যেন না আসে যে আমি একজন নেতা বরং সবসময় নিজেদেরকে মনে করতে হবে জনশক্তির খাদেম দায়িত্বশীল হিসেবে। সকল জনশক্তিকে এক দৃষ্টিতে দেখার মত উদার মানসিকতার বিকল্প নেই। সর্বোপরি আল্লাহর সাহায্য এবং ভরসার ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে।

www.pathagar.com

পরিচিতি

- শাখা পরিচিতি
- দায়িত্বশীল পরিচিতি
- থানা পরিচিতি

ww.pat m

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ঢাকা মহানগরী পূর্ব

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি একটি লাল-সবুজের পতাকা আর পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন অভ্যুদয় হয়েছিল সোনার বাংলাদেশ। কিন্তু সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আর আলোর মুখ দেখতে সমর্থ হয়নি। এক পর্যায়ে আমরা হারালাম আমাদের রাজনৈতিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা। অর্থনৈতিক মুক্তির যে শ্লোগান আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল স্বাধীনতা-উত্তর তা আমাদের অধরাই রয়ে গেল।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিধ্বস্ত অর্থনীতি, বাকশালী একনায়কতন্ত্র, নতজানু পররাষ্ট্রনীতি, ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করাসহ বহুমুখী চক্রান্তে মেতে ওঠে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, রাহাজানি, টেন্ডারবাজি, ব্যাংক ডাকাতি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। গণতন্ত্রের শ্লোগানধারী, ধর্মনিরপেক্ষতার লেবাসে প্রগতির কথা বলে জনগণকে সন্ত্রাসের জালে আবদ্ধ করে ফেলে। এদেশের ছাত্রসমাজ যখন সহস্র সমস্যার গহিন আঁধারে নিমজ্জিত তখনই প্রভাতের সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত করে সৎ, দক্ষ, ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গি সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুতি অর্জন করার জন্য কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্তে ২০০২ সেশনে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণকে বিভক্ত করে ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবস্থান

ঢাকা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল, পল্টন, রমনা, খিলগাঁও, সবুজবাগসহ আশপাশের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এমনকি ঐতিহ্যবাহী বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থিত ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা।

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রশাসনিক থানা ১১টিসহ আরো ৯টি সাংগঠনিক থানা নিয়ে ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা গঠিত।

বিবরণ (প্রশাসনিক থানা)

মতিঝিল থানা, পল্টন মডেল থানা, রমনা থানা, খিলগাঁও থানা, সবুজবাগ থানা, মুগদা থানা, শাহজাহানপুর থানা, রামপুরা থানা, চকবাজার থানা, লালবাগ থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা।

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ

বিশ্ববিদ্যালয়

১. বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
২. স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়
৩. অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

১. খিলগাঁও মডেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
২. সিদ্ধেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
৩. আবুজর গিফারী কলেজ
৪. হাবিবুল্লাহ বাহার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
৫. শেখ বোরহানুদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ

স্কুল

১. আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ (মতিঝিল, মুগদা, বনশ্রী)
২. মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়
৩. মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
৪. খিলগাঁও ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
৫. খিলগাঁও গভঃ স্কুল
৬. রমনা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
৭. বীর শ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
৮. বীর শ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
৯. আরমানিটোলা উচ্চবিদ্যালয়
১০. আব্দুল আজিজ স্কুল এন্ড কলেজ
১১. কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ
১২. উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজ
১৩. বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয়
১৪. সূচয়ন একাডেমী

মাদ্রাসা

১. সরকারি মাদ্রাসা-ই আলিয় ঢাকা
২. মিছবাহুল উলুম কামিল মাদ্রাসা
৩. হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক মাদ্রাসা
৪. মাদ্রাসা মোহাম্মদীয়া আরাবিয়া
৫. নয়াটলা AUN মডেল কামিল মাদরাসা

www.pathagar.com

ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার বিভিন্ন সময়ে যারা কাণ্ডারির দায়িত্ব পালন করেছেন-

সেশন	সভাপতি	সেক্রেটারি
২০০২ অক্টোবর	মোঃ আজিজুর রহমান	মোঃ আশরাফুল ইসলাম
২০০৩-২০০৫	হাফেজ মিজানুর রহমান	মোঃ আশরাফুল ইসলাম মোঃ আকতার হোসাইন মোঃ কামাল হোসাইন
২০০৬-২০০৭ জুন	মোঃ কামাল হোসাইন	মোঃ রফিকুল ইসলাম ডাঃ ফখরুদ্দিন মানিক
২০০৭ জুন-২০০৯ জুন	ডাঃ ফখরুদ্দিন মানিক	নিয়াজ মাখদুম শিবলী মোঃ মনির উদ্দিন মণি
২০০৯ জুলাই-ডিসেম্বর	আরিফ মঈনুদ্দিন	মোঃ মনির উদ্দিন মণি
২০১০ জুন পর্যন্ত	মোঃ মনির উদ্দিন মণি	ইয়াছিন আরাফাত
২০১০ জুন-২০১১	ইয়াছিন আরাফাত	শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির
২০১২	শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির	রাশেদুল হাসান রানা
২০১৩-বর্তমান	রাশেদুল হাসান রানা	রেজাউল হক রিয়াজ

বর্তমান ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার বর্তমান দায়িত্বশীলদের তালিকা

নাম	দায়িত্ব
রাশেদুল হাসান রানা	সভাপতি
রেজাউল হক রিয়াজ	সেক্রেটারি
শরিফুল ইসলাম (১)	বায়তুলমাল সম্পাদক
রওশন জামান	অফিস সম্পাদক
তোজাম্মেল হক	প্রকাশনা ও সাহিত্য সম্পাদক
সোহেল রানা মিঠু	স্কুলকার্যক্রম সম্পাদক
মতিউর রহমান	শিক্ষাকার্যক্রম সম্পাদক
মোঃ গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া	এইচ আর ডি ও মাদরাসা সম্পাদক
এসএম মনিরুজ্জামান	ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক
আব্দুল্লাহি কাফি মামুন	তথ্য ও কোচিং সম্পাদক
তসলিম আলম	পাঠাগার ও ফাউন্ডেশন সম্পাদক
গোলাম সাদেক	কলেজকার্যক্রম সম্পাদক
আমিরুল মোমেনিন তালুকদার	সমাজসেবা সম্পাদক
মুহাম্মদ আব্দুল কাদের	প্রচার ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সম্পাদক
হাফেজ আশ্রাফ উদ্দিন	মহানগরী পরামর্শ সভার সদস্য
ইমাম হোসাইন	মহানগরী পরামর্শ সভার সদস্য
রায়হান উদ্দিন	মহানগরী পরামর্শ সভার সদস্য
শরিফুল ইসলাম (২)	মহানগরী পরামর্শ সভার সদস্য

www.pathagar.com

সরকারি মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা

উপমহাদেশের দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া যা ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন কলকাতার বৈঠকখানা থেকে যাত্রা শুরু করে। পরে ১৯৬১ সালের দিকে বর্তমান বকশিবাজারে স্থায়ীভাবে কার্যক্রম শুরু হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে ১৭৮০ থেকে অদ্যাবধি অসংখ্য আলেম শিক্ষাবিদ তৈরিতে অবদান রেখে আসছে। বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসলার মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও রাজনীতিবিদ জনাব মওদুদ আহমেদ অন্যতম।

সাংগঠনিক কাঠামো: বর্তমানে মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া থানা ক্যাম্পাস ছাড়াও ৬৩,৬৪, নং প্রশাসনিক ওয়ার্ডকে ৭টি সাংগঠনিক ওয়ার্ড এবং ৩১টি উপশাখায় বিভক্ত করে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আলিয়া থানার পূর্ববর্তী সভাপতি-সেক্রেটারিদের নাম ও সেশন

সেশন	সভাপতি	সেক্রেটারি
১৯৭৭-১৯৭৮	মাওলানা আবুল কাশেম	মাওলানা মানসুর উদ্দীন
১৯৭৮-১৯৭৯	মাওলানা মোঃ মোসলেহ উদ্দীন	মাওলানা মোঃ শামসুদ্দীন
১৯৭৯-১৯৮০	মাওলানা মোঃ শামসুদ্দীন	মাওলানা মোঃ মমতাজ উদ্দীন
১৯৮০-১৯৮১	মাওলানা মোঃ মমতাজউদ্দীন	মাওলানা মোঃ আব্দুস সোবহান
১৯৮১-১৯৮২	মাওলানা মোঃ আঃ মতি	
১৯৮২-১৯৮৩	মাওলানা কে এম আঃ সোবহান	মাওলানা মোঃ মোসলেহ উদ্দীন
১৯৮৩-১৯৮৪	মাওলানা কে এম আঃ সোবহান	মাওলানা মোঃ সাহাবুদ্দীন
১৯৮৪-১৯৮৫	মাওলানা কে এম আঃ সোবহান	মাওলানা মোঃ ঈসমাইল হোসেন
১৯৮৫-১৯৮৬	মাওলানা কে এম আঃ সোবহান	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
১৯৮৬-১৯৮৭	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ	মাওলানা আহমেদ ইউসুফ
১৯৮৭-১৯৮৮	মাওলানা সৈয়দ সালেহ আহমেদ	মাওলানা আবু সাঈদ মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ
১৯৮৮-১৯৮৯	মাওলানা আবু সাঈদ	মাওলানা আনোয়ার হোসেন মোল্লা
১৯৮৯-১৯৯০	মাওলানা আহমদ মুসা	মাওলানা মোঃ আব্দুস সবুর মাতুব্বর
১৯৯০-১৯৯১	মাওলানা মোঃ আব্দুস সবুর মাতুব্বর	মাওলানা মোঃ নেছারউদ্দীন
১৯৯১-১৯৯২	মাওলানা মোঃ নেছার উদ্দীন	ব্যারিস্টার নজরুল ইসলাম মাওলানা মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
১৯৯২-১৯৯৩	মাওলানা ব্যারিস্টার নজরুল ইসলাম	মাওলানা মোঃ শহীদুল্লাহ
১৯৯৩-১৯৯৪	মাওলানা মোঃ সাইফুল ইসলাম	মাওলানা মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
১৯৯৪-১৯৯৫	মাওলানা মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	
১৯৯৫-১৯৯৭	ডাঃ আবুল কালাম আজাদ (টুটুল)	
১৯৯৭-১৯৯৮	মাওলানা নাসিরউদ্দীন হেলালী	মাওলানা মোঃ জামাল উদ্দীন
১৯৯৮-১৯৯৯	মাওলানা নাসির উদ্দীন হেলালী	মাওলানা হোসাইন আহমেদ
১৯৯৯-২০০০	মাওলানা হোসাইন আহমেদ	মাওলানা নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

২০০১	মাওলানা মোঃ হারুন-অর-রশিদ	মাওলানা মোঃ আবুল কাশেম
২০০২	মাওলানা মোহারুন-অর-রশিদ	মাওলানা মোঃ মু'তাসিমবিল্লাহ
২০০৩	মাওলানা মোঃ মু'তাসিমবিল্লাহ	মাওলানা মোঃ নিজামুল হক নাঈম
২০০৪	মাওলানা মোঃ নিজামুল হক নাঈম	মাওলানা মোঃ হাবিব বিন আনোয়ার
২০০৫	মাওলানা শহীদ আমজাদ হোসেন	মাওলানা ইয়াছিন আরাফাত
২০০৬	মাওলানা মোঃ ইয়াছিন আরাফাত	মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মাখন
২০০৭	মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মাখন	মাওলানা মোঃ আসাদুল্লাহ গালিব
২০০৭	মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মাখন	মাওলানা মোঃ আবু নোমান সরকার
২০০৮	মাওলানা আবু নোমান সরকার	মাওলানা মোঃ মিজানুর রহমান
২০০৯	মাওলানা মোঃ মিজানুর রহমান	মাওলানা মোঃ জুবায়ের মিয়া
২০১০	মাওলানা রায়হান উদ্দীন	মাওলানা মোঃ গোলাম কিবরিয়া ভূঁঞা
২০১০	মাওলানা মোঃ তোফাজ্জল হোসাইন	মাওলানা মোঃ গোলাম কিবরিয়া ভূঁঞা
২০১১	মাওলানা মোঃ গোলাম কিবরিয়া ভূঁঞা	মাওলানা মোঃ আব্দুল হান্নান
২০১১	মাওলানা মোঃ আব্দুল হান্নান	মাওলানা মোঃ বাহারুল ইসলাম
২০১২	মাওলানা মোঃ বাহারুল ইসলাম	মাওলানা মোঃ রেদওয়ানউল্লাহ
২০১২	মাওলানা মোঃ ইমাম হোসেন	মাওলানা মোঃ রেদওয়ানউল্লাহ

বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের রাজধানীর বুকে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে একটি মহান উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ২০০৪ সালে মতিঝিল মানিকনগর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাধারণ ছাত্রদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি সাংগঠনিক মজবুতি অর্জনের লক্ষ্যে ২০০৪ সালে ঢাকা মহানগরী পূর্ব মতিঝিল থানার অধীনে একটি ইউনিট হিসেবে কাজ শুরু করে। পর্যায়ক্রমে ২০০৭ সালে ওয়ার্ড, ২০০৯ সালে সাংগঠনিক থানা শাখায় উন্নীত হয়। শহীদি কাফেলার এই শাখায় যে সকল সিপাহসলার দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেন,

সেশন	সভাপতি	সেক্রেটারি
২০০৯ এপ্রিল-২০১০ জুন	রাশেদুল ইসলাম শহীদ	মহসিন আলী আমিরুল মোমেনীন তালুকদার
২০১০ জুলাই-২০১১ সেপ্টে	আমিরুল মোমেনীন তালুকদার	রাকিবুল হাসান শামীম
২০১১ সেপ্টে -২০১২	রাকিবুল হাসান শামীম	মু. রিয়াজ উদ্দিন রিয়াজ
২০১৩-২০১৩ সেপ্টেম্বর	মু. রিয়াজ উদ্দিন রিয়াজ	আব্দুর রহমান জুয়েল
২০১৩ সেপ্টেম্বর- বর্তমান	আব্দুর রহমান জুয়েল	আব্দুল হালিম

www.pathagar.com

চকবাজার থানা

রাজধানী ঢাকার একটি গুরুত্ব পূর্ণ থানা চকবাজার। যেখানে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী স্থান তারা মসজিদ, বড় কাটরা, ছোট কাটরা, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, হোসাইনী দালান, চকবাজার শাহী মসজিদ। এই এলাকা ছিল অতি প্রাচীন নগরের কেন্দ্রবিন্দু। পশ্চিমে লালবাগকেল্লা, পূর্বে আরমানিটোলা, উত্তরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী অবস্থিত।

সাংগঠনিক কাঠামো : বর্তমানে চকবাজার থানা ৬৩,৬৪,৬৫,৬৬,৬৭ নং প্রশাসনিক ওয়ার্ডকে ৫টি সাংগঠনিক ওয়ার্ড এবং ১৯টি উপশাখায় বিভক্ত করে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

চকবাজার থানার পূর্ববর্তী সভাপতি-সেক্রেটারিদের নাম ও সেশন :

সেশন	সভাপতি	সেক্রেটারি
২০০৯	আবু নোমান সরকার	মো: শাহজালাল
২০১০	মো: তোফাজ্জল ইসলাম	আবু তাহের মিসবাহ
২০১১	আবু তাহের মিসবাহ	মো: শরীফুল ইসলাম
২০১১	আবু তাহের মিসবাহ	মো: মাসুম বিল্লাহ
২০১১	মো: গোলাম কিবরিয়া ভূঁঞা	মো: মাসুম বিল্লাহ
২০১২	মো: বাহারুল ইসলাম	মো: মাসুম বিল্লাহ
২০১৩	মো: মাসুম বিল্লাহ	মো: মুরাদ হোসেন
২০১৩ বর্তমান	মো: মাসুম বিল্লাহ	মো: মোবারক হোসাইন

শাহজাহানপুর

পূর্বে কমলাপুর মালিবাগ রেললাইন, পশ্চিমে মৌচাক রাজারবাগ মোড়, উত্তরে মৌচাক মালিবাগ রেলগেট সড়ক, দক্ষিণে কমলাপুর রেলস্টেশন রাজারবাগ মোড় এলাকা নিয়ে ২০১২ সালে মে মাসে শাহজাহানপুর থানা যাত্রা শুরু হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো: বর্তমানে ২টি প্রশাসনিক ওয়ার্ডে ৬টি সাংগঠনিক ওয়ার্ড এবং ২৮টি উপশাখা রয়েছে।

সভাপতি-সেক্রেটারির নামঃ (প্রতিষ্ঠাকাল-বর্তমান)

সময়কাল		সভাপতি	[illegible]
২০১২ মে -২০১২	:	আব্দুল্লাহিল কাফি মামুন	মোস্তাফিজুর রহমান জাফর
২০১৩ জুন	:	মোঃ বাহারুল ইসলাম	মোস্তাফিজুর রহমান জাফর
২০১৩-বর্তমান	:	মোঃ বাহারুল ইসলাম	রমিজ উদ্দিন

www.pathagar.com

মতিঝিল স্কুল জোন

দক্ষ ও নৈতিকতা সম্পন্ন একটি শক্তিশালী জাতি গঠন করা এবং সংগঠনের প্রসারতা বৃদ্ধি করার জন্য ২০০৬ সালে মহানগরীর স্কুল বিভাগ অত্র অঞ্চলে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে ৩টি সাংগঠনিক ওয়ার্ড নিয়ে স্কুল জোন মতিঝিল থানা শাখা হিসেবে কাজ শুরু করে।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ বর্তমানে সাংগঠনিক ৬টি ওয়ার্ড ও ৩৭টি উপশাখা নিয়ে স্কুল মতিঝিল থানা গঠিত।

স্কুল মতিঝিল থানার দায়িত্বশীলদের তালিকা

সেশন	সভাপতি	সেক্রেটারি
২০০৮	একেএম ফজলুল হক	এসএম ফজলে রাব্বি সুজন
২০০৯ -২০১০ জুন	এস.এম ফজলে রাব্বি সুজন	মো: শরিফুল ইলাম
২০১০ জুলাই - ২০১১	মো: শরিফুল ইসলাম	সাইয়েদ মু: জুবায়ের
২০১২- ২০১২অক্টোবর	সাইয়েদ মু: জুবায়ের	হাসান মাহমুদ
২০১২ নভেম্বর - ২০১৩ জুন	সাইয়েদ মু: জুবায়ের	এ কে এম মহিউদ্দিন
২০১৩ জুলাই - বর্তমান	মু: মোস্তাফির রহমান জাফর	এ কে এম মহিউদ্দিন

সবুজবাগ স্কুল জোন

স্কুলসমূহের সাংগঠনিক মজবুতি অর্জনের লক্ষ্যে মুগদা ও সবুজবাগের গুরুত্বপূর্ণ স্কুলসমূহের সমন্বয়ে ২০১২ সালের ১৮ই জানুয়ারিতে গঠিত হয় "স্কুল সবুজবাগ থানা"।

সাংগঠনিক কাঠামো: সাংগঠনিক ৫টি ওয়ার্ড ও ১৩টি উপশাখা নিয়ে স্কুল সবুজবাগ থানা গঠিত।

সবুজবাগ স্কুল জোন দায়িত্বশীলদের তালিকা:

সেশন	সভাপতি	সেক্রেটারি
২০১২-২০১২ জুন	মো: শরিফুল ইসলাম	হাফিজুর রহমান
২০১২ জুন -বর্তমান	হাফিজুর রহমান	ইউসুফ ইসলাম

আইলেট

অবস্থান : রাজধানী ঢাকার হাজারীবাগ (পিলখানার পাশে ৫নং গেইটসংলগ্ন)
সাংগঠনিক কাঠামো : সাংগঠনিক ওয়ার্ড ৪টি, উপশাখা ১৬টি।
একাডেমিক বিভাগ : ৩টি।

১. B.Sc in Leather Engineering
২. B.Sc in Footwear Engineering
৩. B.Sc in Leather Product Engineering

হল সংখ্যাঃ ৩টি (ছাত্রদের ২টি ও ছাত্রীদের ১টি)

সেশন	সভাপতি	সেক্রেটারি
২০১৩	মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান	মু. সেলিমুজ্জামান

www.pathagar.com

লালবাগ থানা

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, আর পুরাতন ঢাকা হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী থানা লালবাগ। এটি বাংলাদেশের চিরচেনা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত, আঁকাবাঁকা সরু অলি-গলি আর ঐতিহ্যবাহী লালবাগ কেল্লাসহ শত বছরের প্রাচীন অনেক স্থাপনাকে বুকে ধারণ করে আছে লালবাগের এই মাটি। কোলাহলযুক্ত ঢাকার পরিবেশ আর শত ব্যস্ততার মাঝে সামান্য সময়ের জন্য প্রকৃতিতে হারিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন হাজারো প্রকৃতিপ্রেমিক লোকজন ছুটে আসে ঐতিহাসিক লালবাগের কেল্লায়। মোঘল সম্রাট শায়েস্তা খান ও পরীবিবির স্মৃতিবিজড়িত লালবাগ কেল্লার পূর্ব নাম ছিল আওরঙ্গবাদ। যাহা ১৮৪৪ সালে লালবাগ কেল্লা নামে পরিচিতি লাভ করে। ঐতিহাসিকভাবে লালবাগের গুরুত্ব যেমনি অপরিসীম তেমনি ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের জন্যও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাইতো ১৯৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখানে আন্দোলনের পদযাত্রা শুরু হয়। যদিও শুরুতে হাজারীবাগ, কামরাঙ্গীরচর ও চকবাজারের সমন্বয়ে গঠিত হয় বৃহত্তর লালবাগ। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে তা আজ কেবলমাত্র ৪টি ওয়ার্ড নিয়েই চলছে। নিম্নে এই পর্যন্ত সকল যে সিপাহসলার লালবাগের এই ময়দানকে পরিচালনা করেছেন তাদের নাম উল্লেখ করছি...

সভাপতি-সেক্রেটারির তালিকা

শুরুতে লালবাগ ৩টি ভাগে কাজ করে

	সভাপতি	সেক্রেটারি	[illegible]
লালবাগ পূর্ব:	ইব্রাহীম খলিল	সাইফুল আলম	১৯৮৭-১৯৮৮
	সাইফুল আলম	আব সালেহ	১৯৮৯-৯০
লালবাগ পশ্চিম:	লুৎফুর রহমান	আশরাফুল আলম উজ্জ্বল	১৯৮৮-৮৯
	আবু সালেহ	আসাদুজ্জামান	১৯৯০
আজিমপুর:	আসাদুজ্জামান	মঈন হুসেন	১৯৮৯-১৯৯০
	নিজাম উদ্দিন	মুরশিদ উদ্দিন ফারুক	১৯৯১-৯৩
	আলমগীর কবির	শহীদুল্লাহ	১৯৯৪-৯৫
	জহির উদ্দিন বাবর	আবুল কালাম আজাদ	১৯৯৬-৯৭
	আজিজুল হক	মঈন হাসান	১৯৯৮
	বুরহান উদ্দিন	আনিসুর রহমান	১৯৯৯
	নুরুজ্জামান	আনিসুর রহমান	২০০০
	আনিসুর রহমান	হাফেজ আবু তাহের	২০০১
	হাফেজ আবু তাহের		২০০২
	আব্দুল হক	এস এম এস বারী	২০০৩
	এস এম এস বারী	এটি এম ফজলুল্লাহ	২০০৪-০৫
	এটি এম ফজলুল্লাহ	আল আমিন	২০০৬
	আল আমিন		২০০৭
	আব্দুস সাত্তার সুমন	আহসান উল্লাহ	২০০৮
	আহসান উল্লাহ	সোহেল রানা মিঠু	২০০৯
	সোহেল রানা মিঠু	আব্দুল্লাহিল কাফি মামুন	২০১০-১১
	আব্দুল্লাহিল কাফি মামুন	জাকির হোসাইন	২০১১-০১২
	জাকির হোসাইন	ওয়াহিদুজাম্মান/আশরাফুল ইসলাম	২০১২-বর্তমান

www.pathagar.com

পল্টন থানা

রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত পল্টন থানা। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম, দৈনিক বাংলা, ফকিরাপুল, নয়াপল্টন, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, মালিবাগ মোড়, শান্তিনগর, কাকরাইল, রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় প্রেস ক্লাব, বাংলাদেশ সচিবালয়, পল্টন মোড়, পল্টন ময়দান, মুক্তাঙ্গন এলাকাজুড়ে অবস্থান পল্টন থানা। এই এলাকায় রাজনৈতিক কর্মসূচি সবচেয়ে বেশি পালিত হয় যার কারণে পল্টন থানার গুরুত্ব অনেক বেশি। ২০০৫ সাল পর্যন্ত ৫৬ নং ওয়ার্ড অর্থাৎ পল্টন ছিল মতিঝিল থানার অধীনে। পরবর্তীতে প্রশাসনিকভাবে পল্টন থানা রূপ লাভ করে এবং সাংগঠনিকভাবে যাত্রা শুরু হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো : প্রশাসনিক ওয়ার্ড ২টি মোট সাংগঠনিক ওয়ার্ড ৪টি, উপশাখা ১৭টি

সভাপতি-সেক্রেটারির তালিকা

[illegible]	সভাপতি	সেক্রেটারি
২০০৫ আগস্ট	সাইফুল ইসলাম	মু. আবু সাঈদ
২০০৫ আগস্ট-ডিসেম্বর	ইসমাইল জাবিউল্লাহ	মো: আবু সাঈদ
২০০৬ মার্চ পর্যন্ত	মরহুম আমজাদ হোসাইন	মো: আবু সাঈদ
২০০৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত	মো: আবু সাঈদ	মু: মাহমুদুল হাসান
২০০৭	মু: মাহমুদুল হাসান	আব্দুল মনিম খাঁন
২০০৮ জুলাই পর্যন্ত	মু. নুর উদ্দিন	আব্দুল মনিম খাঁন
২০০৮ জুলাই- ২০০৯	আব্দুল মনিম খাঁন	মু. মিজানুর রহমান
২০১০	হাফেজ মু. মিজানুর রহমান	মু. ওমর ফারুক
২০১১-মে পর্যন্ত	মু. ওমর ফারুক	ইমাম হোসাইন
২০১১	মু. ওমর ফারুক	মোস্তাফিজুর রহমান
২০১২ জুলাই পর্যন্ত	মো: আমিরুল মোমিনিন তালুকদার	মোস্তাফিজুর রহমান
২০১২-২০১৩ জুলাই পর্যন্ত	শরিফুল ইসলাম	মোস্তাফিজুর রহমান
২০১৩ জুলাই- বর্তমান	মোস্তাফিজুর রহমান	মু. মুরাদ হোসাইন

মিছবাহুল উলুম কামিল মাদ্রাসা

মিছবাহুল উলুম কামিল মাদ্রাসা মতিঝিল থানার একটি ওয়ার্ড থেকে ২০০৫ সালে ২টি এবং ২০০৬ সালে ৩টি ওয়ার্ডে পরিণত হয়। এর পর ২০০৭ সালে ক্যাম্পাসে ৩টি ওয়ার্ড এবং ৩৩ পশ্চিম (বর্তমান ৩৩ উত্তর ও দক্ষিণ) ওয়ার্ড নিয়ে ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার একটি স্বতন্ত্র থানা শাখায় উন্নীত হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো : বর্তমানে ৭টি ওয়ার্ড ও ২৭টি উপশাখা নিয়ে থানাটি গঠিত।

এ থানায় দায়িত্ব পালনকারী সভাপতি-সেক্রেটারিগণ:

[illegible]	সভাপতি	সেক্রেটারি
২০০৭ -২০০৮ সেপ্টেম্বর	এইচ এম শহীদুল্লাহ	মু. ইব্রাহীম
২০০৮ সেপ্টেম্বর-২০০৯	মু. ইব্রাহীম	মু. তোজাম্মেল হক
২০১০ -২০১০ এপ্রিল	মু. তোজাম্মেল হক	নাজমুল ইসলাম
২০১০ মে-২০১০	মু. তোজাম্মেল হক	মু. কামাল হোসাইন
২০১১ -২০১১ মার্চ	মু. কামাল হোসাইন	মু. আল আমিন
২০১১ এপ্রিল-২০১২ ডিসেম্বর	মু. আল আমিন	আব্দুল্লাহ আল মামুন
২০১৩ জানুয়ারি-বর্তমান	হাসান মাহমুদ	আব্দুল্লাহ আল মামুন

www.pathagar.com

সবুজবাগ থানা

সবুজবাগ থানা এক সময় মতিঝিল থানার অধীনে ছিল। ১৯৯৮ সবুজবাগ প্রশাসনিক থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সময় সবুজবাগ থানার অধীনে বর্তমানে খিলগাঁও, রামপুরা থানাসমূহ ছিল পরবর্তীতে বর্তমান রূপ লাভ করে। সংগঠন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে নাসিরাবাদ ইউনিয়ন, দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন ও ২৭ নং ওয়ার্ড নিয়ে সবুজবাগ থানা উত্তর এবং ২৮, ২৯, মান্ডা ইউনিয়ন নিয়ে সবুজবাগ দক্ষিণ থানা নামে বিভক্ত হয়। ২০১২ সালে বর্তমান এলাকা নিয়ে সবুজবাগকে প্রশাসনিক থানা হিসেবে যাত্রা শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, খিলগাঁও ফ্লাইওভার থেকে শুরু হয়ে বৌদ্ধমন্দির, বাসাবো, মাদারটেক, দক্ষিণগাঁও নন্দীপাড়া নাসিরাবাদ এলাকা জুড়ে অবস্থিত সবুজবাগ থানা। সবুজবাগ থানার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য যা অনন্তকাল ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তিদের প্রেরণা যোগাবে।

সাংগঠনিক কাঠামো: প্রশাসনিকভাবে ২৭ নং ওয়ার্ড, দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন, নাসিরাবাদ ইউনিয়নসহ মোট ৮টি সাংগঠনিক ওয়ার্ড এবং ৪৫টি উপশাখা ।

শাহাদাৎবরণ : ২ জন

শাহাদাতের ঘটনা ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কালো অধ্যায় ২৮শে অক্টোবর ২০০৬ সালে পল্টন মোড়ে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের হামলায় শহীদ হয়।

শহীদের তালিকা: ১. হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন ২. সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম।

সভাপতি-সেক্রেটারির তালিকা

সেশন	সভাপতি	সেক্রেটারি
১৯৯৮	মাওলানা মনির হোসেন	বোরহান উদ্দিন
১৯৯৯	মাওলানা মনির হোসেন	আখতার হোসাইন
২০০০-২০০১	আখতার হোসাইন	
২০০৩	শামসুল আলম মাহবুব	মিজানুর রহমান মিলন
২০০৪	আবু বকর আব্দুল্লাহ বুলবুল	ওয়াহিদ মাসুদ, কে এম মনির হোসেন
২০০৫-২০০৬	আবুল কালাম আযাদ	সাইফুল্লাহ
২০০৬-২০০৭	সাইফুল্লাহ	তোফাজ্জল হোসাইন
২০০৮-২০০৯	তোফাজ্জল হোসাইন	নাসের মাহদী
২০০৯	আবু তালহা বশির	নাসের মাহদী
২০১০ জুলাই পর্যন্ত	আবু তালহা বশির	রহমত আলী
২০১০ জুলাই	রহমত আলী	আব্দুল কাদের
২০১১ জুলাই পর্যন্ত	আব্দুল কাদের	ফায়জুর রহমান
২০১১জুলাই-২০১২	মহসিন আলী	ফায়জুর রহমান
২০১২-২০১৩ জুন	ফায়জুর রহমান	আলী হোসাইন
২০১৩ (বর্তমান)	ফায়জুর রহমান	আব্দুর রহমান

www.pathagar.com

রামপুরা থানা

মালিবাগ রেলগেইট থেকে পুর্বদিকে খিলগাঁও কমিউনিটি সেন্টার থেকে তালতলা সিটি করপোরেশন মার্কেট হয়ে ২৩ নং ওয়ার্ড সম্পূর্ণ অংশ । মালিবাগ রেলগেইট থেকে উত্তরদিকে রমনা থানার মিরবাগ রোড থেকে পশ্চিমদিকে হাতিরঝিল এর একাংশ দিয়ে রামপুরা ব্রিজ পর্যন্ত । রামপুরা ব্রিজ থেকে পূর্বদিকে বনশ্রী লেক ঘেঁষে মেরাদিয়া বাজার বনশ্রী জি ব্লক এলাকা নিয়ে রামপুরা থানা ২০০৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে খিলগাঁও থানা থেকে বিভক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠা হয় । এই থানায় প্রশাসনিক ওয়ার্ড হচ্ছে ২২ ও ২৩ নং ওয়ার্ড । এই থানা উল্লেখযোগ্য স্থান গুলো হলো- মালিবাগ বাজার, তালতলা সিটি করপোরেশন মার্কেট, চৌধুরীপাড়া আবাসিক, হাজীপাড়া, রামপুরা বাজার, মহানগর প্রজেক্ট, উলন, পূর্ব রামপুরা, টিভি সেন্টার, বনশ্রী অভিজাত আবাসিক এলাকা ।

সাংগঠনিক কাঠামো : প্রশাসনিক ওয়ার্ড ২২ ও ২৩ নং কে ভাগ করে মোট ৭টি সাংগঠনিক ওয়ার্ড এবং ৪০টি উপশাখা ।

সভাপতি-সেক্রেটারির তালিকা

[illegible]	সভাপতি	[illegible]
২০০৮ সেপ্টে-২০০৯ জুন	হাফেজ মু. শহীদুল্যাহ	তসলিম আলম
২০০৯ জুলাই-২০১০ জুলাই	জহুরুল হক সোহেল	তসলিম আলম
২০১০ জুলাই-২০১০	রাশেদুল ইসলাম শহীদ	সাইফুল ইসলাম
২০১১	রাশেদুল ইসলাম শহীদ	এস, এম মনিরুজ্জামান
২০১২	এস,এম, মনিরুজ্জামান	কামরুজ্জামান তানজিন
২০১৩-২০১৩ জুন	কামরুজ্জামান তানজিন	আব্দুর রহমান
২০১৩ জুন (বর্তমান)	কামরুজ্জামান তানজিন	রাশেদ মোশারফ

কলেজ জোন

২০১১ সালে রমনা, পল্টন এলাকার কলেজ সমূহে সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুতি অর্জনের লক্ষ্যে কলেজ জোন থানা প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

দায়িত্বশীলদের তালিকা (প্রতিষ্ঠাকাল- বর্তমান)

[illegible]	সভাপতি	[illegible]
২০১১-২০১২ জুন	আরিফ বিল্লাহ	রায়হান উদ্দিন
২০১২ জুন-২০১৩ জুন	আফজালুন নুর মুন	ফজলুল হক
২০১৩ জুন-বর্তমান	সাইয়েদ জুবায়ের	ফজলুল হকর

www.pathagar.com

কামরাঙ্গীরচর

ঢাকা মহানগরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা কামরাঙ্গীরচর থানা যা ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি ২০০০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বৃহত্তর লালবাগের অধীন ছিল। পরবর্তীতে ২০০০ সালে কামরাঙ্গীর চর একটি পৃথক থানায় পরিচিতি পায়। কামরাঙ্গীর চর থানার আয়তন ২৩২১ একর, জনসংখ্যা প্রায় আট লক্ষ। এ থানায় প্রশাসনিক ওয়ার্ড রয়েছে ৩টি -যথাক্রমে ৫৫,৫৬,৫৭। সংসদীয় আসন -২। সাংগঠনিক কাঠামো : ওয়ার্ড-০৯টি, উপশাখা-৩১টি।

২০০০ সাল থেকে এই পর্যন্ত যে সকল দায়িত্বশীল ভাইয়েরা কামরাঙ্গীরচর থানায় দায়িত্ব পালন করেছেন

সভাপতি-সেক্রেটারির তালিকা

সেশন		
২০০০-২০০১	সেলিম হোসাইন	আলমগীর হোসাইন
২০০২ জুলাই পর্যন্ত	ইসমাঈল জাবিহুল্লাহ	শহীদুল ইসলাম
২০০৩ জুলাই-২০০৪ জুন	সাইফুল ইসলাম	সিরাজুল ইসলাম
২০০৪ জুলাই-ডিসে	সিরাজুল ইসলাম	সাইফুল ইসলাম
২০০৫		আব্দুস সাত্তার সুমন
২০০৫ জুন- ২০০৭	আব্দুস সাত্তার সুমন	সালাউদ্দিন আশরাফী
২০০৮-২০০৯	আবু তালহা বশির	বেলাল হোসাইন
২০১০	বেলাল হোসাইন	আব্দুল মালেক
২০১১ জুলাই পর্যন্ত	আব্দুল মালেক	হেলাল উদ্দিন
২০১১ জুলাই-২০১২ জুন	ইমাম হোসাইন	হেলাল উদ্দিন
২০১২ জুলাই- বর্তমান	হেলাল উদ্দিন	আব্দুল জলিল

www.pathagar.com

খিলগাঁও থানা

তালতলা সিটি করপোরেশন মার্কেট হয়ে ফ্লাইওভার তিলপাপাড়া গোড়ান নাসিরাবাদ ইউনিয়ন একাংশ দক্ষিণ বনশ্রী মেরাদিয়া বাজার বর্তমান রামপুরা থানার সম্পূর্ণ অংশ সিপাহীবাগ ছাহেরুনবাগ এলাকা নিয়ে সবুজবাগ থানা থেকে ১৯৯৯ সালের ৯ জানুয়ারি খিলগাঁও থানার প্রতিষ্ঠা হয়। রাজধানীতে খিলগাঁও থানা শিক্ষা নগরী হিসেবে পরিচিত। এই এলাকায় বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো : খিলগাঁও থানা প্রশাসনিক ওয়ার্ড ২৪,২৫,২৬ নং সহ মোট ৭টি সাংগঠনিক ওয়ার্ড এবং ৩৫ টি উপশাখা।

সভাপতি - সেক্রেটারির তালিকা

সেশন	সভাপতি	সেক্রেটারি
১৯৯৯- ২০০০	মু.নাসির উদ্দিন হেলালী	মু. আঃ মুমিন সরকার
২০০১	মু. বোরহান উদ্দিন	মু. কামাল হোসাইন
২০০২	মু. কামাল হোসাইন	মু. হারুন অর রশিদ
২০০৩-২০০৪ জুলাই	মু. হারুন অর রশিদ	মু. আঃ রাকিব
২০০৪ জুলাই-২০০৪ অক্টো	মু. হারুন অর রশিদ	মু. রেজাউল করিম
২০০৪ অক্টো-২০০৫ জুলাই	আ.ন.ম. শহীদুল্লাহ	মু. নিয়াজ মাখদুম শিবলী
২০০৫ জুলাই-২০০৬	আব্দুল হক	মু. নিয়াজ মাখদুম শিবলী
২০০৭-২০০৭ মে	মু. নিয়াজ মাখদুম শিবলী	ইয়াকুব আলী জুলমতি
২০০৭ মে-২০০৮ জুলাই	ইয়াকুব আলী জুলমতি	জহুরুল হক সোহেল
২০০৮ জুলাই-২০০৮ সেপ্টে	জহুরুল হক সোহেল	মু. তসলিম আলম
২০০৮ সেপ্টে-২০০৯ জুলাই	মু. জহুরুল হক সোহেল	মু. রহমত আলী
২০০৯ জুলাই-ডিসে	মু. রওশন জামান	মু. রহমত আলী
২০১০	মু. রওশন জামান	মু. সামিউর রহমান শামীম
২০১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত	মু. রহমত আলী	মু. আশ্রাফ উদ্দিন
২০১২-২০১৩ জুলাই	মু. আশ্রাফ উদ্দিন	মু. কুদাতুল ফাত্তাহ আজমল
২০১৩ জুলাই-বর্তমান	রায়হান উদ্দিন	মু. কুদরাতুল ফাত্তাহ আজমল

খিলগাঁও স্কুল জোন

খিলগাঁও অঞ্চলের স্কুলগুলোতে সংগঠনের কাজকে বৃদ্ধির মাধ্যমে অত্র এলাকায় ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য খিলগাঁও স্কুল জোন শাখা একটি স্বতন্ত্র সাংগঠনিক থানা হিসেবে কাজ শুরু করে।

সাংগঠনিক কাঠামো: বর্তমানে এর অধীনে ৪টি ওয়ার্ড ও ১৮টি উপশাখা রয়েছে।

সভাপতি-সেক্রেটারির তালিকা

সেশন	সভাপতি	সেক্রেটারি
২০১১	মাহমুদ হাসান	আফজালুন নুর মুন
২০১২ জুন পর্যন্ত	আফজালুন নুর মুন	এ, কে, এম মহিউদ্দিন
২০১২ জুলাই-বর্তমান	মাহমুদুল হাসান	মুজিবর রহমান

শান্তি মিনার
www.pathagar.com

মতিঝিল থানা

মতিঝিল, ঢাকা (বাংলাদেশের রাজধানী) শহরের প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা যা রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত যার বুকে অবস্থান করছে দেশের সর্বোচ্চ অট্টালিকা 'সিটি সেন্টার (৩৭ তলা)' যাকে বেষ্টন করে রয়েছে বঙ্গভবন (রাষ্ট্রপতির বাসভবন), বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়।

কিংবন্তির লেখনীতে এবং ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজে মোঘল সাম্রাজ্যের সময়কাল (১৫২৬ ইং) হতেই মতিঝিল এলাকার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই এলাকাটি সেই সময় মির্জা মোহাম্মদের মহল হিসেবে গণ্য হতো, যার মধ্যে ছিল একটি পুকুর যা শুরুতে 'সুকাকু' মহলের পুকুর হিসেবে খ্যাত হলেও পরবর্তীতে এই পুকুরটি 'মতিঝিল' নামে পরিচিতি লাভ করে। উল্লেখ্য যে, পল্টন ও শাহবাগ থানা ২০০৫ সাল এবং ২০১২ সালে শাহজাহানপুর পর্যন্ত মতিঝিল থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল যা পরবর্তীতে ৩টি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক থানায় বিভক্ত হওয়ার সময় থেকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের মতিঝিল সাংগঠনিক থানাও স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে।

সাংগঠনিক কাঠামো : বর্তমানে মতিঝিল থানা ৩১,৩২,৩৩ নং প্রশাসনিক ওয়ার্ডকে ৭টি সাংগঠনিক ওয়ার্ড এবং ৩৩টি উপশাখায় বিভক্ত করে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মতিঝিল থানার পূর্ববর্তী সভাপতি-সেক্রেটারিদের নাম ও সেশন :

সেশন	[illegible]	[illegible]
২০০২-২০০৩	মু. আব্দুল কাদের	মু. ওলিউল্লাহ খান
২০০৪-২০০৫ জুন	মু. ওলিউল্লাহ খান	মু. রেজাউল করিম
২০০৫ জুলাই- ২০০৬	মু. রেজাউল করিম	আমিনুল ইসলাম শান্ত
২০০৭-২০০৮ জুন	মু. ইয়াসিন আরাফাত	মু. নূর উদ্দীন
২০০৮ জুন-২০০৯ জুলাই	মু. নূর উদ্দীন	মু. ইব্রাহিম
২০০৯ জুলাই-২০১০	এ কে এম ফজলুল হক	এএইচ এম রায়হান
২০১১-২০১১ জুলাই	মু. তোজাম্মেল হক	মু. মতিউর রহমান
২০১১ জুলাই- ২০১২	মু. মতিউর রহমান	হাফিজুল্লাহ
২০১২-বর্তমান	রাকিবুল হাসান শামীম	নুরে আলম সিদ্দিকী আসাদ

**বি: দ্র: অনিবার্যকারণবসত ২০০২ সালের আগের ইতিহাসগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।*

শান্তি মিনার
www.pathagar.com

মুগদা

২০০২ সালের অক্টোবর মাসে সবুজবাগ থানা থেকে সবুজবাগ দক্ষিণ সাংগঠনিক থানা গঠন করা হয়। ২০১২ সালের মার্চ মাসে প্রশাসনিক মুগদা থানা গঠিত হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো : ২৮, ২৯ নং প্রশাসনিক ও ২টি ইউনিয়নসহ মোট ৮টি ওয়ার্ড এবং ৪১টি উপশাখা।

সভাপতি-সেক্রেটারির তালিকা

২০০৩	আব্দুল হক	মোঃ আল আমিন
২০০৪	মোঃ আল আমিন	মোঃ ইসহাক
২০০৫-২০০৬	মোঃ ইসহাক	মজনুর রহমান কালাম
২০০৬-২০০৭	মির মাহবুব হাসান	আব্দুল কাদের
২০০৭-২০০৮	আল আমিন	আব্দুল কাদের
২০০৮	আল আমিন	আব্দুল কাদের
২০০৯	আব্দুল কাদের	জাকির আল মামুন
২০১০	জাকির আল মামুন	মহসিন আলী
২০১১	মহসিন আলী	গোলাম ছাদেক
২০১১-২০১২	গোলাম ছাদেক	এহসানুল হক মাহবুব
২০১৩-২০১৩	এহসানুল হক মাহবুব	আবুল হোসেন সাইফুল্লাহ
২০১৩ (বর্তমান)	মোঃ শরিফুল ইসলাম	আবুল খায়ের

বিঃদ্রঃ- ১. ঢাকা মেডিকেল, নটর ডেম কলেজ, সাইমুম শাখার অন্তর্ভূক্ত ছিল ২০১০ সাল পর্যন্ত
২. এছাড়া আরো ৩টি বিভাগীয় থানা বর্তমান রয়েছে

শান্তি মিনার
www.pathagar.com

রমনা থানা

অবিভক্ত রমনা থানার সভাপতি ছিল ফজলুল করিম ১৯৮০ সালের অক্টোবরে রমনা শাখাকে (পূর্ব পশ্চিম) দু'ভাগে ভাগ করা হয়। রমনা পূর্বের সভাপতি ছিল মোঃ হোসাইন আহমদ ও পশ্চিমের সভাপতি ছিল আলী আকরাম মোঃ উজায়ের

সভাপতি-সেক্রেটারির তালিকা

সেশন	সভাপতি	সেক্রেটারি
অক্টো'১৯৮০-অক্টো'১৯৮২	আলী আকরাম মোঃ উজায়ের	মোহাম্মদ সাইফুদ্দীন
নভে'১৯৮২-অক্টো'১৯৮৩	মোহাম্মদ সাইফুদ্দীন	মোঃ জহিরুল ইসলাম
নভে'১৯৮৩-অক্টো'১৯৮৪	মোঃ জহিরুল ইসলাম	মোঃ আব্দুর রহীম
নভে'১৯৮৪-অক্টো'১৯৮৫	মোঃ আব্দুর রহীম	
নভে'১৯৮৫-অক্টো'১৯৮৬	মোঃ সারোয়ার হোসাইন	মোঃ আব্দুর রহীম
নভে'১৯৮৬-অক্টো'১৯৮৮	মোঃ জাহাঙ্গীর কবির	আব্দুস সাত্তার
নভে'১৯৮৮-অক্টো'১৯৮৯	শাহাজাহান খান	
নভে'১৯৮৯-অক্টো'১৯৯০	মোঃ হাবিবুর রহমান	মোঃ রেজাউল ইসলাম
নভে'১৯৯০-অক্টো'১৯৯২	মোঃ রেজাউল ইসলাম	ইকবাল আহমেদ
নভে'১৯৯২-অক্টো'১৯৯৩	ইকবাল আহমেদ	
নভে'১৯৯৩-ডিসে'১৯৯৪	মঞ্জুরুল ইসলাম	শরিফুল ইসলাম
১৯৯৫-১৯৯৬	শরিফুল ইসলাম	মোস্তাফিজুর রহমান
১৯৯৭	হাফেজ আব্দুল্লাহ আল-আরিফ	মোস্তাফিজুর রহমান, গিয়াস উদ্দিন
১৯৯৮-১৯৯৯	মোস্তাফিজুর রহমান	মঞ্জুরুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, হাবিবুল্লাহ মোঃ ইকবাল
২০০০ জুন পর্যন্ত	আশরাফুল ইসলাম	ইফতেখার আহমেদ, মঈনুর রহমান
২০০০ ডিসে পর্যন্ত	রফিকুল ইসলাম	মঈনুর রহমান
২০০১	মঈনুর রহমান	আ.ন.ম শহিদুল্লাহ
২০০২	আ.ন.ম শহিদুল্লাহ	বোরহান উদ্দিন
২০০৩-২০০৪ জুন	বোরহান উদ্দিন	এনামুল করিম
২০০৪ জুন-২০০৫ জুন	নিজামুল হক নাঈম	এনামুল করিম, আমিনুল হক মোল্লা
২০০৫ জুন-২০০৬ জুন	মনির উদ্দিন মণি	আমিনুল হক মোল্লা, আবু ইউসুফ রিয়াদ
২০০৬ ডিসে পর্যন্ত	এস.এম শামছুল বারী	শেখ মোঃ এনামুল কবির
২০০৭ জুন পর্যন্ত	মোহাম্মদ ইসহাক	শেখ মোঃ এনামুল কবির
২০০৭ জুন-২০০৮	শেখ মোঃ এনামুল কবির	শরিফুল ইসলাম
২০০৯-২০১০	শরিফুল ইসলাম	রওশন জামান, আরিফ বিল্লাহ
২০১১ জুন পর্যন্ত	মোঃ রওশন জামান	মোহাম্মদ শাহ জালাল
২০১১ জুন-২০১২ জুন	সোহেল রানা মিঠু	শাহ জালাল, রায়হান উদ্দিন
২০১২ জুন-২০১৩ জুন	মোঃ রায়হান উদ্দিন	হাসান মাহমুদ, কাউছার আলম
২০১৩ জুন-বর্তমান	হাফেজ মোঃ আশ্রাফ উদ্দিন	কাউছার আলম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দেখেছি মায়ের কান্না

আবু সালেহ মো. ইয়াহইয়া

আমি দেখেছি কত মায়ের কান্না, বাবার আহাজারি
ব্যাথিত হৃদয়ে মলিন বদনে আকাশ হয়েছে ভারী ।

আমি দেখেছি কত মায়ের বুক হয়েছে আজ ফাঁকা
সজল নয়নে আকাশ পানে নির্বাক চেয়ে থাকা ।
আমি দেখেছি বোনের কপোল ভিজে ঝরছে অশ্রুধারা
ব্যাকুল হয়ে ভাইয়ের খোজে ফিরছে সর্বহারা ।

আমি দেখেছি কত বাগানের ফুল অকাল ঝরে পড়া
বিকশিত হয়ে সুরভি ছড়ানো হলোনা আর সারা ।
আমি দেখেছি কত পাখির ছানার ভেঙেছে আজ ডানা
পাখা মেলে তাই বিশ্বটাকে হলোনা তার জানা ।

আমি দেখেছি আজ শত তরুণের নিলাভ চেহারা
লোহার শিকলে পড়েছে বাঁধা অযুত স্বপ্নেরা ।
আমি দেখেছি আজ কত ভাই মোর হয়েছে চোখ হারা
হাত-পা হারিয়ে চলছে তবু গৌরবে বুক ভরা ।

আমি শুনেছি কত মজলুমানের আকুল ফরিয়াদ
শোষনে পীড়ণে বিষাদে তাদের করুণ আর্তনাদ ।
আমি শুনেছি আজ বাতাসের বুকে ব্যাথার গুঞ্জরণ
সত্যের আলো নিভিয়ে দিতে মিথ্যার আস্ফালন ।

আমি জেনেছি কভু বিফলে যাবেনা মোদের আয়োজন
নীরবে নিশীতে প্রভুর চরণে অশ্রু বিসর্জন ।
আমি জেনেছি লাখো তরুণ আবার করছে নতুন পণ
বিজয় কেতন উড়াবার তরে লড়বে আজীবন ।

www.pathagar.com

দুঃসহ যন্ত্রণা

মু. মোস্তাফিজুর রহমান

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার স্মরণে

তন্দ্রা আসে কিন্তু নিদ্রা আসে না
নীরবতা আসে কিন্তু নিস্তব্ধতা আসে না।
বোবা আর্তনাদ মোর বিস্ফোরিত হয়ে
নয়নের অবাধ্য বারিধারা আর বাধ মানে না।

ভুলে থাকতে চাহি দুঃসহ স্মৃতিগুলি
কিন্তু হায়, বারে বারে ভেসে ওঠে মম মানসপটে
হারিয়ে যাওয়া দিবস যামি নির্মমতার স্মৃতিবাহী।
তমসাচ্ছন্ন নিশিথধার যন্ত্রণা আবারো জেগে ওঠে
মানবকুল আরাধনা করে প্রখর ধীশক্তির
চাহি না আমি উন্নত হোক মমশির
হতে চাহি না দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী ধরে
আমি চাই উন্নত হোক মম বিস্মৃতির
কবুল কর মোর অর্চনা, ওগো রহমান
বিস্মৃতি কর মোরে ধ্বংস কর মোর কল্পনা
ফিরিতে চাহি না আমি আবারো
কেউ অন্ধকার রজনীর দুঃসহ যন্ত্রণা।

www.pathagar.com

ভাইয়া তোমার জন্য

নাদিয়া বিনতে মাহতাব

আজ নভেম্বরের দ্বিতীয় দিন
ফুট ফুটে রুপালি চাঁদ
ফকফকে জোছনায় ভরে গেছে চারদিক
সেদিন কিন্তু এমনই রাত ছিল।
অজানা এক শ্রদ্ধায় ভরেছিল সবার বুক
কখন কী হয়।
তাই ফকফকে এই জোছনা থাকলে
দেখার মত মন ছিল না কারও
প্রকৃতিতে জোছনা থাকলেও
মনে ছিল সবার গাঢ় অমাবস্যা
আমার মনেও ছিল।
তোমার চিন্তায় কারও ঘুম নেই
তোমার দুঃখে ঝরিয়েছে অশ্রু সবাই,
কিন্তু তুমি ছিলে নিশ্চিন্ত।
তুমি জোছনা ঠিকই উপভোগ করেছ
সারা রাত জেগে জান্নাতের সুবাস আর,
ভরা পূর্ণিমার চাঁদ তুমি
ঠিকই উপভোগ করলে একা
আমাদের ডাকলে না
ডাকবে কেন?
এটাতো তোমার নিজস্ব প্রাপ্যতা
অবশেষে
ভোরের আলো ফোটার আগে
জোছনার আলো
মিলিয়ে যাওয়ার আগে
তুমি চোখ বুজলে
তুমি ঘুমালে
ঘুমিয়ে পড়লে
সে এক অনন্ত শয়ন
তোমার ঘুম আর ভাঙল না।
সময়ের আবর্তনে ফিরে আসে
নভেম্বরের দ্বিতীয় দিন
ফিরে আসে সেই চাঁদ
সেই জোছনা।
কিন্তু তুমি আসো না।
আসবেও না জানি
ডাহুকির মত কাঁদি
কাঁদি তোমায় না দেখার হাহাকারে
আজ এখনও আমার সেই হাহকার
ভাইয়া তোমার জন্য।

www.pathagar.com

কাণ্ডারির মুক্তি চাই

শিবলী হোসাইন

আজ কোনো আকুতি নিয়ে আমি রাজপথে আসিনি
কারাগারের তালা ভেঙে জাতির কাণ্ডারিকে মুক্ত করতে এসেছি
আজ কোনো বাধাই আমাকে রুখতে পারবে না
কোনো শিকলই আমায় বেঁধে রাখতে পারবে না
শুভ্র কফিন পরে আমি আজ রাজপথে নেমেছি
জীবন নিয়েছি হাতের মুঠোয়
আমি আজ আর ফিরব না খালি হাতে
হয়তো ফিরব কাণ্ডারিকে সাথে নিয়ে
নচেৎ শত খণ্ডে বিখণ্ডিত হয়ে পিষে যাব রাজপথে
আজ আমি শেষ স্নান সেরে রাজপথে এসেছি
শেষ খাবার খেয়ে রাজপথে নেমেছি
মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এখানে এসেছি
মাকে বলে এসেছি খাটিয়া প্রস্তুত করে রাখতে।
আজ পর্যন্ত অর্জিত সকল ডিগ্রি বিসর্জন দিয়ে এসেছি
পৃথিবীর সকল মায়াজাল ছিন্ন করে এসেছি
আমি নজরুলের অরুণ খুনের তরুণ খুনি হয়ে আবির্ভূত হয়েছি
আমি আবুল আসাদের আহমদ মুসা হয়ে আবির্ভূত হয়েছি
আজ আমি বাঙালির আস্তাবল থেকে
ছুটে আসা এক লাগামহীন উন্মত্ত ঘোড়া
কে টেনে ধরবে আমার লাগাম? আয় সামনে দাঁড়া।
কে আছিস সাহসী পুরুষ? আয় সামনে দাঁড়া।
অস্ত্র, গুলি, কাঁদানে গ্যাস ? আমি কিছুই ভয় করি না।
আজ আমি খুনের নেশায় দারুণ মত্ত।

www.pathagar.com

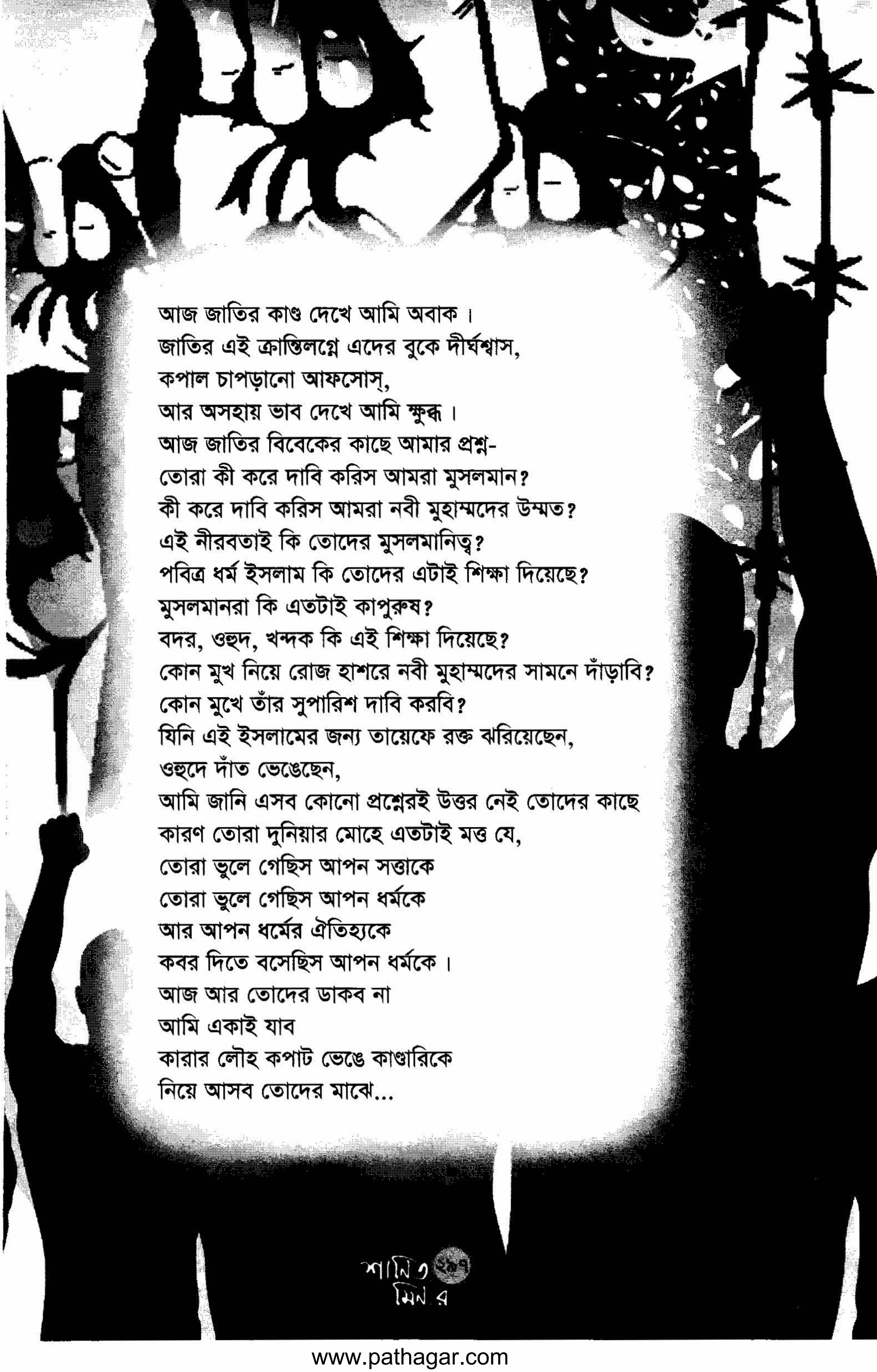

আজ জাতির কাণ্ড দেখে আমি অবাক ।
জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে এদের বুকে দীর্ঘশ্বাস,
কপাল চাপড়ানো আফসোস্,
আর অসহায় ভাব দেখে আমি ক্ষুব্ধ ।
আজ জাতির বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন-
তোরা কী করে দাবি করিস আমরা মুসলমান?
কী করে দাবি করিস আমরা নবী মুহাম্মদের উম্মত?
এই নীরবতাই কি তোদের মুসলমানিত্ব?
পবিত্র ধর্ম ইসলাম কি তোদের এটাই শিক্ষা দিয়েছে?
মুসলমানরা কি এতটাই কাপুরুষ?
বদর, ওহুদ, খন্দক কি এই শিক্ষা দিয়েছে?
কোন মুখ নিয়ে রোজ হাশরে নবী মুহাম্মদের সামনে দাঁড়াবি?
কোন মুখে তাঁর সুপারিশ দাবি করবি?
যিনি এই ইসলামের জন্য তায়েফে রক্ত ঝরিয়েছেন,
ওহুদে দাঁত ভেঙেছেন,
আমি জানি এসব কোনো প্রশ্নেরই উত্তর নেই তোদের কাছে
কারণ তোরা দুনিয়ার মোহে এতটাই মত্ত যে,
তোরা ভুলে গেছিস আপন সত্তাকে
তোরা ভুলে গেছিস আপন ধর্মকে
আর আপন ধর্মের ঐতিহ্যকে
কবর দিতে বসেছিস আপন ধর্মকে ।
আজ আর তোদের ডাকব না
আমি একাই যাব
কারার লৌহ কপাট ভেঙে কাণ্ডারিকে
নিয়ে আসব তোদের মাঝে...

www.pathagar.com

পত্রিকার পাতায়

নয়া দিগন্ত

সংগ্রাম
ঢাকা, সোমবার
২২ জুলাই ২০১৩

দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ ■ প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

সংগ্রাম
ঢাকা, মঙ্গলবার
২ আশ্বিন ১৪২০
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

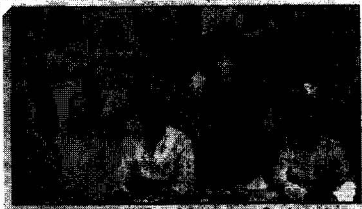

২৭.০৭.১৩

সরকারের দুঃশাসন ও দাম্ভিকতার জবাব দিতে জনগণ এখন প্রস্তুত-ড. মোবারক

দেশ ও ইসলাম রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে রাজপথে থাকতে হবে

——ছাত্রশিবির

ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগরী পূর্বের সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা বলেছেন, দেশ থেকে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনকে নির্মূল করতে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে ইসলামপ্রিয় জনগণের প্রিয় নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ জামায়াত নেতৃবৃন্দকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। ... অন্যদিকে চলছে নাস্তিকদের লালন ইসলামবিদ্বেষী এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন তৌহিদী জনতা রাজপথে নেমে এসেছে, তখন নিরীহ নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও আলেম-ওলামাদের ওপর চালানো হচ্ছে বর্বর গণহত্যা।

কৃতী ছাত্র সংবর্ধনা
মেধাবীদের সুখী-সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে

——ছাত্রশিবির

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ... বলেছেন, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এই দেশে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ ...

কুরআন নাজিলের মাসে কুরআনের সম্মান রক্ষায় ভূমিকা রাখতে হবে

——ছাত্রশিবির

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক মোবারক হোসাইন বলেছেন, রমজান মাস কুরআন নাজিলের মাস। কিন্তু বর্তমান সরকার কুরআনপ্রেমিকদের অন্যায়ভাবে কারাগারে আটক রেখে জুলুম-নির্যাতন করছে। বাংলাদেশে ... কুরআন রক্ষার যোগ্য মানুষ তৈরি করছে ছাত্রশিবির। ...

আমার দেশ

গতকাল বুধবার স্থানীয় একটি মিলনায়তনে ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের সম্মানে ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখেন ... —সংগ্রাম

নয়া দিগন্ত

গতকাল শনিবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার ... বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক মোবারক হোসেন —সংগ্রাম

গতকাল শনিবার স্থানীয় একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার উদ্যোগে ঐতিহাসিক বদর দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা ... কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন ...

আগামী দিনে সরকার পতনে ছাত্রশিবির রাজপথে তীব্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিবে

——ছাত্রশিবির

ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা বলেছেন, বর্তমান সরকার যে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ওপর জেল-জুলুম, নির্যাতন ও অন্যায়ভাবে জামায়াত শীর্ষ নেতাদের রায় দিচ্ছে আগামীদিনে সরকার পতনে ইসলামী ছাত্রশিবির রাজপথে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে।

গতকাল রোববার পল্টন থানার সাথী সমাবেশে প্রধান অতিথির ...

সংগ্রাম
ঢাকা, মঙ্গলবার
২ আশ্বিন ১৪২০
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

www.pathagar.com

নয়া দিগন্ত

সংগ্রাম

ঢাকা, মঙ্গলবার
২ আশ্বিন ১৪২০
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

গতকাল বৃহস্পতিবার ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা আয়োজিত সদস্য শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল জব্বার

গতকাল সোমবার আহত বাংলাভিশনের সিনিয়র ক্যামেরাপার্সন জহিরুল ইসলাম জনি সাংবাদিককে দেখতে যান ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা —সংগ্রাম

শিবিরের সদস্য শিক্ষাশিবিরে সেক্রেটারি জেনারেল

প্রহসনের নির্বাচনের ষড়যন্ত্র রুখতে ছাত্রসমাজ রাজপথে ইস্পাত কঠিন প্রাচীর তৈরি করবে

ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল জব্বার বলেছেন, বর্তমান সরকার জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের উপর জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনকে ধ্বংস করা এবং নেতৃত্ব শূন্য করার ষড়যন্ত্র করছে। সরকার অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করে ছাত্রশিবিরকে রাজপথে নামিয়ে জনগণের দৃষ্টি অন্যপথে নেয়ার চেষ্টা করছে। জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে এবং সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহাল না করে যে প্রহসনের নির্বাচন করার ষড়যন্ত্র সরকার করছে ছাত্রশিবির ছাত্রসমাজকে সাথে নিয়ে প্রতিহত করতে রাজপথে ইস্পাত কঠিন প্রাচীর তৈরি করবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা আয়োজিত সদস্য শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানার পরিচালনায় এবং সেক্রেটারি রেজাউল হক রিয়াজের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষাশিবিরে বিশেষ অতিথি ছিলেন ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক মোবারক হোসাইন, কেন্দ্রীয় গবেষণা সম্পাদক শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির, সাবেক কেন্দ্রীয় দাওয়াহ সম্পাদক আলমগীর মোহাম্মদ ইউসুফ। আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগরী অর্থ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, অফিস সম্পাদক রওশন জামান, প্রকাশনা সম্পাদক ... সোহেল রানা প্রমুখ।

আমার দেশ

... একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম। এখানে আড়াইহাজার লোক উপস্থিত হবে। দিন সচেতনতা নিয়ে এই অনুষ্ঠান।

ছাত্রশিবিরের ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি

গরিব-দুঃখী মানুষকে সাহায্য করতে ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচির আয়োজন করে ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা। কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা মহানগর পূর্ব শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য রাশেদুল হাসান রানা। বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি থানা শাখার সভাপতি মু. রিয়াজ উদ্দিনের পরিচালনায় এতে আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর পশ্চিমের সাবেক সভাপতি আব্দুল মান্নান, মোস্তাফিজুর রহমান, আব্দুর রহমান, আব্দুল হালিম প্রমুখ।

প্রধান অতিথি রাশেদুল হাসান ...

পুলিশের গুলীতে আহত সাংবাদিকের পাশে শিবির নেতৃবৃন্দ

গত ১৪ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী ... শিবিরের মিছিলে পুলিশের গুলীতে নিহত শিবির নেতা ... নিহত হন। সেই মিছিলে পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাংলাভিশনের সিনিয়র ক্যামেরাপার্সন জহিরুল ইসলাম জনি পুলিশের গুলীতে আহত হন। গতকাল সোমবার আহত সাংবাদিককে দেখতে যান ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা। এ সময় আহত সাংবাদিক জহিরুল ইসলাম জনির শারীরিক সার্বিক খোঁজ-খবর নেন এবং আল্লাহর কাছে তার দ্রুত সুস্থতার দোয়া কামনা করেন। আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগরী অফিস সম্পাদক রওশন জামান, প্রচার সম্পাদক আব্দুল কাদের, ... সম্পাদক গোলাম সারোয়ারসহ মহানগরী নেতৃবৃন্দ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক

দ্বিতীয় সংস্করণ

ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ ■ প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

নয়া দিগন্ত

জুলুমবাজ সরকারের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে —ছাত্রশিবির

ইসলামী ছাত্রশিবির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন বলেন, ছাত্রশিবিরের কর্মীদেরকে উন্নত চারিত্রিক শক্তি নিয়ে মানুষের নিকট ইসলামের সুমহান আদর্শকে তুলে ধরতে হবে। ত্যাগ কুরবানীর মাধ্যমে ... জুলুমবাজ সরকারের সকল ষড়যন্ত্র ছাত্রশিবির প্রতিহত করবে।

গতকাল সোমবার ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখা আয়োজিত আঞ্চলিক দায়িত্বশীল সাথীদের দিনব্যাপী শিক্ষা বৈঠকে প্রধান ...

শিবিরের ... সরকারের জামায়াত নিষিদ্ধের ষড়যন্ত্র ছাত্রসমাজ প্রতিহত করবে

... ও জামায়াতে ... বলেছেন, ট্রাইব্যুনাল-এর মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর ... বাংলাদেশের জনগণ সাথে নিয়ে প্রতিহত করবে। ... সরকারের ... প্রতি মানুষের আস্থা ... হয়ে গিয়েছে। ...

আমার দেশ

কারামুক্ত সংবর্ধনা ও ইফতার মাহফিলে মজলুল ইসলাম ভূঁইয়া

বর্তমান সরকারের সকল ষড়যন্ত্রকে রাজপথে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলে প্রতিহত করা হবে

জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর ... সেক্রেটারি ... বলেন, বর্তমান আওয়ামী সরকার ডিজিটাল কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ওপর জেল, জুলুম, নির্যাতন চালিয়ে আসছে। ইসলামী আন্দোলনকে ... সরকারের সকল ষড়যন্ত্রকে ... রাজপথে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে প্রতিহত করবে। তিনি আরো বলেন ...

কৃতী ছাত্র সংবর্ধনা

মেধাবীদের সুখী-সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে —ছাত্রশিবির

ইসলামী ছাত্রশিবিরের ... বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ... ইসলাম বলেছেন, আমাদের ... ভূমি বাংলাদেশ পৃথিবীর ... একটি স্বাধীন সার্বভৌম ...

ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে হবে

ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. ... বলেছেন, ... সাহাবিরা ইসলামকে ... করার জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করে ইসলামের ...

... আন্দোলনের ... সব ষড়যন্ত্র ... হত করতে হবে

... ছাত্রশিবিরের ...

জাতি বিভক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতার অর্জন ম্লান করার ষড়যন্ত্র চলছে —ছাত্রশিবির

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ...

www.pathagar.com

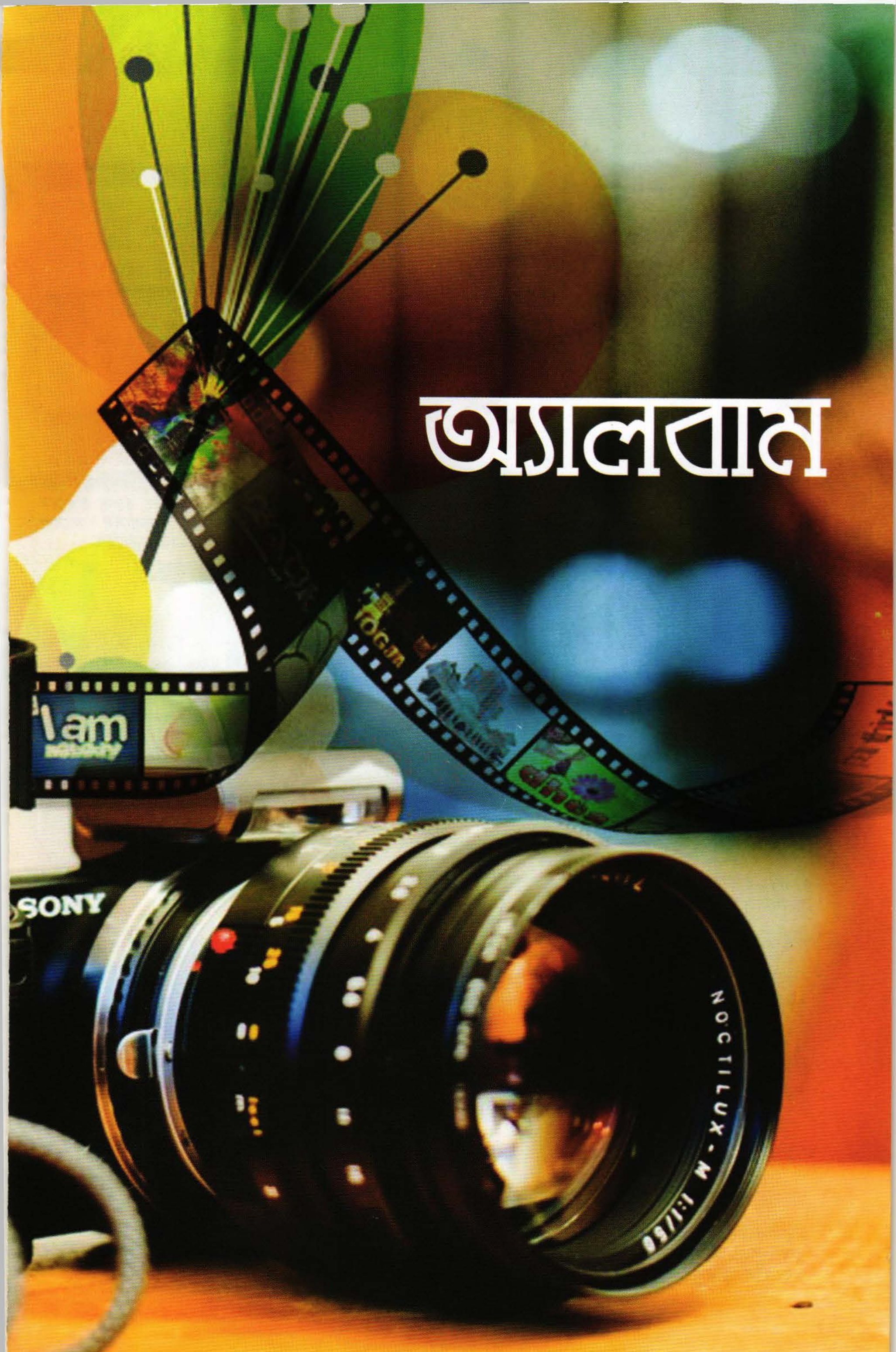

www.pathagar.com

জাতীয়

ঐতিহাসিক ১১ মে কোরআন দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কোরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক তাসলিম আলম

২৮ অক্টোবর শহীদদের স্মরণে কবর জিয়ারত করছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ ফখরুদ্দিন মানিকসহ কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন (উপরে বাম থেকে) তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল ডা: ফখরুদ্দিন মানিক, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, তৎকালীন মহানগরী সভাপতি মনির উদ্দিন মণি

www.pathagar.com

মহান মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিমসহ কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ

সিরাতুননবী (সা) উযযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত মকবুল আহমদ

ঐতিহাসিক পলাশী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা: ফখরুদ্দিন মানিক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনে দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী নায়েবে আমীর হামিদুর রহমান আযাদ এমপি

স্কুল ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথি সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান ছাত্রদের মাঝে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ করছেন সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল জব্বার

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক বদর দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের সম্মানে ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক মিজানুর রহমান

২৮ অক্টোবর শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলাওয়ার হোসেন ভাইকে রিমান্ডে নির্মম নির্যাতন করলে সুস্থতার জন্য দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক মোবারক হোসাইন

ঐতিহাসিক বদর দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক আতাউর রহমান সরকার

ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন

www.pathagar.com

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে বিশাল র‍্যালি

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাইয়ের রুহের মাগফিরাতে দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক মোবারক হোসাইন

২৮ অক্টোবর শহীদদের স্মরণে কোরআনখানি ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডা: ফখরুদ্দিন মানিকসহ কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ

সাথী শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক আলমগীর হোসাইন

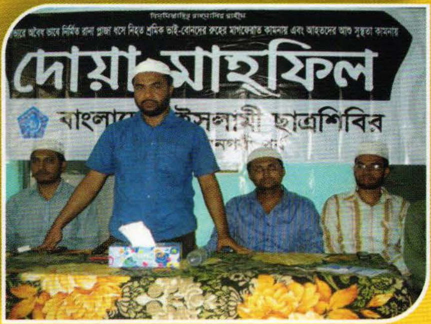

সাভারে অবৈধভাবে নির্মিত রানা প্লাজায় নিহত শ্রমিকদের রুহের মাগফিরাতে দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় গবেষণা সম্পাদক শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির

জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিলে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় বাংলা ভিশনের সিনিয়র ক্যামেরা পারসন পুলিশের গুলিতে আহত হলে তার সাথে দেখা করতে যান মহানগরী প্রচার সম্পাদক আব্দুল কাদের

www.pathagar.com

উপশাখা সভাপতি সেক্রেটারি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য তৎকালীন মন্ত্রী মির্জা আব্বাস

বন্যার্ত অসহায় মানুষের সাহায্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছেন তৎকালীন মহানগরী সভাপতি আজিজুর রহমান

সাথী শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

কৃতী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ও তৎকালীন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ

ফিলিস্তিনে অবৈধভাবে ইসরাইল কর্তৃক যুদ্ধের প্রতিবাদে ঢাকার রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল

লালবাগ থানায় এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

www.pathagar.com

সাংগঠনিক কার্যক্রম

আলফালাহ মিলনায়তনে দিনব্যাপী সাথী শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন (উপরে বাম থেকে) তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ রেজাউল করিম, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ, কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক নুর মোহাম্মদ মন্ডল, কেন্দ্রীয় এইচ আর ডি সম্পাদক নিজামুল হক নাঈম, মহানগরী পূর্বের সাবেক সভাপতি কামাল হোসাইন, সাবেক সেক্রেটারি আখতার হোসাইন, সভাপতির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন মহানগরী সভাপতি মনির উদ্দিন মণি

আলফালাহ মিলনায়তনে দিনব্যাপী এইচএসসি ও আলিম ফলপ্রার্থীদের নিয়ে শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারি জেনারেল ডা. ফখরুদ্দিন মানিক, মহানগরী তৎকালীন সভাপতি মনির উদ্দিন মণি, মহানগরী সেক্রেটারি ইয়াছিন আরাফাত

www.pathagar.com

সদস্য শিক্ষাশিবিরের প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম বুলবুল, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. রেজাউল হক রিয়াজ, সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল জব্বার, কেন্দ্রীয় ছাত্র আন্দোলন সম্পাদক শামসুল আলম গোলাপ, সাবেক কেন্দ্রীয় দাওয়াহ সম্পাদক আলমগীর মোহাম্মদ ইউসুফ, কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক মোবারক হোসাইন, কেন্দ্রীয় গবেষণা সম্পাদক শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির, মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা, মহানগরী সেক্রেটারি রেজাউল রিয়াজ

ওয়ার্ড সভাপতি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাবেক কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক শামসুর রহমান, মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা, মহানগরী সেক্রেটারি রেজাউল হক রিয়াজ

www.pathagar.com

এইচ এস সি ও আলীম ফলপ্রার্থী শিক্ষা শিবিরের প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর মরহুম একেএম নাজির আহমদ

খিলগাঁও থানা আয়োজিত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

সবুজবাগ থানা দক্ষিণ আয়োজিত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

আলফালাহ মিলনায়তনে দিনব্যাপী এইচ এস সি ও আলিম ফলপ্রার্থীদের নিয়ে শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. রেজাউল করিম

পুলিশ ও ছাত্রলীগের হামলায় শিবির নেতা মাহমুদুল হাসানের শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনায় দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল জব্বার

মাহে রমযানকে স্বাগত জানিয়ে রাজধানীতে বর্নাঢ্য র‍্যালী

www.pathagar.com

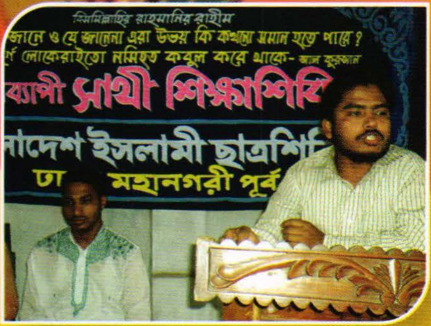

দিনব্যাপী সাথী শিক্ষাশিবিরের প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

বার্ষিক পরামর্শ সভার বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা: ফখরুদ্দিন মানিক

ষান্মাসিক সদস্য বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মেধাবী ছাত্রদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় এইচআরডি সম্পাদক নিজামুল হক নাঈম

দিনব্যাপী সাথী শিক্ষাশিবিরের প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

www.pathagar.com

বার্ষিক সদস্য বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

থানা দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক সভাপতি আজিজুর রহমান।

সদস্য বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক নুর মোহাম্মদ মন্ডল

রামপুরা থানায় ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

সদস্য সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল জব্বার

সাথী প্রার্থী শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তাৎকালিন কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক আতাউর রহমান সরকার

www.pathagar.com

সবুজবাগ থানা উত্তর আয়োজিত সাথী শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন মহানগরী সভাপতি ইয়াছিন আরাফাত

সরকারী-ই আলিয়া মাদরাসা ঢাকার অধ্যয়নরত ছাত্রদের নিয়ে ইফতার মাহফিলে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

সদস্য শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী তৎকালীন সহকারী সেক্রেটারি ও সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম

স্কুল দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

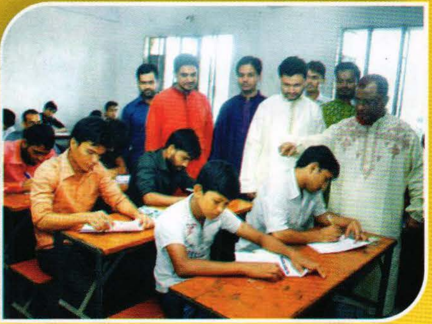

সাথীদের মানযাচাই পরীক্ষা পরিদর্শন করছেন তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলাম ও তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা: ফখরুদ্দিন মানিকসহ অতিথিবৃন্দ

দিনাজপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত শিবিরনেতা শহীদ মুজাহিদুল ইসলামের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠানে মুনাজাত করছেন সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল জব্বার

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল জব্বার

পুলিশি নির্যাতনের শিকার কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ভাইয়ের সুস্থতা ও মুক্তি কামনায় দোয়া অনুষ্ঠানে মুনাজাত করছেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত

মাওলানা রাফিক বিন সাঈদীর রুহের মাগফিরাত কামনা দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

সবুজবাগ থানা দক্ষিণ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আলোচনা সভা

আলফালাহ মিলনায়তনে সাথী শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা: ফখরুদ্দিন মানিক

পল্টন থানার ষান্মাসিক সাথী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা

www.pathagar.com

সাথী শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

২৮ অক্টোবর কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা: ফখরুদ্দিন মানিক

সাথী শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম

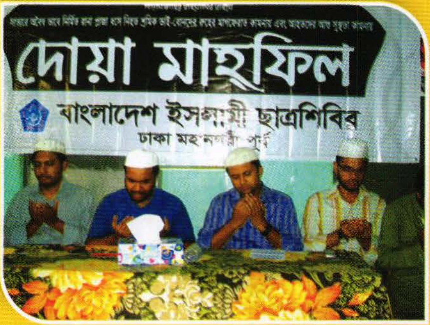

সাভারের রানা প্লাজায় নিহত শ্রমিকদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠান

কলেজ জোন সাথী শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

মিছবাহুল উলুম কামিল মাদ্রাসা সাথী শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা

www.pathagar.com

ওয়ার্ড দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম বুলবুল

উপশাখা দায়িত্বশীল সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার

ওয়ার্ড দায়িত্বশীল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. রেজাউল করিম

ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

স্কুল দায়িত্বশীল শিক্ষাবৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

www.pathagar.com

রাজধানীতে মাহে রমযানকে স্বাগত জানিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

জাতীয় সিরাত পাঠ প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল জব্বার

উপশাখা দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন মহানগরী সভাপতি কামাল হোসাইন

খিলগাঁও থানার কর্মী শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

বিশিষ্ট সুধীদের সম্মানে ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামীর নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম

www.pathagar.com

শিক্ষাকার্যক্রম

জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় এ+ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, প্রধান বক্তা তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, বিশেষ অতিথি সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, মহানগরী সভাপতি মনির উদ্দিন মণি

জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় এ+ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত আমীর মকবুল আহমদ, প্রধান বক্তা তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা: ফখরুদ্দিন মানিক, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা: আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, ঢাকা মহানগরী জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর হামিদুর রহমান আযাদ, তৎকালীন কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক আব্দুল জব্বার, কমিশনার আব্দুর রউফ, তৎকালীন বুয়েট সভাপতি ইঞ্জি: সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ সভাপতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি শাহীন আহম্মেদ খান, মহানগরী সভাপতি ইয়াছিন আরাফাত, মহানগরী সেক্রেটারি শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির

www.pathagar.com

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্ত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার আব্দুল রাজ্জাক, বিশেষ অতিথি সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, কেন্দ্রীয় এইচআরডি সম্পাদক ইয়াছিন আরাফাত, মহানগরী সভাপতি শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির

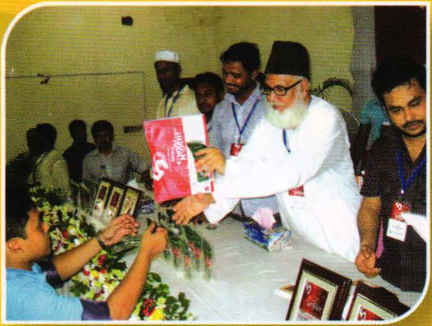

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্ত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্ত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অতিথিবৃন্দ

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্ত কৃতী ছাত্রদের উপস্থিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্ত কৃতী ছাত্রদের মাঝে উপস্থিত আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সহ সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

www.pathagar.com

আন্তঃথানা স্কুল বিতর্ক ফাইনাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিসিএসআইআর সাবেক চেয়ারম্যান ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসানসহ অতিথিবৃন্দ

এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণদের তাৎক্ষণিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল জব্বার

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্ত কৃতী ছাত্রদের মাঝে উপস্থিত কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সিরাজুল ইসলামসহ অতিথিবৃন্দ

পল্টন থানায় এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্ত কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা দিচ্ছেন মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানাসহ অতিথিবৃন্দ

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা

আন্তঃথানা স্কুল বিতর্ক ফাইনাল অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান অধিকারী গ্রুপকে প্রধান অতিথি বিসিএসআইআর সাবেক চেয়ারম্যান ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসানসহ অতিথিবৃন্দ পুরস্কার দিচ্ছেন

www.pathagar.com

GPA-5 পাওয়া কি এতই কঠিন? ক্যারিয়ার গাইড লাইন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান

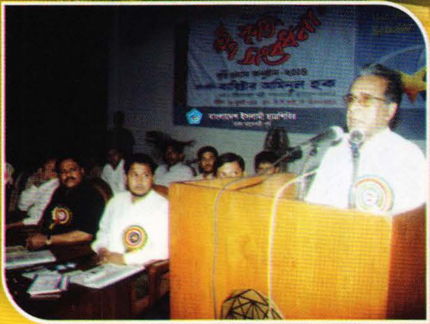

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক

GPA-5 পাওয়া কি এতই কঠিন? বিজ্ঞানবিষয়ক প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল শিশির মোহাম্মদ মনির

বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন ঢাকা মহানগরী আমীর মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান ও তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছাত্র-ছাত্রীদে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন তৎকালীন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ডা: মতিয়ার রহমানসহ অতিথিবৃন্দ

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের উপহার দিচ্ছেন প্রধান অতিথি সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান ও বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ডা: মতিয়ার রহমানসহ অতিথিবৃন্দ

www.pathagar.com

সামাজিক কার্যক্রম

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

দক্ষিণ মুগদায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন ও মহানগরী সভাপতি হাফেজ মিজানুর রহমান

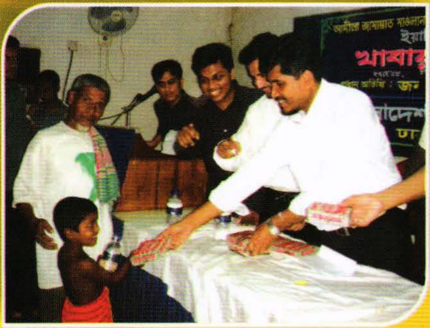

ইয়াতিম ও পথশিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুর রহমান ও মহানগরী সভাপতি ডা. ফখরুদ্দিন মানিক

গরিব মানুষের মাঝে ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান অনুষ্ঠান উদ্বোধন করছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম ও সেক্রেটারি জেনারেল শিশির মুহাম্মদ মনির

ইয়াতিম ও পথশিশুদের মাঝে খাবার বিতরন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুর রহমান

গরিব ও অসহায় মানুষের মাঝে রাজধানীতে ঈদসামগ্রী বিতরণ করছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিমসহ অতিথিবৃন্দ

www.pathagar.com

গরিব ছাত্রদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিমসহ অতিথিবৃন্দ

সবুজবাগ থানা উত্তর গরিব ছাত্রদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি আয়োজিত ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং উদ্বোধন করছেন মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা ও মহানগরী পশ্চিম সাবেক সভাপতি আব্দুল মান্নান

গরিব, দুস্থ ও মেধাবীদের মাঝে ইফতারসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় গবেষণা সম্পাদক শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করছেন মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানাসহ নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

GPA-5 প্রাপ্ত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উপহার তুলে দিচ্ছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

গরিব ও অসহায় মানুষের মাঝে ঈদসামগ্রী বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন ও মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা

বন্যার্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর আলোচনা সভা ও প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

ন্যাশনাল পার্ক গাজীপুর শিক্ষা সফর ২০০৬ সালে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

www.pathagar.com

রাজনীতি কার্যক্রম

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে বায়তুল মোকাররম মসজিদ উত্তরগেটে মানববন্ধন কর্মসূচি

আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাতিল ও জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে রাজধানীতে গণমিছিল

আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাতিল ও জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল

আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাতিল ও জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে রাজধানী খিলগাঁওয়ে সমাবেশে যোগদান

আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাতিল ও জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মুক্তি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে রাজধানীতে সমাবেশে যোগদান

আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাতিল ও জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মুক্তির এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশ সফল করতে মিছিল নিয়ে যোগদান

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অবৈধ তফসিল বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে রাজপথ অবরোধ মিছিল

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অবৈধ তফসিল বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে রাজপথ অবরোধ মিছিল

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লাসহ নেতৃবৃন্দের মক্তির দাবিতে হরতাল মিছিল

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অবৈধ তফসিল বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে রাজপথ হরতাল মিছিল

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অবৈধ তফসিল বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে রাজপথ অবরোধ মিছিল

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অবৈধ তফসিল বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে রাজপথ অবরোধ মিছিল

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অবৈধ তফসিল বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে রাজপথ হরতাল মিছিল

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লাসহ নেতৃবৃন্দের মক্তির দাবিতে হরতাল মিছিল

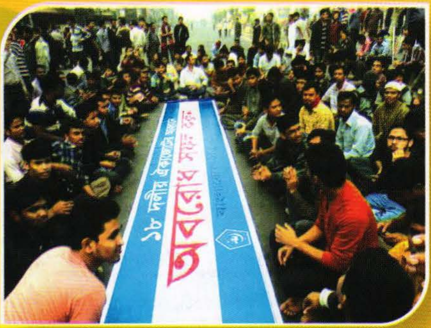

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে রাজপথ অবরোধ

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর সাবেক এমপি মাওলানা আব্দুস সোবহানকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল

ইতিহাসের কালো অধ্যায় ২৮ অক্টোবর'০৬ লগি-বৈঠাধারী খুনিদের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামরুজ্জামানের ফাঁসির রায়ের প্রতিবাদে হরতাল মিছিল

ইসলামী ছাত্রশিবিরের সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীকে অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও মুক্তির দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি ছাত্রলীগের অব্যাহত সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জঙ্গি ছাত্রলীগের অব্যাহত সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল

আওয়ামী জালিম সরকারের কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ায় মহানগরী অফিস সম্পাদক রওশন জামান ও মহানগরী সাহিত্য সম্পাদক তোজাম্মেল হককে মহানগরী নেতৃবৃন্দ ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজধানীতে ১৮ দলীয় জোটের বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন মহানগরী সভাপতি শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির

www.pathagar.com

জেল-জুলুমে নির্যাতিত যারা

আওয়ামী জালিম সরকারের কারাগার থেকে কামরাঙ্গীরচর থানা সভাপতি আব্দুল মালেক ভাই জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় অফিসে তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল ডা: ফখরুদ্দিন মানিক ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেন

আওয়ামী জালিম সরকারের কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ায় মহানগরী সেক্রেটারি রেজাউল হক রিয়াজ ভাইকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেন সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলাওয়ার হোসেন ও মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা

আওয়ামী জালিম সরকারের কারাবাস-পরবর্তী কারামুক্ত সংবর্ধনা

আওয়ামী জালিম সরকারের কারাবাস-পরবর্তী কারামুক্ত সংবর্ধনা

আওয়ামী জালিম সরকারের কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি লাভের পর মহানগরী প্রচার ও বিজ্ঞানপ্রযুক্তি সম্পাদক আব্দুল কাদের এবং স্কুলজোন খিলগাঁও সেক্রেটারি মজিবুর রহমানকে মহানগরী সভাপতি ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেন

আওয়ামী জালিম সরকারের কারাবাস পরবর্তী খিলগাঁও থানার কারামুক্ত সংবর্ধনায় মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা

www.pathagar.com

আওয়ামী জালিম সরকারের কারাবাস-পরবর্তী কারামুক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মুঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়াসহ নেতৃবৃন্দ

আওয়ামী জালিম সরকারের কারাগার থেকে জামিনে মুক্তির পর কলেজ জোন থানায় ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা

আওয়ামী জালিম সরকারের দীর্ঘদিন কারাবাসের পর জামিনে মুক্ত হলে জেলগেটে মহানগরী স্কুল সম্পাদক আবু তালহা বশিরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন তৎকালীন মহানগরী সভাপতি ইয়াছিন আরাফাত

আওয়ামী জালিম সরকারের পুলিশ বাহিনী অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে শিবির নেতাদের

আওয়ামী জালিম সরকারের পুলিশ-ছাত্রলীগ যৌথভাবে নির্যাতন করে শিবির নেতা আনিসুজ্জামান ভাইকে

শান্তিনগরে বিক্ষোভ মিছিলে আওয়ামী জালিম সরকারের পুলিশের হামলায় মারাত্মক আহত হন তৎকালীন মহানগরী সেক্রেটারি শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির

www.pathagar.com

বিভিন্ন কর্মসূচির একাংশ

শাখার নিজেস্ব ওয়েবসাইট উদ্বোধন করছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা: ফখরুদ্দিন মানিক

সদস্য ভাইদের নিয়ে সিলেট জাফলং, মাধবকুন্ড শিক্ষা সফরে সিলেট সরকারি মাদ্রাসা হল রুমে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী

পবিত্র ঈদুল আজহার পরদিন শহীদ সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম ভাইয়ের বাসায় ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন মহানগরী নেতৃবৃন্দ

ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সম্মানে ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় গবেষণা সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ এনামুল কবির

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ফুটবল টুর্নামেন্ট সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিমসহ মহানগরী নেতৃবৃন্দ

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ফুটবল টুর্নামেন্ট শুভ উদ্বোধন করছেন তৎকালীন মহানগরী সভাপতি ও সেক্রেটারি মনির উদ্দিন মণি ও ইয়াছিন আরাফাত

www.pathagar.com

পবিত্র ঈদুল আজহার পরদিন শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন ভাইয়ের বাসায় ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ফুটবল টুর্নামেন্ট সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের উপহার দিচ্ছেন সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল জব্বারসহ মহানগরী নেতৃবৃন্দ

শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন ভাইয়ের বাসায় শহীদদের পরিবারের সাথে ইফতার পূর্ব দোয়া করছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা: ফখরুদ্দিন মানিক

রামপুরা থানার শিক্ষা সফর

সদস্য ভাইদের নিয়ে সিলেট জাফলং শিক্ষা সফরের একটি মুহূর্ত

২০০৯ সালে আন্তঃথানা ফুটবল টুর্নামেন্ট সমাপনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন মহানগরী সভাপতি মরহুম আরিফ মাঈন উদ্দিনসহ মহানগরী নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

কুরবানীর গোশত বিতরণ কর্মসূচিতে কুরবানীর গরু জবেহ করার একটি মুহূর্ত

মহানগরীর কুরবানীর গরু জবেহ করছেন মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা

গরু কুরবানী করার সময় বিদেশি মেহমানদের সাথে আলাপচারিতায় কেন্দ্রীয় গবেষণা সম্পাদক শেখ মুহাম্মদ এনামুল কবির ও মহানগরী সভাপতির রাশেদুল হাসানা রানা

গরিব ও অসহায় মানুষের মাঝে কুরবানীর গোশত বিতরণ করছেন মহানগরী সভাপতি রাশেদুল হাসান রানা ও মহানগরী সেক্রেটারি রেজাউল হক রিয়াজ

রামপুরা থানায় ফুটবল খেলার উদ্বোধন করছেন তৎকালীন মহানগরী সেক্রেটারি ইয়াছিন আরাফাত ও থানা সভাপতি জহুরুল হক সোহেল

জাগরণ শিল্পীগোষ্ঠীর সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালার উদ্বোধন করছেন তৎকালীন মহানগরী সভাপতি ইয়াছিন আরাফাত

www.pathagar.com

الله أكبر